শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]　　　　স্বামী সারদা

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥

গীতা। ১৮—৬৪।

ভাবসমাধি দর্শন ও সাধনাদি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত 'গোপালের মার' অদ্ভুত দর্শনাদির কথা আমরা পাঠককে উপহার দিয়াছি। কিন্তু ভয় হইতেছে পাছে পাঠক উহার বিপরীত অর্থ বুঝিয়া ফেলেন। যাঁহারা মনে করিবেন, আমরা উহা অতিরঞ্জিত করিয়াছি, তাহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা উহাতে মুন্সিয়ানা কিছুই ফলাই নাই—এমন কি ভাষাতে পর্য্যন্ত নহে—যেমন সংগ্রহ করিয়াছি, তেমনই ধরিয়া দিয়াছি এবং সংগ্রহও করিয়াছি এমন সব লোকের নিকট হইতে, যাঁহারা সকল বিষয়ে যথাযথ বলিবার সম্পূর্ণ চেষ্টা পাইয়া থাকেন, না পারিলে অনুতপ্ত হন এবং 'কামারহাটির বামুনির' স্তাবক হওয়া দূরে যাউক, কখন কখন তদনুষ্ঠিত কোন কোন আচরণের তীব্র সমালোচনা আমাদের নিকট করিয়াছেন।

আর এক দল যাঁহারা ভাবিবেন, ঐরূপ দর্শনাদি হওয়া অসম্ভব বা মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত, তাঁহাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, সাধারণ মানবে যাহা উপলব্ধি করে না, তাহাকেই আমরা সচরাচর 'বিকার' বলিয়া থাকি কিন্তু ধর্ম্মজগতের সূক্ষ্ম উপলব্ধিসমূহ কখনই সাধারণ মানবমনের অনুভবের বিষয় হইতে পারে না; উহাতে শিক্ষা, দীক্ষা ও নিরন্তর অভ্যাসাদির প্রয়োজন। ঐ সকল অসাধারণ দর্শন ও অনুভবাদি সাধককে [illegible]বিত্রতর করে ও নিত্য নূতন বলে বলীয়ান্ এবং নব নব ভাবে পূর্ণিত [illegible]রিয়া ক্রমে চিরশান্তির অধিকারী করে। অতএব ঐ সকল দর্শনাদিকে [illegible]কার' বলা যুক্তিসঙ্গত কি? 'বিকার'মাত্রই যে মানবকে দুর্ব্বল করে [illegible]হার বুদ্ধিশুদ্ধি হ্রাস করে, এ [illegible] সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ৮

ও সম্পূর্ণ বিপরীত এবং উহাদিগকে মস্তিষ্ক-বিকার বা রোগ চলে না।

বিশেষ ধর্ম্মানুভূতি সকল ঐরূপ দর্শনাদি দ্বারাই চিরকাল অনুভূত সিয়াছে। তবে যতক্ষণ না মনের সকল বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া মানব ল্প অবস্থায় উপনীত ও অদ্বৈতভাবে অবস্থিত হয়, ততক্ষণ সে ধর্ম্মের সীমায় উপস্থিত হইতে বা চিরশান্তির অধিকারী হইতে পারে না। মকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন—'একটা কাঁটা ফুটেছে, আর একটা কাঁটা পূর্ব্বের সেই কাঁটাটা তুলে ফেলে, দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।' ক ভুলিয়া এই জগৎ-রূপ বিকার উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল শব্দরূপরসাদির অনুভবরূপ বিকার ধর্ম্মজগতের পূর্ব্বোক্ত দর্শনানুভবাদির দ্বারা প্রতিহত হইয়া মানবকে ঐ অদ্বৈতানুভূতিতে উপস্থিত করে। তখন 'রসো বৈ সঃ' এই ঋষিবাক্যের উপলব্ধি হইয়া মানব ধন্য হয়। ইহাই প্রণালী। ধর্ম্মজগতের যত কিছু মত, অনুভব, দর্শনাদি, সব ঐ লক্ষ্যেই মানবকে অগ্রসর করে। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজি ঐ সকল দর্শনাদিকে, সাধক লক্ষ্যাভিমুখে কতদূর অগ্রসর হইল, তাহারই পরিচায়কস্বরূপ (milestones on the way to progress) বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। অতএব পাঠক যেন না মনে করেন, ঐ সকল দর্শনাদিতেই ধর্ম্মের 'ইতি' হইল। তাহা হইলে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে সাধকেরা ধর্ম্মজগতে ঐরূপ বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াই লক্ষ্য হারাইয়াছিলেন এবং লক্ষ্য হারাইয়াই পরস্পরের প্রতি দ্বেষহিংসাদিতে পূর্ণিত হইয়াছিলেন। শ্রীভগবানে ভক্তি করিতে যাইয়া ঐ ভ্রম উপস্থিত হইলেই মানুষ 'গোঁড়া' 'একঘেয়ে' হয়। ঐ দোষই ভক্তি-পথের বিষম কণ্টকস্বরূপ এবং মানবের 'হীনবুদ্ধি'-প্রসূত।

আর এক কথা, ঐরূপ দর্শনাদির আলোচনা করিতে যাইয়া অনেকে বুঝিয়া বসেন, যাহার ঐরূপ দর্শনাদি হয় নাই, সে আর ধার্ম্মিক নহে। ধর্ম্ম ও লক্ষ্যবিহীন-অদ্ভুত-দর্শন-পিপাসা (miracle-mongering) তাঁহাদের নিকট একই ব্যাপার বলিয়া প্রতিভাত হয়। উহাতে ধর্ম্মলাভ না হইয়া মানব দিন দিন সকল বিষয়ে দুর্ব্বলই হইয়া থাকে। যাহাতে একনিষ্ঠ বুদ্ধি চরিত্রবল না আসে, যাহাতে মানব পবিত্রতার দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়াইয়া ত্যের জন্য সমগ্র জগৎকে তুচ্ছ করিতে [illegible] যাহাতে কামগন্ধহীন [illegible]

ং প্রথম প্রথম ধ্যানের সময় ইষ্টমূর্ত্তির নানাভাবে সন্দর্শন করিতে গলেন। যেমন যেমন দেখিতেন, কয়েক দিন অন্তর দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে জানাইতেন। ঠাকুরও শুনিয়া বলিতেন, 'বেশ হইয়াছে' া 'এইরূপ করিস্' ইত্যাদি। পরে একদিন ঐ বন্ধুটি ধ্যানের সময় দেখিলেন, যত প্রকার দেবদেবীর মূর্ত্তি, একটির অঙ্গে মিলিত হইয়া গেল। ঠাকুরকে ঐকথা নিবেদন করায় ঠাকুর বলিলেন—'যা, তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হইয়া গেল। ইহার পর আর দর্শন হবে না।' আমাদের বন্ধু বলেন, 'বাস্তবিকও তাহাই হইল—আর ধ্যান করিতে করিতে কোন মূর্ত্ত্যাদি দেখিতে পাইতাম না। শ্রীভগবানের সর্ব্বব্যাপিত্বাদি অন্য প্রকারের উচ্চ ভাব আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত; আমার তখন মূর্ত্তি দর্শনাদি করা বেশ লাগিত, যাহাতে আবার ঐরূপ দর্শনাদি হয়, তাহার চেষ্টাও খুব করিতাম, কিন্তু করিলে কি হবে, কিছুতেই আর কোন মূর্ত্তির দর্শন হইত না।'

সাকারবাদি ভক্তদের বলিতেন—"ধ্যান কর্‌বার সময় ভাব্‌বে যেন মনকে রেশমের রশি দিয়ে ইষ্টের পাদপদ্মে বেঁধে রাখ্‌চ, সেখান থেকে আর কোথাও যেতে না পারে। রেশমের দড়ি বল্‌ছি কেন?—সে পাদপদ্ম যে বড় নরম। অন্য দড়ি দিয়ে বাধলে লাগ্‌বে—তাই।" আবার বলিতেন—"ধ্যান কর্‌বার সময় ইষ্টচিন্তা কোবে তারপর কি অন্য সময় ভুলে থাক্‌তে হয়? কতকটা মন সেই দিকে সর্ব্বদা রাখ্‌বে। ওগো, দুর্গাপূজার সময় একটা যাগ্‌-প্রদীপ জ্বালতে হয়। ঠাকুরের কাছে সর্ব্বদা একটা জ্যোৎ (জ্যোতি) রাখ্‌তে হয়, সেটাকে নিব্‌তে দিতে নেই। নিব্‌লে—গেরস্তর অকল্যাণ হয়। সেই রকম হৃদয়পদ্মে ইষ্টকে এনে বসিয়ে তাঁর চিন্তারূপ যাগ-প্রদীপ সর্ব্বদা জ্বেলে রাখ্‌তে হয়। সংসারের কাজ কর্‌তে কর্‌তে মাঝে মাঝে ভিতরে চেয়ে দেখ্‌তে হয়, সে প্রদীপটা জ্বলচে কি না?"

আবার বলিতেন—"ওগো, তখন তখন ইষ্টচিন্তা কর্‌বার আগে ভাবতুম যেন মনের ভিতরটা বেশ করে ধুয়ে দিচ্চি! মনের ভিতর নানান্ আবর্জ্জনা ময়লা মাটি (চিন্তা বাসনা ইত্যাদি) থাকে কিনা? সেগুলো সব বেশ করে ধুয়ে ধেয়ে সাফ্ করে তার ভিতর ইষ্টকে এনে বসাচ্চি! এই রকম কোরো!"—ইত্যাদি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক সময়ে শ্রীভগবানের সাকার ও নিরাকার ভাব চিন্তা আমাদের বলেন যে 'কেহবা সাকার দিয়ে নিরাকারে পৌঁছায়, আবার

দের জীবনে হইয়াছে আর কি!—শরণাগত হইয়া থাকাই দেখিতেছি আম দের একমাত্র উপায়। তাহাতেও কিছুদিন বাদে দেখি—বিষম প্যাঁ সেখানেও মন বলে, আমি অমুকের অপেক্ষা ছোট ভক্ত কিসে? আমা কেন ঠাকুর সকলের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিবেন না? অন্ততঃ নরে নাথকে যেমন ভালবাসেন, আমাকে কেন না তেমন ভালবাসিবেন? ইত্যাদি!

এইরূপে, 'ভাবমুখে থাক্'—শ্রীশ্রীজগদম্বার এই কথা শুনার পরে উচ্চ অদ্বৈত-ভাবভূমী হইতে নামিয়া আসিয়াই ঠাকুরের সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসোপলব্ধি সাধনা এবং তৎপরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি। তাহার অনেক দিন পরে যখন ভক্তেরা অনেকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তখন একদিন ঠাকুরের ভাবাবস্থায় ইচ্ছা হয়, ভক্তদেরও ভাবসমাধি হউক এবং জগদম্বার নিকট ঐ বিষয়ে প্রার্থনাও করেন। তাহার পরই ভক্তদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও ঐরূপ হইতে থাকে। ঐরূপ ভাবাবস্থায় তাঁহাদের বাহ্য-জগত ও দেহাদি বোধ কতকটা কমিয়া যাইয়া ভিতরের কোন একটি বিশেষ ভাবপ্রবাহ, যথা, কোন মূর্ত্তিচিন্তা, এত পরিস্ফুট হইত, যে ঐ মূর্ত্তি যেন জলন্ত জীবন্তরূপে তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন ইত্যাদি, তাঁহারা দেখিতে পাইতেন। ভজনসংগীতাদি শুনিলেই তাঁহাদের প্রধানতঃ ঐরূপ হইত।

ঠাকুরের আর এক দল ভক্ত ছিলেন, যাঁহাদের সঙ্গীতাদি শুনিলে ওরূপ হইত না কিন্তু ধ্যানাদি করিবার কালে দেবমূর্ত্ত্যাদির সন্দর্শন হইত। প্রথম প্রথম দর্শনাদি হইত, পরে ধ্যান যত গাঢ় গভীর হইতে থাকিত, তত ঐ সকল মূর্ত্তির নড়াচড়া কথা কওয়া ইত্যাদিও দর্শন হইত। আবার কেহ কেহ প্রথম প্রথম নানাপ্রকার দর্শনাদি করিতেন কিন্তু ধ্যান আরও গভীর-ভাব প্রাপ্ত হইলে আর ঐরূপ দর্শনাদি করিতেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইঁহাদের প্রত্যেকের দর্শন ও অনুভবাদির কথা শ্রবণ করিয়াই বুঝিতেন, কে কোন্ থাকের বা শ্রেণীর এবং কাহার পক্ষে কি প্রয়োজন এবং পরেই বা তাঁহারা প্রত্যেকে কি দর্শনাদি করিবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এখানে একজনের কথাই বলি। আমাদের একটি বন্ধু* শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া ধ্যানাদি করিতে আরম্ভ করিলেন

* স্বামী অভেদানন্দ।

.খে মুখে খাবার গুঁজে দিত। এই রকমে কোন দিন একটু আধটু পেটে যেত, কোন দিন যেতো না! এই ভাবে ছ মাস গেছে! তার পর এই অবস্থার কতদিন পরে শুন্‌তে পেলুম, মার কথা—'ভাবমুখে থাক্, লোকশিক্ষার জন্য ভাবমুখে থাক্!' তার পর অসুখ হল, রক্ত আমাশয়, পেটে খুব মোচোড়, খুব যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণায় প্রায় ছ মাস ভুগে ভুগে তবে শরীরে একটু একটু করে মন নাব্‌লো—সাধারণ মানুষের মত হুঁস এলো! নতুবা থাক্‌চে থাক্‌চে আর মন সেই নির্বিকল্প অবস্থায় চলে যাচ্চে।" বাস্তবিক তাঁহার শরীর-ত্যাগের দশ বার বৎসর পূর্ব্বেও দর্শনলাভ যাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি, তখনও ঠাকুরের কথাবার্ত্তা শুনা বড় একটা তাঁহা-দের হইয়া উঠিত না। চব্বিশ ঘণ্টা ভাবসমাধি লাগিয়াই আছে—কথা কহিবে কে? নেপাল রাজসরকারের প্রধান কর্ম্মচারী শ্রীবিশ্বনাথ উপা-ধ্যায়—যাহাকে ঠাকুর "কাপ্তেন" বলিয়া ডাকিতেন—মহাশয়ের মুখে আমরা শুনিয়াছি, তিনি একাদিক্রমে তিন অহোরাত্র ঠাকুরকে নিরন্তর সমাধিমগ্ন হইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন! তিনি আরও বলিয়াছিলেন, ঐরূপ বহুকালব্যাপী গভীর সমাধির সময় ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে—গ্রীবাদেশ হইতে মেরুদণ্ডের শেষ পর্য্যন্ত এবং জানু হইতে পদতল পর্য্যন্ত, উপর হইতে নিম্নের দিকে—গব্যঘৃত মধ্যে মধ্যে মালিস করা হইত এবং ঐরূপ করা হইলে সমাধির উচ্চভাবভূমী হইতে 'আমি আমার' রাজ্যে আবার নামিতে ঠাকুরের সুবিধা বোধ হইত।

আমাদের নিকট ঠাকুর কতদিন স্বয়ং বলিয়াছেন—"এখানকার মনের স্বাভাবিক গতিই উর্দ্ধদিকে (নির্ব্বিকল্পের দিকে)। সমাধি হলে আর নাম্‌তে চায় না। তোদের জন্য জোর করে নামিয়ে আনি। কোন একটা নিচেকার বাসনা না ধর্‌লে নাম্‌বার ত জোর হয় না, তাই 'তামাক খাব,' 'জল খাব', 'সুক্তো খাব', 'অমুককে দেখ্‌ব, কথা কইব', এইরূপ একটা ছোট খাট বাসনা মনে তুলে, বার বার সেইটে আওড়াতে আওড়াতে তবে মন ধীরে ধীরে নিচে (শরীরে) নামে। আবার নাম্‌তে নাম্‌তে হয়ত সেই দিকে (উর্দ্ধে, চোঁচায় দৌড়ুল!" আবার তাকে তখন ঐরূপ বাসনা দিয়ে ধরে নামিয়ে আন্‌তে হয়!"—চমৎকার ব্যাপার! শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম আর ভাবিতাম—'অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর,' এ কথার যদি ঐ মানে হয়, তাহা হইলেই ঐরূপ করা আমা-

ঠাকুর বলিতেন—“মন কুড়িয়ে এক করে যাই এনেচি আর ‘মার’ মূ এসে সামনে দাঁড়াল!—আর তার পারে যেতে ইচ্ছা হয় না! শেষ মনে খুব জোর এনে জ্ঞানকে ‘অসি’ ভেবে সেই অসি দিয়ে ঐ মূর্ত্তিও মনে মনে দুখানা করে কেটে ফেল্লুম. তখন মনে আর কিছুই রহিল না; হু হু করে একেবারে নির্ব্বিকল্প অবস্থায় পৌছুল!” আমাদের কাছে এগুলি যেন অর্থহীন কথার কথা মাত্র। কারণ, কখন ত জগদম্বার কোন মূর্ত্তি ঠিক ঠিক আপনার করিয়া লই নাই। কখন তো কাহাকেও সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে শিখি নাই। সে পূর্ণ ভালবাসা, মনের অন্তস্থল পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া ভালবাসা রহিয়াছে—আমাদের এই মাংসপিণ্ড শরীর ও মনের উপর। তাই মৃত্যুতে বা মনের হঠাৎ একটা আমূল পরিবর্ত্তনে এত ভয়! ঠাকুরের তো তাহা ছিল না। সংসারে একমাত্র জগদম্বার পাদপদ্মই মনে জ্ঞান সার জানিতেন এবং সেই পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া তাঁহার শ্রীমূর্ত্তির দিবানিশি সেবা করিয়াই কাল কাটাইতেছিলেন - কাজেই ঐ মূর্ত্তিকে যখন কোন প্রকারে মন হইতে সরাইয়া ফেলিলেন, তখন আর মন কি লইয়া সংসারে থাকিবে?—একেবারে আলম্বনবিহীন হইয়া, বৃত্তিরহিত হইয়া, নির্ব্বিকল্প অবস্থায় যাইয়া দাঁড়াইল। পাঠক, এ কথা বুঝিতে না পার, একবার কল্পনা করিতে চেষ্টা করিও। তাহা হইলেই বুঝিবে, ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে কতদূর আপনার করিয়াছিলেন, কি “পাঁচ সিকে পাঁচ আনা” মন দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন।

এই নির্ব্বিকল্প অবস্থায় প্রায় নিরন্তর থাকা ঠাকুরের ছয় মাস ব্যাপিয়া ছিল। ঠাকুর বলিতেন—“যে অবস্থায় সাধারণ জীবেরা পৌঁছুলে আর ফিরতে পারে না, একুশ দিন মাত্র শরীরটে থেকে শুক্‌নো পাতা যেমন গাছ থেকে খসে পড়ে তেমনি পড়ে যায়, সেইখানে ছ মাস ছিলুম! কখন দিন আস্‌ত, রাত যেত, তার ঠিকানাই ছিল না! মরা মানুষের নাকে মুখে যেমন মাছি ঢোকে, তেমনি ঢুক্‌তো কিন্তু সাড় হ’ত না! চুলগুলো ধূলোয় ধূলোয় জটা পাকিয়ে গিয়েছিল! হয়ত অসাড়ে শৌচাদি হয়ে গেছে, তার হুঁস নেই! শরীরটে কি আর থাক্‌ত?—এই সময়েই যেত। তবে এই সময়ে একজন সাধু এসেছিল। তার হাতে রুলের মত একগাছা লাঠি ছিল। সে অবস্থা দেখেই চিনেছিল আর বুঝেছিল—এ শরীরটে দিয়ে মার অনেক কাজ আছে, এটাকে রাখ্‌তে পারলে অনেক লোকের কল্যাণ হবে। তাই খাবার সময় খাবার এনে মেরে মেরে হুঁস আন্‌বার চেষ্টা কর্‌ত। একটু হুঁস হচ্চে

অতএব শারীরিক বিকার এবং দর্শনাদিই যে ভাবের গভীরতার ধ্রুব লক্ষণ, তাহাও নহে। ভাবের গভীরতার যদি পরিমাণের আবশ্যক হয়, তবে পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি, নিষ্ঠা, ত্যাগ, চারিত্রবল, বিষয়কামনার হ্রাস প্রভৃতি দেখিয়াই অনুমান করিতে হইবে। ভাবসমাধিতে কত খাদ আছে, তাহা কেবল ঐ কষ্টি পাথরেই পরীক্ষিত হইতে পারে, নতুবা আর অন্য উপায় নাই। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহারা সকল প্রকার বিষয়বাসনা বর্জ্জিত হইয়া শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ভিতরেই কেবল শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর—যে কোন ভাবের যথাযথ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ ছবি দেখিতে পাওয়াই সম্ভব; যাহারা কামকাঞ্চন-বাসনাবিজড়িত তাহাদে ভিতর নহে। কামান্ধ, কামনার টানই বুঝে—কামগন্ধরহিত যে মনে আবেগ, তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে?

ভাব-সমাধির দার্শনিক তত্ত্ব শ্রীগুরুর মুখ হইতে আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহাই সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করিলাম। কথাগুলি যদি পাঠককে বুঝাইতে পারিয়া থাকি, তবে আর বলিয়া দিতে হইবে না,—'গোপালের মার' ভাব ও দর্শনাদির ঠাকুর কেন এত প্রশংসা করিতেন ও উচ্চ স্থান দিতেন।

আর এ টি কথা এখানে বলিয়াই আমরা ভাবসমাধির দার্শনিক তত্ত্বের 'ইতি' করিব। উপরে শান্ত দাস্যাদি ও অদ্বৈতভাবোপলব্ধির তারতম্য সাধক-দিগের মধ্যে লক্ষিত হওয়া সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইল, তাহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে, ঈশ্বরাবতারেরাও ভাবরাজ্যে কোনরূপ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকেন। তাঁহারা শান্ত দাস্যাদি যখন যে ভাব ইচ্ছা, পূর্ণমাত্রায় প্রদর্শন করিতে পারেন আবার অদ্বৈতভাবাবলম্বনে শ্রীভগবানের সহিত একত্বানুভবে এতদূর অগ্রসর হইতে পারেন যে, জীবন্মুক্ত, নিত্যমুক্ত বা ঈশ্বর-কোটি কোন প্রকার জীবেরই তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে। রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপের সহিত অতদূর একত্বে অগ্রসর হইয়া আবার তাহা হইতে বিযুক্ত হওয়া এবং 'আমি আমার' রাজ্যে পুনরায় নামিয়া আসা—জীবের কখনই সম্ভবপর নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন—'এখানকার অবস্থা (উপলব্ধি) বেদবেদান্তে যা লেখা আছে তা ঢের ছাড়িয়ে চলে গেছে!' সেজন্যই তিনি ব) প্রায় নিরন্তর ছয়মাস কাল অদ্বৈতভাবে পূর্ণরূপে অবস্থা আবার 'বহুজনহিতায়' 'লোকশিক্ষা'র জন্য 'আমি আমার'

শ্রীমদ্ তোতাপুরীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর ঠাকুরের তৃতীয় দিবসে বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত নির্ব্বিকল্প সমাধি বা শ্রীভগবানের সহিত অদ্বৈতভাবে অবস্থানের চরম উপলব্ধি হয়—একথা এখন সকলেই জানেন। সে সময় ঠাকুরের তন্ত্রোক্ত সকল প্রকার সাধন হইয়া গিয়াছে এবং যিনি ঐ সকল সাধনার সময় বৈধী দ্রব্যাদি সংগ্রহ, ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবহার প্রণালী প্রভৃতি দেখাইয়া সহায়তা করিয়াছিলেন, সে বিদুষী ভৈরবীও (ঠাকুর ইঁহাকে আমাদের নিকট 'বাম্‌নি' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন) দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট বাস করিতেছেন। কারণ, ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি, উক্ত 'বাম্‌নি' বা ভৈরবী তাঁহাকে শ্রীমদ্ তোতাপুরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশা-মিশি করিতে নিষেধ করিয়া বলিতেন—'বাবা, ওর সঙ্গে অত মেশামিশি করো না, ওদের সব শুকনো ভাব; ওর অত সঙ্গ করলে তোমার ভাব প্রেম আর কিছু থাকবে না।' বলা বাহুল্য, ঠাকুর ঐ কথায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অহর্নিশি তখন বেদান্ত বিচার ও উপলব্ধিতে নিমগ্ন থাকিতেন।

এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া শ্রীমদ্ তোতাপুরী চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের তখন দৃঢ়সঙ্কল্প হইল—আর 'আমি আমার' রাজ্যে না থাকিয়া নিরন্তর শ্রীভগবানের সহিত একত্বানুভবে বা অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান করিব। সে এক অপূর্ব্ব কথা—ঠাকুরের শরীরটা যে আছে, তার আদৌ হুঁস নাই; খাইব, শুইব, শৌচাদি করিব—এ সকল কথারও মনে উদয় নাই তো অপরের সহিত কথাবার্ত্তা কহিব, সে তো অনেক দূরের কথা! সেখানে 'আমি আমার'ও নাই—আর 'তুমি তোমার'ও নাই;—'দুই' নাই; 'এক'ও নাই! কারণ, 'দুই'র স্মৃতি থাকিলে তবে তো 'এক'র উপলব্ধি হইবে?—মনের সব বৃত্তি স্থির—স্থির—শান্ত!—কেবল—

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরুপমমতিবেলং প্রখ্যমাখ্যাবিহীনং
নিরবধি গগনাভং নিত্যমুক্তং নিরীহং

* * * *

প্রকৃতি-বিকৃতিশূন্যং ভাবাতীতঞ্চ ভাবং

* * * *

কেবল আনন্দ! আনন্দ!—তার দিক্ নাই, দেশ নাই, রূপ নাই, নাম না[illegible]

ব'লে তার কর্ম্মচারীর নিকট হ'তে চেয়ে নিয়ে যাচ্ছি। কর্ম্মচারীর শম্ভুর মে ব্যতীত দেওয়া উচিত নয়, আর আমারও শম্ভু যেমন বলিয়াছে, তাহার নকট হইতেই লওয়া উচিত। নহিলে যে ভাবে আমি আফিম লইয়া যাইতেছি, হাতে মিথ্যা ও চুরি এই দুটী দোষ হচ্চে—সেজন্যই মা আমায় অমন করে ঘারাচ্চেন, ফিরে যেতে দিচ্চেন না!" এই মনে করিয়া শম্ভু বাবুর ঔষধালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন, সেখানে সে কর্ম্মচারীও নাই—সেও ভিতরে খাইতে গিয়াছে। কাজেই জানালা গলাইয়া আফিমের মোড়কটি ঔষধালয়ের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—'ওগো এই তোমাদের আফিম রহিল'। বলিয়া রাসমণির বাগানের দিকে চলিলেন। এবার যাইবার সময় আর তেমন ঝোঁক নাই; রাস্তাও বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে; বেশ চলিয়া গেলেন! ঠাকুর বলিতেন—"যার উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়েছি কিনা?" তাই মা হাত ধরে আছেন। এতটুকু বেচালে পা পড়তে দেন না! ঐরূপ কতই না দৃষ্টান্ত আমরা ঠাকুরের জীবনে শুনিয়াছি! চমৎকার কারখানা, আমরা কি এ সত্যনিষ্ঠা এ সর্ব্বাঙ্গীণ নির্ভরতার এতটুকু কল্পনায়ও অনুভব করিতে পারি, ইহা কি তাহাই, ঠাকুর যাহা বলিতেন—"ওদেশে (ঠাকুরের জন্মস্থান, কামারপুকুরে) মাঠের মাঝে আলপথ আছে। তার উপর দিয়ে সকলে এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে যায়। সরু আল্ কি না? পাছে পড়ে যায়, বাপ ছোট ছেলেটিকে কোলে করেছে আর বড় ছেলেটি সেয়ানা বলে বাপের হাত ধরে যাচ্চে। এমন সময় হয়ত একটা শঙ্খচিল বা আর কিছু দেখে ছেলেগুলো আহ্লাদে হাততালি দিচ্ছে। কোলের ছেলেটি জানে বাপ আমায় ধরে আছে, নির্ভয়ে আনন্দ করতে করতে চলেছে। আর যে ছেলেটা বাপের হাত ধরে যাচ্ছিল, সে যেই পথের কথা ভুলে বাপের হাত ছেড়ে হাততালি দিতে গেছে আর অমনি টিপ করে পড়ে গিয়ে কেঁদে উঠলো। সেই রকম মা যার হাত ধরেছে, তার আর ভয় নেই; আর যে মার হাত ধরেছে, তার ভয় আছে—হাত ছাড়লেই পড়ে যাবে।"

এইরূপে কোন 'পেছটান' ছিল না বলিয়াই নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভের পথে সাংসারিক কোনরূপ বাসনা-কামনা ঠাকুরের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় নাই। দাঁড়াইয়াছিল—কেবল যাঁহার এতকাল ভক্তিভরে পূজা করিয়া, ভালবাসিয়া সারাৎসারা পরাৎপরা বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিতেছিলেন—শ্রীশ্রীজগদম্বার সেই 'সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী' মূর্ত্তি!

চারিজন 'রসদ্দারের' ভিতর দ্বিতীয় রসদ্দার বলিয়া ঠাকুর নির্দ্দেশ করিতেন রাণী রাসমণির কালিবাটির নিকটেই তাঁহার একখানি বাগান ছিল উহাতে তিনি ভগবদ্‌চর্চ্চায় ঠাকুরের সঙ্গে অনেক কাল কাটাইতেন। ঐ বাগানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি দাতব্য ঔষধালয়ও ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পেটের অসুখ অনেক সময়ই দেখা দিত। একদিন ঐরূপ পেটের অসুখের কথা শম্ভু বাবু জানিতে পারিয়া তাঁহাকে একটু আফিম সেবন করিতে ও রাসমণির বাগানে ফিরিবার সময় উহা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া যাইতে পরামর্শ দেন। তারপর কথাবার্ত্তায় ঐ কথা দুইজনেই ভুলিয়া যান। শম্ভু বাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পথে আসিয়া ঠাকুরের ঐ কথা মনে পড়ে। শম্ভু বাবু তখন অন্দরে গিয়াছেন। সেজন্য ঠাকুর আর তাঁহাকে না ডাকাইয়া তাঁহার কর্ম্মচারীর নিকট হইতে একটু আফিম চাহিয়া লইয়া রাসমণির বাগানে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু পথে আসিয়াই ঠাকুরের কেমন একটা ঝোঁক আসিয়া পথ আর দেখিতে পাইলেন না। রাস্তার পাশে যে জলনালা আছে, তাহাতে যেন কে পা টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল! ঠাকুর ভাবিলেন—এ কি? এ তো পথ নয়? অথচ পথও খুঁজিয়া পান না। অগত্যা কোনরূপে দিক্ ভুল হইয়াছে ঠাওরাইয়া, পুনরায় শম্ভু বাবুর বাগানের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—সে দিকের পথ বেশ দেখা যাইতেছে। ভাবিয়া চিন্তিয়া পুনরায় শম্ভু বাবুর বাগানের ফটকে আসিয়া সেখান হইতে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া পুনরায় সাবধানে রাসমণির বাগানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু দুই এক পা আসিতে না আসিতে আবার পূর্ব্বের মত হইল—পথ আর দেখিতে পান না! বিপরীত দিকে যাইতে পা টানে! এইরূপ কয়েকবার হইবার পর ঠাকুরের মনে উদয় হইল—"ওঃ, শম্ভু বলেছিল, 'আমার নিকট হতে আফিম চেয়ে নিয়ে যেও,' তা না ক'রে আমি তাকে

* পূর্ব্বপ্রবন্ধে আমরা ঠাকুরের পরম ভক্ত বাগবাজারের ৺বলরাম বসু মহাশয়কে দ্বিতীয় রসদ্দার বলিয়া ভুলক্রমে নির্দ্দেশ করিয়াছি। ৺শম্ভুচন্দ্র মল্লিকই দ্বিতীয় রসদ্দার। বলরাম বাবুকে ঠাকুর রসদ্দারদিগের মধ্যে নির্দ্দেশ করিতেন না; চৈতন্যদেবের সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের ভিতর তাঁহাকে দেখিয়াছিলেন, এই কথাই বলিতেন। এতদ্ভিন্ন 'গোপালের মা'কে বলরামবাবুর বাটীতে ১৮৮৫ খৃঃ রথের দিনে আনয়ন করা হয়, ইহাও অনুসন্ধানে প্রমাণিত হইল, ইহাও উল্লেখযোগ্য।

যে জিনিস লইব বলিয়াছেন, তাহার নিকটে ভিন্ন অপর কাহারও নিকটে তাহা লইতে পারেন নাই। যে দিন বলিয়াছেন, আর অমুক জিনিসটা খাইব না বা অমুক কাজ আর করিব না, সে দিন হইতে আর তাহা খাইতে বা করিতে পারেন নাই।)

ঠাকুর বলিতেন –'যার সত্য নিষ্ঠা আছে, সে সত্যের ভগবান্‌কে পায়। যার সত্যনিষ্ঠা আছে, মা তার কথা কখনও মিথ্যা হতে দেন না।' বাস্তবিকও ঐ বিষয়ের কতই না দৃষ্টান্ত আমরা তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি! দক্ষিণেশ্বরে একদিন গোপালের মা ঠাকুরকে ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইবেন। সব প্রস্তুত—ঠাকুর খাইতে বসিলেন। বসিয়া দেখেন, ভাতগুলি শক্ত রহিয়াছে—সুসিদ্ধ হয় নাই। ঠাকুর বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন—'এ ভাত কি আমি খেতে পারি? ওর হাতে আর কখন ভাত খাব না।' ঠাকুরের মুখ দিয়া ঐ কথাগুলি বাহির হওয়ায় সকলে ভাবিলেন, ঠাকুর গোপালের মাকে ভবিষ্যতে সতর্ক করিবার নিমিত্ত ঐরূপ বলিয়া ভয় দেখাইলেন মাত্র, নতুবা গোপালের মাকে যেরূপ আদর যত্ন করেন, তাহাতে তাঁহার হাতে আর খাইবেন না –ইহা কি হইতে পারে? কিছুক্ষণ বাদেই আবার গোপালের মাকে ক্ষমা করিবেন এবং ঐ কথাগুলির আর কোন উচ্চবাচ্য হইবে না। কিন্তু ফলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। কারণ, উহার অল্পকাল পরেই ঠাকুরের গলায় অসুখ হইল। ক্রমে উহা বাড়িয়া ঠাকুরের ভাত খাওয়া বন্ধ হইল এবং গোপালের মার হাতে আর একদিনও ভাত খাওয়া হইল না।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুর ভাবাবস্থায় বলিতেছেন—"এর পরে আর কিছু খাব না, কেবল পায়সান্ন, কেবল পায়সান্ন।" শ্রীশ্রীমা ঐ সময়ে ঠাকুরের খাবার লইয়া আসিতেছিলেন। ঐ কথা শুনিতে পাইয়া এবং ঠাকুরের শ্রীমুখ দিয়া যে কথা যখনি নির্গত হয়, তাহা কখনই নিরর্থক হয় না জানিয়া, ভয় পাইয়া বলিলেন—"আমি মাছের ঝোল ভাত রেঁধে দেব, খাবে।—পায়েস কেন?" ঠাকুর (ঐরূপ ভাবাবস্থায় জোর করিয়া)—"না—পায়সান্ন!" তাহার অল্পকাল পরেই ঠাকুরের গলদেশে অসুখ হওয়ায় বাস্তবিকই আর কোনরূপ ব্যঞ্জনাদি খাওয়া চলিল না!—কেবল দুধ ভাত, দুধ বার্লি ইত্যাদি খাইয়াই কাল কাটিতে লাগিল।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ দানশীল ধনী ৺শম্ভুচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ই ঠাকুরের

র্ব্বচনীয় আনন্দে মনবুদ্ধির গোচরে অবস্থিত যত প্রকার ভাবরাশি আছে, সে সকলের অতীত এক প্রকার ভাবাতীত ভাবে অবস্থিত!—যাহাকে শাস্ত্র 'আত্মায় আত্মায় রমণ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন!

ঠাকুর বলিতেন, বেদান্তের নির্ব্বিকল্প সমাধি উপলব্ধিতে উঠিবার পথে সংসারের কোনও পদার্থ বা সম্বন্ধই তাঁহার অন্তরায় হয় নাই। কারণ, পূর্ব্ব হইতেই তো তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার শ্রীপাদপদ্ম সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত যতপ্রকার ভোগ বাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন। "মা এই নে তোর জ্ঞান, এই নে তোর অজ্ঞান—এই নে তোর ধর্ম্ম, এই নে তোর অধর্ম্ম—এই নে তোর ভাল, এই নে তোর মন্দ—এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য—এই নে তোর যশ, এই নে তোর অযশ—আমায় তোর শ্রীচরণে শুদ্ধা ভক্তি দে, দেখা দে"—এই বলিয়া মন হইতে ঠিক ঠিক সকল প্রকার বাসনা-কামনা শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ভালবাসিয়া তাঁহার জন্য ত্যাগ করিয়াছিলেন। হায়, সে একাঙ্গী ভক্তি প্রেমের কথা কি আমরা উপলব্ধি দূরে থাক্, একটুও কল্পনা করিতে পারি?—আমরা মুখে যদি কখনও শ্রীভগবান্‌কে বলি 'ঠাকুর, এই নাও আমার যা কিছু সব' তো বলিবার পরই আবার কাজের সময় ঠাকুরকে তাড়াইয়া সে সব 'আমার আমার' বলিতে থাকি, লাভ লোকসান খতাই, 'লোকে কি বলিবে' ভাবিয়া আঁচোড় পাঁচড় ছুটোছুটি করি, ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবে কখন অকূলপাতারে, কখন আনন্দে ভাসি, আর মনে ঠিক ঠিক এঁটে বসে থাকি, দুনিয়াটা আমাদের উদ্যমে একেবারে উল্টে পাল্টে দেওয়া না হোক্, কতকটাও ঘুরাতে ফিরাতে পারি। ঠাকুরের তো অমন পাজি জুয়াচোর মন ছিল না—যেমন বলা, 'মা এই তোর দেওয়া জিনিস তুই নে', অমনি তখন থেকে আর সে সবের প্রতি লালসাপূর্ণ দৃষ্টি-পাত নাই। 'বলে ফেলেছি কি করি? না বল্‌লে হত'—মনের এরূপ ভাব পর্য্যন্তও নাই! তাই ঠাকুরের জীবনে দেখিতে পাই, যখনই যাহা শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দিবেন বলিয়াছেন আর তাহা কখনও 'আমার' নিজের বলিতে পারেন নাই। 'মা এই নে তোর সত্য, এই নে তোর মিথ্যা'—এ কথাটি কিন্তু বলিতে পারেন নাই। কারণ সত্য ত্যাগ করিলে "শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলাম"—এ সত্য রাখিবেন কিরূপে? সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াও কি সত্য-নিষ্ঠাই না আমরা তাঁহাতে দেখিয়াছি! যে দিন যেখানে যাইব বলিয়াছেন, সে দিন ঠিক সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন; যাহার নিকট বা হাত দিয়া

কেহবা নিরাকার দিয়ে সাকারে পৌঁছায়।’ ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের বাড়িতে বসিয়া একদিন আমাদের এক বন্ধু* ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন—‘মহাশয়, সাকার বড় না নিরাকার বড়?’ তাহাতে ঠাকুর বলেন—‘নিরাকার দু রকম আছে, পাকা ও কাঁচা। পাকা নিরাকার উঁচু ভাব বটে। সাকার ধরে সে নিরাকারে পৌঁছুতে হয়। কাঁচা নিরাকারে চোখ্ বুজলেই অন্ধকার—যেমন ব্রাহ্মদের †।’ পাশ্চাত্য-শিক্ষার ফলে ঐরূপ কাঁচা নিরাকার ধরিয়া সাধনায় অগ্রসর, ঠাকুরের আর এক দল ভক্তও ছিলেন। তাঁহাদের ঠাকুর ক্রীশ্চান পাদ্রিদের মত সাকার ভাব চিন্তায় নিন্দা অথবা শ্রীভগবানের সাকার মূর্ত্ত্যাদি অবলম্বনে সাধনায় অগ্রসর ভক্তদিগের ‘পৌত্তলিক’ ‘অন্ধ-বিশ্বাস’ ইত্যাদি বলিয়া দ্বেষ করিতে নিষেধ করিতেন। বলিতেন—‘ওরে তিনি সাকারও বটে আবার নিরাকারও বটে, আবার তা ছাড়া আরও কি তা কে জানে?’ ‘সাকার কেমন জানিস্—যেমন জল আর বরফ। জল জমেই বরফ হয়। বরফের ভিতরে বাহিরে জল। জল ছাড়া বরফ আর কিছুই নয়। কিন্তু ছাথ্, জলের রূপ নেই একটা কোন বিশেষ আকার নাই) কিন্তু বরফের আকার আছে। তেমনি ভক্তি হিমে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ সাগরের জল জমে বরফের মত নানা আকার ধারণ করে। ঠাকুরের ঐ দৃষ্টান্তটি যে কত লোকের মনে শ্রীভগবানের সাকার নিরাকার উভয় ভাবের একত্র এক সময়ে সমাবেশ সম্ভবপর বলিয়া ধারণা করাইয়া শান্তি দিয়াছে, তাহা বলিবার নহে।

এখানে আর একটি কথাও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ঠাকুরের কাঁচা নিরাকারবাদি ভক্তদলের ভিতর সর্ব্বপ্রধান ছিলেন—শুধু ঐ দলের কেন ঠাকুর তাঁহাকে সকল থাক্ বা শ্রেণীর সকল ভক্তদিগের অগ্রে আসন

* শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু।

† সত্যের অনুরোধে এ কথাটি আমরা বলিলাম বলিয়া কেহ না মনে করেন, ঠাকুর বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রহ্মজ্ঞানীদের নিন্দা করিতেন। কীর্ত্তনান্তে যখন সকল সম্প্রদায়ের সকল ভক্তদের প্রণাম করিতেন, তখন ‘আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম’—একথাটি তাঁহাকে বার বার আমরা বলিতে শুনিয়াছি। সুবিখ্যাত ব্রাহ্মসমাজের নেতা ভক্তপ্রবর কেশবই সর্ব্বপ্রথম ঠাকুরের কথা কলিকাতার জনসাধারণে প্রচার করেন একথা সকলেই জানেন এবং ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তদের মধ্যে শ্রীবিবেকানন্দপ্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্মসমাজের নিকট চিরঋণী, একথাও তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।

প্রদান করিতেন—শ্রীযুত নরেন্দ্র বা স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁহার তখন পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে সাকারবাদীদের উপর একটু আধটু কঠিন কটাক্ষ কখন কখন আসিয়া পড়িত। তর্কের সময়েই ঐ ভাবটি তাঁহাতে বিশেষ লক্ষিত হইত। ঠাকুর কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত সাকারবাদী কোন কোন ভক্তের ঝুটোপুটি তর্ক লাগাইয়া দিয়া মজা দেখিতেন। ঐরূপ তর্কে স্বামীজির মুখের সামনে বড় একটা কেহ দাঁড়াইতে পারিতেন না এবং কেহ কেহ মনে মনে ক্ষুণ্ণও হইতেন। ঠাকুরও সে কথা অপরের নিকট অনেক সময় আনন্দের সহিত বলিতেন—'অমুকের কথাগুলো নরেন্দর সে দিন ক্যাঁচ ক্যাঁচ্ করে কেটে দিলে! কি বুদ্ধি!' ইত্যাদি। কেবল শ্রীযুত গিরিশের সহিত তর্কে একদিন স্বামীজিকে নিরুত্তর হইতে হইয়াছিল। সে দিন ঠাকুর শ্রীযুত গিরিশের বিশ্বাস আরও দৃঢ় ও পুষ্ট করিবার জন্যই যেন তাঁহার পক্ষে ছিলেন বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছিল। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন শ্রীভগবানে বিশ্বাস সম্বন্ধে কথার সময় ঠাকুরের নিকট সাকারবাদীদের বিশ্বাসকে 'অন্ধবিশ্বাস' বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ঠাকুর তদুত্তরে তাঁহাকে বলেন—"আচ্ছা, অন্ধবিশ্বাসটা কাকে বলিস্ আমায় বোঝাতে পারিস্? বিশ্বাসের তো সবটাই অন্ধ; বিশ্বাসের আবার চক্ষু কি? হয় বল্ 'বিশ্বাস', আর নয় বল্ 'জ্ঞান।' তা নয়, বিশ্বাসের ভিতর আবার কতকগুলো অন্ধ আর কতকগুলোর চোখ আছে—এ আবার কি রকম?" স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "বাস্তবিকই সে দিন আমি ঠাকুরকে অন্ধবিশ্বাসের মানে বুঝাইতে গিয়ে ফাঁপরে পড়েছিলাম। ও কথাটার কোনও মানেই খুঁজে পাই নাই। ঠাকুরের কথাই ঠিক বলে বুঝে সেদিন থেকে আর ও কথাটা বলা ছেড়ে দিয়েছি।"

ক্রমশঃ।

স্বামী অদ্বৈতানন্দের মহাসমাধি।

গত ১৩ই পৌষ ইংরাজী ২৮শে ডিসেম্বর ১৯০৯ মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৪—১৫ মিনিটের সময় বেলুড় মঠে স্বামী অদ্বৈতানন্দ মহাসমাধিস্থ হইয়াছেন। ইনি দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুর বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনেক সেবা সুশ্রূষা করিয়াছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গের ভিতর সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। ইঁহার পবিত্র জীবনের অন্যসময়ে যথাসাধ্য আলোচনা করিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল।

স্বামি-শিষ্য সংবাদ।

(বেলুড় মঠে)

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ]

সংপ্রতি স্বামীজির শরীর বেশ সুস্থ; মঠের নূতন জমিতে যে প্রাচীন বাড়ী ছিল, তার ঘরগুলি মেরামত করিয়া সন্ন্যাসী মহারাজগণের বাসোপযোগী করা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান বাড়ী এখনো সম্পূর্ণ নির্ম্মিত হয় নাই। স্বামীজি আজ বিকালে শিষ্যকে সঙ্গে করিয়া মঠের জমিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মঠের জমি সমতল করা হইয়াছে। স্বামীজির হস্তে একটি দীর্ঘ যষ্টি, গায়ে গেরুয়া রঙ্গের ফ্লেনেলের আলখাল্লা, মস্তক অনাবৃত। শিষ্যের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে দক্ষিণ মুখে অগ্রসর হইতেছেন। দক্ষিণের ফটকে গিয়া পুনরায় উত্তরাস্যে ফিরিতেছেন। দক্ষিণ পার্শ্বে বিল্বতরুমূল বান্ধান হইয়াছে; ঐ বেলগাছের অদূরে দাঁড়াইয়া কিন্নরকণ্ঠে স্বামীজি গান ধরিয়াছেন—

"গিরি! গণেশ আমার শুভকারী।
বিল্ববৃক্ষমূলে পাতিয়ে বোধন, গণেশের কল্যাণে গৌরীর আগমন,
ঘরে আনব চণ্ডী, শুনব কত চণ্ডী, আসবে কত দণ্ডী, যোগী জটাধারী॥
(ইত্যাদি)।

গান গাইতে গাইতে শিষ্যকে বল্‌ছেন—"হেথা আসবে কত দণ্ডী, যোগী জটাধারী"—বুঝ্‌লি? এখানে কালে কত সাধু সন্ন্যাসীর সমাগম হবে। বলিতে বলিতে ঐ বিল্বতরুমূলে উপবেশন করিতেছেন। শিষ্য অবাক্ হইয়া স্বামীজির মুখপানে তাকাইয়া ভাব্‌ছে—"হেথা আসবে কত দণ্ডী, যোগী জটাধারী" কালে এ কথা নিশ্চয় সত্য হবে। শিষ্য জানে স্বামীজির কথা বেদবাক্য!

স্বামীজি শিষ্যকে বল্‌ছেন, "দেখ্, এই বিল্বতরুমূল বড়ই পবিত্র স্থান। এখানে ব'সে ধ্যান ধারণা করলে শীঘ্র শীঘ্র উদ্দীপনা হয়। ঠাকুর একথা বল্‌তেন!"

শিষ্য—মশায়, যারা আত্মবিচারবান্, তাদের আবার স্থানাস্থান, কালাকাল, শুদ্ধি অশুদ্ধি বিচারের আবশ্যক কি?

স্বামীজি—যাঁদের আত্মজ্ঞানে "নিষ্ঠা" হয়েছে, তাঁদের ঐ কথা বটে।

কিন্তু নিষ্ঠা কি প্রথমেই হয় রে বাপ্? তাই প্রথম প্রথম এক আধটা বাহ্যিক অবলম্বন নিয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াবার চেষ্টা কত্তে হয়। তুই যখন আত্মজ্ঞাননিষ্ঠা লাভ কর্‌বি,তখন তোর কিছু অবলম্বনের দরকার থাক্‌বে না।

শিষ্য—এই যে সব সাধন মার্গ নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, এরা কি কেবল সেই আত্মজ্ঞানলাভের জন্য?

স্বামীজি—তা বই কি! তবে অধিকারীভেদে সাধনাদি ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু ঐ সকল সাধনাদিও এক প্রকার কর্ম্ম এবং যতক্ষণ কর্ম্ম, ততক্ষণ আত্মার দেখা নাই। আত্মপ্রকাশের অন্তরায়গুলি শাস্ত্রোক্ত সাধনরূপ কর্ম্ম দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, কর্ম্মের positive কোন শক্তি নাই; কতকগুলি আবরণকে দূর ক'রে দেয় মাত্র। তারপর আত্মা আপন প্রভায় আপনি উদ্ভিন্ন হয়। বুঝ্‌লি? এইজন্য তোর ভাষ্যকার বল্‌ছেন—"ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের লেশমাত্র সম্বন্ধ নাই।"

শিষ্য—কিন্তু কোন না কোনরূপ কর্ম্ম না কর্‌লে যখন আত্মপ্রকাশের অন্তরায়গুলির নিরাশ হয় না, তখন পরোক্ষভাবে কর্ম্মই ত জ্ঞানের কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে।

স্বামীজি—কার্য্যকারণপরম্পরায় আপাতঃদৃষ্টিতে ঐরূপ প্রতীয়মান্ হয় বটে। মীমাংসা-শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মাদি ফলপ্রসূ বটে কিন্তু নির্ব্বিশেষ আত্মায় কর্ম্মের প্রসরতা কিরূপে থাকিবে? আবার আত্মজ্ঞানপিপাসুর পক্ষে বিধান এই যে, সাধনাদিরূপ কর্ম্মও কর্‌বে অথচ তার ফলাফলে উদাসীন্ থাক্‌বে। তবেই হলনা সে সকল সাধনাদি চিত্তশুদ্ধির কারণ ভিন্ন আর কিছুই নয়? মীমাংসাশাস্ত্রোক্ত এই ফলপ্রসূ কর্ম্মবাদের নিরাকরণকল্পে গীতোক্ত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের অবতারণা। বুঝ্‌লি?

শিষ্য—যে সকল কর্ম্মের ফলাফলের প্রত্যাশা নাই, সেই সকল কষ্টকর কর্ম্মাদি করার প্রয়োজনই বা কি? আর কর্‌তে প্রবৃত্তিই বা হবে কেন?

স্বামীজি—তুই ত শরীর ধারণ ক'রে একটা না একটা কিছু না ক'রে থাক্‌তে পারিস্ না। কর্ম্ম যখন কত্তেই হচ্চে, তখন যে সকল কর্ম্মে আত্মার বিকাশ হয়, সেইগুলিই ক'রে চলে যা। আর তুই যে বল্লি—'প্রবৃত্তি হবে কেন?'—তার উত্তর হচ্চে এই যে, যত কিছু কর্ম্ম করা যায়, তা সবই প্রবৃত্তি-মূলক; কিন্তু কর্ম্ম ক'রে ক'রে যখন দেখা যায়, কর্ম্ম হ'তে কর্ম্মান্তরে, জন্ম হ'তে জন্মান্তরেই কেবল গতি হয়, তখন লোক বিচারবান্ হয়ে জিজ্ঞাসা করে, এই

কর্ম্মের অন্ত কোথায় ? তখনি সে বুঝে—গীতামুখে ভগবান্ যা বল্‌ছেন—"গহনা কর্ম্মণোগতিঃ।" যখন কর্ম্ম ক'রে ক'রে আর শান্তিলাভ হয় না, তখন সাধক কর্ম্মত্যাগী হয়। কিন্তু দেহ ধারণ ক'রে কিছু একটা নিয়ে ত থাক্‌তে হবে—কি নিয়ে থাক্‌বে বল্ ?—তাই দু চারটে সৎকর্ম্ম করে যায়, কিন্তু ঐ কর্ম্মের ফলাফলের প্রত্যাশা রাখে না। কারণ, তখন তারা জেনেছে যে, ঐ কর্ম্মফলেই জন্মমৃত্যুর বহুধা অঙ্কুর নিহিত আছে। সেজন্যই ব্রহ্মজ্ঞ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী—লোক-দেখানো দু চারটে কর্ম্ম কর্‌লেও তাতে তাদের কিছুমাত্র আঁট নাই। এরাই শাস্ত্রে নিষ্কামকর্ম্মযোগী বলে কথিত হয়েছে।

শিষ্য—তা হলে কি বুঝ্‌তে হবে, নিষ্কাম ব্রহ্মজ্ঞের কর্ম্মাদি উদ্দেশ্যহীন—উন্মত্তের চেষ্টাদির ন্যায় ?

স্বামীজি। তা কেন ? তারা ফলাসঙ্গরহিত হ'য়ে যা কিছু কর্ম্ম ক'রে যায়, তাতে জগতের হিত হয়—সে সব কর্ম্ম "বহুজনহিতায়", "বহুজনসুখায়" হয়। তাদের পা কখনো বেতালে পড়ে না। তারা যা যা করে, তাই অর্থবন্ত হয়ে দাড়ায়। উত্তরচরিতে পড়িস্ নি—

"ঋষিণাং পুনরাদ্যানাং বাচমর্থোঽনুধাবতি"।

অর্থাৎ ঋষিদের বাক্যের অর্থ আছেই আছে, কখন নিরর্থক বা মিথ্যা হয় না।

শিষ্য—উদ্দেশ্য নাই, অথচ কৃতকর্ম্ম 'জগদ্ধিতায়' হয়—একথা বুঝ্‌তে পাচ্ছি না।

স্বামীজি—মন যখন আত্মায় লীন হয়ে বৃত্তিহীনপ্রায় হয়, তখন ইহামুত্রফলভোগবিরাগ জন্মায় অর্থাৎ সংসারে বা মৃত্যুর পর স্বর্গাদিতে কোন প্রকার সুখভোগ করিবার বাসনা থাকে না। মনে আর সংকল্পবিকল্পের তরঙ্গ থাকে না। কিন্তু ব্যুত্থানকালে অর্থাৎ সমাধি বা ঐ বৃত্তিহীনাবস্থা হইতে নামিয়া মন যখন আবার 'আমি আমার' রাজ্যে আসে, তখন পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম বা অভ্যাস বা প্রারব্ধজনিত সংস্কারবশে দেহাদির কর্ম্ম চলিতে থাকে। মন তখন প্রায়ই Superconscious অবস্থায় থাকে ; না খেলে দেলে নয়—তাই খাওয়া দাওয়া—দেহাদি বুদ্ধি এত অল্প বা ক্ষীণ হয়ে যায়। এই Superconscious অবস্থায় পৌঁছে যাহা যাহা করা যায়, তাই ঠিক ঠিক কর্‌তে পারা যায় ; সেই সকল কার্য্যে জীবের ও জগতের যথার্থ হিত হয়, কারণ, তখন কর্ত্তার মন আর স্বার্থপরতার বা নিজের লাভ লোকসান খতিয়ে দূষিত

হয় না। ঈশ্বরের Superconscious stateএ অবস্থান ক'রে এই জগদ্রূপ বিচিত্র সৃষ্টি—এ সৃষ্টিতে সেইজন্য কোন কিছু Imperfect (অসম্পূর্ণ) দেখা যায় না। এই জন্যই বল্‌ছিলুম—আত্মজ্ঞজীবের ফলাসঙ্গরহিত—কর্ম্মাদি Perfect (সম্পূর্ণ), তাতে জীবের ও জগতের ঠিক ঠিক কল্যাণ হয়।

শিষ্য—আপনি পূর্ব্বে বল্লেন, জ্ঞান কর্ম্মবিরোধী। ব্রহ্মজ্ঞানে কর্ম্মের তিলমাত্র স্থান নাই। তা হলে আপনি আবার মহা রজোগুণের উদ্দীপক উপদেশ দেন কেন? সে দিন বল্‌ছিলেন—"কর্ম্ম—কর্ম্ম—কর্ম্ম—নান্যপন্থা-বিদ্যতেঽয়নায়"—এর মানে কি?

স্বামীজি—দেখ্, আমি এই দুনিয়াটা ঘুরে দেখলুম, এ দেশের মত তামস প্রকৃতির লোক পৃথিবীর আর কোথাও নাই। বাহিরে সাত্ত্বিকতার ভান, ভিতরে ইট্ পাটকেলের মত জড়ত্ব—তোদের দ্বারা জগতের কি কাজ হবে রে? এমন অকর্ম্মা, অলস, শিশ্নোদরপরায়ণ জাত দুনিয়ায় আর নাই। যা, ওদেশ (পাশ্চাত্য) বেড়িয়ে দেখে আয়, পরে আমার কথার প্রতিবাদ কর্‌বিস্। তাদের জীবনে কত উদ্যম, কত কর্ম্মতৎপরতা, কত উৎসাহ, কত রজোগুণের বিকাশ! তোদের দেশের লোকগুলোর রক্ত যেন হৃদয়ে রুদ্ধ হ'য়ে রয়েছে—ধমনীতে যেন আর রক্ত বয় না—তাই সর্ব্বাঙ্গে Paralysis হ'য়ে পড়েছে! আমি তাই রজোগুণ বাড়িয়ে কর্ম্মতৎপরতাদ্বারা এদেশের লোকগুলোকে আগে ঐহিক জীবনসংগ্রামে সমর্থ কত্তে চাই। শরীরে বল নাই—হৃদয়ে উৎসাহ নাই—মস্তিষ্কে প্রতিভা নাই!—কি হবে রে, এই জড়পিণ্ডগুলি দ্বারা? আমি নেড়ে চেড়ে এদের একবার সাড়া নিতে চাই—এজন্য আমার প্রাণান্ত পণ। তোর বেদান্তের ভেতর দিয়ে এদের জাগাব। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"—এই অভয় বাণী শুনাতে আমার জন্ম। তোরা আমার সহায়। যা—গাঁয়ে গাঁয়ে, যা—দেশে দেশে, এই অভয়বাণী আচণ্ডালব্রাহ্মণকে শুনাগে। সকলকে বল্‌গে যা—তোরা অমিতবীর্য্য—অমৃতের অধিকারী। আগে রজোশক্তির উদ্দীপনা কর্—ইহজীবনের সংগ্রামে সকলকে উপযুক্ত কর্, তারপর পরজীবন দেখা যাবে। আগে এই ভেতরের শক্তি জাগ্রত করে তোর দেশের লোককে দাঁড় করা নিজের পায়ের উপর। উত্তম অশন বসন—উত্তম ভোগ—আগে কর্‌তে শিখুক, তারপর বেদান্ত ফেদান্ত দেখা যাবে। অলসতা, হীনবুদ্ধিতা, কপটতায় দেশ ছেয়ে ফেলেছে—বুদ্ধিমান্ লোক এ দেখে কি স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পারে? কান্না পায় না? মান্দ্রাজ, বম্বে,

পঞ্জাব, বাঙ্গালা, যে দিকে চাই কোথাও ত জীবনীশক্তির চিহ্ন দেখি না! তোরা ভাবছিস্—আমরা শিক্ষিত। কি ছাই মাথামুণ্ডু শিখেছিস্? কতকগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ ক'রে, মাথার ভিতর পুরে, পাশ করে ভাবছিস্—আমরা শিক্ষিত! ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা!! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরাণীগিরি, না হয় একটা দুষ্ট উকীল হওয়া, না হয় বড় জোর কেরাণীগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটীগিরি চাকুরী—এই ত শেষ?—এতে তোদেরই বা কি হল? আর দেশেরই বা কি হল? স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অন্নের হাহাকার!! তোদের এ শিক্ষায় তার অভাব পূর্ণ হবে কি? আমি বল্‌ছি—কখনও নয়। পাশ্চাত্যবিজ্ঞানসহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যা, আগে অন্নের সংস্থান কর্—চাকুরী গুখুরী ক'রে নয়—নিজের চেষ্টায়—পাশ্চাত্যবিজ্ঞানসহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্করণ দ্বারা। এ অন্নবস্ত্রের সংস্থান আগে কত্তে আমি লোক-গুলোকে রজোগুণতৎপর হ'তে উপদেশ দিই। অন্নবস্ত্রাভাবে, চিন্তায় চিন্তায় দেশ উৎসন্ন হ'য়ে গেছে—তার তোরা কি কচ্ছিস? ফেলে দে তোর শাস্ত্র মাস্ত্র গঙ্গাজলে। আগে অন্ন সংস্থান কর্ তারপর ভাগবৎ পড়ে শুনাস্। এই কর্ম্মতৎপরতা দ্বারা ঐহিক অভাব দূর না হলে তোর কথায় কেউ কান দেবে না। তাই বলি, আগে এই অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত কর্—আর বসে থাক্‌বার সময় নাই—মরণ ত কাছে এলো বলে।

কথাগুলি বল্‌তে বল্‌তে স্বামীজির মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠিল। চক্ষে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হতে লাগল! তাঁর তখনকার সেই মূর্ত্তি দেখে শিষ্যের ভয়ে আর কোন কথা সরল না! কতক্ষণ পরে স্বামীজি বল্‌ছেন, "সময়ে এ কর্ম্মতৎপরতা, আত্মনির্ভরতা দেশে আস্‌তে হবেই হবে—বেশ দেখ্‌তে পাচ্চি। There is no escape (গত্যন্তর নাই)। যারা বুদ্ধিমান্, তারা ভাবী তিন যুগের ছবি সাম্‌নে প্রত্যক্ষ দেখে—বুঝ্‌লি?"

শিষ্য—আপনি কি তাই দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

স্বামীজি—দেখ্‌ছি বই কি? পূর্ব্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে—ঠাকুরের জন্মদিন থেকে। কালে তার উদ্ভিন্ন ছটায় দেশ মধ্যাহ্ন-সূর্য্য-করে আলো-কিত হবে।

শিষ্য (হাসিতে হাসিতে বল্‌ছে)—মশায়, দেশের এই তমোপ্রাবল্যের একটা লাভ দেখ্‌তে পাচ্ছি।

স্বামীজি—কি লাভ দেখ্‌ছিস্‌?

শিষ্য—এই অন্ধকার দূর কত্তে ত ভগবান্‌কে দেহ ধারণ করে এদেশে আস্‌তে হলো। এত তমোব্যাপ্তি না হলে তিনি আস্‌তেন কি? আর আপনাদেরও দেহ ধরে আসা হ'ত কি? ধন্য সে তমোপ্রবলতা, যাতে আপনাদিগকে মর্ত্তে শরীর ধারণ করায়—যাতে বিরাট ভগবান্‌কে স্বরাট্‌ দেহে অবতীর্ণ করায়!

স্বামীজি কথা শুনে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ছেন—তোর সঙ্গে কথায় পারা দায়; চল্‌, মঠের জমিতে বেড়াবি আয়। আজ মঠে থাক্‌বি ত? না কল্‌কাতায় পচা দুর্গন্ধ গলিতে গিয়ে আবার ঢুক্‌বি।

শিষ্য—না মশাই, এখন দুদিন মঠে থাক্‌বো। আপনার সঙ্গে থাকলে আমার যেন সব ভুল হয়ে যায়। কোটী কোটী জন্মেও আপনার সঙ্গলাভ-স্পৃহা পূরণ হয় কি না সন্দেহ।

কথা বলিতে বলিতে স্বামীজি ও শিষ্য মঠের জমিতে বেড়াইতে লাগিল।

ধর্ম্মবিজ্ঞান।

[স্বামী বিবেকানন্দ।]

এখানে আমরা এই ভাব পাইলাম যে, আমরা সকলেই স্ফুলিঙ্গাকারে তাঁহা হইতে বহির্গত হইয়াছি আর তাঁহাকে জানিতে পারিলে তাঁহার নিকট ফিরিয়া গিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত এক হইয়া যাই।

এই উপদেশে মৈত্রেয়ী ভীত হইলেন, যেমন সর্ব্বত্রই লোকে হইয়া থাকে।

মৈত্রেয়ী বলিলেন, "ভগবন্‌, আপনি এইখানে আমার মাথা গুলাইয়া দিলেন। দেবতা প্রভৃতি সে অবস্থায় থাকিবে না, 'আমি' জ্ঞান নষ্ট হইয়া যাইবে, ইহা বলিয়া আপনি আমার ভীতি উৎপাদন করিতেছেন। যখন আমি ঐ অবস্থায় পঁহুছিব, তখন কি আমি আত্মাকে জানিতে পারিব? আমি কি অহংজ্ঞান হারাইয়া অজ্ঞান অবস্থা প্রাপ্ত হইব, অথবা আমি তাঁহাকে জানিতেছি, এই জ্ঞান থাকিবে? তখন কি কাহাকেও জানিবার

কিছু অনুভব করিবার, কাহাকেও ভালবাসিবার, কাহাকেও ঘৃণা করিবার থাকিবে না ?”

যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, “মৈত্রেয়ি, মনে করিও না, আমি অজ্ঞান অবস্থার কথা বলিতেছি, ভয়ও পাইও না ! এই আত্মা অবিনাশী, তিনি স্বরূপতঃ নিত্য। যে অবস্থায় দুই থাকে অর্থাৎ যাহা দ্বৈতাবস্থা, তাহা নিম্নতর অবস্থা। যেখানে দ্বৈতভাব থাকে, সেখানে একজন অপরকে ঘ্রাণ করে, একজন অপরকে দর্শন করে, একজন অপরকে শ্রবণ করে, একজন অপরকে অভ্যর্থনা করে, একজন অপরের সম্বন্ধে চিন্তা করে, একজন অপরকে জানে। কিন্তু যখন সবই আত্মা হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে ঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহাকে শুনিবে, কে কাহাকে অভ্যর্থনা করিবে, কে কাহাকে জানিবে ? যাঁহা দ্বারা জানা যায়, তাঁহাকে কে জানিতে পারে ? এই আত্মাকে কেবল নেতি নেতি (ইহা নহে, ইহা নহে) এইরূপে বর্ণনা করা যাইতে পারে। তিনি অচিন্ত্য, তাঁহাকে বুদ্ধি দ্বারা ধারণা করিতে পারা যায় না। তিনি অপরিণামী, তাঁহার কখন ক্ষয় হয় না। তিনি অনাসক্ত, কখনই প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হন না। তিনি পূর্ণ, সমুদয় সুখদুঃখের অতীত। বিজ্ঞাতাকে কে জানিতে পারে ? কি উপায়ে তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি ? কোন উপায়েই নহে। হে মৈত্রেয়ি, ইহাই ঋষিদিগের চরম সিদ্ধান্ত। সমুদয় জ্ঞানের অতীত অবস্থায় যাইলেই তাঁহাকে লাভ হয়। তখনই অমৃতত্ব লাভ হয়।”

এতদূর পর্য্যন্ত এই ভাব পাওয়া গেল যে, এই সমুদয়ই এক অনন্ত পুরুষ আর তাঁহাতেই আমাদের যথার্থ আমিত্ব—সেখানে কোন ভাগ বা অংশ নাই, এই সকল ভ্রমাত্মক নিম্নভাব কিছুই নাই। কিন্তু তথাপি এই ক্ষুদ্র আমিত্বের ভিতর আগাগোড়া সেই অনন্ত যথার্থ আমিত্ব প্রতিভাত হইতেছে। সমুদয়ই আত্মার অভিব্যক্তিমাত্র। কি করিয়া আমরা এই আত্মাকে লাভ করিব ? যাজ্ঞবল্ক্য প্রথমেই আমাদিগকে বলিয়াছেন, ‘প্রথমে এই আত্মার সম্বন্ধে শুনিতে হইবে, তার পর বিচার করিতে হইবে, তৎপরে উঁহার ধ্যান করিতে হইবে।’ ঐ পর্য্যন্ত তিনি আত্মাকে এই জগতের সর্ব্ববস্তুর সাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তার পর সেই আত্মার অনন্ত স্বরূপ আর মানবমনের সান্তভাবের সম্বন্ধে বিচার করিয়া তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সকলের জ্ঞাতা আত্মাকে সীমাবদ্ধ মনের দ্বারা জানা অসম্ভব।

তবে যদি আত্মাকে জানিতে পারা যায় না, তবে কি করিতে হইবে? যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে বলিলেন, যদিও আত্মাকে জানা যায় না, তথাপি উহাকে উপলব্ধি করা যাইতে পারে। সুতরাং তাঁহাকে কিরূপে ধ্যান করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। এই জগৎ সকল প্রাণীরই কল্যাণকারী এবং প্রত্যেক প্রাণীই জগতের কল্যাণকারী; কারণ, উভয়েই পরস্পরের অংশীভূত—একের উন্নতি অপরের উন্নতির সাহায্য করে। কিন্তু স্বপ্রকাশ আত্মার কল্যাণকারী বা সাহায্যকারী কেহ হইতে পারে না, কারণ, তিনি পূর্ণ ও অনন্তস্বরূপ। জগতে যত কিছু আনন্দ আছে, এমন কি, খুব নিম্নদরের আনন্দ পর্য্যন্ত ইহারই প্রতিবিম্বমাত্র। যাহা কিছু ভাল, সবই সেই আত্মার প্রতিবিম্বমাত্র, আর ঐ প্রতিবিম্ব যখন অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট হয়, তাহাকেই মন্দ বলা যায়। যখন এই আত্মা কম অভিব্যক্ত, তখন তাহাকে তমঃ বা মন্দ বলে, যখন অধিকতর অভিব্যক্ত, তখন উহাকে প্রকাশ বা ভাল বলে। এই মাত্র প্রভেদ। ভাল মন্দ কেবল মাত্রার তারতম্য, আত্মার কম বেশী অভিব্যক্তি লইয়া। আমাদের নিজেদের জীবনের দৃষ্টান্তই লউন। ছেলেবেলা কত জিনিষকে আমরা ভাল বলিয়া মনে করি, বাস্তবিক সেগুলি মন্দ আবার কত জিনিষকে মন্দ বলিয়া দেখি, বাস্তবিক সেগুলি ভাল। আমাদের ধারণার কেমন পরিবর্ত্তন হয়। একটা ভাব কেমন উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতে থাকে। আমরা এক সময়ে যাহা খুব ভাল বলিয়া ভাবিতাম, এখন আর তাহা তদ্রূপ ভাল ভাবি না। এইরূপে ভাল মন্দ আমাদের মনের বিকাশের উপর নির্ভর করে বাহিরে উহাদের অস্তিত্ব নাই। প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে। সবই সেই আত্মারই প্রকাশমাত্র। উহা সকলেতেই প্রকাশ পাইতেছে, কেবল উহার প্রকাশ অল্প হইলে আমরা উহাকে মন্দ বলি ও স্পষ্টতর হইলে ভাল বলি। কিন্তু আত্মা স্বয়ং শুভাশুভের অতীত। অতএব জগতে যাহা কিছু আছে সকলকেই প্রথমে ভাল বলিয়া ধ্যান করিতে হইবে, কারণ, উহারা সেই পূর্ণস্বরূপের অভিব্যক্তি। তিনি ভালও নন, মন্দও নন; তিনি পূর্ণ আর পূর্ণ বস্তু কেবল একটীই হইতে পারে। ভাল জিনিষ অনেক প্রকার হইতে পারে, মন্দও অনেক থাকিতে পারে, ভালমন্দের মধ্যে প্রভেদের নানাবিধ মাত্রা থাকিতে পারে, কিন্তু পূর্ণ বস্তু কেবল একমাত্র; ঐ পূর্ণ বস্তু বিশেষ বিশেষ প্রকার আবরণের মধ্য দিয়া দৃষ্ট হইলে বিভিন্ন মাত্রায় ভাল বলিয়া

আমরা অভিহিত করি, অন্য প্রকারের আবরণের মধ্য দিয়া উহা প্রকাশিত হইলে উহাকে আমরা মন্দ বলিয়া অভিহিত করি। এই বস্তু সম্পূর্ণ ভাল ও এই বস্তু সম্পূর্ণ মন্দ—এরূপ ধারণা কুসংস্কারমাত্র। প্রকৃত পক্ষে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, এই জিনিষ বেশী ভাল ও এই জিনিষ কম ভাল আর কম ভালকেই আমরা মন্দ বলি। ভাল মন্দ সম্বন্ধে এই সমুদয় ভ্রান্ত ধারণাই সর্ব্বপ্রকার দ্বৈত ভ্রম প্রসব করিয়াছে। উহারা সকল যুগের নরনারীর বিভীষিকাপ্রদ ভাবরূপে মানবজাতির হৃদয়ে দৃঢ় নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা যে অপরকে ঘৃণা করি, তাহার কারণ শৈশবকাল হইতে অভ্যস্ত এই সকল নির্ব্বোধজনোচিত ধারণা। মানবজাতিসম্বন্ধে আমাদের বিচার সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়াছে, আমরা এই সুন্দর পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছি, কিন্তু যখনই আমরা ভালমন্দর এই ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে ছাড়িয়া দিব, তখনই ইহা স্বর্গে পরিণত হইবে।

এখন যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহার স্ত্রীকে কি উপদেশ করিতেছেন, শুনা যাউক।

"এই পৃথিবী সকল প্রাণীর পক্ষে মধু অর্থাৎ মিষ্ট বা আনন্দজনক, সকল প্রাণীই আবার এই পৃথিবীর পক্ষে মধু—উভয়েই পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করিয়া থাকে। আর ইহাদের এই মধুরত্ব সেই তেজোময় অমৃতময় আত্মা হইতে আসিতেছে।"

সেই এক মধু বা মধুরত্ব বিভিন্ন ভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে। যেখানেই মানবজাতির ভিতর কোনরূপ প্রেম বা মধুরত্ব দেখা যায়, সাধুতেই হউক, পাপীতেই হউক, মহাপুরুষেই হউক বা হত্যাকারীতেই হউক, দেহে হউক, মনে হউক বা ইন্দ্রিয়েই হউক, সেখানেই তিনি রহিয়াছেন। সেই এক পুরুষ ব্যতীত উহা আর কি হইতে পারে? অতি নীচতম ইন্দ্রিয়সুখও তিনি আবার উচ্চতম আধ্যাত্মিক আনন্দও তিনি। তিনি ব্যতীত মধুরত্ব কিছুর থাকিতে পারে না। যাজ্ঞবল্ক্য ইহাই বলিতেছেন। যখন আপনি ঐ অবস্থায় উপনীত হইবেন, যখন সকল বস্তু সমদৃষ্টিতে দেখিবেন, যখন মাতালের পানাসক্তি ও সাধুর ধ্যানে সেই এক মধুরত্ব, এক আনন্দের প্রকাশ দেখিবেন, তখনই বুঝিতে হইবে, আপনি সত্য পাইয়াছেন। তখনই কেবল আপনি বুঝিবেন, সুখ কাহাকে বলে, শান্তি কাহাকে বলে, প্রেম কাহাকে বলে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আপনি এই বৃথা ভেদজ্ঞান রাখিবেন, আহাম্মকের মত ছেলেমানুষী কুসংস্কারগুলি রাখিবেন, ততদিন আপনার সর্ব্বপ্রকার দুঃখ

আসিবে। সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষই সমগ্র জগতের ভিত্তিস্বরূপ উহার পশ্চাতে রহিয়াছেন—সমুদয়ই তাঁহার মধুরত্বের অভিব্যক্তিমাত্র। এই দেহটীও যেন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ—আর এই দেহের সমুদয় শক্তিগুলির ভিতর দিয়া, মনের সর্ব্বপ্রকার উপভোগের মধ্য দিয়া সেই তেজোময় পুরুষ প্রকাশ পাইতেছেন। দেহের মধ্যে সেই যে তেজোময় স্বপ্রকাশ পুরুষ রহিয়াছেন, তিনিই আত্মা। "এই জগৎ সকল প্রাণীর পক্ষে এমন মধুময় এবং সকল প্রাণীই উহার নিকট মধুময়"; কারণ, সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এই সমগ্র জগতের আনন্দস্বরূপ। আমাদের মধ্যেও তিনি আনন্দস্বরূপ। তিনিই ব্রহ্ম।

"এই বায়ু সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ আর এই বায়ুব নিকটও সকল প্রাণী মধুস্বরূপ; কারণ, সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বায়ুতেও রহিয়াছেন এবং দেহেও রহিয়াছেন। তিনি সকল প্রাণীর প্রাণরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।"

"এই সূর্য্য সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ এবং এই সূর্য্যের পক্ষেও সকল প্রাণী মধুস্বরূপ। কারণ, সেই তেজোময় পুরুষ সূর্য্যে রহিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রতিবিম্ব অমাদের ভিতর ক্ষুদ্রতর জ্যোতিরূপে রহিয়াছে। তাঁহার প্রতিবিম্ব ব্যতীত আর কি থাকিতে পারে? তিনি আমাদের দেহেও রহিয়াছেন এবং তাহারই ঐ প্রতিবিম্ববলে আমরা আলোকদর্শনে সমর্থ হইতেছি।"

"এই চন্দ্র সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ, এই চন্দ্রের পক্ষে আবার সকল প্রাণী মধুস্বরূপ; কারণ, সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, যিনি চন্দ্রের অন্তরাত্মা স্বরূপ, তিনিই আমাদের ভিতর মনরূপে প্রকাশ পাইতেছেন।"

"এই বিদ্যুৎ সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ, সকল প্রাণীই বিদ্যুতের পক্ষে মধুস্বরূপ। কারণ, সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ বিদ্যুতের আত্মাস্বরূপ আর তিনি আমাদের মধ্যেও রহিয়াছেন, কারণ, সবই সেই ব্রহ্ম।"

"সেই ব্রহ্ম, সেই আত্মা, সকল প্রাণীর রাজা।"

এই ভাবগুলি মানবের পক্ষে বড়ই উপকারী; ঐগুলি ধ্যানের জন্য উপদিষ্ট। দৃষ্টান্তস্বরূপ—পৃথিবীকে ধ্যান করিতে থাকুন, পৃথিবীকে চিন্তা করুন, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ভাবুন যে, পৃথিবীতে যাহা আছে, আমাদের দেহেও তাহাই আছে। চিন্তাবলে পৃথিবী ও দেহে এক করিয়া ফেলুন আর দেহস্থ আত্মার সহিত পৃথিবীর অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মার অভিন্নভাব সাধন করুন।

বায়ুকে বায়ুর অভ্যন্তরবর্ত্তী ও আপনার অভ্যন্তরবর্ত্তী আত্মার সহিত অভিন্ন ভাবে চিন্তা করুন। এইরূপে এই সকল ধ্যান করিতে হয়। এই সবই এক, বিভিন্নাকারে প্রকাশ পাইতেছে মাত্র। সকল ধ্যানেরই চরম লক্ষ্য—এই একত্ব উপলব্ধি করা আর যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ইহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়।

জ্ঞানযোগের চরমাদর্শ।

অদ্যকার বক্তৃতা হইয়াই এই সাংখ্য ও বেদান্ত বিষয়ক বক্তৃতাবলি সমাপ্ত হইবে, অতএব আমি এই কয়দিন ধরিয়া যাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, অদ্য সংক্ষেপে তাহার পুনরাবৃত্তি করিব। বেদ ও উপনিষদে আমরা হিন্দুদের অতি প্রাচীনতম ধর্ম্মভাবের কয়েকটীর বর্ণনা পাইয়া থাকি। আর মহর্ষি কপিল খুব প্রাচীন বটে, কিন্তু এই সকল ভাব তাঁহা হইতেও প্রাচীনতর। কপিলের সাংখ্যদর্শন তদুদ্ভাবিত নূতন মতবাদবিশেষ নহে। তাঁহার সময়ে ধর্ম্মসম্বন্ধে যে সকল বিভিন্নমতবাদরাশি প্রচলিত ছিল, তিনি নিজের অপূর্ব্বপ্রতিভাবলে তাহা হইতে একটী যুক্তিসঙ্গত ও সামঞ্জস্যময় প্রণালী গঠন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র। তিনি ভারতবাসীগণের নিকট যে মনোবিজ্ঞান প্রচারে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা এখনও হিন্দুদিগের মধ্যে বিভিন্ন আপাতবিরোধী দার্শনিকসম্প্রদায়সমূহ মানিয়া থাকে। পরবর্ত্তী কোন দার্শনিকই এ পর্য্যন্ত তাঁহার মানবমনের অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ এবং জ্ঞানলাভপ্রক্রিয়াসম্বন্ধে বিস্তারিত সিদ্ধান্তের অধিক যাইতে পারেন নাই, আর তিনি নিঃসন্দেহ অদ্বৈতবাদের ভিত্তিস্থাপন করিয়া যান—উহা—তিনি যতদূর পর্য্যন্ত সিদ্ধান্তে অগ্রসর হইয়াছিলেন—তাহা গ্রহণ করিয়া আর এক পদ অগ্রসর হইল। এইরূপে সাংখ্যদর্শনের শেষ সিদ্ধান্ত দ্বৈতবাদ ছাড়াইয়া চরম একত্বে পঁহুছিল।

কপিলের সময়ের পূর্ব্বে ভারতে যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচলিত ছিল (আমি অবশ্য পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ধর্ম্মতত্ত্বগুলিকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি, ধর্ম্মনামের অযোগ্য খুব নিম্ন ধারণাগুলি নহে) তাহাদের মধ্যে আমরা দেখিতে পাই, তন্মধ্যে প্রাথমিক শ্রেণীগুলির ভিতর প্রত্যাদেশ, ঈশ্বরাদিষ্ট শাস্ত্র প্রভৃতি

ধারণা ছিল। অতি প্রাচীনতম অবস্থায় সৃষ্টির ধারণা বড়ই বিচিত্র—তাহা এই যে, সমগ্র জগৎ ঈশ্বরেচ্ছায় শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, আদিতে এই জগৎ একেবারে ছিল না, আর সেই অভাব বা শূন্য হইতেই এই সমুদয় আসিয়াছে। পরবর্ত্তী সোপানে আমরা দেখিতে পাই, এই সিদ্ধান্তে সন্দেহ প্রকাশ করা হইতেছে। বেদান্তের প্রথম সোপানেই এই প্রশ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে? যদি এই জগৎ সৎ অর্থাৎ অস্তিত্বযুক্ত হয়, তবে ইহা অবশ্য কিছু হইতে আসিয়াছে। এই প্রাচীনেরা সহজেই দেখিতে পাইলেন, কোথাও এমন কিছুই নাই, যাহা কিছু না হইতে উৎপন্ন হইতেছে। মনুষ্যহস্তের দ্বারা যাহা কিছু কার্য্য হয়, তাহাতেই ত উপাদান কারণের প্রয়োজন হয়। অতএব প্রাচীন হিন্দুরা স্বভাবতঃই, এই জগৎ যে শূন্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, এই প্রথম ধারণা ত্যাগ করিলেন আর এই জগৎসৃষ্টির কারণীভূত উপাদান কি, তাহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র জগতের ধর্ম্মেতিহাস—কোথা হইতে এই সমুদয়ের উৎপত্তি হইল, এই প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টায় এই উপাদানকারণের অন্বেষণ মাত্র। নিমিত্তকারণ বা ঈশ্বরের বিষয় ব্যতীত, ঈশ্বর এই জগৎসৃষ্টি করিয়াছেন কি না, এই প্রশ্ন ব্যতীত,—চিরকালই এই মহাপ্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে —ঈশ্বর কি উপাদান লইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরেই বিভিন্ন দর্শন নির্ভর করিতেছে।

একটী সিদ্ধান্ত এই যে, এই উপাদান এবং ঈশ্বর ও আত্মা তিনই নিত্য বস্তু—উহারা যেন তিনটী সমান্তরাল রেখার মত অনন্তকালের জন্য পাশাপাশি চলিয়াছে—উহাদের মধ্যে প্রকৃতি ও আত্মাকে তাঁহারা অস্বতন্ত্র তত্ত্ব এবং ঈশ্বরকে স্বতন্ত্র তত্ত্ব বা পুরুষ বলেন। প্রত্যেক জড়পরমাণুর ন্যায় প্রত্যেক আত্মাই ঈশ্বরেচ্ছার সম্পূর্ণ অধীন। যখন কপিল সাংখ্য মনোবিজ্ঞান প্রচার করিলেন, তখন পূর্ব্ব হইতেই এই সকল ও অন্যান্য অনেক প্রকার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ধারণা বিদ্যমান ছিল। ঐ মনোবিজ্ঞানের মতে বিষয়ানুভূতির প্রণালী এই— প্রথমতঃ, বাহিরের বস্তু হইতে ঘাত বা ইঙ্গিত প্রদত্ত হয়, তাঁহাতে ইন্দ্রিয়সমূহের ভৌতিক দ্বারসকলকে উত্তেজিত করে। যেমন প্রথমে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারে বাহ্য বিষয়ের আঘাত লাগিল, চক্ষুরাদি দ্বার বা যন্ত্র হইতে তত্তদিন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয়-সমূহ হইতে মনে, মন হইতে বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি হইতে এমন এক পদার্থে গিয়া লাগিল—যাহা এক তত্ত্বস্বরূপ—

উহাকে তাঁহারা আত্মা বলেন। আধুনিক শারীরবিধান শাস্ত্র আলোচনা করিলেও আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার বিষয়ানুভূতির জন্য বিভিন্ন কেন্দ্র আছে, ইহা আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রথমতঃ, নিম্নশ্রেণীর কেন্দ্রসমূহ, দ্বিতীয়তঃ, উচ্চশ্রেণীর কেন্দ্রসমূহ আর এই দুইটীর সঙ্গে মন ও বুদ্ধির কার্য্যের সহিত ঠিক মিলে, কিন্তু তাঁহারা এমন কোন কেন্দ্র পান নাই, যাহা অপর সমুদয় কেন্দ্রগুলিকে নিয়মিত করিতেছে, সুতরাং কে এই সমুদয় কেন্দ্রগুলির একত্ব বিধান করিতেছে, শারীরবিধান শাস্ত্র তাহার উত্তর দিতে অক্ষম। কোথায় এবং কিরূপে এই কেন্দ্রগুলি মিলিত হয়? মস্তিষ্ককেন্দ্রসমূহ সকলেই পৃথক্ পৃথক্, আর এমন কোন একটী কেন্দ্র নাই, যাহা অপর সকল কেন্দ্রগুলিকে নিয়মিত করিতেছে। অতএব এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে সাংখ্য মনোবিজ্ঞানের প্রতিবাদী কেহ নাই। একটী সম্পূর্ণ বস্তু গঠনের জন্য এই একীভাব, যাহার উপর বিষয়ানুভূতিগুলি প্রতিবিম্বিত হইবে, এমন কিছু প্রয়োজন। সেই কিছু না থাকিলে আমি আপনার বা ঐ ছবিখানার বা অন্য কোন বস্তুরই কোন জ্ঞানলাভ করিতে পারি না। যদি আমাদের ভিতরে এই একত্ববিধায়ক কিছু না থাকিত, তবে আমরা হয়ত কেবল দেখিতেই লাগিলাম, খানিক পরে শুনিতে লাগিলাম, খানিক পরে স্পর্শানুভব করিতে লাগিলাম আর এমন হইত যে, এক জন কথা কহিতেছে শুনিতেছি, কিন্তু তাহাকে মোটেই দেখিতে পাইতেছি না, কারণ, কেন্দ্রসমূহ ভিন্ন ভিন্ন।

এই দেহ জড়পরমাণুবিরচিত আর ইহা জড় ও অচেতন। যাহাকে সূক্ষ্মশরীর বলা হয়, তাহাও তদ্রূপ। সাংখ্যের মতে সূক্ষ্মশরীর অতি সূক্ষ্ম পরমাণুগঠিত একটী ক্ষুদ্র শরীর—উহার পরমাণুগুলি এত সূক্ষ্ম যে, কোন প্রকার অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাই উহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সূক্ষ্মদেহের প্রয়োজন কি? উহা আমরা যাহাকে মন বলি, তাহার আধারস্বরূপ। যেমন এই স্থূল শরীর স্থূলতর শক্তিসমূহের আধার, তদ্রূপ সূক্ষ্ম শরীর, চিন্তা ও উহার নানাবিধ বিকারস্বরূপ সূক্ষ্মতর শক্তিসমূহের আধার। প্রথমতঃ, এই স্থূল শরীর—ইহা স্থূল জড় ও স্থূল শক্তি ময়। শক্তি জড় ব্যতীত থাকিতে পারে না, কারণ, উহা কেবল জড়ের মধ্য দিয়াই আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে। অতএব স্থূলতর শক্তিসমূহ এই স্থূল শরীরের মধ্য দিয়াই কার্য্য করিতে পারে ও অবশেষে উহারা সূক্ষ্মতর রূপ ধারণ করে।

যে শক্তি স্থূলভাবে কার্য্য করিতেছে, তাহাই সূক্ষ্মতররূপে কার্য্য করিতে থাকে ও চিন্তারূপে পরিণত হয়। উহাদের মধ্যে কোনরূপ বাস্তব ভেদ নাই, একই বস্তুর একটী স্থূল ও অপরটী সূক্ষ্ম প্রকাশ মাত্র। সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল শরীরের মধ্যেও উপাদানগত কোন ভেদ নাই। সূক্ষ্ম শরীরও জড়, তবে উহা খুব সূক্ষ্ম জড়।

এই সকল শক্তি কোথা হইতে আইসে? বেদান্ত দর্শনের মতে প্রকৃতি দুইটী বস্তুতে গঠিত—একটীকে তাঁহারা আকাশ বলেন, উহা অতি সূক্ষ্ম জড় আর অপরটীকে তাঁহারা প্রাণ বলেন। আপনারা পৃথিবী, বায়ু বা অন্য যাহা কিছু দেখেন, শুনেন বা স্পর্শ দ্বারা অনুভব করেন, তাহাই জড় আর সকলই এই আকাশেরই বিভিন্ন রূপ মাত্র। উহা প্রাণ বা সর্ব্বব্যাপী শক্তির প্রেরণায় কখন সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হয়, কখন স্থূল হইতে স্থূলতর হয়। আকাশের ন্যায় প্রাণও সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্ববস্তুতে অনুস্যূত। আকাশ যেন জলের মত আর জগতে আর যাহা কিছু আছে, সমুদয়ই বরফখণ্ডের ন্যায় ঐ গুলি হইতে উৎপন্ন হইয়া জলেই ভাসিতেছে আর প্রাণই সেই শক্তি, যাহা আকাশকে এই বিভিন্নরূপে পরিণত করিতেছে।

এই দেহযন্ত্র পৈশিকগতি বা ভ্রমণ, উপবেশন, বাক্যকথন প্রভৃতিরূপে প্রাণের স্থূলাকারে প্রকাশের জন্য আকাশ হইতে নির্ম্মিত হইয়াছে। সূক্ষ্ম শরীরও সেই প্রাণের চিন্তারূপ সূক্ষ্ম আকারে অভিব্যক্তির জন্য আকাশ হইতে—আকাশের সূক্ষ্মতর রূপ হইতে—নির্ম্মিত হইয়াছে। অতএব, প্রথমে এই স্থূল শরীর, তারপর সূক্ষ্মশরীর, তারপর জীব বা আত্মা—উহাই মানবের যথার্থ স্বরূপ। যেমন আমাদের নখ বৎসরে শতবার কাটিয়া ফেলা যাইতে পারে, কিন্তু উহা আমাদের শরীরেরই অংশস্বরূপ, উহা হইতে পৃথক্ নহে, তেমনি আমাদের শরীর দুটী নহে। মানুষের একটী সূক্ষ্ম শরীর আর একটি স্থূল শরীর আছে, তাহা নহে; শরীর একই, তবে সূক্ষ্মাকারে উহা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল থাকে, আর স্থূলটী শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। যেমন আমি বৎসরে শতবার এই নখ কাটিয়া ফেলিতে পারি, তদ্রূপ এক যুগে আমি লক্ষ লক্ষ স্থূল শরীর ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর থাকিয়া যাইবে। দ্বৈতবাদীদের মতে এই জীব অর্থাৎ মানুষের যথার্থ স্বরূপ যাহা, তাহা অণু অর্থাৎ অতি সূক্ষ্ম।

এতদূর পর্য্যন্ত আমরা দেখিলাম, মানুষের আছে প্রথমতঃ এই স্থূল শরীর,

যাহা অতি শীঘ্রই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তারপর সূক্ষ্ম শরীর—উহা যুগযুগান্তর ধরিয়া বর্ত্তমান থাকে, তারপর জীবাত্মা। বেদান্ত দর্শনের মতে ঈশ্বর যেমন নিত্য, এই জীবও তদ্রূপ নিত্য, আর প্রকৃতিও নিত্য—তবে উহা প্রবাহরূপে নিত্য। প্রকৃতির উপাদানস্বরূপ আকাশ ও প্রাণ নিত্য কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়া উহারা বিভিন্নাকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। জড় ও শক্তি নিত্য, কিন্তু উহাদের সমবায়সমূহ সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল। জীব আকাশ বা প্রাণ কিছু হইতেই নির্ম্মিত নহে, উহা অজড়, অতএব চিরকাল ধরিয়া উহা থাকিবে। উহা প্রাণ ও আকাশের কোনরূপ সংযোগের ফলস্বরূপ নহে, আর যাহা সংযোগের ফল নহে, তাহা কখন নষ্ট হইবে না; কারণ, বিনাশের অর্থ সংযোগের বিশ্লেষণ। যে কোন বস্তু যৌগিক নহে, তাহা কখন নষ্ট হইতে পারে না। স্থূল-শরীর আকাশ ও প্রাণের নানারূপে সংযোগের ফল, সুতরাং উহা বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে। সূক্ষ্ম শরীরও দীর্ঘকাল পরে বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবে, কিন্তু জীব অযৌগিক পদার্থ, সুতরাং উহা কখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না। পূর্ব্বোক্ত কারণেই আমরা বলিতে পারি না যে, জীবের কোনকালে জন্ম হইয়াছে। কোন অযৌগিক পদার্থের জন্ম হইতে পারে না; কেবল যাহা যৌগিক, তাহারই জন্ম হইতে পারে।

লক্ষ লক্ষ প্রকার আকারে মিশ্রিত এই সমগ্র প্রকৃতি ঈশ্বরের ইচ্ছার অধীন। ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ ও নিরাকার এবং তিনি দিবারাত্র এই প্রকৃতিকে পরিচালিত করিতেছেন। সমগ্র প্রকৃতিই তাঁহার শাসনাধীনে রহিয়াছে। কোন প্রাণীর স্বাধীনতা নাই, উহা থাকিতেই পারে না। তিনিই শাস্তা। ইহাই দ্বৈতবাদাত্মক বেদান্তের উপদেশ।

তারপর এই প্রশ্ন আসিতেছে যে, যদি ঈশ্বর এই জগতের শাস্তা হন, তবে তিনি কেন এমন কুৎসিৎ জগৎ সৃষ্টি করিলেন? কেন আমরা এত কষ্ট পাইব? ইহার উত্তর এইরূপ দেওয়া হইয়া থাকে যে, ইহাতে ঈশ্বরের কোন দোষ নাই। আমাদের নিজেদের দোষেই আমরা কষ্ট পাইয়া থাকি। আমরা যেরূপ বীজ বপন করি, তদ্রূপ শস্যই পাইয়া থাকি। ঈশ্বর আমাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য কিছু করেন না। যদি কোন ব্যক্তি দরিদ্র, অন্ধ বা খঞ্জ হইয়া জন্মগ্রহণ করে, বুঝিতে হইবে, সে ঐরূপে জন্মিবার পূর্ব্বে এমন কিছু করিয়াছিল, যাহা এই ফল প্রসব করিয়াছে। জীব চিরকাল হইতে বর্ত্তমান আছেন, তিনি কখন সৃষ্ট হন নাই। আর তিনি চিরকাল ধরিয়া

নানারূপ কার্য্য করিতেছেন। আর আমরা যাহা কিছু করি, তাহারই ফল ভোগ করিতে হয়। যদি শুভকর্ম্ম করি, তবে আমরা সুখলাভ করিব, অশুভ কর্ম্ম করিলে দুঃখভোগ করিতে হইবে। জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধস্বভাব, তবে দ্বৈতবাদী বলেন, অজ্ঞান উহার স্বরূপকে আবৃত করিয়াছে। যেমন অসৎ কর্ম্মের দ্বারা উহা আপনাকে অজ্ঞানে আবৃত করিয়াছে, তদ্রূপ শুভ-কর্ম্মের দ্বারা উহা নিজস্বরূপ পুনরায় জানিতে পারে। জীব যেমন নিত্য, তদ্রূপ শুদ্ধ। প্রত্যেক ব্যক্তির স্বরূপ শুদ্ধ। যখন শুভকর্ম্মের দ্বারা উহার সমুদয় পাপ ও অশুভ কর্ম্ম ধৌত হইয়া যায়, তখন জীব আবার শুদ্ধ হয় আর যখন সে শুদ্ধ হয়, তখন সে মৃত্যুর পর দেবযান পথে স্বর্গে বা দেবলোকে গমন করে। যদি সে অমনি চলনসইগোছের ভাললোক হয়, সে পিতৃলোকে গমন করে।

স্থূলদেহের পতন হইলে বাক্যেন্দ্রিয় মনে প্রবেশ করে। বাক্য ব্যতীত চিন্তা করিতে পারা যায় না; যেখানেই বাক্য, তথায়ই অবশ্যই চিন্তা বিদ্যমান। মন আবার প্রাণে লয় হয়, প্রাণ জীবে লয় প্রাপ্ত হয়। তখন জীব দেহ ত্যাগ করিয়া তাহার ভূত জীবনের কর্ম্মের ফলস্বরূপ যে পুরস্কার বা শাস্তির উপযুক্ত, তদবস্থায় গমন করে। দেবলোক অর্থে দেবগণের বাসস্থান। দেব শব্দের অর্থ উজ্জ্বল বা প্রকাশস্বভাব—খৃষ্টীয়ান্ ও মুসল-মানেরা যাহাকে Angel বলেন, দেব বলিতে তাহাই বুঝায়। ইহাদের মতে—দান্তে তাঁহার Divine comedy তে যেরূপ নানাবিধ স্বর্গলোকের বর্ণনা করিয়াছেন, কতকটা তাহারই মত নানা প্রকার স্বর্গলোক আছে। পিতৃ-লোক, দেবলোক, চন্দ্রলোক, বিদ্যুল্লোক, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মার স্থান। ব্রহ্মলোক ব্যতীত অন্যান্য স্থান হইতে জীব ইহলোকে ফিরিয়া আসিয়া আবার নরজন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু যিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তিনি তথায় অনন্তকাল ধরিয়া বাস করেন। যে সকল শ্রেষ্ঠতম মানব সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও সম্পূর্ণ পবিত্র হইয়াছেন, যাঁহারা সমুদয় বাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহারা ঈশ্বরের উপাসনা ও তদীয় প্রেমে নিমগ্ন হওয়া ব্যতীত আর কিছু করিতে চান না, তাঁহাদেরই এইরূপ শ্রেষ্ঠতম গতি হয়। ইহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ নিম্নদরের দ্বিতীয় শ্রেণীর আর একদল লোক আছেন, তাঁহারা শুভকর্ম্ম করেন বটে, কিন্তু তজ্জন্য পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা ঐ শুভকর্ম্মের ফলস্বরূপ স্বর্গে যাইতে চাহেন। তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের জীব চন্দ্রলোকে গিয়া

স্বর্গসুখ ভোগ করিতে থাকেন। তথায় তিনি একজন দেব হন। দেবগণ অমর নহেন, তাঁহাদিগকেও মরিতে হয়। স্বর্গেও সকলে মরিবে। মৃত্যু-শূন্য স্থান কেবল ব্রহ্মলোক, সেখানেই কেবল জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। আমাদের পুরাণে দৈত্যদিগেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা সময়ে সময়ে দেবগণের সহিত বিরোধ করেন। সর্ব্বদেশের পুরাণেই এই দেবদৈত্যের সংগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে দৈত্যেরা দেবগণের উপর জয়লাভ করিয়া থাকেন। সকল দেশের পুরাণে ইহাও পাওয়া যায় যে, দেবগণ মানবজাতির সুন্দরী দুহিতাপ্রিয়। দেবরূপে জীব কেবল তাঁহার ভূতকর্ম্মের ফলভোগ করেন, কিন্তু কোন নূতন কর্ম্ম করেন না। কর্ম্ম অর্থে যে সকল কার্য্য ফলপ্রসব করিবে, সেগুলিও বুঝাইয়া থাকে আবার ফলগুলিকেও বুঝাইয়া থাকে। মানুষের যখন মৃত্যু হয় ও সে দেব হয়, তখন সে কেবল সুখভোগ করে, নূতন কোন কর্ম্ম করে না। সে তাহার অতীত শুভকর্ম্মের পুরস্কার ভোগ করে মাত্র। কিন্তু যখন ঐ শুভ-কর্ম্মের ফল শেষ হইয়া যায়, তখন তাহার অন্য কর্ম্মফল প্রসবোন্মুখ হয়।

বেদে নরকের কোন প্রসঙ্গ নাই। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে পুরাণকার—আমাদের পরবর্ত্তী কালের শাস্ত্রকারগণ—ভাবিয়াছিলেন, নরক না থাকিলে কোন ধর্ম্মই সম্পূর্ণ হইতে পারে না, সুতরাং তাঁহারা নানাবিধ নরক কল্পনা করিলেন। দান্তে তাঁহার 'নরকে' যত প্রকারের শাস্তি দেখাইয়াছিলেন, ইঁহারা তত প্রকার, এমন কি, তাহা হইতেও অধিক প্রকার নরক যন্ত্রণার কল্পনা করিলেন। তবে আমাদের শাস্ত্র দয়া করিয়া বলেন, এই শাস্তি কিছুকালের জন্য মাত্র। ঐ অবস্থায় অশুভ কর্ম্মের ফল ভোগ হইয়া উহা ক্ষয় হইয়া যায়, তখন জীবাত্মাগণ পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া আর একবার উন্নতি করিবার অবসর পায়। এই মানবদেহেই মানুষ উন্নতিসাধনের বিশেষ সুযোগ পায়। এই মানবদেহকে কর্ম্মদেহ বলে, এই মানব দেহেই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট স্থির করিয়া থাকি। আমরা একটী বৃহৎ বৃত্তাকারে ভ্রমণ করিতেছি, আর মানবদেহই সেই বৃত্তের মধ্যে এক বিন্দু, যথায় আমাদের ভবিষ্যৎ অবস্থা স্থির হয়। এই কারণেই অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার দেহ অপেক্ষা মানবদেহই শ্রেষ্ঠতম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মানব দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠতর। দেবগণও মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। দ্বৈত বেদান্ত এই পর্য্যন্ত বলেন।

তারপর বেদান্ত দর্শনের আর এক উচ্চতর ভাব আছে—তাহাতে বলে, এ সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণ সমীচীন নহে। যদি বলেন, ঈশ্বরও অনন্ত, জীবাত্মাও অনন্ত এবং প্রকৃতিও অনন্ত, তবে এইরূপ অনন্তের সংখ্যা আপনি যত ইচ্ছা বাড়াইতে পারেন, কিন্তু এইরূপ অনেকগুলি অনন্ত কল্পনা করা যুক্তিবিরুদ্ধ; কারণ, এই 'অনন্ত'গুলি পরস্পর পরস্পরের সঙ্কোচ করিয়া প্রত্যেককেই সসীম করিয়া তুলিবে, প্রকৃত পক্ষে অনন্ত বলিয়া কিছু থাকিবে না। অতএব ইহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ; তিনি নিজের ভিতর হইতে এই জগৎ বাহির করিয়াছেন। ইহার অর্থ কি ঈশ্বরই এই দেয়াল, এই টেবিল,এই পশু, হত্যাকারী এবং জগতের অন্তর্গত আর আর মন্দ জিনিষ সব হইয়াছেন? ঈশ্বর শুদ্ধস্বরূপ, তিনি কিরূপে এ সকল মন্দ জিনিষ হইতে পারেন? ইঁহারা একথার উত্তরে বলেন, না, তিনি হন নাই। ঈশ্বর অপরিণামী, এ সকল পরিণাম প্রকৃতিগত মাত্র—যেমন আমি আত্মা, অথচ আমার দেহ রহিয়াছে। এক অর্থে এই দেহ আমা হইতে পৃথক্ নহে, কিন্তু আমি, যথার্থ আমি কখনই দেহ নই। আমি কখন বালক, কখন যুবা, কখন বা বৃদ্ধ হইতেছি, কিন্তু উহাতে আমার আত্মার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। উহা সেই যে আত্মা, সেই আত্মাই থাকে। এইরূপ প্রকৃতি এবং অনন্ত আত্মা সমন্বিত এই জগৎ যেন ঈশ্বরের অনন্ত শরীরস্বরূপ। তিনি ইহার সর্ব্বাংশে ওতপ্রোত ভাবে রহিয়াছেন। তিনিই একমাত্র অপরিণামী, কিন্তু প্রকৃতি পরিণামী এবং আত্মাগণও পরিণামী। প্রকৃতির কিরূপ পরিণাম হয়? প্রকৃতির রূপ বা আকার ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, উহা নূতন নূতন আকার গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু আত্মাসকল এইরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে না। উহাদের কেবল জ্ঞানের সঙ্কোচ ও বিকাশ হয়। প্রত্যেক আত্মাই অশুভ কর্ম্ম দ্বারা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়। যে সকল কার্য্যের দ্বারা আত্মার স্বাভাবিক জ্ঞান ও পবিত্রতা সঙ্কুচিত হয়, তাহাদিগকেই অশুভ কর্ম্ম বলে। যে সকল কর্ম্ম আবার আত্মার স্বাভাবিক মহিমা প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহাদিগকে শুভকর্ম্ম বলে। সকল আত্মাই শুদ্ধস্বভাব ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের নিজেদের কার্য্য দ্বারা তাঁহারা সঙ্কোচ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তথাপি ঈশ্বরের কৃপায় ও শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহারা আবার বিকাশপ্রাপ্ত হইবেন ও পুনরায় শুদ্ধস্বরূপ হইবেন। প্রত্যেক জীবাত্মার মুক্তিলাভের সমান সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে এবং কালে সকলেই শুদ্ধ-

স্বরূপ হইয়া প্রকৃতির বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও এই জগতের লোপ হইবে না, কারণ, উহা অনন্ত। ইহাই বেদান্তের দ্বিতীয় প্রকার সিদ্ধান্ত। প্রথমোক্তটীকে দ্বৈতবেদান্ত বলে; আর দ্বিতীয়োক্তটী—যাহার মতে ঈশ্বর, আত্মা ও প্রকৃতি আছেন, আর আত্মা ও প্রকৃতি ঈশ্বরের দেহস্বরূপ আর ঐ তিনে মিলিয়া এক—ইহাকে বিশিষ্টাদ্বৈত বেদান্ত বলে। আর এই মতাবলম্বিগণকে বিশিষ্টাদ্বৈতী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বলে।

সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মত অদ্বৈতবাদ। ইহারও মতে ঈশ্বর এই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ উভয়ই। সুতরাং ঈশ্বর এই সমগ্র জগৎ হইয়াছেন। অদ্বৈতবাদী—"ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ আর জগৎ যেন তাঁহার দেহস্বরূপ আর সেই দেহের পরিণাম হইতেছে"—বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীর এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, তবে আর ঈশ্বরকে এই জগতের উপাদান কারণ বলিবার কি প্রয়োজন? উপাদান কারণ অর্থে যে কারণটী কার্য্যরূপ ধারণ করিয়াছে। কার্য্য কারণের রূপান্তর বই আর কিছুই নহে। যেখানেই কার্য্য দেখা যায়, তথায়ই বুঝিতে হইবে, কারণই রূপান্তরিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। যদি জগৎ কার্য্য হয়, আর ঈশ্বর কারণ হন, তবে এই জগৎ অবশ্যই ঈশ্বরের রূপান্তরমাত্র। যদি বলা হয়, জগৎ ঈশ্বরের শরীর, আর ঐ দেহ সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মাকার ধারণ করিয়া কারণ হয় ও পরে আবার সেই কারণ হইতে জগতের বিকাশ হয়, তাহাতে অদ্বৈতবাদী বলেন, ঈশ্বর স্বয়ংই এই জগৎ হইয়াছেন। এক্ষণে একটী অতি সূক্ষ্ম প্রশ্ন আসিতেছে। যদি ঈশ্বর এই জগৎ হইয়া থাকেন, তবে সবই ঈশ্বর। অবশ্য, সবই ঈশ্বর। আমার দেহও ঈশ্বর, আমার মনও ঈশ্বর, আমার আত্মাও ঈশ্বর। তবে এত জীব কোথা হইতে আসিল? ঈশ্বর কি লক্ষ লক্ষ জীবরূপে বিভক্ত হইয়াছেন? সেই অনন্ত শক্তি, সেই অনন্ত পদার্থ, জগতের সেই এক সত্তা কিরূপে বিভক্ত হইতে পারেন? অনন্তকে বিভাগ করা অসম্ভব। তবে কিরূপে সেই শুদ্ধস্বরূপ এই জগৎ হইলেন? যদি তিনি জগৎ হইয়া থাকেন, তবে তিনি পরিণামী, আর পরিণামী হইলেই তিনি প্রকৃতির অন্তর্গত আর প্রকৃতির অন্তর্গত যাহা কিছু, তাহারই জন্ম মরণ আছে। যদি ঈশ্বর পরিণামী হন, তবে তাঁহারও একদিন মৃত্যু হইবে। এইটী মনে রাখিবেন। আবার আর এক জিজ্ঞাস্য এই যে, ঈশ্বরের কতখানি এই জগৎ হইয়াছে? যদি বলেন, ঈশ্বরের 'ক' অংশ জগৎ হইয়াছে, তবে ঈশ্বর

এক্ষণে ঈশ্বর—ক হইয়াছেন; অতএব সৃষ্টির পূর্ব্বে তিনি যে ঈশ্বর ছিলেন, এখন আর সে ঈশ্বর নাই। কারণ, তাঁহার ঐ অংশটী জগৎ হইয়াছে। ইহাতে অদ্বৈতবাদীর উত্তর এই যে, এই জগতের বাস্তবিক সত্তা নাই, উহা আছে, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে মাত্র। এই দেবতা, স্বর্গ, জন্মমৃত্যু, অনন্ত-সংখ্যক আত্মা আসিতেছে যাইতেছে—এ সমুদয়ই কেবল স্বপ্নমাত্র। সমুদয়ই সেই এক অনন্তস্বরূপ। একই সূর্য্য বিবিধ জলবিন্দুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানারূপ দেখাইতেছে। লক্ষ লক্ষ জলকণাতে লক্ষ লক্ষ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে আর প্রত্যেক জলকণাতেই সূর্য্যের সম্পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি রহিয়াছে; কিন্তু সূর্য্য প্রকৃতপক্ষে একটী। এই সকল জীবগণসম্বন্ধেও সেই কথা—তাহারা সেই এক অনন্ত পুরুষের প্রতিবিম্ব মাত্র। স্বপ্ন কখন সত্য ব্যতীত থাকিতে পারে না, আর সেই সত্য—সেই এক অনন্ত সত্তা। শরীর, মন বা আত্মা ভাবে ধরিলে আপনি স্বপ্নমাত্র, কিন্তু আপনার যথার্থস্বরূপ অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। অদ্বৈতবাদী ইহাই বলেন। এই সব জন্ম, পুনর্জ্জন্ম, এই আসা যাওয়া—এ সব সেই স্বপ্নের অংশমাত্র। আপনি অনন্তস্বরূপ। আপনি আবার কোথায় যাইবেন? সূর্য্য, চন্দ্র এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড আপনার যথার্থস্বরূপের নিকট এক বিন্দুমাত্র। আপনার আবার জন্মমরণ কিরূপে হইবে? আত্মা কখন জন্মান নাই, কখন মরিবেনও না, আত্মার কোন কালে পিতামাতা শত্রু মিত্র কিছুই নাই; কারণ, আত্মা অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ।

অদ্বৈত বেদান্তের মতে মানবের চরম লক্ষ্য কি? এই জ্ঞান লাভ করা ও জগতের সহিত একত্বভাব প্রাপ্তি। যাঁহারা এই অবস্থা লাভ করেন, তাঁহাদের পক্ষে সমুদয় স্বর্গ, এমন কি, ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়, এই সমুদয় স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় আর তাঁহারা আপনাদিগকে জগতের নিত্য ঈশ্বর বলিয়া দেখিতে পান। তাঁহারা তাঁহাদের যথার্থ আমিত্বলাভ করেন—আমরা এক্ষণে যাহাকে এত গুরুতর বলিয়া মনে করিতেছি, উহা সেই ক্ষুদ্র আমিত্বের অনন্তগুণ দূরে। আমিত্ব নষ্ট হইবে না—অনন্ত ও সনাতন আমিত্ব লাভ হইবে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুতে সুখবোধ আর থাকিবে না। আমরা এক্ষণে এই ক্ষুদ্র দেহে, এই ক্ষুদ্র আমিকে লইয়া সুখ পাইতেছি। যখন সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আমাদের নিজেদের দেহরূপে বোধ হইবে, তখন আমরা কত অধিক সুখ পাইব! এই পৃথক্ পৃথক্ দেহে যদি এত সুখ থাকে, তবে যখন সকল দেহ এক হইয়া যাইবে, তখন আরও কত অধিক সুখ! যে ব্যক্তি ইহা সাক্ষাৎ

করিয়াছে, সেই মুক্তিলাভ করিয়াছে, এই স্বপ্ন কাটাইয়া তাহার পারে চলিয়া গিয়াছে, নিজের যথার্থস্বরূপ জানিয়াছে। অদ্বৈত বেদান্তের ইহাই উপদেশ।

বেদান্ত দর্শন এক একটী করিয়া এই তিনটী সোপান অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে আর আমরা ঐ তৃতীয় সোপান অতিক্রম করিয়া আর অগ্রসর হইতে পারি না, কারণ, আমরা একত্বের উপর আর যাইতে পারি না। যাঁহা হইতে জগতের সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে, সেই পূর্ণ, একস্বরূপের ধারণার বেশী আমরা আর যাইতে পারি না। সকল লোকে এই অদ্বৈতবাদ গ্রহণ করিতে পারে না; উহা তাহাদের পক্ষে বিশেষ কঠিন। প্রথমতঃ, বুদ্ধিবিচারের দ্বারা বুঝাই বিশেষ কঠিন। উহা বুঝিতে তীক্ষ্ণতম বুদ্ধির প্রযোজন, অকুতোভয় বিচারশক্তির প্রয়োজন। দ্বিতীয়তঃ, উহা অধিকাংশ ব্যক্তিরই উপযোগী নহে।

এই তিনটী সোপানের মধ্যে প্রথমটী হইতে আরম্ভ করা ভাল। ঐ প্রথম সোপানটীর সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া বেশ করিয়া বুঝিলে দ্বিতীয়টী আপনিই খুলিয়া যাইবে। যেমন একটী জাতি ধীরে ধীরে উন্নতিসোপানে অগ্রসর হয়, ব্যক্তিকেও তদ্রূপ করিতে হয়। ধর্ম্মজ্ঞানের উচ্চতম চূড়ায় আরোহণ করিতে মানবজাতিকে যে সকল সোপান অবলম্বন করিতে হইয়াছে, প্রত্যেক ব্যক্তিকেও তাহাই অবলম্বন করিতে হইবে। কেবল প্রভেদ এই যে, সমগ্র মানবজাতিকেই এক সোপান হইতে সোপানান্তরে আরোহণ করিতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ লাগিয়াছে, কিন্তু ব্যক্তিগণ কয়েক বর্ষের মধ্যেই মানবজাতির সমগ্র জীবন যাপন করিয়া লইতে পারেন, অথবা তাঁহারা আরো শীঘ্র, হয় ত ছয় মাসের মধ্যেই উহা সারিয়া লইতে পারেন। কিন্তু আমাদের প্রত্যেককেই এই সোপানগুলির মধ্য দিয়া যাইতে হইবে। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা অদ্বৈতবাদী, তাঁহারা অবশ্য যখন ঘোর দ্বৈতবাদী ছিলেন, নিজেদের জীবনের সেই অংশের বিষয় আলোচনা করিবেন। যখনই আপনারা আপনাদিগকে দেহ ও মন বলিয়া ভাবেন, তখন আপনাদিগকে এই স্বপ্নের সমগ্রটাকেই লইতে হইবে। একটী ভাগ লইলেই সমুদয়টীকেই লইতে হইবে। যে ব্যক্তি বলে, এই জগৎ রহিয়াছে, কিন্তু ঈশ্বর নাই, সে নির্ব্বোধ; কারণ, যদি জগৎ থাকে, তবে জগতের একটা কারণও থাকিবে, আর সেই কারণের নামই ঈশ্বর। কার্য্য থাকিলেই তাহার কারণ আছে,

অবশ্য জানিতে হইবে। যখন এই জগৎ অন্তর্হিত হইবে, তখনই ঈশ্বরও অন্তর্হিত হইবেন। যখন আপনি ঈশ্বরের সহিত আপন একত্ব অনুভব করিবেন, তখন আপনার পক্ষে এই জগৎ আর থাকিবে না; কিন্তু যতদিন এই স্বপ্ন রহিয়াছে, ততদিন আমরা আমাদিগকে জন্মমৃত্যুশীল বলিয়া দেখিতে বাধ্য, কিন্তু যখনই 'আমরা দেহ' এই স্বপ্ন অন্তর্হিত হয়, অমনি সঙ্গে সঙ্গে আমরা জন্মাইতেছি ও মরিতেছি, এ স্বপ্নও অন্তর্হিত হইবে আর 'একটা জগৎ আছে,' এই যে অপর স্বপ্ন, তাহাও চলিয়া যাইবে। যাহাকে আমরা এক্ষণে এই জগৎ বলিয়া দেখিতেছি, তাহাই আমাদের নিকট ঈশ্বর বলিয়া প্রতিভাত হইবে, এবং যে ঈশ্বরকে এতদিন আমরা বহির্দ্দেশে অবস্থিত বলিয়া জানিতেছিলাম, তিনিই আমাদের আত্মার অন্তরাত্মারূপে প্রতীত হইবেন। অদ্বৈতবাদের শেষ কথা 'তত্ত্বমসি'—তাহাই তুমি।

আমাদের জাতীয় সমস্যা।

[শ্রীকুমুদ বন্ধু সেন।]

প্রত্যেক জাতির একটা জাতীয় ভাব আছে। সেই ভাবসহায়ে জাতির গঠন, শক্তি ও জীবনীস্রোত প্রবাহিত হয়। এই ভাবই জাতীয় উন্নতি ও অবনতির মূল। অধুনা অনেকেই বলিয়া থাকেন, জাতি বা nation জাতীয়তা বা nationality এবং দেশহিতৈষিতা বা patriotism প্রভৃতি ভাব বিদেশী পণ্যের ন্যায় এই দেশে অল্পকালমাত্র আমদানী হইয়াছে। বাস্তবিক কি তাই?—ইহা চিন্তার বিষয়। যদি বিদেশীজাত ভাবসমুচ্চয় ভারতে উপস্থিত হইয়াই আমাদের সমগ্র জাতীয় চরিত্র বর্ত্তমানকালে আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে, তবে ইতিহাসালোচনায় আবহমানকাল হইতে আমাদের যে জাতীয় ভাবের একটা স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়, তাহার অর্থ কি? ইতিহাসসহায়ে অনুসন্ধান করিয়া দেখি, বাস্তবিকই আমাদের একটা বিশেষ ভাব আছে; নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সেই ভাব দিবারাত্রি আমাদের জাতীয় জীবনে প্রবাহিত রহিয়াছে। বিদেশীয় নয়নাভিরাম মনোমুগ্ধকর উজ্জ্বল দৃশ্যে সেই হিরণ্যজ্যোতির্ম্ময় জাতীয় ভাবটী একটু

পরিম্লান হইলেও বিনষ্ট হইবার নহে। ঐ ভাবটীই কি আমাদের nationality বা জাতীয়তার মূল সূত্র নহে ?

সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত রেণা বলেন যে, অতি প্রাচীনকালে nation ছিল না। মিশর, চীন বা খাল্‌দে (Chaldeon) nationএর মধ্যে পরিগণিত নহে। এই nation শব্দের আলোচনা করিলে এস্থলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। nation শব্দের অর্থ কি? ইংরাজী অভিধানে আছে, nation অর্থে এক শাসনতন্ত্রের অধীন বা একদেশবাসী প্রজামণ্ডলী (the people inhabiting the same country or under the same Government)। অভিধানের এই অর্থটুকু ঠিক হৃদয়ঙ্গম হয় না। এক দেশে ও এক শাসনতন্ত্রে বিভিন্নজাতির বাস থাকিতে পারে, তাহা বলিয়া সেই বিভিন্নজাতিকে একটী nation বলিয়া পরিগণিত করা, সকল সময়ে চলে না। শ্রদ্ধাস্পদ কবিবর রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, "কিন্তু nation শব্দটা অবিকৃত আকারে গ্রহণ করিতে আমি কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করি না। ভাবটা আমরা ইংরাজের কাছ হইতে পাইয়াছি, ভাষাটাও ইংরাজী রাখিয়া ঋণস্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। উপনিষদের 'ব্রহ্ম', শঙ্করের 'মায়া' ও বুদ্ধের 'নির্ব্বাণ' শব্দ ইংরাজী রচনায় প্রায় ভাষান্তরিত হয় না এবং না হওয়াই উচিত।" রবীন্দ্রনাথ nationএর ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগ-দুঃখ স্বীকার এবং পুনর্ব্বার সেইজন্য সকলে মিলিয়া প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতেই জনসাধারণকে যে একটী একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে, তাহাই নেশন্।" "অনেকগুলি সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্তহৃদয় মনুষ্যের মহাসংঘ যে একটী সচেতন চারিত্র্য সৃজন করে, তাহাই নেশন্।" যে জাতির প্রথম ভাষা বেদরূপে নির্গত হইয়াছিল, যে জাতির মূলমন্ত্র "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনং॥" এবং যে জাতির মধ্যে কঠোর তপস্বী, অপূর্ব্ব ত্যাগী এবং প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ ও আর্য্য ঋষিগণ সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন, যে জাতি "বহুসংযতমনা ও ভাবোত্তপ্ত হৃদয়" মহাপুরুষগণ কর্তৃক সংগঠিত এবং যাহা "সচেতন চরিত্র"-গৌরবে ও ব্রতসাধনে বহু প্রাচীন যুগ হইতে একটী "একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি" প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং এখনও প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, সে জাতি কি 'নেশন' মধ্যে পরিগণিত নহে ?

প্রাচীন ভারতে আমাদের পুণ্যময় পিতৃপুরুষগণ আপনাদিগকে 'আর্য্য'

বলিয়া পরিচয় দিতেন। বর্ত্তমানকালে 'নেশন' বলিলে যাহা বুঝা যায়, তৎকালে আর্য্যশব্দেও তদ্রূপ একটী গৌরবময় পৃথক্ ভাব প্রকাশ করিত। এই আর্য্যজাতি নানাবর্ণে বিভক্ত থাকিয়াও আর্য্যেতর জাতিসমূহ হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া গৌরব ও স্পর্দ্ধা অনুভব করিতেন। তখন "ইহা আর্য্যজনোচিত নহে," এরূপ শব্দে বিশেষ নিন্দা ও ঘৃণা সূচিত হইত। 'নেশন' বলিলে এখন যেমন একটী "মানস পদার্থ বা ভাবময় মনুষ্যজাতির মহাসংঘ" বুঝায়, বৈদিক বা পৌরাণিক যুগে 'আর্য্য' শব্দেও তাহাই বুঝাইত। আর্য্যজাতি যে তেজোপূর্ণ অভয়বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, যুগে যুগে যে মহাবাণী ধর্ম্মাচার্য্য ও ভারতীয় বীরেন্দ্রবৃন্দের মধ্যে অভিব্যক্ত হইয়া আমাদের সমগ্র জাতিকে আন্দোলিত ও উন্মত্ত করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, তাহা কি 'নেশন' বলিলে যাহা বুঝায়, তাহাই নহে? আমাদের পূর্ব্বতন প্রাচীন বৈদিক ঋষিগণ ধর্ম্মকে মূল কেন্দ্র করিয়া জাতিকে বা নেশনকে সংগঠিত করিয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা 'নেশন' শব্দোক্তভাবকে এদেশে ইংরাজ আনিত একটী অভিনব পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত বলিয়াই আমাদের বোধ হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহে আমরা এমন অন্ধ হইয়াছি যে, আমাদের ভিতরে যে পূর্ব্বোক্তরূপ একটী জাতীয় ভাব আদিমকাল হইতে পরিপুষ্ট ও উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আমরা একেবারেই অক্ষম। অত্যুঙ্গ হিমালয় হইতে সুদূর কন্যাকুমারিকা পর্য্যন্ত বিভিন্নভাষী জাতিসমূহকে যে ভাবটি ধর্ম্মের দ্বারা শাস্ত্রের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই অবধারণ করিতে আমরা ভুলিয়া যাই। 'নেশন' শব্দ ভাষান্তরিত না হইতে পারে, কিন্তু এক মহাভাব যে ভারতবাসীকে দৃঢ়রূপে সংবেষ্টন করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতি হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে, তাহা আমরা অবিচলিত কণ্ঠে বলিব। ইতিপূর্ব্বে এই সভাগৃহে ভারতের ঐতিহাসিক তত্ত্ব আলোচনায় আমরা যাহা বলিয়াছিলাম, তাহারই কিঞ্চিৎ এস্থলে উদ্ধৃত করিব।

"এইটুকু মাত্র এখন আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, পাশ্চাত্য জাতির ইতিবৃত্তের প্রধান নায়ক—রাজা, এবং তৎপ্রতিদ্বন্দ্বী—প্রজাকুল। সমগ্রজাতি এতৎ উভয়ের সংঘর্ষবলে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে এবং উহাদের উত্থান পতনে, মিলন দ্বন্দ্বে এবং বিকাশ সঙ্কোচে, সমগ্র জাতির ভাগ্য নিহিত। আর সে সকল পাশ্চাত্য জাতির ভিতর উক্ত রাজশক্তিকে প্রজাকুল সম্যক্-

রূপে করায়ত্ত করিয়া আপন ইঙ্গিতে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাহাদের ভিতর বাণিজ্যাধিগত ধনাধিকারী বৈশ্যকুল সর্ব্ববিষয়ে নায়কত্ব লাভ করিতেছে। ভারতের জাতীয়তা এইরূপে কোন কালে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।"

"অনন্ত কালচক্রের কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে আমাদের জন্মভূমি এই পুণ্য-ক্ষেত্র ভারত, মনোরম প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ হইয়া, আর্য্যসন্তানকে প্রথম বক্ষে ধারণ করিলেন। ভারতসন্তান নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন—রেবা, দৃশদ্বতী, সিন্ধু, কাবেরী, সরস্বতী, গঙ্গা, যমুনা প্রভৃতি নদীকুল মৃদু কল-নাদে বহিয়া যাইতেছে; শুভ্রতুষারকিরীটী হিমাচল প্রেমে গদ গদ হইয়া ধ্যানস্তিমিতলোচনে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব জগন্নিয়ন্তার উদ্দেশে ঊর্দ্ধদেশে চাহিয়া রহিয়াছে; নিবিড় অরণ্যানী তরুলতাগুল্মবিতানে বিবিধ শ্বাপদ বিহঙ্গম প্রভৃতি প্রাণীর আশ্রয়স্বরূপ হইয়া পুণ্য তপোবনের আকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আর্য্যসন্তান দেখিলেন—জলে রূপ, স্থলে মোহ, চন্দ্রে দীপ্তি, সূর্য্যে জ্যোতিঃ, বিহঙ্গে গীতি, কুসুমে কান্তি এবং হৃদয়ে প্রেম। জীবনের সেই শুভদিনে তাহার প্রথম অনুভূতি হইল—শৈলে শান্তি, অরণ্যে ছায়া, বৃক্ষে পুষ্টি, কাষ্ঠে আরুণি এবং নদীতে পাবনীশক্তি। স্তব্ধ হৃদয়ে আর্য্যসন্তান নদীতীরে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে তখন মায়া-আবরণ খসিয়া পড়িল; দেখিলেন—সীমাশূন্য—দিক্‌শূন্য—অনন্তপ্রসারিত ব্রহ্মাণ্ডাবরণে আবৃতা অনন্তকান্তি উমা হৈমবতী ধীরে ধীরে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতে করিতে তাঁহার মুগ্ধনেত্রের সম্মুখে বিরাজিতা রহিয়াছেন। সে অখণ্ড রূপরাশিতে সমগ্র জগৎ নূতনালোকে উদ্ভাসিত। দেখিলেন এবং শুনিলেন—সেই সশৈলবনকাননাম্বরা মোহিনীর অশরীরি বাণী—'অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্য-হমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ। * ময়াসোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণীতি যঃ শৃণোত্যুক্তং।—আমি রুদ্রাদি দেবশরীরে শক্তিরূপে বর্ত্তমান; আমারই শক্তিপ্রভাবে সকলে জীবিত থাকে এবং দর্শনশ্রবণাদি সকলকার্য্য সম্পাদন করে।' ভারতের জীবনেতিহাসে সেই নবারুণরাগরঞ্জিত প্রথম ঊষা। তারপর দিনে দিনে বৎসরে বৎসরে কত দর্শন, কত ধর্ম্ম, কত অপূর্ব্ব চিন্তায় ভারত পল্লবিত হইল। এইরূপে দিব্যদর্শী ঋষিকুল হইতে আমাদের ইতিহাসের আরম্ভ। বৈদিক যুগই আমাদের ভারতীয় ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়। পূণ্যময় হিমালয়ের পাদমূল হইতে আমাদের জাতীয় জীবনস্রোত প্রথম প্রবাহিত হয়।"

ধর্ম্ম আমাদের জাতীয়তার মূল কেন্দ্র। সমাজ ও রাজনীতি শিক্ষা দীক্ষা প্রভৃতি সমস্তই এই দৃঢ়ভিত্তির উপর সংস্থাপিত। আমাদের ভারতীয় আর্য্যজাতির মূল উদ্দেশ্য—আধ্যাত্মিক ভাবতরঙ্গ বিস্তার। কবি যথার্থই গাহিয়াছেন—

"প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে
প্রথম সামগান তব তপোবনে
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞান ধর্ম্ম কত পুণ্য কাহিনী।"

ভারতীয় মহাপুরুষদিগের ঐ উচ্চাদর্শই আমাদের জাতীয় ভাব। আমাদের বীরত্ব মহত্ত্ব ত্যাগ ও কঠোর সহিষ্ণুতা ঐ ব্রতপালনেই উদ্ভাসিত হয়। আধ্যাত্মিক কষ্টিপাথরেই আমাদের জাতীয়তা চিরকাল পরীক্ষিত হয়। নেশন বা জাতি, নেশন্যালিটী বা জাতীয়তা ভারতে চিরদিন বিদ্যমান ছিল। ভারতীয় আর্য্যজাতি ধর্ম্মের বন্ধনে চিরকাল পরকে আপন করিয়া লইয়াছে। নানাভাষা, নানাবর্ণ, নানাপ্রকার বিভিন্ন আচার ও বিরুদ্ধ প্রকৃতি জাতিসমূহ ঐ ধর্ম্মভাবসহায়েই হিন্দুসমাজের ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছে। সৃষ্টির বিচিত্রতার মধ্যে যেমন এক অপূর্ব্ব মিলন সঙ্গীত উত্থিত হইতেছে, তেমনি ভারতের বিশাল বিচিত্র সমাজে নানা প্রভেদ ও আপাতঃ বিরোধ পার্থক্যের মধ্যেও ঐ ভাবই ঐক্যের বন্ধন রাখিয়াছে। যেদিন হইতে আমরা ঐক্যের ঐ মূলভাবটী হারাইয়া ফেলিয়াছি, সেদিন হইতে আমরা আমাদের বিরাট্ সমাজের পরিধির কেন্দ্র খুঁজিয়া পাইতেছি না।

বহুদিন হইতে ভারত জড়জগতকে উপেক্ষা করিয়া অন্তর্জগতের তত্ত্বান্বেষণ করিতেছে। যাহা ক্ষণভঙ্গুর ও বিনাশশীল, তাহা মানবের শান্তির আকর হইতে পারে না। তাই বাহ্যসৌন্দর্য্য ও বাহ্যসুখসচ্ছন্দতার প্রতি মনোনিবেশ না করিয়া, কেবল অতীন্দ্রিয় চিরসুন্দরের পূজা আর্য্য ঋষিগণ করিয়া গিয়াছেন। এই আধ্যাত্মিক তরঙ্গে আত্মহারা হইয়া আমরা বাহ্য জগতকে উপেক্ষা করিয়াছি। ব্রাহ্মণ্যশক্তি ক্ষাত্রবীর্য্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া চিরদিন বাহুবলকে ভারতবাসী তুচ্ছ করিয়াছে। কিন্তু যখন কালক্রমে দুর্দ্ধর্ষ আরবজাতি প্রদীপ্তহুতাশনের ন্যায় ভারতে প্রবেশ করিয়া তপোবন দগ্ধ করিতে লাগিল, তখন বাহুবলের প্রয়োজনীয়তা আমরা উপলব্ধি করিলাম। কিন্তু তখন তাহার অনুশীলন করিবার সুযোগ কোথায়? চারিদিকে হিন্দুজাতি বিধ্বস্ত ও

বিপর্য্যস্ত হইল। তখন আমরা বাহুবলের নিকট অবনত-শির হইলাম। ক্ষণ-কালের নিমিত্ত আধ্যাত্মিক শক্তি তখন বাহুবলের নিকট সঙ্কুচিত ও সন্ত্রস্ত। পরে ক্রমশঃ যখন আমাদের জাতীয় ভাব বিনিময়ে ইস্‌লামকে আপনার করিবার উপক্রম করিলাম, তখন সমুদ্রপার হইতে বিদেশী বণিক্‌জাতি বাণিজ্যকৌশলে আমাদিগকে বিমুগ্ধ করিয়া করায়ত্ত করিল। এই বাণিজ্যবিস্তারের অন্তরালে ক্ষত্রিয়ের বাহুশক্তি লুক্কায়িত ছিল। বণিক্ ইংরাজজাতি এক্ষণে ভারতের একচ্ছত্র অধীশ্বর হইল। বিলাতী পুতুল ও ক্রীড়ার সামগ্রী দেখিয়া যেমন বালকেরা দেশের মাটীর পুতুল বা খেল্‌না ভুলিয়া গেল, ভারতবাসীও তেমনি এই নবীন জাতির বিচিত্র পোষাক, হাবভাব, আচার, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতিতে বিস্মিত হইল। জড়বিজ্ঞানের অভিনব তত্ত্ব ভারতে প্রতিষ্ঠালাভ করিল। পাশ্চাত্য জাতির শাসনপদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক উন্নতি এবং অপূর্ব্ব কার্য্যকুশলতা দেখিয়া ভারতবাসী আপনাদিগকে হীন মনে করিয়া দীন ভাবে ইহাদের আমূল শিক্ষা অবিকল গ্রহণ করিতে লাগিল। সেই দিন হইতেই আমাদের জাতীয় জীবনে বিষম আঘাত পড়িয়াছে। আমাদের চিরপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম ও সমাজ প্রভৃতিতে বিপ্লবের সূচনা আরম্ভ হইয়াছে এবং বিদেশী অনুকরণের মোহ আসিয়া আমা-দিগকে আবরিত করিয়াছে। ঐ অনুকরণ-মোহে কয়েক বৎসর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া এখন আমরা দেখিতেছি, উহাতে আমাদের যথার্থ মঙ্গল সাধিত হয় নাই, আমরা দিন দিন অবনতির চরমসীমায় উপনীত হইতেছি। আমরা দেখিতেছি, বিলাসিতার মোহে জোৎজমী ছাড়িয়া চাকুরীস্বীকার জীবনের উদ্দেশ্য করা আমাদের ভাল হয় নাই; দেশজাতশিল্প দূরে ফেলিয়া বিদেশীর মনোভিরাম ভোগোদ্দীপক দ্রব্যসম্ভারের আদর করা আমাদের ভাল হয় নাই। আমরা দেখিতেছি, ঐ প্রকার কারণসমূহ মিলিত হওয়াতেই দেশ ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া চিরদুর্ভিক্ষ ও রোগের আকর হইয়াছে। আজ অতীত স্মৃতি আমাদের একটু জাগিয়া উঠিয়াছে, তাই আধ্যাত্মিক শক্তির অভাবই যে আমাদের জাতীয় জীবনে এই দরিদ্রতা আনয়ন করিতেছে, তাহা কেহ কেহ উপলব্ধি করিতেছেন; এবং এই অতীত ও বর্ত্তমানের বিষম দ্বন্দ্ব উপলব্ধি করিয়াই ভারতে আজ এই মহা চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইতেছে।

ঐ চাঞ্চল্যের ফলস্বরূপ যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, কংগ্রেস তন্মধ্যে অন্যতম। গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ কংগ্রেস ভারতে নেশন গঠন করিবার জন্য

রাজনৈতিক আন্দোলন করিতেছিল। কংগ্রেসের নেতৃবর্গের ধারণা ছিল যে, তাঁহারা রাজদ্বারে রাজনীতি অধিকারের ভিক্ষার দ্বারা সমগ্র জাতিটাকে ঘোর সুষুপ্তি হইতে উদ্বোধিত করিতে পারিবেন। রাজ্যশাসনে আমাদের অধিকার না থাকার কথা শুনিয়া প্রজাসাধারণ তল্লাভে সচেষ্ট হইবে এবং আমাদের দুঃখ, আমাদের মর্ম্মকাহিনীর অভিযোগ দ্বারা রাজকর্ণ পীড়িত হইলে আমরা সায়ত্বশাসনের সুবর্ণ গোলক হস্তগত করিয়া মহাজাতিতে পরিণত হইতে পারিব—এইরূপে ইংরাজজাতির উদারতা আমাদিগের জাতীয় দুর্ব্বলতা নষ্ট করিয়া সবলতা আনয়ন করিবে, ইহাই কংগ্রেসের নেতৃবর্গের বিশ্বাস ছিল।

কথায় বলে বালক ও স্ত্রী জাতির রোদনই বল। কারণ, ইহাদের কোন স্বাতন্ত্র্য নাই। পিতা মাতা, ভ্রাতা পুত্র প্রভৃতির দ্বারা ইহারা পরিচালিত, সুতরাং ইহাদের আর্ত্তনাদ ভিন্ন আর গতি নাই। সেইরূপ কোন জাতি বালকত্ব বা স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইলে রোদন ও আবদার করিতে শিখে। কংগ্রেসও নিশ্চিত ঐ মন্ত্র লইয়া ভারত-মণ্ডপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, নতুবা ত্রিশ বৎ-সরের মিলনের ফলে নেতৃবর্গের মধ্যে বাদবিসম্বাদে আজ এই বিষম দুর্দ্দশা সমুপস্থিত হইবে কেন? কংগ্রেসের এখন ভাঙ্গা আসর। এই ভাঙ্গা আসরে খণ্ডবিগ্রহসকল এখন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোন ব্যক্তি, জাতি বা দলের যে একটা উদ্দেশ্য থাকে, তাহার সেই উদ্দেশ্য সাধন না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাতে জীবনীশক্তি পূর্ণরূপে প্রবাহিত থাকে। কংগ্রেসের এই অকালবিয়োগে প্রতিপন্ন হয় যে, হয় ইহার ঠিক একটা জীবনীশক্তি ছিল না অথবা যে ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য লইয়া উহা ক্ষুদ্র জীবনলাভ করিয়াছিল, তাহা সাধিত হইয়া গিয়াছে। শুধু কাঁদিয়া ও অভাব জানাইয়া কখনও কোনও জাতি কি মহত্ত্ব-শিখরে আরূঢ় হইয়াছে? ইতিহাসে আমরা এরূপ দৃষ্টান্ত আজ পর্য্যন্তও দেখি নাই।

কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া অধুনা যে সকল দলের সৃষ্টি হইয়াছে তাহাদেরই অন্ত-তমে স্বদেশসেবা, স্বরাজ ও স্বাধীনতা মূলমন্ত্র হইয়াছে। ফরাসীবিপ্লবে যে Liberty, fraternity এবং equality'র ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, ইহা তাহারই অনুকরণ বা প্রতিধ্বনি বলিয়া বোধ হয়। এই দলে স্বার্থশূন্যতা, আত্মত্যাগ ও চরিত্রের অপরিসীম বল অনেক স্থলে পরিলক্ষিত হয় বটে কিন্তু ইহার উদ্দেশ্যও আমাদের জাতীয় মহদাদর্শের উপর

ঠিক ঠিক প্রতিষ্ঠিত কি না, সে বিষয়ে আমরা বিশেষ সন্দিহান। সত্য, প্রেম ও সরলতার উপর যাহার ভিত্তি সংস্থাপিত হয়, তাহাই অবিনাশী। দ্বেষ হিংসা প্রভৃতির সহায়ে কখনও কোন বাস্তবিক মহৎ কার্য্য সাধিত হয় না। সেজন্য ভারতের মৃত্তিকায় এই বিজাতীয় ভাব যে অঙ্কুরিত হইয়া কখনও ফলপুষ্পে সুশোভিত হইবে, সে বিষয়ে আমাদের বিশেষ সন্দেহ; সেই জন্যই মনে হয়, ইহারও স্বাভাবিক মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের মনে হয়, এই সকল বাহ্যিক রাজনীতি আন্দোলনে আমাদের জাতীয় জীবন কখনই পূর্ব্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবে না। উহা করিতে হইলে আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় সমস্যা কি, তাহা পূর্ব্বে নির্দ্ধারণ করিয়া স্থির শান্ত বুদ্ধিতে ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিতে হইবে।

পূর্ব্বে আমাদের যে সমাজ-বন্ধন ছিল, এখন তাহা নাই। ঐ সমাজ উচ্চনীচ সকলের ভিতর একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া এক একটী প্রদেশকে একতার সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছিল। শিক্ষিত সম্প্রদায় "সমাজ" বলিলেই এখন নাসিকা কুঞ্চন করেন। এখন ঐ কথায় তাহাদের মনোমধ্যে জাতি-ভেদপ্রথার কথাই উদিত হয়। জাতিভেদকে তাঁহারা এখন যতই কুপ্রথা মনে করুন না কেন, তত্রাচ পূর্ব্বকালে উহাতে যে আমাদের বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয়, তাঁহারা অস্বীকার করিবেন না। তখনকার জাতিভেদটাও যে এখনকার জাতিভেদটার মত ঠিক ছিল না, তাহাও বোধ হয়, নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। "রহিম চাচা," "আবদুল দাদা" প্রভৃতি গ্রাম্যসম্বন্ধ সমাজের শীর্ষস্থানে আসীন ব্রাহ্মণও অবনত মস্তকে স্বীকার করিত। তখন তাঁতি, কামার, জেলে, সূত্রধর প্রভৃতি সমাজের নিম্নশ্রেণীর জাতিসমূহের সহিত জাতিভেদ প্রথা সত্বেও এইরূপ একটা নিকট সম্পর্ক স্ত্রীপুরুষ মধ্যেও প্রচলিত ছিল। তখন আমাদের গ্রামের অন্তঃপুরে বা বাহিরের বৈঠকখানায় উচ্চাবচ সকল শ্রেণীরই সুখদুঃখের কাহিনী সমভাবে আলোচিত হইত এবং পরস্পরের সাহায্যে আমাদের সমাজের গতি নির্ব্বিঘ্নে অতি শীঘ্র সম্পন্ন হইত। আজ বৈদেশিক সংঘর্ষে আমাদের সমাজের সে সহজ সরল অবস্থা দূরীভূত হইয়াছে এবং তৎপরিবর্ত্তে আমরা একরূপ সামাজিক অরাজকতায় বাস করিতেছি। কেহ কাহাকেও বড় বলিয়া খাতির করিতে নারাজ। গ্রামের মধ্যবিত্ত-শ্রেণী প্রায়ই বিদেশে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য প্রবাস করিতেছেন। জমিদার

ও মহাজন দরিদ্র প্রজা ও কৃষিকুল নিষ্পীড়ন করিয়া, মধু আহরণ করিতেই ব্যস্ত। ব্যাবহারজীবী ও দালালের (Touter এর) কৃপায় এতদুভয়ের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদ লাগিয়াই আছে। দারোগার নির্ব্বাচিত পঞ্চায়েৎ অনেক স্থলে চৌকীদার দফাদারের সাহায্যে ফৌজদারী মোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন; এবং এক বিচারালয়েই আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা অনর্থক ব্যয় হইয়া যাইতেছে। এইরূপে ধনী দরিদ্র সকলেরই ভিতর আমাদের জাতীয় ঐক্যের ব্যবধান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

ইংরাজরাজ আদালত প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহের দরুণ ষ্ট্যাম্পের প্রচলন করিয়াছেন। যাঁহাদের মোকদ্দমায় একটু অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারাই জানেন, এই ষ্ট্যাম্পের কর কত বেশী। তবু এই দরিদ্র জাতির মধ্যে মোকদ্দমার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আদালতের ব্যবহারজীবী ও টাউটরের সংখ্যা বাড়িতেছে—ইহা কে অস্বীকার করিবে? এই অর্থ নাশ রহিত করিবার অনেকটা ক্ষমতা আমাদের আছে। আমরা ইচ্ছা করিলে প্রায় বার আনা মোকদ্দমার সংখ্যা হ্রাস করিতে পারি। সমাজতন্ত্র নিয়মিতরূপে গঠিত হইলে সালিসীবিচারে অনেক বিষয়ের মীমাংসা হইতে পারে। গ্রাম্য সভা বা সমিতি সমাজের পুনর্গঠনের চেষ্টা করিতে পারে; এবং এই গ্রাম্য সমাজ হইতে আমাদের ভ্রাতৃবিরোধ প্রভৃতি নানা বিরোধের ন্যায্য বিচার হইতে পারে। এই গ্রাম্য সমাজের চেষ্টায় পথ ঘাট নির্ম্মাণ বা পরিষ্কার, জলকষ্টনিবারণ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ গ্রাম্য অভাব মোচন হইতে পারে। এই বিষয়ে দৃষ্টি আমাদের আদৌ নাই, কেন না, রাজনীতি আন্দোলনে ব্যবহারজীবী উকীলেরাই বর্ত্তমানে প্রধানতঃ আমাদের নেতা-স্বরূপে কাজ করিতেছেন। সুতরাং এই জাতীয় সমস্যার কি মীমাংসা হইতে পারে, তাহা আমাদের চিন্তা করিবার বিশেষ দরকার। প্রকৃত ধর্ম্ম, ন্যায় সরলতা ও প্রেমের সহিত এতদুপায় স্থির করিতে হইবে।

আমাদের ধারণা, যথার্থ শিক্ষাই আমাদের জাতির বর্ত্তমান অভাব। স্বদেশী আন্দোলনে জাতীয় শিক্ষাপারিষদের প্রতিষ্ঠা ও উদ্যমে আমাদের আশার সঞ্চার হইয়াছিল কিন্তু আজ আমরা তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালীতে নিরাশ হইয়াছি। জাতীয় শিক্ষাপারিষদ আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের অনুকরণে শিক্ষা মন্দিরের কার্য্য সমাধান করিতেছেন। ইহাতে জাতীয়ভাব কোথায়? যে শিক্ষায় আমাদের খাঁটি জাতীয় আদর্শ নাই, যে

শিক্ষা আমাদের ধর্ম্ম ও স্মৃতির উপর সংস্থাপিত নহে এবং তজ্জন্য আমাদের ভিতরে আমাদের জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে না, সে শিক্ষা জাতীয় শিক্ষা নামে অভিহিত হইতে পারে না। রেষারেষি করিয়া একটা শিক্ষামন্দির নির্ম্মাণ করিলেই কি তাহাতে প্রার্থিত ফল লাভ হইবে?

আমাদের শিক্ষামন্দিরে ব্রহ্মনিষ্ঠ, আদর্শ চরিত্র, বিদ্বান্, স্বার্থত্যাগী অধ্যাপকগণ থাকিবেন। তাঁহাদের পদপ্রান্তে বসিয়া বিদ্যার্থী বালক ও যুবকগণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করতঃ সংযতমনে পাঠ অভ্যাস ও জীবন গঠন করিতে শিখিবে। অধ্যাপক ও ছাত্রের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব সদা জাগরূক থাকিবে। আমাদের শিক্ষামন্দিরে দেবায়তনের গগনস্পর্শী চূড়া বিরাজমান থাকিবে এবং সে মন্দির, পবিত্র শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে মুখরিত হইয়া, "একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি"—এই সার্ব্বজনীন উদারতা প্রচার করিবে। আমাদের এই শিক্ষা মন্দিরে পরাবিদ্যা লাভের উপায়ও শিক্ষিতব্য হইবে এবং ধ্যানপরায়ণ ব্রহ্মজ্ঞগণের জ্যোতির্ম্ময় মুখমণ্ডল হইতে সেই পুরাকালের বৈদিক বাণী ধ্বনিত হইবে—

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
* * *
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং।
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥"

—"হে অমৃতের পুত্রগণ, শ্রবণ কর, হে দিব্যধামবাসিগণ, তোমরাও শ্রবণ কর। আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি—তিনি জ্যোতির্ম্ময়, অজ্ঞানান্ধকারের অতীত। তাঁহাকে জানিতে পারিলেই অমৃতত্ব লাভ হয়, মুক্তির আর অন্য পথ নাই।"

এইরূপে ঋষিপ্রদর্শিত মহদাদর্শের উপর আমাদের শিক্ষামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদের জাতীয়ভাব প্রকৃত বজায় থাকিবে এবং ঐ শিক্ষার সহিত আধুনিক বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চ্চা সম্মিলিত থাকিলে উহা দ্বারা আমাদের জাতীয়ভাব অধিকতর পুষ্টিলাভ করিবে। আমাদের শিক্ষা মন্দির হইতে মাতৃভাষায় সহজ সরলভাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রভৃতি অনূদিত হইয়া আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি এবং জনসাধারণে শিক্ষা প্রচারের সহায়তা করিবে।

আমাদের শিক্ষামন্দিরের বিদ্যার্থী যুবকগণ আপনাদিগের মধ্যে সেবকমণ্ডলী গঠিত করিয়া গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে অবকাশ মত ভ্রমণ করিয়া উপার্জ্জিত জ্ঞান দরিদ্রের পর্ণকুটীরে পর্য্যন্ত প্রচার করিবে। যাত্রা, কথকতা প্রভৃতির ভিতর দিয়া যেমন আমাদের জনসাধারণের পৌরাণিক ধর্ম্ম ও আদর্শ প্রচারিত হইত, সেইরূপ নানাবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া তাহারা যথার্থ জ্ঞান, শিক্ষা ও সকল বিষয়ের উচ্চাদর্শ দরিদ্র অজ্ঞ ও পতিতদিগের মধ্যে প্রচার করিবে। আমাদের শিক্ষামন্দিরের ছাত্রগণ এই মহাব্রত পালন করিবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যোগী থাকিবে, নাম যশের আকাঙ্ক্ষায় নহে, কিন্তু সমগ্র জাতির প্রতি মহাপ্রেমে আকৃষ্ট হইয়া নীরবে এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপারিষদ আমাদের কোন্ বিষয় শিক্ষা করা প্রকৃত আবশ্যক এবং সমগ্র জাতির ভিতরে তৎশিক্ষা কিরূপে প্রচারিত হইতে পারে, তৎপ্রতি আদৌ দৃষ্টি করিতেছেন না। তাঁহারা একটী প্রাইভেট স্কুলের মত একটী স্কুল স্থাপন করিয়া জাতীয় জীবনে নূতন স্রোত প্রবাহিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন! কিন্তু হায়! সে স্কুলে আমাদের জাতীয় জীবনপ্রবাহের প্রসারতা লাভের উপায় কোথায়—আমাদের জাতীয় আদর্শ কোথায়?

সমাজ ও শিক্ষাতন্ত্র সুনিয়ন্ত্রিত ও সুগঠিত হইলে আমাদের বর্ত্তমান জাতীয় সমস্যার অনেকটা সমাধান হয়—এ কথা সকলে বুঝিতে পারে। সেজন্য এই দুই বিষয়ে আমাদের সর্ব্বতোভাবে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু এই-গুলির চেষ্টা করিতে হইলে আমাদের জাতীয় ধনভাণ্ডারের আবশ্যক। "ন্যাশন্যাল ফণ্ড" যেরূপ ফলে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহা মনে উদিত হইলে লজ্জায় ও ঘৃণায় মস্তক অবনত করিতে হয়।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবরে রাখীবন্ধনের উৎসবে জনসাধারণের যে উন্মাদবৎ উত্তেজনা দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাতে যুগপৎ হর্ষ ও আশার সঞ্চার হয়। লোকে আমাদের জাতীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠাকল্পে সাধ্যমত টাকা লইয়া জাতীয় ধনভাণ্ডারে জমা দিতে আগ্রহান্বিত, দেখিয়াছিলাম। লোকে ভিড় ঠেলিয়া অতি কষ্টে টাকা জমা দিয়া এক একখানি রসিদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই রসিদে মুদ্রিতাক্ষরে লিখিত ছিল—"আপনার টাকা তুলা ও বস্ত্র শিল্পের উন্নতিকল্পে ব্যয়িত হইবে"; কিন্তু হায়! নেতাদিগের সেই স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞা এখন মৃগমরীচিকায় পরিণত! শুনিতে পাই, সেই অর্থ ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত

ব্যাঙ্কে জমা হইয়া, মাসে মাসে সুদে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। এরূপ জনরবও দেশে প্রচার হইয়াছিল যে, এই ন্যাশনাল ফণ্ডের টাকায় মিলনমন্দির বা Federation Hall নির্ম্মাণ হইবে। পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞার এই ফলোদয়ে জাতি আর কাহাকে বিশ্বাস করিবে? পরে হয়ত আবার শুনা যাইবে, বিলাতে কংগ্রেস অধিবেশনে ঐ টাকা ব্যয়িত হইবে। যাঁহারা এই ধনভাণ্ডারে অর্থ প্রদান করিয়াছেন, যাঁহাদের রক্তে এই ধনভাণ্ডার পুষ্টিলাভ করিয়াছে, আজ তাঁহারা যেন পর, তাঁহাদের নিকট ঐ ধনরক্ষকগণের যেন কোন কৈফিয়তেরই আবশ্যকতা নাই। এই প্রকার সহানুভূতি ও মিলনমন্ত্রে আমরা সমগ্র জাতিটাকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে চাই! হায় জাতীয়তা!

বিগত ত্রিশ বৎসরে আমাদের কার্য্যপ্রণালী অবলোকন করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, অনুকরণমোহে আমাদের মতির স্থিরতা অনেকটা নষ্ট হইয়াছে। আমরা আজ যাহা চাহিয়াছি, কাল আবার তাহা উপেক্ষা করিয়া আর একটা নূতন সামগ্রীর লোভে ধাবিত হইয়াছি। বিগত কর্ম্মগুলি ইহার জ্বলন্ত নিদর্শন। ইংরাজীশিক্ষিত সম্প্রদায় জাতীয় ভাবটা বোধ হয় যেন সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা ঐ ত্রিশ বৎসর নিত্য নূতন আদর্শ অবলম্বন করিয়া, "জাতীয় উন্নতির পক্ষে ইহাই ধ্রুব-সত্য" বলিয়া বারংবার প্রচার করিয়াছেন এবং একটু অনুধাবন করিলেই দেখিব, আমাদের সমুদায় আন্দোলনগুলিই ঠিক ঐ ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে।

আমাদের খাঁটি জাতীয় ভাব পরের অপেক্ষা করে না। সে নিজের বলে নিজে বলীয়ান্। যে ভাবমন্দাকিনী হিমালয় হইতে নির্গত হইয়া শত সহস্র বৎসর ভারতকে শস্যশ্যামলা করিয়া রাখিয়াছে, যে পবিত্র বৈদিক নির্ঝর আমাদের দেহের পুষ্টি ও মনের উৎকর্ষতা আজিও সাধন করিয়া আমাদিগকে এখনও মহদাদর্শে উদ্বোধিত করিতেছে, যে গিরিনিঃস্রাবে এখনও মহর্ষি, মহারথী ও মহাপুরুষগণ জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্ম্মক্ষেত্র ভারতকে এখনও পুণ্যতীর্থে পরিণত করিতেছেন, আমরা সেই ভাবে লব্ধজীবন মহা-পুরুষগণের মানসসন্তান। আমরা রাজপুত্র হইয়া অপরের নিকট আমাদের জাতীয়তার জন্য ভিখারী হইব কেন? আমরা আমাদের পিতৃপুরুষগণের পদানুসরণ করিয়া তাঁহাদের অপূর্ব্ব চরিত্রের আদর্শে আমাদের জাতীয় ঐক্য সাধন করিব।

প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিলে তাহার উন্নতির প্রতিরোধ করিতে কে সমর্থ হয়? জাতিটা পূর্ব্ব গৌরব স্মরণ করিলে আত্মপ্রত্যয় লাভ করিবে, আত্মপ্রত্যয় লাভ করিলেই তাহার মনে আসিবে—"অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমি সেই বিরাট্ পুরুষের অঙ্গ, আমাতে সর্ব্বশক্তি নিহিত রহিয়াছে আর এই ভাব আসিলেই সে 'অভী' বা ভয়শূন্য হইয়া নীচতা, ক্ষুদ্রাশয়তা, পরমুখাপেক্ষিতা প্রভৃতি যত কিছু বন্ধন দূরে নিক্ষেপ করিয়া, আপনার মহিমায় আপনি দণ্ডায়মান হইবে। আমাদের মধ্যে যে প্রজাশক্তি এখন বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে রহিয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্তরূপে মিলিত ও সুগঠিত করিতে হইবে। সকল বিষয়ে আর অপরের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের অনেক অভাব যে আমরা রাজদ্বারে না ভিক্ষা করিয়া নিজেরাই পূরণ করিতে পারি, ইহা নিঃসন্দেহ এবং প্রজাদের নিজের চেষ্টা না থাকিলে প্রজাদের সমূহ কল্যাণ করা কোন রাজারই সাধ্যায়ত্ব নহে—এ কথাও ঠিক। অবশ্য রাজশক্তি সহায় হইলে প্রজাশক্তি ক্ষিপ্রগতিতে পুষ্টিলাভ করে। অনেকে আক্ষেপ করেন, আমাদের সে সুযোগ নাই। কিন্তু আমরা যদি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে না করিতে মনে করি, এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করে তবেই ইহা সফল হইবে, তবে উহাকে পরাধীন জাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম ভিন্ন আর কি বলিব? এই দুর্ব্বলতা বা সঙ্কোচ দূরে পরিহার করিয়া আমাদের আত্মশক্তিতে জাগ্রত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ভাবটা আনিতে পারিলে তবেই সমগ্র জাতিটা ঐ বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ হইবে এবং তাহা হইলেই আমাদের ভিতর আত্মশক্তির বিকাশ হইবে। সমাজের পুনর্গঠনে ও আমাদিগকে সমাজগত প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতর যাহাতে ঐ 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ভাব বিকাশের সুবিধা হয়, সে বিষয়ে অগ্রে লক্ষ্য করিতে হইবে এবং ঐ ভাব যাঁহারা জীবনে অন্ততঃ অনেকটা উপলব্ধি করিয়া অনেকাংশে স্বার্থশূন্য হইতে পারিয়াছেন, এমন সকল নেতার অধীনে আমাদিগকে পরিচালিত হইতে হইবে। এইরূপে জাতিটা আবার ধাতে আসিবে এবং আবার ধীরে ধীরে তাহার প্রাণস্পন্দন হইবে। সমাজ তখন স্বতঃই জনসাধারণে শিক্ষাবিস্তার, পরস্পরের বিরোধভঞ্জন, জলকষ্টনিবারণ ও দেশে নানাবিধ সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিবে। তখনই আমরা সকল বিষয়ে যথাযথ ফললাভ করিয়া আমাদের বল বুঝিতে পারিব।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, "দার্শনিক যুক্তিবিচার ছাড়িয়া এখন কার্য্যতঃ কি করিতে পারি, তাহা বল।" কথাটা ঠিক। আমরা প্রকৃত প্রস্তাবে কি কার্য্য করিতে সক্ষম হইতে পারি, তাহা এস্থলে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিব।

(১) আমরা "অহং ব্রহ্মাস্মি" মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া সমাজকে পুনর্গঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারি। উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে দিন দিন যে ব্যবধান বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা ঐ মন্ত্রপ্রভাবে দূর করিতে পারি। ডোম, হাড়ি, চণ্ডাল, জোলা, দোসাদ প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীস্থ জাতিসমূহকে আমরা ঐ মন্ত্র উপদেশ ও সাধু সহানুভূতিপূর্ণ ব্যবহারে শিক্ষিত ও উন্নত করিতে পারি। এস্থলে একটী ঘটনার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। একদা আমি গোয়ালন্দ ষ্টেশন হইতে ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হইতেছিলাম। ষ্টীমারে দেখিলাম, তিনটী পাহাড়ী যুবক সুসজ্জিত হইয়া পুস্তকালোচনা করিতেছে। দৃশ্যটী দেখিয়া আমার কৌতূহল জন্মিল। আমি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কি জাতি? তাহাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ, সে উত্তর করিল, 'আমরা খাসিয়া'। আলাপ পরিচয়ে জানিতে পারিলাম, ইহারা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। একজন প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে, একজন দ্বিতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিতেছে এবং অপরটি কটকে চাকুরী করে। তিনজন বেশ সুন্দর ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিল। তাহারা যে আমাদের অপেক্ষা কোন বিষয়ে হীন, তাহা বোধ হইল না। মনে হইল, "আমরা নীচ অধম বর্ব্বর নহি—মানুষ, সকল মানুষের ন্যায় আমাদেরও সমাজগত জাতিগত সকল বিষয়ে সমানাধিকার আছে"—এই শিক্ষার ফলে যদি ইহাদের ভিতর এতদূর উন্নতি হইতে পারে, তাহা হইলে আর একটু অগ্রসর হইয়া ইহাদিগকে এবং দেশের সকল লোককে যদি বাল্যকাল হইতে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ভাব শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহা হইলে না জানি আরও কত লোককল্যাণ সাধিত হইতে পারে এবং সমাজের উচ্চ ও নীচ স্তরসমূহে যে বিষম ব্যবধান রহিয়াছে, তাহা ঐ শিক্ষার ফলে কতই না শীঘ্র অপসারিত হইতে পারে! 'সর্ব্বভূতে নারায়ণ অধিষ্ঠিত', 'সকলেই আমরা সনাতন বিরাট্ পুরুষের দাস, সন্তান এবং অংশ', 'বিদ্যা জ্ঞান ও সকল সদ্বিষয়ে উচ্চ জাতি সকলের ন্যায় নীচ জাতিসমূহেরও সমানাধিকার', এই সকল ঋষিবাক্য আমরা দূরে ফেলিয়া সমাজের নীচ জাতি সকলকে গো মহিষ বলীবর্দ্দের ন্যায় মনুষ্যাকারে অসভ্য প্রাণী বলিয়া স্থির ধারণা করিয়া রহিয়াছি! শিক্ষা দিলে

তাহারাও যে আমাদের মত উন্নত ও চিন্তাশীল হইতে পারে, তাহা আমরা আদৌ মনে করি না!

(২) অতএব 'অহং ব্রহ্মাস্মি' শিক্ষার অবাধ প্রচলন। শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজে ঐ মন্ত্রে বিশ্বাসবান্ হইয়া প্রতি পল্লীতে 'নৈশ বিদ্যালয়াদি' স্থাপন করিয়া নানা উপায়ে ঐ শিক্ষাবিস্তারে সহাযতা করিলে শীঘ্রই লোককল্যাণ সাধিত হইতে পারে। একখানি কি দুইখানি মাদুর, একটী বোর্ড ও কতকগুলি 'বর্ণপরিচয়' প্রভৃতি পুস্তক লইয়া রাত্রিকালে আমরা পল্লীর দরিদ্র নিম্নশ্রেণীদিগকে ঐ সঙ্গে অনায়াসে ব্যবহারিক অর্থকরী বিদ্যাসমূহও শিক্ষাদান করিতে পারি। ইহার জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে স্কুল কলেজ স্থাপন করিতে হয় না।

(৩) 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ভাব বা ধর্ম্মের বিস্তার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতির মধ্যে এক সেবাধর্ম্মের দ্বারা অনেক দূর অগ্রসর হইতে পারে। স্বয়ং ঐ মন্ত্রে বিশ্বাসবান্ হইয়া প্রেম ও সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে আমরা জাতিগত বিদ্বেষ ত্যাগ করিয়া সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে অসহায় রোগক্লিষ্ট ও ক্ষুধিতের সেবা করিলে, নিরাশ্রয়ের বেদনা নিজ হৃদয়ে অনুভব করিতে চেষ্টা করিলে ঐ 'সেবাধর্ম্ম' জাতীয় ঐক্যসংস্থাপনে কত সহায়ক হইতে পারে, তাহা আর বলিতে হইবে না।

(৪) 'অহং ব্রহ্মাস্মি' মন্ত্রে বিশ্বাসবান্ হইয়া জাতীয় মহামণ্ডলীর অধিবেশনেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। সে অধিবেশনে আমাদের রাজনৈতিক ভিক্ষা থাকিবে না। আমাদের প্রকৃত অভাব ও আমাদের চেষ্টার দ্বারা তাহার মোচনের উপায়ই তাহাতে নির্দ্ধারিত হইবে।

দেশে এখন 'অহং ব্রহ্মস্মি' ভাব বিস্তাররূপ কার্য্য করিবার সময় আসিয়াছে। আমাদের গৌরবময় অতীত স্মৃতি জাগ্রত করিয়া আমাদের বর্ত্তমানকে তাহার সহিত সম্মিলিত করিবার সময় আসিয়াছে। এই মহাকার্য্য সাধিত হইলে ভারত আবার জগতের শীর্ষস্থান লাভ করিবে! ভারতের ব্রত আছে, উদ্দেশ্য আছে, তাই ভারতের ধ্বংস হয় নাই। জগতের সভ্যতাভাণ্ডারে ভারতের ঐ ভাব বিস্তাররূপ প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই ভারত আজিও জীবন্ত রহিয়াছে। ভারতের ভগবান্ পুনরায় বজ্রগম্ভীর নির্ঘোষে বলিতেছেন—

"কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিত।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন॥
ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপঃ॥"

এবং পুনরায় তপোদ্দীপ্ত ঋষিগণ দিব্যদেহে আমাদিগকে আহ্বান করিয়া অভয় প্রদান করতঃ বলিতেছেন—

"উত্তিষ্ঠতঃ জাগ্রতঃ প্রাপ্য বরান্নিবোধতঃ।

৺রামেশ্বর।

[শ্রীনিকুঞ্জ বিহারী মল্লিক।]

ভগবান্ ত্রেতাযুগে দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া পিতৃসত্য-পালনহেতু বনবাসকালে লঙ্কাধিপতি রাবণ তাঁহার পত্নী সীতাদেবীকে হরণ করে। শ্রীরামচন্দ্র সীতা উদ্ধারার্থ বানরগণের সাহায্যে বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নল বানরের দ্বারায় ভারতের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত সমুদ্রের উপর যে পারাপারের সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহারই এক অংশের উপর ৺রামেশ্বর মহাদেব প্রতিষ্ঠিত। ভগবান্ চারিযুগে চারিমূর্ত্তিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ভারতের চারিদিকে যে চারিটী লীলাস্থান বা কীর্ত্তিচিহ্ন রাখিয়া যান, তাহাই সচরাচর ভগবানের 'চারিধাম' আখ্যায় অভিহিত হইয়া ভারতের সকল স্থানের সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুদের নিকট মহাতীর্থ বলিয়া চিরপরিচিত ; তাহার মধ্যে এই সেতুবন্ধ রামেশ্বর দ্বিতীয় ধাম বলিয়া প্রসিদ্ধ। বিশেষতঃ মহাদেবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে ৺রামেশ্বর অন্যতম, এজন্য এখনও ভারতের সকল প্রদেশ হইতে সাধু সন্ন্যাসী ও গৃহস্থ যাত্রিগণ ইহা দর্শন করিতে আইসেন। ভারতে রেলপথ নির্ম্মিত হইবার অনেক পূর্ব্বে স্বর্গীয়া রাণী অহল্যাবাই বাঙ্গালার মেদিনীপুর সহর হইতে শ্রীক্ষেত্রের মধ্য দিয়া রামেশ্বর পর্য্যন্ত যাত্রীদের সুবিধার জন্য এক রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই রাস্তার মধ্যে সাধু সন্ন্যাসীদের জন্য সত্র বা সদাব্রত সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। এখনও অনেক সাধু সন্ন্যাসীরা এই পথে শ্রীক্ষেত্রে জগদীশ দর্শন করিয়া পরে জিওড়ে নৃসিংহজী, বেঙ্কটাদ্রি বা শ্রীশৈলে বালাজী, বিষ্ণুকাঞ্চি বা শিবকাঞ্চি, ত্রিচিনপল্লিতে শ্রীরঙ্গম, মদুরা, কূর্ম্মক্ষেত্র প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান সকল ক্রমশঃ দর্শন করিতে

করিতে রামেশ্বরে আগমন করিয়া থাকেন। রামেশ্বর হইতে অপর একটী রাস্তা ভারতের পশ্চিম সাগরের উপকূল দিয়া দ্বারকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। সাধু সন্ন্যাসিগণ রামেশ্বর দর্শন করিয়া এই শেষোক্ত রাস্তা ধরিয়া পদম্‌নাথ, জনার্দ্দন, কন্যাকুমারী, কানাড়ায় গোকর্ণ মহাদেব, মহাবালেশ্বর, পুণ্ডারপুর প্রভৃতি তীর্থসমূহ দর্শন করিতে করিতে ক্রমশঃ প্রভাস ও দ্বারকায় গমন করেন।

আমি চার বৎসর পূর্ব্বে জনৈক বন্ধুর সহিত রেলযোগে দাক্ষিণাত্যের বালাজী, কাঞ্চী, শ্রীরঙ্গম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ দেবস্থান সকল দর্শন করিয়া সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলের মদুরা ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। তখন মদুরা হইতে রামেশ্বর যাইবার জন্য পামবান-শাখা রেল খোলা হয় নাই, এ কারণ, মদুরা হইতে গোরুর গাড়িতে করিয়া রামেশ্বর যাইতে হইত। এখন পামবান পাশ বা হরবলার খাড়ি পর্য্যন্ত রেল খোলা হইয়াছে। অতএব যাত্রিগণ এই শাখা রেলের শেষ ষ্টেশন মানডাপাম (Mandapam) বা হরবলার খাড়ি রেলযোগে আসিলে আর পূর্ব্বের ন্যায় বিলম্ব ও গোরুর গাড়ির কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। আমরা মদুরা ষ্টেশনে নামিয়া ষ্টেশনের নিকট মিউনিসিপালিটীর নির্ম্মিত ধরমশালায় বাসা লইলাম। মদুরা সহর ভ্যাগারু নদীর দক্ষিণ তটে সংস্থাপিত। এখানে যাত্রীদের থাকিবার জন্য দুইটী ধরমশালা আছে। একটী ভ্যাগারু নদীর তটে, অপরটী ষ্টেশনের নিকট। মদুরা, সুন্দরলিঙ্গের মন্দির ও তিরুমল নায়কনের প্রাসাদের জন্য প্রসিদ্ধ; এই স্থানে অতি পুরাকালে পাণ্ড্য রাজারা রাজত্ব করিতেন। স্থল-পুরাণে বর্ণিত আছে যে, এক সময় দেবরাজ ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যাপাপে লিপ্ত হইয়া স্বর্গ-ত্যাগ করিয়া ভারতের তীর্থসকল ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে পৌঁছিবা-মাত্র ব্রহ্মহত্যাপাপ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। দেবরাজ ইন্দ্র এই স্থানে আসিয়াই সহসা ঐ পাপ হইতে মুক্তির কারণ অবগত হইবার মানসে এই স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে এক অনাদিলিঙ্গ দেখিতে পাইয়া, বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া উক্ত লিঙ্গের উপর মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন। লিঙ্গের নাম 'সুন্দর' রাখিয়া বৃহস্পতির দ্বারা বৈশাখী পূর্ণিমাতে বৈদিক মতে তাহার পূজা করাইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। স্থল পুরাণে বর্ণিত আছে, শ্রীরামচন্দ্র সীতান্বেষণ করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে লঙ্কার উদ্দেশে আসিবার সময়ে অগস্ত্য মুনির আদেশানুসারে মদুরায় আসিযা 'সুন্দর' দেবের পূজা ও আরাধনা করিয়াছিলেন।

খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান শাসনকর্ত্তারা সুন্দরেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখের প্রাচীর ও গোপুর বা প্রবেশদ্বার ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। এখন মন্দিরের সম্মুখে এই ভাঙ্গা গোপুরের নিম্নে বাজার বসিয়া থাকে। মন্দিরটী খুব বড় ও প্রশস্ত এবং চতুর্দ্দিকে রাজপথ দ্বারায় বেষ্টিত। ইহাতে ৯টী গোপুর বা প্রবেশদ্বার আছে। তন্মধ্যে একটী ১৫২ ফিট্ উচ্চ। এই দেবালয়ের প্রাকার পূর্ব্ব পশ্চিমে ৭৪৪ ফিট্ এবং উত্তর দক্ষিণে ৮৩৭ ফিট্। মন্দির-মধ্যে ৺সুন্দরেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গ ও ৺মীনাক্ষী দেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। পার্শ্বে শিবগঙ্গা নামক চতুর্দ্দিকে পাথরে বাঁধান সরোবর। মন্দিরের মধ্যে স্থানে স্থানে সুন্দরেশ্বরের লীলার জন্য অনেকগুলি মণ্ডপ নির্ম্মিত আছে। তন্মধ্যে সহস্র-স্তম্ভ-মণ্ডপ ও বসন্ত-মণ্ডপ নামে বৃহৎ মণ্ডপদ্বয় প্রসিদ্ধ। বসন্ত-মণ্ডপ দৈর্ঘ্যে ১০০ গজ ও প্রস্থে ৬০ ফিট্। ইহার ছাদ ১২০টী প্রস্তর-স্তম্ভের উপর নির্ম্মিত এবং প্রত্যেক স্তম্ভ ২০ ফিট্ উচ্চ। ইহার মধ্যে জল প্রবাহিত হইবার পয়ঃপ্রণালী আছে। এই মণ্ডপে বৈশাখ মাসে ৺সুন্দর-লিঙ্গদেবের বসন্ত ক্রীড়া উৎসব হইয়া থাকে। এই মণ্ডপ তিরুমল নায়ক নামক জনৈক ভক্তরাজা ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দেন। প্রত্যহ রাত্রে এই মন্দির আলোকমালায় সুশোভিত করা হয়।

এই মন্দির হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে তিরুমল নায়কের রাজভবন বা চৌলটি দেখিবার যোগ্য স্থান। ইহার সমুদয়ই প্রস্তরনির্ম্মিত ও সুগঠিত। এই প্রশস্ত গৃহের ছাদ ১২৫টী চমৎকার খোদকারী স্তম্ভের উপর রক্ষিত। এই বাটীতে এক্ষণে জজ্ আদালত, কলেক্টারি আফিস, আবকারি বিভাগ প্রভৃতি সরকারি দপ্তর আছে। এই রাজভবন হইতে পূর্ব্ব-উত্তরে দেড় মাইল দূরে ৺রামেশ্বর যাইবার রাস্তার পার্শ্বে তেপ্পন কুলম্ নামক একটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। ইহার প্রত্যেক দিক্ ১২০০ গজ লম্বা—চারিদিকে পাথরের সিঁড়ি ও স্থানে স্থানে পাথরের ঘোড়া, ময়ূর প্রভৃতি মূর্ত্তি সুশোভিত। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটী উপদ্বীপ আছে, উপদ্বীপের চতুর্দ্দিক্‌ও প্রস্তর দিয়া বাঁধান। ইহার উপর মধ্যস্থলে দ্বিমহল দেবালয় ও চারি কোণে ৪টী ক্ষুদ্র কারুকার্য্যবিশিষ্ট দেবমন্দির আছে। গ্রীষ্মকালে জলযাত্রার উৎসবকালে সন্ধ্যার পর ৺সুন্দর লিঙ্গ ৺মীনাক্ষী দেবীর সহিত এই সরোবরে আসিয়া নৌকায় চড়িয়া পূর্ব্বোক্ত উপদ্বীপের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। এই সময় পুষ্করিণীর চারি দিকে এক লক্ষ

বাতি দেওয়ায় এই স্থান খুব আলোকিত হয়। মদুরায় এই কয়টী ভিন্ন আর বিশেষ কিছু দেখিবার নাই। তবে মদুরা এই জেলার প্রধান নগর, এ কারণ, অনেক ভাল ভাল সরকারি বাটী ও আফিস এই স্থানে আছে। আমরা এই সকল দেখিয়া গোরুর গাড়ী করিয়া পামবান্ বা হরবলার খাড়ি যাত্রা করিলাম। মদুরা হইতে হরবলার খাড়ি প্রায় ৫০ ক্রোশ। আমরা পথে ত্রিভুবন, মোতানন্দন, মানামাদুরা, পদুকোটা, পরমগুড়ি, পলুরছত্র, রামনদপুর, উচাপল্লি হইয়া চারি দিন বাদে খাড়িকা বা হরবলার খাড়ি আসিয়া পৌছিলাম। পথে এক রামনদপুর ভিন্ন আর সকলগুলিই ছোট ছোট গ্রাম, এ কারণ, দেখিবার বিশেষ কিছুই নাই। রামনদপুর বেশ বড় সহর, এখানকার বাজার হাট, রাজবাটী, মন্দির প্রভৃতি দেখিবার যোগ্য। সেতুবন্ধ রামেশ্বর, পামবান্ বা পবন বন্দর প্রভৃতি স্থান রামনদ রাজার এলাকাভুক্ত। পথে প্রত্যহই আমাদিগকে নিজ হস্তে রসুই করিতে হইত; কারণ, দাক্ষিণাত্যের অপরাপর স্থানের ন্যায় এই পথে এক রামনদ সহর ভিন্ন আর কোন স্থানেই পুরি মিষ্টান্ন প্রভৃতির দোকান নাই।

ত্রেতাযুগের সেই নলনির্ম্মিত সেতু আজও সমুদ্রোপকূলস্থ উচাপল্লি হইতে আরম্ভ হইয়া লঙ্কা পর্য্যন্ত লম্বে ৬০ মাইল এবং প্রস্থে ২।৩ মাইল স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মধ্যে ২।৩ স্থানে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় এখন আর এই সেতুর উপর দিয়া ভারত হইতে লঙ্কায় চলিয়া যাওয়া যায় না। এখনও পূর্ব্বোক্ত সেতুর ১১ মাইল একটি অংশ উচা-পল্লি হইতে খাড়িকা বা হরবলার খাড়ি পর্য্যন্ত ভারতের সহিত সম্বদ্ধ রহিয়াছে। তাহার পর ২ মাইল ভাঙ্গা, ইহাকেই পামবান্ পাশ বলে। ইংরাজেরা সেতুর এই অংশটুকু জাহাজ গমনাগমনের জন্য তোপ দিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। এখনও জলমধ্যে স্থানে স্থানে বড় বড় প্রস্তরখণ্ডসকল দেখিতে পাওয়ায় অনুমান হয় যে, আদিম কালে পাথরের দ্বারা এই সেতুবন্ধন হওয়ার কথাটি সত্য। এই পামবান্ পাশের পর ২৪ মাইল দীর্ঘ ও ৩।৪ মাইল বিস্তীর্ণ রামেশ্বর দ্বীপ। তাহার পর আবার প্রায় ৩ মাইল ভাঙ্গা। এখানে জোয়ারের সময় জল থাকে কিন্তু ভাঁটার সময় স্থানে স্থানে বালি ও পাথর জাগিয়া উঠে। তাহার পর আবার সেতুর আর একটি অংশ, ১৮ মাইল দীর্ঘ ও আড়াই মাইল বিস্তৃত। একটি কেল্লা ও বহুলোকের বাস একটি নগর শোভিত এই অংশটির নাম মান্নার দ্বীপ। ইহার পর আবার ২ মাইল ভাঙ্গা,

এই ভাঙ্গা অংশটুকু পার হইলেই লঙ্কা। এখানেও জল বড় কম। এত কম যে, ভাঁটার সময় মান্নার দ্বীপ হইতে মানুষ ও গরু হাঁটিয়া পার হইয়া লঙ্কায় যায়। পূর্ব্বে এই সেতুর উপর দিয়া লোকে লঙ্কা যাতায়াত করিত। পরে সমুদ্রের ধাক্কায় ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে ১৪৮৪ খৃঃ অবধি চলাচল বন্ধ হইয়াছে। এই সেতুর উভয় পার্শ্বে সাগরের জল কম ও অভ্যন্তরে বালি ও পর্ব্বত। এই সকল ভাগ পূর্ব্বে সেতুর অংশ ছিল। এজন্য ক্ষুদ্র নৌকাদি ব্যতীত জাহাজ চলিতে পারে না।

খাড়িকা আসিয়া আমরা গোরুর গাড়ি ছাড়িয়া দিলাম এবং নৌকা ('মেচুয়া' এখানে বলে) আরোহণ পূর্ব্বক হরবলার খাড়ি পার হইয়া রামেশ্বর দ্বীপের পামবান্ বা পবন বন্দরে উপস্থিত হইলাম। এই পামবান্ বা পবন বন্দর হইতে অনেকগুলি ষ্টীমার কলম্বো, তুতকুড়ি (Tuticorin), মান্দ্রাজ প্রভৃতি বন্দরে যাতায়াত করে। যাত্রিগণ সুবিধা বোধ করিলে ঐ সকল স্থান হইতে ষ্টীমার যোগেও রামেশ্বর আসিতে পারেন। তবে ঐ সকল স্থান হইতে প্রত্যহ ষ্টীমার যাতায়াত করে না; কোথাও সপ্তাহে দুইবার, কোথাও সপ্তাহে একবার মাত্র ষ্টীমার পাওয়া যায়। পবন বন্দরে সমুদ্রোপকূলে ৩।৪টী সাহেবদের বাঙ্গলো এবং অনেকগুলি মালগুদাম আছে। এখানে যাত্রীদের থাকিবার জন্য একটী ধরমশালা আছে। এখানকার কূপের জল বেশ সুমিষ্ট। রামেশ্বর দ্বীপে সর্ব্বত্রই কূপের জল মিষ্ট, এ কারণ, জলকষ্ট নাই। আমরা এই স্থানে আহারাদি করিয়া পুনরায় এই স্থানে গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া, এখান হইতে ৪ ক্রোশ দূরে রামেশ্বরের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। রামেশ্বর মন্দিরের চতুর্দ্দিকে প্রায় ৫০।৬০ ঘর ব্রাহ্মণ বা পাণ্ডার বাস। ইহা ভিন্ন অপর জাতীয় লোকেরও বাস আছে। এখানে সকল সম্প্রদায়ের সাধু সন্ন্যাসীদের মঠ আছে। এ কারণ,এই স্থানটী যেন একটী ছোট খাট সহর হইয়াছে। বাজারেসকল দ্রব্যই পাওয়া যায়। অনেকগুলি ধরমশালা ও পাণ্ডাদের নির্ম্মিত যাত্রীদের থাকিবার জন্য কয়েকটী বাসাবাটীও আছে। আমরা এই স্থানের একজন পাণ্ডার বাসাবাটীতে স্থান লইলাম। এখানকার পাণ্ডারা আর্য্যাবর্ত্তবাসী যাত্রীদিগের ভাষা জানেন না বলিয়া, সকলেরই যাত্রীকার্য্য সুবিধার জন্য দুই একজন আর্য্যাবর্ত্তবাসী লোক গোমস্তা নিযুক্ত আছে। ঐরূপ একজন হিন্দুস্থানী গোমস্তা মদুরা হইতেই আমাদের সঙ্গে আসিতেছিল। আমরা তাহারই নিয়োগকর্ত্তা পাণ্ডাকে আমাদের

পাণ্ডা করিলাম। আমরা শিবরাত্রের ২।৩ দিন পূর্ব্বে এখানে পৌঁছিয়াছিলাম, এ কারণ, এখানে শিবরাত্র দেখিবার জন্য ৩।৪ দিন বাস করিয়াছিলাম।

রামেশ্বর দ্বীপ বালুকাময় ও বাবলাবৃক্ষে আকীর্ণ। চাসের সম্পর্ক নাই। অধিকাংশ দ্বীপবাসী দানের উপর নির্ভর করিয়াই দিনপাত করে। ৺ রামেশ্বরের মন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত, অতি প্রকাণ্ড ও খোদকারী কারুকার্য্য পূর্ণ। দেখিতে অতি চমৎকার। প্রায় এক পোয়া সমচতুষ্কোণ স্থান ব্যাপিয়া মন্দির নির্ম্মিত। মন্দিরের বাহিরে চতুর্দ্দিকেই রাজপথ। মন্দিরের দ্বারদেশ প্রায় শত ফিট্। উহার উপর অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথর। চতুষ্কোণাকার এই সুবিস্তীর্ণ মন্দিরের দ্বারশ্রেণী দ্বারা আমরা অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলাম। পূর্ব্বদিকের বারাণ্ডা মন্ত্রীসহ পলিগার রাজমূর্ত্তি পূর্ণ রহিয়াছে। এই সকল প্রস্তর মূর্ত্তির গঠন তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। পলিগার রাজা এই স্থানে দান-শালা স্থাপন করিয়াছেন। মন্দিরের মধ্যে এক কোণে চতুর্দ্দিকে পাথরে বাঁধান ছোট একটি সরোবর বা কুণ্ড আছে। মন্দিরের মধ্যে চতুর্দ্দিকে যে কত দালান, দেবতার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন লীলা বা উৎসবের স্থান ও দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে, তাহা গণনা করা যায় না। মন্দিরের ভিতর এই সকল দেখিতে দেখিতে আমরা ২।৩ মহল অতিক্রম করিয়া শেষে রামেশ্বরজীর মহলে প্রবেশ করিলাম। এই মহলের প্রাঙ্গণে একতলা সমান উচ্চ একটী প্রকাণ্ড পাথরের ষাঁড় (এখানে এই বৃষই নন্দী নামে অভিহিত হয়) রহিয়াছে। নিকটেই একটী ৩।৪ তলা উচ্চ লৌহ নির্ম্মিত যূপস্তম্ভ প্রোথিত আছে ও প্রত্যহ ইহার পূজা হইয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল মন্দিরেই এইরূপ লোহা, পিত্তল বা তামার যূপস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়। ৺রামেশ্বর মহাদেবের মহলের চতুর্দ্দিকে বিশ্বেশ্বর, কেদারনাথ, গোকর্ণ প্রভৃতি বিস্তর লিঙ্গমূর্ত্তি পৃথক্ পৃথক্ ঘরে বিরাজিত। পূর্ব্বদিকে প্রস্তরের উচ্চ বেদিকার উপর কতকগুলি মূর্ত্তি বসিয়া আছে। পার্শ্ববর্ত্তী পৃথক্ মহলে পার্ব্বতী দেবীর মূর্ত্তি বিরাজিত। এই সকল দর্শন করিয়া আমরা ৺রামেশ্বরের গৃহে উপস্থিত হইলাম। গৃহটী খুব বড় এবং অত্যন্ত অন্ধকার, এ কারণ, গৃহমধ্যে দিবারাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছে। দাক্ষিণাত্যের প্রায় সকল মন্দিরেই এইরূপ অন্ধকার বলিয়া দিবারাত্র দীপ জ্বলিবার ব্যবস্থা আছে। গৃহমধ্যে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি কুণ্ডমধ্যে সংস্থিত। কুণ্ডের উপর অর্দ্ধ হস্ত উচ্চ হইয়া রহিয়াছে। চারিদিকে চন্দনের ছড়াছড়ি ও

ত্রিপুণ্ডধারী ব্রাহ্মণগণ মহাদেবের স্তব করিতেছে। গৃহমধ্যে কোন যাত্রীকেই প্রবেশ করিতে দেয় না। যাত্রীদের মহাদেবকে পূজা করিতে ইচ্ছা হইলে এই মন্দিরের পূজারীদের হাত দিয়াই পূজা করিতে হয়। পূজকেরা সকলেই দক্ষিণী ব্রাহ্মণ। মহাদেবের গৃহমধ্যে এদেশবাসী ব্রাহ্মণীরাও প্রবেশ করিতে পায় কিন্তু আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণকেও প্রবেশ করিতে দেয় না। শিবমন্দিরে এইরূপ নিয়ম ভারতের আর কোন স্থানে দেখি নাই। মহাদেবের আসলমূর্ত্তি সর্ব্বদাই সোনার টোপ দিয়া ঢাকা থাকে, এই টোপের উপরই মহাদেবের মাথায় জল চড়ান ও পূজাদি হয়। কেবল প্রাতে যখন গঙ্গাজলে স্নান করান হয়, তখন টোপ খোলা হইয়া থাকে, ঐ সময় আসল মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন যাত্রিগণ গঙ্গোত্রির জল চড়াইতে চাহিলে টোপ খুলিয়া পূজারীগণ মহাদেবের মাথায় ঢালিয়া দেন! রামেশ্বরের মস্তকে টোপ খুলিয়া গঙ্গোত্রির জল চড়াইতে হইলে যাত্রীদিগকে এই মন্দিরে অবস্থিত রামনদের রাজার কাছারীতে ১৸০ জমা দিয়া চিঠি লইয়া আসিতে হয়। ৺রামেশ্বরের প্রত্যহ স্নান ও ভোগের জন্য গঙ্গাজল ব্যবহৃত হয়। আর্য্যাবর্ত্ত হইতে এই সুদূর দক্ষিণ দেশে গঙ্গাজল আনিতে বিস্তর ব্যয় যে হইয়া থাকে—ইহা আর বলিতে হইবে না। হোলকারের রাণী অহল্যা বাই ৺রামেশ্বরের প্রত্যহ গঙ্গাজল সরবরাহের ব্যয়নির্ব্বাহার্থে অনেক অর্থ দিয়া এ বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিয়া গিয়াছেন।

প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার পর খুব ধুমধামের সহিত আলো, বাজনাবাদ্য, রেসেলা ও হাতি ঘোড়া লইয়া ৺রামেশ্বরজীর সোয়ারী বা পাল্‌কি রাস্তায় বাহির হয়। প্রত্যহই ৺রামেশ্বরের এক একটী পৃথক্ পৃথক্ লীলা বা উৎসবের অনুকরণ সোয়ারীতে দেখিতে পাওয়া যায়। রাস্তায় যে সকল মূর্ত্তি বাহির হয়, সে সকল স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত ৺রামেশ্বরজীর সচল মূর্ত্তি। সোয়ারী বা পাল্‌কির সঙ্গে ৺রামেশ্বরের নর্ত্তকীগণ (ইহাদিগকে দেবনর্ত্তকী বলে) অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে স্থানে স্থানে নৃত্যগীত করে। এইরূপে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া সোয়ারী পুনরায় মন্দিরে প্রবেশ করিলে মন্দিরেও আবার কিছুক্ষণ দেবনর্ত্তকীদের নৃত্যগীত হয়। শ্রীক্ষেত্রের ন্যায় এই সকল দেবনর্ত্তকীদের অলঙ্কারাদি সমুদয় ভূষণ এবং আহারাদির ব্যয় মন্দির হইতে দেওয়া হয়; তবে এই সকল স্ত্রীলোকদের কোনরূপ চরিত্রদোষ

ঘটিলে, ইহাদের নিকট হইতে অলঙ্কারাদি ফিরাইয়া লইয়া মন্দিরের কার্য্য হইতে বিদায় করিয়া দেওয়া হয়।

৺রামেশ্বর মহাদেবের প্রকট (প্রচার) হওয়া সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—ভগবান্ রামচন্দ্র বানরসৈন্যের সহিত লঙ্কা যাইবার জন্য সমুদ্রোপরি সেতুবন্ধনকালে তৃষার্ত্ত হইয়া এক সময়ে পানীয় জল আনিতে আদেশ করেন। জল আনা হইলে, তাঁহার স্মরণ হইল, এখনও শিবপূজা করা হয় নাই, কি করিয়া জল পান করি, কাজেই তখন আর জল না খাইয়া তিনি পার্থিব শিবলিঙ্গ গঠন করিয়া গন্ধপুষ্পপ্রভৃতি উপচারপ্রদানে শঙ্করের পূজা করতঃ এইরূপ প্রার্থনা করেন—"হে প্রভো! এই সমুদ্রের জল অগাধ। রাক্ষসাধিপতি রাবণও অতি বলবান্ এবং যুদ্ধে একমাত্র সহায় আমার এই বানরসকলও অতি চপল। হে শম্ভো! এ কারণ, আপনি এ বিষয়ে আমার সাহায্য করুন। রাবণ ত্বদীয় ভক্ত হইয়া মানবগণের সর্ব্বথা অজেয় হইলেও হে শিব! আপনি ত সর্ব্বদা ধর্ম্মের পক্ষপাতী, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন।" শ্রীরামচন্দ্র শিবকে এইরূপ স্তব করিলে, ভগবান্ শঙ্কর জ্যোতির্ম্ময়রূপ ধারণ করতঃ পার্ব্বতী ও নিজগণে পরিবৃত হইয়া শ্রীরামের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। রঘুনাথ ঐ প্রকার শিবরূপসন্দর্শন করতঃ পুনরায় বিবিধ উপচারে তাঁহার পূজা ও স্তব করিয়া নিজ জয় প্রার্থনা করিলে, শিব কহিলেন, "তোমার জয় হউক।" অনন্তর শিব-দত্ত জল পান করিয়া পুনরায় প্রার্থনা করিলেন, "হে প্রভো! আপনি লোকের উপকারার্থে ও জগৎ পবিত্র করিবার জন্য এই স্থানে চিরাবস্থান করুন।" মহাদেবও শ্রীরাম কর্ত্তৃক এইরূপে প্রার্থিত হইয়া লিঙ্গরূপী হইলেন এবং মহীতলে 'রামেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া এই সমুদ্রতীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

৺রামেশ্বর মহাদেবের প্রকট (প্রচার) সম্বন্ধে শাস্ত্রে ঐরূপ বর্ণনা থাকিলেও এখানে লোকমুখে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে—শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কেশ্বর দশাননকে বধ করিয়া, সীতাকে উদ্ধার করিলে পর সীতাদেবী কিরূপে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এই অপার জলধির উপর সেতু বাঁধিয়াছেন, তাহা দেখিবার জন্য কৌতুহলাক্রান্তা হইয়া এই স্থানে আগমন করিলেন। সেতু দেখিয়া তিনি বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূতা হইয়া স্বামীর এই কীর্ত্তি চিরদিন অক্ষয় করিবার জন্য ইহার উপর মহাদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে

ইচ্ছুক হইলেন। অন্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ইহা জানিতে পারিয়া পবননন্দন হনুমানকে মহাদেবের লিঙ্গ আনিবার জন্য পাঠাইলেন; হনুমান ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে কেদারনাথ, গোকর্ণ প্রভৃতি লিঙ্গ লইয়া এই সেতুতে উপস্থিত হইল এবং সীতাদেবীকে ঐ সকল প্রদান করিল। কিন্তু সীতাদেবী ঐ সকল লিঙ্গের মধ্যে কাশীর বিশ্বেশ্বরের মূর্ত্তি দেখিতে না পাইয়া হনুমানকে উহা আনিতে পুনরায় প্রেরণ করিলেন। হনুমানের কাশী হইতে ৺বিশ্বনাথের লিঙ্গ আনিতে বিলম্ব দেখিয়া সীতাদেবী হনুমানকে উক্ত কার্য্যে অসমর্থ বোধে স্বীয় রন্ধই করা খিচড়ী বা অন্নপিণ্ড এই স্থানে ঢালিয়া দিলে, উহা ক্রমে কঠিন হইয়া প্রস্তরলিঙ্গে পরিণত হয় এবং সীতাদেবী উক্ত পিণ্ডের '৺রামেশ্বর' নাম রাখেন। এইরূপে রামেশ্বর-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হনুমান কাশী হইতে বিশ্বেশ্বরকে লইয়া এই স্থানে উপস্থিত হইল এবং ইতিপূর্ব্বেই রামেশ্বর নামে অপর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া, ক্ষোভে অপমানে ক্রোধান্বিত হইয়া স্বীয় লাঙ্গুল উক্ত রামেশ্বর লিঙ্গের চতুর্দ্দিকে জড়াইয়া উহা উঠাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; বরং আকর্ষণ-বলে নিজ লাঙ্গুল ছিঁড়িয়া যাওয়ায়, হনুমান এখান হইতে এক মাইল দূরে রামঝরকা নামক স্থানে গিয়া পতিত হইল। শ্রীরামচন্দ্র ইহা দেখিয়া হনুমানের নিকট যাইয়া তাহার অঙ্গক্লেশ দূর করিয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন এবং সীতাদেবী প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর লিঙ্গের চতুর্দ্দিকে হনুমানের আনীত বিশ্বনাথ গোকর্ণ প্রভৃতি লিঙ্গের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

রামেশ্বরে অবস্থানকালে প্রথম দিবস প্রাতে আমরা পাণ্ডার সহিত সহরের প্রান্তবর্ত্তী একটী পুরাতন মহল ও উহার পার্শ্বস্থিত নলমন্দির বা টৌনাগুড়ি দেখিতে যাইলাম। এই মহল ও সেতুনির্ম্মাণকর্ত্তা বিশ্বকর্ম্মার পুত্র নলের মন্দিরে বিশেষ কিছু দেখিবার নাই; কেবল প্রাচীন ধ্বংশাবশেষ মাত্র দেখা যায়। ইহা দেখিয়া নিকটেই লক্ষ্মণকুণ্ড নামক চতুর্দ্দিকে পাথরে বাঁধান পথিপার্শ্বস্থ সরোবরে উপস্থিত হইলাম। এখানে ক্ষৌর-কার্য্য সমাধা করিয়া এই কুণ্ডে স্নান, পূজা ও শ্রাদ্ধাদি করিতে হইল। কুণ্ডের জল বেশ সুমিষ্ট ও পরিস্কার। এই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া আমরা ৺রামেশ্বরের মন্দির দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। বৈকালে রামঝরকা দেখিতে গমন করিলাম। রামঝরকা একটী বালির

পর্ব্বত বা বালিয়ারি স্তূপ—ইহার উপর রামসীতার মন্দির আছে। ইহা সহরের প্রান্তভাগে সমুদ্রের উপকূলে অবস্থিত। হনুমান রামেশ্বর লিঙ্গ তুলিতে গিয়া লেজ ছিঁড়িয়া এই স্থানে পতিত হন বলিয়া প্রসিদ্ধি। নিম্নে ভাঙ্গা ফটক ও কয়েকটী মন্দির ভগ্ন অবস্থায় আশে পাশে পড়িয়া আছে। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিলে এই টিলার উপর রামসীতার মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরটী বেশ বড়, ভিতরে রামসীতা ও হনুমানের মূর্ত্তি বিরাজিত। রামঝরকার উপর হইতে রামেশ্বর দ্বীপ ও চতুর্দ্দিকের সমুদ্র বেশ সুন্দর দেখিতে পাওয়া যায়। রামঝরকা ও নিকটবর্ত্তী আর ২।৩টী দেবস্থান দেখিয়া আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

ক্রমশঃ।

সংবাদ।

রামকৃষ্ণ-মিশন ঘাঁটাল বন্যাকার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে। অতএব সর্ব্বসাধারণের নিকট নিবেদন, এই কার্য্যের জন্য আর কাহাকেও কিছু পাঠাইতে হইবে না। কার্য্যের সমুদয় বিবরণ ও আয়ব্যয়ের হিসাব সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাতার্থ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

আগামী ২৪শে মাঘ ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীমদ্ বিবেকানন্দ স্বামীর অষ্টচত্বারিংশ জন্মোৎসব তদীয় শিষ্য ও ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইবে। উৎসবের প্রধান অঙ্গ "দরিদ্র নারায়ণ"গণের সেবাও ঐ দিন অনুষ্ঠিত হইবে। সর্ব্বসাধারণের উৎসবে যোগদান প্রার্থনীয়।

রামকৃষ্ণ মিশন ঘাঁটাল বন্যাকার্য্যে প্রাপ্তি-স্বীকার।

অগ্রহায়ণের উদ্বোধনে স্বীকৃত ২৩৪২।৶১০
শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী, হাজারিবাগ ৫৲
শ্রীকৃষ্ণগোপাল মল্লিক, দিনাজপুর ১৲
শ্রীসুশীলকৃষ্ণ সিংহ, কলিকাতা ২৲
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সান্যাল, মথুরা ২৲
সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায়, চন্দননগর ১০৲
শ্রীমতী মোক্ষদাসুন্দরী মিত্র, কলিকাতা ২৲
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দে, কলিকাতা ।/০
দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দ, সেণ্ট্রাল কলেজ, কলিকাতা ২৲
শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায় ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ, ইরপালা (মেদিনীপুর) ২০৲
শ্রীসারদাপ্রসাদ চৌধুরী, ইরপালা ২৲
ঘাঁটাল-বন্যাদুঃখ-প্রতীকার-সমিতি মাঃ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ৩।৯৲
শ্রীপ্রফুল্লনাথ রুদ্র সংগৃহীত (বাগবাজার) ৫।৶০
শ্রীমতী মোক্ষদাকুমারী বারিক, কাঁথি ১০৲
হোড়খালি ছাত্র সম্মিলনী, মেদিনীপুর ২৲
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য (কলিকাতা) সংগৃহীত ৪৸/৫
শ্রীকামদাপ্রসন্ন চৌধুরী, রাজসাহী ৬৲
শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, শিমুলতলা ৫৲
শ্রীসুরেন্দ্রকৃষ্ণ মিত্র, কলিকাতা ২৲
শ্রীব্রজনাথ দত্ত, কলিকাতা ৫৲
গোপালপুর (মেদিনীপুর) চতুষ্পাঠীর ছাত্রবৃন্দ ৩৸০
পি, সি, দে (চন্দননগর) সংগৃহীত ১।৷০
এ, কে, রায় চৌধুরী, কলিকাতা ২৲
শ্রীতারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, চুনার ৫৲
ডি, সি, সোম সংগৃহীত, গিরিধি ২০৲
শ্রীঅতুলকৃষ্ণ দে, কলিকাতা ।/০
শ্রীদোলগোবিন্দ মিত্র, কলিকাতা ৷০
শ্রীদেবশঙ্কর মিত্র, কলিকাতা ৫৲
হোয়াইট হল ফার্ম্মেসি, কলিকাতা ৫৲
গোপালপুর (মেদিনীপুর) চতুষ্পাঠীর ছাত্রবৃন্দ ১।০
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু, কলিকাতা ২৲
শ্রীসুব্রহ্মণ্য আয়ার, ত্রিবাঙ্কুর ১৲
শ্রীপূর্ণচন্দ্র শেঠ, বড়বাজার, কলিকাতা ১০৲
মিঃ টি, এস, নরসিংহস্বামী, মালাবার ১০৲
এ, আর, কুমারগুরু, বাঙ্গালোর ২৲
মাঃ স্বামী অচলানন্দ, (বারাণসী) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান সংগ্রহ (দ্বিতীয় দফা) ১০০০৲
শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, কলিকাতা ১।৶০
শ্রীমণীন্দ্রভূষণ বসু (হুগলি) সংগৃহীত ৪৲
শ্রীবিপিনবিহারী মণ্ডল, রাণীচক ২৲
শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, নাড়াজোল ১৲
জনৈক বন্ধু, কলিকাতা ৶০
শ্রীযদুনাথ দত্ত (ঢাকা) সংগৃহীত ১৲
শ্রীনন্দলাল ভট্টাচার্য্য, চম্পারণ ২৲
শ্রীযাদবচন্দ্র শিরোরত্ন, সিরাজগঞ্জ ৷০
পিঃ সিঃ দে (চন্দননগর) সংগৃহীত চাউল বিক্রয় হইতে প্রাপ্ত ২৲
শ্রীগিরিজাভূষণ মিত্র, দার্জ্জিলিং ১৲
শ্রীকানাইলাল বসু, রেঙ্গুন ১৫৲
শ্রীগোপালচন্দ্র দাস, মেদিনীপুর ৪৲
বাগনাপাড়া বান্ধব সমাজ মাঃ শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৲

মিঃ, ডি, কে, নাটু, রত্নগিরি	১০৲	শ্রীনরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, কালীঘাট	১৸০
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঢোল সংগৃহীত	১।১০	জনৈক বঙ্গমহিলা, বাতানল	।০
শ্রীদুর্গাপদ বন্দোপাধ্যায়, কলিকাতা	৩৲	শ্রীআশুতোষ ঘোষ, কুচবিহার	৫৲
শ্রীচুণীলাল মিত্র, কলিকাতা	২।০	শ্রীবসন্তকুমার বসু, চুঁচুড়া	১৫৲
শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, ভবানীপুর	৩॥০	শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র রায় (ঢাকা) সংগৃহীত	১১৲
শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সরকার, পোর্টব্লেয়ার	২৫৲	শ্রীভরতচন্দ্র বড়ুয়া, মেদিনীপুর	৫৲
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, খুলনা	২৲	মাঃ শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য, ব রমপুর	৩৲
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ ঠাকুর (কলিকাতা) সংগৃহীত	১।০	ব্রহ্মচারী গুরুদাস, কনখল	৫৲
		এন, এল, প্রধান, রত্নগিরি	৫৲
শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার চৌধুরী, নদীয়া	২৲	শ্রীনাগেশ্বরপ্রসাদ সিংহ সংগৃহীত, কৈঁচকাপুর	২২৲
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দে, চন্দননগর	৩।০		
শ্রীসনাতন কর্ম্মকার, ঘাঁটাল	২৲	ঘাঁটাল স্কুলের ছাত্রবৃন্দ	৪৲
শ্রীনন্দলাল কুণ্ডু, ঘাঁটাল	৯৲	বেঙ্গোরপার সমিতি, রামকৃষ্ণপুর	১৲
শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ পাল, ঘাঁটাল চাউলপট্টি বারোয়ারি	৩০৲	শ্রীমাখনলাল গাঙ্গুলি, কলিকাতা	॥৶০
		মোট—	৪২২৭৸৶৫

এতদ্ব্যতীত নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ ও সমিতিসমূহ কাপড় সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন ঃ—

চন্দননগর সৎপথাবলম্বী সম্প্রদায় ; পি, সি, দে—চন্দননগর ; বেঙ্গোরপার সমিতি, রামকৃষ্ণপুর ; শ্রীনরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু, কালীঘাট।

মেসার্স বটকৃষ্ণ পাল ৬ বোতল এডোয়াডর্স টনিক্‌ এবং ৭২টী খালি ৪ আউন্স শিশি কর্ক সমেত দিয়া বাধিত করিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত বেঙ্গল গভর্ণমেণ্ট বিতরণের জন্য ১৫ মণ চাউল দিয়া আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর] [স্বামী সারদানন্দ।

কাঁচা নিরাকারবাদীদেরও ঠাকুর সাকারবাদীদের সহিত সমান চক্ষে দেখিতেন। তাহাদেরও কিরূপভাবে ধ্যান করিলে সহায়ক হইবে বলিয়া দিতেন। বলিতেন—"দ্যাখ, আমি তখন তখন ভাবতুম, ভগবান্ যেন সমুদ্রের জলের মত সব জায়গা পূর্ণ করে রয়েছেন, আর আমি যেন একটি মাছ—সেই সচ্চিদানন্দ সাগরে ডুব্‌ছি, ভাস্‌ছি, সাঁতার দিচ্চি! আবার কখন মনে হ'ত, আমি যেন একটি কুম্ভ, সেই জলে ডুবে রয়েছি, আর আমার ভিতরে বাহিরে সেই সচ্চিদানন্দ পূর্ণ হয়ে রয়েছেন!" আবার বলিতেন—"দ্যাখ, ধ্যান করতে বসবার আগে একবার (আপনাকে দেখাইয়া) একে ভেবে নিবি। কেন বল্‌ছি?—এখানকার উপর তোদের বিশ্বাস আছে কি না? একে ভাবলেই তাঁকে (ভগবানকে) মনে পড়ে যাবে। ঐ যে গো, যেমন গরুর পাল দেখলেই রাখালকে মনে পড়ে, ছেলেকে দেখলেই তার বাপের কথা মনে পড়ে, উকীল দেখলেই কাছারীর কথা মনে পড়ে, সেই রকম—বুঝলে কি, না? মন নানান্ জায়গায় ছড়িয়ে থাকে কি না, একে ভাবলেই মনটা এক জায়গায় গুটিয়ে আসবে, আর সেই মনে ঈশ্বরকে চিন্তা করলে তাতে ঠিক্ ঠিক্ ধ্যান লাগবে—এই জন্যে বলছি।" আবার বলিতেন—"যাঁকে ভাল লাগে, যে ভাব ভাল লাগে এক জনকে বা একটাকে পাকা করে ধর, তবে ত আঁট হবে। 'সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে।' ভাব চাই। একটা ভাব নিয়ে তাঁকে ডাকৃতে হয়। "যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়। ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।"—ভাব চাই, বিশ্বাস চাই, পাকা করে ধরা চাই—তবে তো হবে। ভাব কি জান?—তাঁর (ঈশ্বরের) সঙ্গে একটা সম্বন্ধ রাখা—এর নাম। সেইটে সর্ব্বক্ষণ মনে রাখা, যেমন—তাঁর দাস আমি, তাঁর সন্তান আমি, তাঁর অংশ আমি এই হচ্ছে পাকা আমি, বিদ্যার আমি—এইটি খেতে শুতে বসতে সব সময় স্মরণ রাখা। আর এই যে বামুন আমি, কায়েৎ আমি, অমুকের ছেলে আমি, অমুকের বাপ আমি, এ সব হচ্চে অবিদ্যার আমি—এগুলোকে ছাড়তে হয়, ত্যাগ করৃতে হয়—ওগুলোতে অভিমান অহঙ্কার বাড়িয়ে বন্ধন এনে দেয়। স্মরণ মননটা সর্ব্বদা রাখা চাই, খানিকটে মন সব সময় তাঁর দিকে ফিরিয়ে রাখবে—তবে তো হবে। একটা ভাব পাকা করে ধরে তাঁকে আপনার করে নিতে হবে, তবে তো তাঁর উপর জোর চলবে। এই দ্যাখ না, প্রথম প্রথম একটু আধটু ভাব যতক্ষণ ততক্ষণ। "আপনি মশাই"; সেই ভাব যেই বাড়্‌ল, অমনি 'তুমি তুমি' আর "আপনি টাপনি" নেই; যেই

আরও বাড়ল, আর 'তুমি টুমি'তেও সানে না, তখন "তুই মুই"! তাঁকে আপনার হতে 'আপনার করে নিতে হবে, তবে তো হবে। যেমন নষ্ট মেয়ে, পর পুরুষকে প্রথম প্রথম ভালবাস্‌তে শিখ্‌চে—তখন কত লুকোলুকি কত ভয় কত লজ্জা; তারপর যেই ভাব বেড়ে উঠলো, তখন আর কিছু নেই! একেবারে তার হাত ধরে সকলের সামনে কুলের বাইরে এসে দাঁড়ালেন—তখন যদি সে পুরুষটা তাকে আদর যত্ন না করে, ছেড়ে যেতে চায়, তো তার গলায় কাপড় দিয়ে টেনে ধরে বলে, "তোর জন্যে পথে দাঁড়ালুম, এখন তুই খেতে দিবি কি না—বল?" সেই রকম: যে ভগবানের জন্য সব ছেড়েছে, তাঁকে আপনার করে নিয়েচে, সে তাঁর উপর জোর করে বলে, "তোর জন্যে সব ছাড়লুম, এখন দ্যাখা দিবি কি না—বল?"

কাহারও ভগবদনুরাগে জোর কমিয়াছে দেখিলে বলিতেন—'এ জন্মে না হোক্ পরজন্মে পাব,' ও কি কথা? অমন ম্যাদাটে ভক্তি করতে নেই। তাঁর কৃপায় তাঁকে এ জন্মেই পাব—এখনি পাব—মনে এই রকম জোর রাখতে হয়, বিশ্বাস রাখতে হয়, তা না হলে কি হয়? ওদেশে চাষারা সব গরু কিনতে গিয়ে গরুর ল্যাজে আগে হাত দেয়। কতকগুলো গরু আছে ল্যাজে হাত দিলে কিছু বলে না, অমনি গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে—অমনি তারা বোঝে সেগুলো ভাল নয়। আর যেগুলোর ল্যাজে হাত দেবামাত্র তিড়িং মিড়িং করে লাফিয়ে উঠে—অমনি বোঝে এইগুলো খুব কাজ দেবে—ঐগুলোর ভিতর থেকে পছন্দ করে কিনে। "ম্যাদাটে ভাব ভাল নয়—জোর নিয়ে এসে, বিশ্বাস করে বল—তাঁকে পাবই পাব, এখনই পাব, তবে ত হবে।" আবার বলিতেন, "এ দিক্‌কার বাসনা কামনাগুলো সব এক এক ক'রে ছাড়, তবে ত হবে। কোথা ওগুলোকে সব এক্ এক্ ক'রে ছাড়বে—না আরও বাড়াতে চ'ল্‌লে!—তা হ'লে কেমন ক'রে হবে?"

যখন ধ্যান ভজন প্রার্থনাদি করে শ্রীভগবানের সাড়া না পেয়ে মন নিরাশার সাগরে ভাসিত তখন সাকার নিরাকার উভয় বাদিদেরই বলিতেন—'মাছ ধরতে গেলে প্রথম চার করতে হয়। হয়ত চার করে ছিপ ফেলে বসেই আছে—মাছের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্চে না, মনে হচ্চে তবে বুঝি পুকুরে মাছ নাই। তারপর হয়ত একদিন দেখলে একটা বড় মাছ ঘাই দিলে—অমনি বিশ্বাস হ'ল পুকুরে মাছ আছে। তারপর হয়ত একদিন ছিপের ফাতনাটা নড়লো—অমনি মনে হ'ল চারে মাছ এয়েছে। তারপর হয় ত একদিন ফাতনাটা ডুবলো, তুলে দেখলে—মাছ টোপ খেয়ে পালিয়েছে; আবার টোপ গেঁথে ছিপ ফেলে খুব সাবধানে বসে রইল। তারপর একদিন যেমন টোপ খেয়েছে, অমনি টেনে তুলতেই মাছশুদ্ধ আড়ায় উঠলো।' কখন বলিতেন—'তিনি খুব কাণখড়কে, সব শুনতে পানগো। যত ডেকেছ সব শুনেছেন। একদিন না একদিন দেখা দেবেনই দেবেন। অন্ততঃ

মৃত্যুসময়েও দেখা দেবেন।" কখন বলিতেন—"সাকার কি নিরাকার যদি ঠিক করতে না পারিস্ তো এই বলে প্রার্থনা করিস্ যে 'হে ভগবান্, তুমি সাকার কি নিরাকার আমি জানি না, বুঝি না, তুমি যেমন তেমনি আমার কথা শুন, আমায় দেখা দাও, আমায় বুঝিয়ে দাও।" আবার বলিতেন—"সত্য সত্যই ভগবানকে দেখা যায়, পাওয়া যায়, যেমন তুমি আমি কথা কইছি এই রকম—সত্য বলছি, মাইরি বলছি।"—

এ সব ত গেল, নিম্নাঙ্গের ভাবসমূহের কথা—যাহারা মোটে সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে বা প্রবর্ত্তকদিগের প্রতি সাধনায় ভগবদনুরাগে অগ্রসর হইবার জন্য উত্তেজনা। উচ্চাঙ্গের ভাব সমাধির বিষয়ে ঠাকুর যাহা যাহা বলিতেন তাহারও কিছু কিছু এখানে বলা আবশ্যক, নতুবা অঙ্গহানি হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উচ্চভাব যে ভাবই মনে আসুক না কেন, উহার সহিত কোন না কোন প্রকার শারীরিক পরিবর্ত্তনও অবশ্যম্ভাবী। ইহা, আর বুঝাইতে হয় না, নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়। ক্রোধের উদয়ে একপ্রকার, ভালবাসায় অন্য প্রকার—এইরূপ নিত্যানুভূত সাধারণ ভাবসমূহের আলোচনাতেই উহা সহজে বুঝা যায়। আবার সৎ বা অসৎ কোন প্রকার চিন্তার সবিশেষ আধিক্য কাহারও মনে থাকিলে তাহার শরীরেও এমন একটা পরিবর্ত্তন আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তাহাকে দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে—ইহার এইরূপ প্রকৃতি। 'অমুককে দেখলেই মনে হয় রাগী বা কামুক বা সাধু'—এরূপ কথার নিত্য ব্যবহার হওয়াই ঐ বিষয়ের প্রমাণ। আবার দানবতুল্য বিকটাকৃতি বিকৃত স্বভাবাপন্ন লোক যদি কোনও কারণে সৎচিন্তায় সাধুভাবে নিরন্তর ছয় মাস কাল কাটায় ত তাহার আকৃতি হাব ভাব পূর্ব্বাপেক্ষা কত কোমল কত মোলায়েম হইয়া আসে তাহাও বোধ হয়, আমাদের ভিতর অনেকের প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছে। পাশ্চাত্য শরীর-তত্ত্ববিৎ বলেন, যে প্রকার ভাবই তোমার মনে উঠুক না কেন, উহা তোমার মস্তিষ্কে চিরকালের নিমিত্ত একটি দাগ অঙ্কিত করিয়া যাইবে! এইরূপে ভাল মন্দ দুই প্রকার ভাবের দুই প্রকার দাগের সমষ্টির স্বল্পাধিক্য লইয়াই তোমার চরিত্র গঠিত ও তুমি ভাল বা মন্দ লোক বলিয়া পরিগণিত। প্রাচ্যের বিশেষতঃ ভারতের যোগী ঋষিরা বলেন, ঐ দুই প্রকার ভাব মস্তিষ্কে দুই প্রকার দাগ অঙ্কিত করিয়াই শেষ হইল না, ভবিষ্যতে আবার তোমাকে পুনরায় ভাল মন্দ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে এরূপ সূক্ষ্ম প্রেরণা শক্তিতে পরিণত হইয়া মেরুদণ্ডের শেষভাগে অবস্থিত 'মূলাধার' নামক মেরুচক্রে নিত্যকাল অবস্থান করিতে থাকে; জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত ঐরূপ প্রেরণাশক্তিসমূহের উহাই আবাসভূমি—ঐ সকলের নামই সংস্কার—পূর্ব্ব সংস্কার, এবং ঐ সকলের নাশ একমাত্র শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইলে বা নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হইলে তবেই হইয়া থাকে—নতুবা দেহ হইতে দেহা-

স্তরে যাইবার সময়ও জীব ঐ সংস্কারের পুঁটুলিটি "বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ" বগলে করিয়া লইয়া যায়।

অদ্বৈত জ্ঞান বা শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শরীর ও মনের এইরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। শরীরে কিছু হইলে মনে আঘাত লাগে আবার মনে কিছু হইলে শরীরে আঘাত অনুভব হয়। আবার ব্যক্তির শরীর মনের ন্যায়, ব্যক্তির সমষ্টি—সমগ্র মনুষ্যজাতির শরীর ও মনে এই সম্বন্ধ বর্ত্তমান। তোমার শরীর মনের ঘাত প্রতিঘাত আমার ও অপর সকলের শরীর মনে লাগে। এইরূপে বাহ্য ও আন্তর, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ নিত্য সম্বন্ধে অবস্থিত ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিরন্তর ঘাত প্রতিঘাত করিতেছে। সেজন্যই দেখা যায় যেখানে সকলে শোকাকুল, সেখানে তোমার মনে শোকের উদয় হইবে। যেখানে সকলে ভক্তিমান, সেখানে তোমারও মনে বিনা চেষ্টায় ভক্তিভাব আসিবে। এইরূপ অন্যান্য ভাবেও।

সেজন্যই দেখা যায় শারীরিক রোগ ও স্বাস্থ্যের ন্যায় মানসিক বিকার বা ভাব সকলেরও সংক্রামিকা শক্তি আছে। উহারাও অধিকারী ভেদে সংক্রমণ করিয়া থাকে। ভগবদনুরাগ উদ্দীপিত করিবার জন্য সেজন্যই শাস্ত্রে সাধুসঙ্গের এত মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছে। সেজন্যই ঠাকুর যাহারা তাঁহার নিকট একবার যাইত তাহাদের "এখানে যাওয়া আসা কোরো।" 'প্রথম প্রথম এখানে বেশী বেশী যাওয়া আসাটা রাখ্‌তে হয়' ইত্যাদি বলিতেন। যাক্ এখন সে কথা!

সাধারণ মানসিক ভাবসমূহের ন্যায় শ্রীভগবানের প্রতি একান্ত একনিষ্ঠ তীব্র অনুরাগে যে সমস্ত ভাব মনে উদয় হয় সে সকলেও অপূর্ব্ব শারীরিক পরিবর্ত্তন আনিয়া দেয়। যথা—ঐরূপ অনুরাগ উপস্থিত হইলে সাধকের রূপরসাদির উপর টান কমিয়া যায়, স্বল্পাহার স্বল্পনিদ্রা হয়, খাদ্যবিশেষে রুচি ও অন্য প্রকার খাদ্যে বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়, যে সকল ব্যক্তির সহিত মায়িক সম্বন্ধ। যথা স্ত্রী পুত্রাদি, তাহাকে শ্রীভগবান হইতে বিমুখ করে তাহাদিগকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়, বায়ুপ্রধান ধাত্ হয়—ইত্যাদি; ঠাকুর যেমন বলিতেন—"বিষয়ী লোকের হাওয়া সইতে পারতুম না, আত্মীয় স্বজনের সংসর্গে যেন দম বন্ধ হয়ে প্রাণটা বেরিয়ে যাবার মত হত"—আবার বলিতেন—'ঈশ্বরকে যে ঠিক্ ঠিক্ ডাকে, তারশরীরে মহাবায়ু গর গর করে মাথায় গিয়ে উঠবেই উঠবে'—ইত্যাদি।

অতএব দেখা যাইতেছে ভগবদনুরাগে যে সকল মানসিক পরিবর্ত্তন বা ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, ঐ সকলেরও এক একটা শারীরিক প্রতিকৃতি বা পরিবর্ত্তন আছে। মনের দিক দিয়া দেখিয়া বৈষ্ণবতন্ত্র ঐ সকল ভাবকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—আর ঐ সকল মানসিক বিকারকে আশ্রয় করিয়া শারীরিক পরিবর্ত্তন সমূহ উপ-

স্থিত হয়, তাহার দিক দিয়া দেখিয়া যোগশাস্ত্র মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কান্তর্গত কুণ্ডলিনী-শক্তি ও ষট্‌চক্রাদির বর্ণনা করিয়াছেন।

কুণ্ডলী বা কুণ্ডলিনী শক্তির সংক্ষেপ পরিচয় আমরা ইতিপূর্ব্বেই দিয়াছি—ইহজন্ম এবং পূর্ব্বপূর্ব্ব জন্মজন্মান্তরে যত মানসিক পরিবর্ত্তন বা ভাব জীবের উপস্থিত হইতেছে ও হইয়াছিল তৎসমূহের সূক্ষ্ম শারীরিক প্রতিকৃতি অবলম্বনে অবস্থিতা মহা ওজস্বিনী প্রেরণা শক্তি। যোগী বলেন, উহা বদ্ধজীবে প্রায় সম্পূর্ণ সুপ্ত বা অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে। উহার এরূপ সুপ্তাবস্থাতেই জীবের স্মৃতি, কল্পনা প্রভৃতি বৃত্তির উদয়। উহা যদি কোনরূপে সম্পূর্ণ জাগ্রত বা প্রকাশাবস্থা প্রাপ্ত হয় তবেই জীবকে পূর্ণজ্ঞানলাভে প্রেরণা করিয়া শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার করাইয়া দেয়। যদি বল, সুপ্তাবস্থায় কুণ্ডলিনী শক্তি হইতে কেমন করিয়া স্মৃতি কল্পনা প্রভৃতি উদয় হইতে পারে? তদুত্তরে বলি, সুপ্ত হইলেও বাহিরের রূপরসাদি পদার্থ পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বার দিয়া নিরন্তর মস্তিষ্কে যে আঘাত করিতেছে তজ্জন্য একটু আধটু ক্ষণমাত্র স্থায়ী চৈতন্য তাহার আসিয়া উপস্থিত হয়। যেমন মশকদষ্ট নিদ্রিত ব্যক্তির হস্ত স্বতঃই মশককে আঘাত বা কণ্ডুয়নাদি করে, সেইরূপ।

যোগী বলেন, মস্তিষ্কমধ্যগত ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ অবকাশ বা আকাশে অখণ্ডসচ্চিদানন্দস্বরূপ-পরমাত্মার বা শ্রীভগবানের জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান। তাঁহার প্রতি পূর্ব্বোক্ত কুণ্ডলী-শক্তির বিশেষ অনুরাগ, অথবা শ্রীভগবান তাহাকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু জাগ্রতা না থাকায় কুণ্ডলী শক্তির সে আকর্ষণ অনুভব হইতেছে না। জাগ্রতা হইবামাত্র উহা শ্রীভগবানের ঐ আকর্ষণ অনুভব করিবে এবং তাঁহার নিকটস্থ হইবে। ঐরূপে কুণ্ডলীর শ্রীভগবানের নিকটস্থ হইবার পথ ও শরীরে বর্ত্তমান—মস্তিষ্ক হইতে আরব্ধ হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া বরাবর ঐ পথ মেরুদণ্ডের মূলে মূলাধার নামক মেরুচক্র পর্য্যন্ত আসিয়াছে। ঐ পথই যোগশাস্ত্রকথিত সুষুম্নাবর্ত্ম। পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্ববিৎ ঐ পথকেই Canal Centralis বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, কিন্তু উহার কোনরূপ আবশ্যকতা বা কার্য্যকারিতা এ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পায় নাই। ঐ পথ দিয়াই কুণ্ডলী পূর্ব্বে পরমাত্মা হইতে বিযুক্তা হইয়া মস্তিষ্ক হইতে মেরুচক্রে বা মূলাধারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া নিদ্রিতা হইয়াছে। আবার ঐ পথ দিয়াই উহাই মেরুদণ্ড মধ্যে ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছয়টি চক্র ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়া পরিশেষে মস্তিষ্কে আসিয়া উপনীত হয়।* কুণ্ডলী জাগ্রতা হইয়া

* যোগশাস্ত্রে এই ছয়টি মেরুচক্রের নাম ও বিশেষ বিশেষ অবস্থান স্থান পর পর নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা,—মেরুদণ্ডের শেষভাগে, মূলাধার (১) তদূর্দ্ধে লিঙ্গমূলে, স্বাধিষ্ঠান (২) তদূর্দ্ধে নাভিস্থলে, মণিপুর (৩) তদূর্দ্ধে হৃদয়ে, অনাহত (৪) তদূর্দ্ধে কণ্ঠে, বিশুদ্ধ (৫) তদূর্দ্ধে ভ্রূমধ্যে, আজ্ঞা (৬)—অবশ্য এই ছয়টি চক্রই মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ সুষুম্না পথেই বর্ত্তমান, অতএব "হৃদয়, কণ্ঠ" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা তদ্বিপরীতে অবস্থিত মেরুমধ্যস্থ স্থলই লক্ষিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

এক চক্র হইতে অন্য চক্রে যেই আসিয়া উপস্থিত হয় অমনি জীবের এক এক প্রকার অভূতপূর্ব্ব উপলব্ধি হইতে থাকে; এবং যেই মস্তিষ্কে উহা উপনীত হয়, অমনি জীবের ধর্ম্মবিজ্ঞানের চরমোপলব্ধি হয়—অদ্বৈতজ্ঞানে বা "কারণং কারণানাং" পরমাত্মার জ্ঞানে তন্ময়ত্ব আসে। তখনই জীবের ভাবেরও চরমোপলব্ধি হয় বা যে মহাভাব অবলম্বনে অপর সকল ভাব মানব মনে উদিত হয় সেই 'ভাবাতীত ভাবে' তন্ময়ত্ব আসে।

কি সরল কথা দিয়াই না ঠাকুর যোগের এই সকল জটিল তত্ত্ব আমাদিগকে বুঝাইতেন! বলিতেন—"দ্যাখ্, সড় সড় করে একটা পা থেকে মাথায় গিয়ে উঠে!—যতক্ষণ না সেটা মাথায় গিয়ে ওঠে ততক্ষণ হুঁস্ থাকে; আর যেই সেটা মাথায় গিয়ে উঠ্‌লো আর একেবারে বেহুঁস হয়ে যাই—তখন আর দেখা শুনাই থাকে না, তা কথা কওয়া; কথা কইবে কে?—'আমি' 'তুমি' এ বুদ্ধিই চলে যায়! মনে করি তোদের সব ব'লবো; সেটা উঠ্‌তে উঠ্‌তে কত কি দর্শন টর্শন হয় সব কথা ব'লবো, যতক্ষণ সেটা (হৃদয় ও কণ্ঠ দেখাইয়া) এই অবধি বা এই অবধি বড় জোর উঠেছে ততক্ষণ বলা চলে, ও বলি; কিন্তু যেই সেটা (কণ্ঠ দেখাইয়া) এখান ছাড়িয়ে উঠ্‌লো আর অমনি যেন কে মুখ চেপে ধরে, আর বেহুঁস হয়ে যাই, সামলাতে পারিনি! (কণ্ঠ দেখাইয়া) ওর উপরে গেলে কি রকম সব দর্শন হয় তা বলতে গিয়ে যেই ভাবচি কি রকম দেখিছি আর অমনি মন হুস্ করে উপরে উঠে যায়—আর বলা যায় না!" আহা কত দিন যে ঠাকুর কণ্ঠের উপরিস্থ চক্রে মন উঠিলে কিরূপ দর্শনাদি হয় তাহা সাম্‌লে সুম্‌লে আমাদের নিকট বলিতে যাইয়া অপারক হইয়াছেন তাহা বলা যায় না! আমাদের এক বন্ধু বলেন—একদিন ঐরূপে খুব জোর করিয়া বলিলেন,—'আজ তোদের কাছে সব কথা ব'লবো, একটুও লুকোবো না' বলিয়া আরম্ভ করিলেন। হৃদয় ও কণ্ঠ পর্য্যন্ত সকল চক্রাদির কথা বেশ বলিলেন; তার পর ভ্রূমধ্যস্থল দেখাইয়া বলিলেন, 'এই খানে মন উঠ্‌লেই পরমাত্মার দর্শন হয় ও জীবের সমাধি হয়। তখন পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে কেবল একটি স্বচ্ছ পাতলা পর্দ্দামাত্র আড়াল (ব্যবধান) থাকে। সে তখন এই রকম দ্যাখে,"—বলিয়া পরমাত্মার দর্শনের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিবেন, অমনি সমাধিস্থ হইলেন। সমাধিভঙ্গে পুনরায় বলিতে চেষ্টা করিলেন পুনরায় সমাধিস্থ হইলেন। এইরূপ বার বার চেষ্টার পর সজল নয়নে আমাদের বলিলেন—"ওরে আমি তো মনে করি সব কথা বলি, এতটুকুও তোদের কাছে লুকোবো না, কিন্তু 'মা' কিছুতেই বল্‌তে দিলে না—মুখ চেপে ধরলে!' আমরা অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলাম 'একি ব্যাপার—দেখ্‌ছি উনি এত চেষ্টা করছেন বলবেন বলে। না বলতে পেরে ওঁর কষ্টও হচ্চে বুঝ্‌চি, কিন্তু কিছুতেই পাচ্চেন না—মা বেটী কিন্তু ভারি দুষ্ট; উনি ভাল কথা বলবেন, ভগবদ্দর্শনের কথা বলবেন, তাতে মুখ চেপে ধরা কেন বাবু?' তখন কি আর বুঝি, মন বুদ্ধি যার সাহায্যে বলা

কথাগুলো হয় তাদের দোড় বড় বেশী দূর নয়, আর তারা যতদূর দৌড়ুতে পারে তার বাহিরে না গেলে পরমাত্মার পূর্ণ দর্শন হয় না?—আর ঠাকুর আমাদের ভালবাসায় অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টা কচ্চেন!

কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্নাপথে উঠিবার কালে যে যে রূপ অনুভব হয় তৎসম্বন্ধে ঠাকুর আরও বিশেষ করিয়া বলিতেন—"দ্যাখ, সেটা ঘড় ঘড় করে মাথায় উঠে, সেটা সব সময় এক রকম ভাবে উঠে না। শাস্ত্রে সেটার পাঁচ রকম গতির কথা আছে—পিপীলিকা গতি; যেমন পিঁপড়েগুলো খাবার মুখে করে সার দিয়ে সুড় সুড় করে যায়, সেই রকম পা থেকে একটা সুড় সুড়ানি আরম্ভ হয়ে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে উপরে উঠ্‌তে থাকে, মাথা পর্য্যন্ত যায়, আর সমাধি হয়! ভেক গতি—ব্যাঙগুলো যেমন টুপ্ টুপ্ টুপ্—টুপ্ টুপ টুপ্ করে দু তিন বার লাফিয়ে একটু করে থামে আবার দু তিন বার লাফিয়ে আবার একটু থামে, সেই রকম করে একটা পায়ের দিক থেকে মাথায় উঠ্‌ছে বোঝা যায়; আর যেই মাথায় উঠ্‌লো আর সমাধি! সর্প গতি—সাপগুলো যেমন লম্বা হয়ে বা পুঁটুলি পাকিয়ে চুপ্ করে পড়ে আছে, আর যেই সামনে খাবার (শিকার) দেখেছে বা ভয় পেয়েছে, অমনি কিল্‌বিল্ কিল্‌বিল্ করো এঁকে বেঁকে ছোটে, সেই রকম করে ওটা কিল্‌বিল্ কিল্‌বিল্ করে একেবারে মাথায় উঠে—আর সমাধি! পক্ষি গতি—পক্ষিগুলো যেমন এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে বসবার সময় হুস্ করে উড়ে কখন একটু উঁচুতে উঠে কখন একটু নিচুতে নাবে কিন্তু কোথাও বিশ্রাম করে না, একেবারে যেখানে বস্‌বে মনে করেছে সেই খানে গিয়ে বসে, সেই রকম করে ওটা মাথায় উঠে সমাধি হয়! বাঁদর গতি—হনুমানগুলো যেমন একগাছ থেকে আর এক গাছে যাবার সময় 'উউপ্' করে এক ডাল থেকে আর এক ডালে গিয়ে পড়ল, সেখান থেকে 'উউপ' করে আর এক ডালে গিয়ে পড়লো, এইরূপে দু তিন লাফে যেখানে মনে করেছে সেখানে উপস্থিত হয়, সেইরকম করে ওটাও দু তিন লাফে মাথায় গিয়ে উঠে বোঝা যায় ও সমাধি হয়।"

কুণ্ডলিনী শক্তি সুষুম্নাপথে উঠিবার কালে প্রতি চক্রে কি কি প্রকার দর্শন হয়। তদ্বিষয়ে বলিতেন—"বেদান্তে আছে, সপ্ত ভূমীকার কথা। এক এক ভূমী হতে এক এক রকম দর্শন হয়। মনের স্বভাবতঃ নিচের তিন ভূমীতে ওঠা নামা, ঐ দিকেই দৃষ্টি—গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি—খাওয়া পরা রমণ ইত্যাদিতে। ঐ তিন ভূমী ছাড়িয়ে যদি হৃদয়ে ওঠে তো তখন তার জ্যোতি দর্শন হয়। কিন্তু হৃদয়ে কখন কখন উঠলেও মন আবার নিচের তিন ভূমী, গুহ্য লিঙ্গ নাভিতে নেমে যায়। হৃদয় ছাড়িয়ে যদি কারো মন কণ্ঠে ওঠে তো সে আর ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর কোন কথা যেমন বিষয়ের কথা টথা কহিতে পারে না।—তখন তখন এমনি হোতো, বিষয়কথা যদি কেউ কয়েছে তো মনে হ'ত মাথায় লাঠি মারলে; দূরে, পঞ্চবটীতে পালিয়ে যেতাম—যেখানে

ওসব কথা শুন্‌তে পাব না। বিষয়ী দেখলে ভয়ে লুকোতুম্! আত্মীয় স্বজনকে যেন কূপ বলে মনে হ'ত - মনে হ'ত তারা যেন, টেনে কূপে ফেলবার চেষ্টা করছে, পড়ে যাব আর উঠ্‌তে পারব না। দম্ বন্ধ হয়ে যেতো, মনে হোতো যেন প্রাণ বেরোয় বেরোয়—সেখান থেকে পালিয়ে এলে তবে শান্তি হ'ত!—কণ্ঠে উঠলেও মন আবার গুহ্য লিঙ্গ নাভিতে নেমে যেতে পারে, তখনও সাবধানে থাকিতে হয়। তারপর কণ্ঠ ছাড়িয়ে যদি কারো মন ভ্রূমধ্যে ওঠে তো তার আর পড়বার ভয় নেই। তখন পরমাত্মার দর্শন হয়ে নিরন্তর সমাধিস্থ থাকে। এখানটার আর সহস্রারের মাঝে একটা কাচের মত স্বচ্ছ পদ্দামাত্র আড়াল আছে। তখন পরমাত্মার এত নিকটে যে মনে হয় যেন মিশে গেছি, এক হয়ে গেছি, কিন্তু তখনও এক হয় নি। এখান থেকে মন যদি নামে তো বড় জোর কণ্ঠ বা হৃদয় পর্য্যন্ত নামে - তার নিচে আর নামতে পারে না। জীবকোটিরা এখান থেকে আর নামে না—একুশ দিন নিরন্তর সমাধিতে থাক্‌বার পর ঐ আড়ালটা বা পর্দ্দাটা ভেদ হয়ে যায়, আর তার সঙ্গে একেবারে মিশে যায়। সহস্রারে পরমাত্মার সঙ্গে একেবারে মেশামেশী হয়ে যাওয়াই সপ্তম ভূমী।"

ঠাকুরকে ঐ সব বেদ বেদান্ত যোগ বিজ্ঞানের কথা কহিতে শুনিয়া আমাদের কেহ কেহ আবার কখন কখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত - 'মশাই আপনি তো লেখা পড়ার কখন ধার ধারেন নি, এত সব জানলেন কোথা থেকে?' অদ্ভুৎ ঠাকুরের ঐ অদ্ভুৎ প্রশ্নেও বিরক্তি নাই! একটু হাসিয়া বলিতেন—"নিজে পড়ি নাই, কিন্তু ঢের সব যে শুনেছি গো? সে সব মনে আছে অপরের কাছ থেকে, ভাল ভাল পণ্ডিতের কাছ থেকে, বেদ বেদান্ত দর্শন পুরাণ সব শুনেছি। শুনে, তাদের ভিতর কি আছে জেনে তারপর সেগুলোকে (গ্রন্থগুলোকে) দড়ি দিয়ে মালা ক'রে গেঁথে গলায় পরে নেচে, 'এই নে তোর শাস্ত্র পুরাণ আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে,' বলে মার পাদপদ্মে ফেলে দিয়েছি!

বেদান্তের অদ্বৈত ভাব বা ভাবাতীত ভাব সম্বন্ধে বলিতেন "ওটা সব শেষের কথা। কি রকম জানিস্?—যেমন, অনেক দিনের পুরোণো চাকর। মনিব তার গুণে খুসী হয়ে তাকে সকল কথায় বিশ্বাস করে, সব বিষয়ে পরামর্শ করে। এক দিন বা খুব খুসী হয়ে তার হাত ধরে নিজের গদিতেই বসাতে গেল। চাকর সঙ্কোচ হয়ে 'কি কর, কি কর' বল্‌লেও মনিব জোর করে টেনে বসিয়ে বল্‌লে, "আঃ বস্ না, তুইও যে, আমিও সে"—সেই রকম।

আমাদের জনৈক বন্ধু এক সময়ে বেদান্তচর্চ্চায় বিশেষ মনোনিবেশ করেন। ঠাকুর তখন বর্ত্তমান এবং উঁহার আকুমার ব্রহ্মচর্য্য ভক্তি নিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য উঁহাকে বিশেষ ভাল বাসিতেন। বেদান্ত চর্চ্চা ও ধ্যান ভজনাদিতে নিবিষ্ট হইয়া বন্ধুটী ঠাকুরের নিকট পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেমন ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন সেরূপ কিছুদিন করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। ঠাকুরের

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে বিষয় উপেক্ষিত হয় নাই। বন্ধুটির সঙ্গে যাতায়াত করিত এমন এক ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে একাকী দেখিয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি রে তুই যে একলা, সে আসে নি?' জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি 'না' বলায় ঠাকুর পুনরায় বলিলেন—'কেন রে? সে আজ কাল কি করে?' জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বলিল—'সে মশাই আজ কাল খুব বেদান্তচর্চ্চায় মন দিয়েছে। রাত দিন বিচার, ধ্যান এই নিয়ে আছে। তাই বোধ হয় সময় নষ্ট হবে ব'লে আসে নি।' ঠাকুর শুনিয়া আর কিছুই বলিলেন না।

উহার কিছুদিন পরেই ঠাকুর একদিন বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাটীতে আসিয়াই—আমাদের বন্ধুর বাটী নিকটেই জানা ছিল—তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বন্ধুও সসম্ভ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, 'কি গো, তুমি নাকি আজ কাল খুব বেদান্ত বিচার করচ? তা বেশ বেশ। তা বিচার তো খালি এই গো—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—না আর কিছু?'

বন্ধু—"আজ্ঞা হাঁ, আর কি?"

ঠাকুর—"শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—আগে শুনলে; তারপর মনন, বিচার করে মনে মনে পাকা করলে; তারপর নিদিধ্যাসন, মিথ্যা বস্তু জগৎকে ত্যাগ ক'রে সদ্বস্তু ব্রহ্মের ধ্যানে মন লাগালে—এই। তা না হয়ে—শুনলুম, বুঝলুম, কিন্তু যেটা মিথ্যা সেটাকে ছাড়্‌তে চেষ্টা করলুম না—তা হলে কি হবে? সেটা হচ্চে সংসারীদের জ্ঞানের মত, ও রকম জ্ঞানে বস্তুলাভ হয় না। ধারণা চাই, ত্যাগ চাই—তবে হবে। তা না হলে মুখে বল্‌চ বটে কাঁটা নেই, খোঁচা নেই, কিন্তু যেই হাত দিয়েছ অমনি প্যাঁট্ করে কাঁটা ফুটে উহুঃ উহুঃ করে উঠতে হবে। মুখে বলচ জগৎ নেই, অসৎ—একমাত্র ব্রহ্মই আছেন', ইত্যাদি, কিন্তু যেই জগতের রূপরসাদি বিষয় সম্মুখে আসা, অমনি সত্যজ্ঞান হয়ে বন্ধনে পড়া। পঞ্চবটীতে এক সাধু এসেছিল। সে লোকজনের সঙ্গে খুব বেদান্ত টেদান্ত বলে। তারপর একদিন শুনলুম, একটা মাগীর সঙ্গে নট্ ঘট্ হয়েছে। তারপর ওদিকে শৌচে গিয়েছি দেখি সে বসে আছে। বললুম 'তুমি এত বেদান্ত টেদান্ত বল, আবার এ সব কি?' সে বললে 'তাতে কি? আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্চি তাতে দোষ নাই। যখন জগৎটাই তিন কাল মিথ্যা হল তখন ঐটেই কি সত্য হবে ওটাও মিথ্যা।' আমি তো শুনে বিরক্ত হয়ে

বলি—'তোর অমন বেদান্ত জ্ঞানে আমি মুতে দি।' ওসব হচ্চে সংসারী, বিষয়ী জ্ঞানীর জ্ঞান। ও জ্ঞান জ্ঞানই নয়। কি জান?—অসৎকে ঠিক ঠিক মনে প্রাণে অসৎ বোধ হয়ে যাওয়া তাঁর দয়া না হলে হয় না।" ঈশ্বরের দয়ার কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের সমাধি হইল। কিছুক্ষণ পরে অর্দ্ধ-বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন—'একটা ঠিক্ করতে পারে না, আবার আর একটা চায়!' ঐ কথাগুলি বলেই বন্ধুর হাত ধরে ঐ ভাবাবস্থায় গান ধরলেন—

"ওরে কুশি লব, করিস্ কি গৌরব,
বাঁধা না দিলে কি পারিস্ বাঁধতে।"

গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের দুই চক্ষে এত জলধারা বহিতে লাগিল যে বিছানার চাদরের খানিকটা ভিজিয়া গেল!—বন্ধুও সে অপূর্ব্ব শিক্ষায় দ্রবীভূত হইয়া কাঁদিয়া আকুল! কতক্ষণে তবে দুইজনে প্রকৃতিস্থ হইলেন। বন্ধু * বলেন—"সে শিক্ষা আমার চিরকাল হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে!"

এখানে ঠাকুরের অদ্বৈত জ্ঞানসম্বন্ধীয় আর একটি কথা আমরা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। ঠাকুরের তখন অসুখ—কাশীপুরের বাগানে বাড়াবাড়ি। শ্রীযুৎ শশধর তর্কচূড়ামণি, ও সঙ্গে কয়েকজন, অসুখের কথা শুনিয়া দেখিতে আসিলেন। পণ্ডিতজী কথায় কথায় ঠাকুরকে বলিলেন—'মহাশয়, শাস্ত্রে পড়েছি আপনাদের ন্যায় পুরুষ ইচ্ছামাত্রেই শারীরিক রোগ আরাম করিয়া ফেলিতে পারেন। আরাম হোক্ মনে করে, মন একাগ্র করে একবার অসুস্থ স্থানে কিছুক্ষণ রাখলেই সব সেরে যায়। আপনার একবার ঐরূপ করিলে হয় না?'

ঠাকুর বলিলেন—"তুমি পণ্ডিত হয়ে একথা কি করে বল্লে গো? যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙ্গা হাড়-মাসের খাঁচাটার উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয়?"

পণ্ডিতজী নিরুত্তর হইলেন; কিন্তু শ্রীযুৎ নরেন্দ্রপ্রমুখ ভক্তেরা নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। পণ্ডিতজী চলিয়া যাইবার পরেই ঠাকুরকে একেবারে সটে্পটে ধরিলেন। বলিলেন,'আপনাকে অসুখ সারাতেই হবে,আমাদের জন্য সারাতে হবে।'

ঠাকুর—"আমার কি ইচ্ছা রে, যে আমি রোগে ভুগি; আমি তো মনে করি সারুক, কিন্তু সারে কৈ? সারা, না সারা, মার হাত।"

* স্বামী তুরীয়ানন্দ।

শ্রীযুৎ নরেন্দ্র—"তবে মাকে বলুন সারিয়ে দিতে, তিনি আপনার কথা শুনবেনই শুনবেন।"

ঠাকুর—"তোরা তো বলছিস্ কিন্তু ও কথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় না রে।

শ্রীযুৎন—"তা হবে না মশাই, আপনাকে বলতেই হবে। আমাদের জন্য বলতে হবে।"

ঠাকুর—"আচ্ছা দেখি পারিত বলবো।"

কয়েক ঘণ্টা পরে শ্রীযুৎ নরেন্দ্র পুনরায় ঠাকুরের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশায় বলেছিলেন? মা কি বল্লেন?"

ঠাকুর—"মাকে বল্লুম (গলার ক্ষত দেখাইয়া) "এইটের দরুণ কিছু খেতে পারি না যাতে দুটি খেতে পারি করে দে।" তা মা বল্লেন—তোদের সকলকে দেখিয়ে—"কেন? এই যে এত মুখে খাচ্চিস্।" আমি আর লজ্জায় কথাটী কইতে পারলুম না।"

কি অদ্ভুৎ দেহ বুদ্ধির অভাব! কি অপূর্ব্ব অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান! তখন ছয় মাস কাল ধরিয়া ঠাকুরের নিত্য আহার বোধ হয় চারি পাঁচ ছটাক বার্লি মাত্র, সেই অবস্থায় জগন্মাতা যাই বলিয়াছেন 'এই যে এত মুখে খাচ্চিস্', অমনি কি কুকর্ম্ম করিয়াছি এই একটা ক্ষুদ্র শরীরকে 'আমি' বলিয়াছি? মনে করিয়া ঠাকুর লজ্জায় হেঁটমুখ ও নিরুত্তর হইলেন! পাঠক এ ভাব কি একটুও কল্পনায় আনিতে পার?

কি অদ্ভুৎ, ঠাকুরের সঙ্গে দেখাই না আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে! জ্ঞান ভক্তি, যোগ কর্ম্ম, পুরাণ নবীন সকল প্রকার ধর্ম্মভাবের, কি অদৃষ্টপূর্ব্ব সামঞ্জস্যই না তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি! উপনিষদকার ঋষি বলেন, ঠিক্ ঠিক্ ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প হন। সংকল্প বা ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার ইচ্ছা, বাহ্য জগতের সকল পদার্থ, সকল শক্তি ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লয় ও সেই ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়!—উক্ত পুরুষের নিজের শরীর মন তো তদ্রূপ করিবেই! উপনিষদ্কারের ঐ বাক্যের সত্যতা পরীক্ষা সর্ব্বতোভাবে করা সাধারণ মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে—তবে ঐ বিষয়ের যতদুর পরীক্ষা করা তাহার ক্ষুদ্র প্রাণে সম্ভব তাহার বোধ হয় কিছু অভাব বা ত্রুটি, আমরা সকলে অনুক্ষণ যে ভাবে ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া লইতাম তাহাতে হয় নাই। এবং প্রতিবারই ঠাকুর সে সকল পরীক্ষায় হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যেন ব্যঙ্গ করিয়াই আমাদের বলিতেন এখনও অবিশ্বাস! বিশ্বাস

কর—পাকা করে ধর—'যে রাম, যে কৃষ্ণ হয়েছিল সেই ইদানীং (নিজের শরীরটা দেখাইয়া) এ খোলটার ভিতর'—তবে 'এবার গুপ্ত ভাবে আসা! যেমন, রাজার ছদ্মবেশে নিজ রাজ্য পরিদর্শন! যেমনি জানাজানি কানাকানি হয় অমনি সে সেখান থেকে সরে পড়ে—সেই রকম!'

ঠাকুরের জীবনের এক একটা ঘটনা যেন ঐ বিষয়ে আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া দেয়! সাধারণতঃ তো দেখা যায় মানব মনে যত প্রকার ভাবই উদয় হয় সেগুলি প্রকৃত পক্ষে তাহারই 'স্বসংবেদ্য' বা ঐ সকল ভাবের পরিমাণ তীব্রতা ইত্যাদি সে নিজেই ঠিক্ ঠিক্ জানিতে পারে। অপরে কেবল ভাবের বাহ্যিক বিকাশ দেখিয়া ঐ সকলের অনুমান মাত্র করিয়া থাকে। ভাব সমাধির এই রূপ স্বসংবেদ্য প্রকৃতি (subjective nature) সকলেরই প্রত্যক্ষের অন্তর্ভূত। সকলেই জানে ভাব সকল অন্যান্য চিন্তাসমূহের ন্যায় মানসিক বিকারমাত্র—মনেতেই উহাদের উদয়, মনেতেই লয়; বাহ্যজগতে উহার ছবি বা অনুরূপ প্রতিকৃতি দেখা ও দেখান অসম্ভব। ঠাকুরের ভাব সমাধির অনেকগুলিতে কিন্তু উহার বৈপরীত্য দেখা যায়। ধর, সাধনাবস্থায়—প্রথম প্রথম পঞ্চবটীতে বসিয়া তাঁহার মনে হওয়ার কথা, 'এই গাছতলায় যদি একখানি কুটীর হয় তো তার ভিতর পড়ে মা তোকে ডাকি'—আর তার কিছুক্ষণ পরেই গঙ্গায় বান ডাকিয়া এক খানি ক্ষুদ্র কুটীরনির্ম্মাণের আবশ্যকীয় যত কিছু দ্রব্যাদি, মায় একখানি কাটারি পর্য্যন্ত, সেই স্থানে ভাসিয়া আসিয়া লাগা ও তাঁহার কালীবাটীর মালির সাহায্যে ঐ কুটীর নির্ম্মাণ! অথবা ধর—রাসমণির জামাতা মথুরানাথের সহিত তর্কে তাঁহার বলা 'ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব হতে পারে—লালজবা ফুলের গাছে সাদা জবাও হতে পারে', মথুরের তাহা অস্বীকার করা এবং পরদিনই ঠাকুরের বাগানের জবা গাছের একটী ডালের দুটী ফ্যাকড়ায় ঐ রূপ দুটি ফুল দেখিতে পাওয়া ও ফুলশুদ্ধ ঐ ডালটি ভাঙ্গিয়া আনিয়া মথুরানাথকে দেওয়া! অথবা ধর—তন্ত্র বেদান্ত বৈষ্ণব ইসলামাদি যখন যে মতের সাধনা করিবারই অভিলাষ ঠাকুরের প্রাণে উদয় হওয়া, তখনি সেই সেই মতের এক এক জন সিদ্ধব্যক্তির দক্ষিণেশ্বর কালীবাটিতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ঐ ঐ মতে দীক্ষিত করা অথবা ধর—ঠাকুরের ভক্তদিগকে আহ্বান ও তাহারা উপস্থিত হইলে তাহাদের চিনিয়া গ্রহণ করা। এরূপ কত কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে—সকলগুলিতে এইটি দেখিতে পাওয়া যায় যে ঠাকুরের মানসিক ভাবের অনেক

গুলি সাধারণ মানবমনের ভাবের ন্যায় কেবল মানসিক বিকার মাত্র নহে, বাহ্যজগতে ঐ সকলের অনুরূপ প্রতিকৃতি দেখা গিয়াছে। আমরা এখানে উক্ত সত্যের নির্দ্দেশমাত্র করিয়াই ছাড়িয়া দিলাম। উহা হইতে পাঠকের যাঁর যেরূপ অভিরুচি তিনি তদ্রূপ আলোচনা ও অনুমানাদি করুন—ঘটনা কিন্তু সত্যই ঐরূপ!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠাকুর আমাদের নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থার সময় ছাড়া অপর সকল সময়ে 'ভাবমুখে' থাকিতেন—শ্রীভগবান ও প্রত্যেক ভক্তের সহিত এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বরাবর সেই সেই সম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বা ও তাঁহারই হ্লাদিনি ও সন্ধিনি শক্তির বিশেষ-বিকাশক্ষেত্র স্বরূপ যত স্ত্রীমূর্ত্তির সহিত ঠাকুরের মাতৃসম্বন্ধ এখন সাধারণ প্রসিদ্ধ। ভক্তদিগের প্রত্যেকের সহিত তাঁহার ঐরূপ এক একটি সম্বন্ধ থাকার কথা বোধ হয় সাধারণে এখনও জ্ঞাত নহে। কিন্তু বাস্তবিকই ঐরূপ ছিল। সাধারণতঃ ঠাকুর তাঁহার ভক্তদিগকে দুই থাকে বা শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিতেন—শিবাংশসম্ভূত ও বিষ্ণু অংশোদ্ভূত। ঐ দুই শ্রেণীর ভক্তদিগের প্রকৃতি আচার ব্যবহার ভজনানুরাগ প্রভৃতি সকল বিষয়ে পার্থক্য আছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন ও নিজে তাহা বুঝিতে পারিতেন—কিন্তু ঐ পার্থক্য যে কি, তাহা বিশেষ করিয়া বুঝা বা বুঝান আমাদের সাধ্যাতীত। অল্প স্বল্প যাহা বুঝি তাহা বলিবারও এস্থান নহে। অতএব সংক্ষেপে পাঠক ইহাই বুঝিয়া লউন যে শিব ও বিষ্ণু চরিত্র যেন দুইটি আদর্শ ছাঁচ (type or model) এবং ঐ দুই ভিন্ন ছাঁচে যেন ভক্তদিগের প্রত্যেকের মানসিক প্রকৃতি গঠিত—এই পর্য্যন্ত। ঐ সকল ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি সকল প্রকার ভাবেরই সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল—অবশ্য বিভিন্ন জনের সহিত বিভিন্ন ভাবের। যথা শ্রীযুৎ নরেন্দ্র নাথ বা স্বামি বিবেকানন্দের কথায় বলিতেন, "নরেন্দ্রর যেন আমার শ্বশুর ঘর"—(আপনাকে দেখাইয়া) 'এর ভিতর যেটা আছে সেটা যেন মাদি, আর (নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) ওর ভিতর যেটা আছে সেটা যেন মদ্দা'; শ্রীযুৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামি বা রাখাল মহারাজকে ঠিক ঠিক নিজ পুত্রস্থানীয় বিবেচনা করিতেন—এইরূপ সন্ন্যাসী ও গৃহী বিশেষ বিশেষ ভক্তদিগের প্রত্যেকের সহিত ঠাকুরের এক একটা বিশেষ বিশেষ ভাব বা সম্বন্ধ ছিল। এবং সাধারণ ভক্তমণ্ডলীর প্রত্যেকের প্রতি ঠাকুরের নারায়ণ বুদ্ধি সর্ব্বদা থাকায় তাহা-

দের সহিত শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতেন। ভক্তদিগের প্রত্যেকের ভিতরকার প্রকৃতি দেখিয়াই ঠাকুরের তাহার সহিত ঐ ভাব বা সম্বন্ধ স্থাপিত হইত। কারণ ঠাকুর বলিতেন—'মানুষগুলোর ভিতরে কি আছে, তা সব দেখ্‌তে পাই ; যেমন কাচের আলমারির ভিতর যা যা জিনিস থাকে সব দেখা যায়, সেই রকম! যাহার যেরূপ প্রকৃতি সে তদ্বিপরীতে কখনই আচরণ করিতে পারে না—কাজেই ভক্তদিগের কাহারও ঠাকুরের ঐ সম্বন্ধ বা ভাবের বিপরীতে গমন বা আচরণ কখন সাধ্যায়ত্ত ছিল না। যদি কখনও কেহ অপর কাহারও দেখাদেখি বিপরীত ভাবের আচরণ করিত ত ঠাকুর তাহাতে বিশেষ বিরক্ত হইতেন ও তাহার ভুল বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। যথা, শ্রীযুৎ গিরিশকে ঠাকুর ভৈরব বলিতেন ও ভাবে ঐরূপ দেখিয়াছিলেন। শ্রীযুৎ গিরিশের অনেক আবদার ও কঠিন ভাষা তিনি হাসিয়া সহ্য করিতেন—কারণ তাহার ঐরূপ ভাষার আবরণে কি কোমল একান্ত নির্ভরতার ভাব লুক্কায়িত তাহা তিনি দেখিতে পাইতেন। তাহার দেখাদেখি ঠাকুরের অপর অনেক প্রিয় ভক্ত ঐরূপ ভাষা প্রয়োগ করায় ঠাকুর তাহার প্রতি বিশেষ বিরক্ত হন ও পরে তাহার ভুল তাহাকে বুঝাইয়া দেন। যাক্, এখন সে সব কথা—আমাদের বক্তব্য বিষয়ই বলিয়া যাই। /

চব্বিশ ঘণ্টা 'ভাবমুখে' থাকিলে ভাবুকতার এত বৃদ্ধি হয় যে, তাহার দ্বারা আর সংসারের অপর কোন কর্ম্ম চলে না, সে সংসারের ছোট খাট ব্যাপার আর মনে রাখিতে পারে না—সহজে আমরা এইরূপই দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত—ধর্ম্ম-জগতের তো কথাই নাই, বিজ্ঞান, রাজনীতি বা অন্য কোন বিষয়ে বিশেষ মনস্বী পুরুষগণের জীবনালোচনায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা হয়ত নিজের অঙ্গসংস্কার বা নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিস পত্রের যথাযথ স্থানে রাখা ইত্যাদি সামান্য বিষয় সকলে একেবারেই অপটু ছিলেন। ঠাকুরের জীবনে দেখিতে পাই যে অত অধিক ভাবপ্রবণতার ভিতরেও তাঁর ঐ প্রকার সামান্য বিষয় সকলেরও হুঁস থাকিত। যখন হুঁস্ থাকিত না তখন নিজের দেহ বা জগৎ সংসারের কিছুরই হুঁস থাকিত না, যেমন সমাধিতে—আর যখন থাকিত, তখন সকল বিষয়েরই থাকিত, ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে! এখানে দুই একটি মাত্র ঐরূপ দৃষ্টান্তেরই আমরা উল্লেখ করিব।

একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর হ'তে বলরাম বাবুর বাটী গমন করিতেছেন,

সঙ্গে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল ও শ্রীযুৎ যোগানন্দ স্বামী। সকলে গাড়িতে উঠিয়াছেন, গাড়ি ছাড়িয়া বাগানের গেট পর্য্যন্ত আসিয়াছে মাত্র, ঠাকুর শ্রীযুৎ যোগানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে নাইবার কাপড় টাপর এনেছিস্ তো?" —তখন প্রাতঃকাল।

শ্রীযুৎ যোগেন—'না মশাই, ভুল হয়েছে। তা তারা (বলরাম বাবু) একখানা কাপড় দেখে শুনে দেবে এখন।'

ঠাকুর—"ও কি তোর কথা? লোকে বল্‌বে, কোথা থেকে হাবাতে এসেছে। তাদের কষ্ট হবে, আতান্তরে পড়বে—যা নেবে গিয়ে নিয়ে আয়।" কাজেই যোগিন স্বামিজী তদ্রূপ করিলেন।

ঠাকুর বলিতেন—"ভাল লোক, লক্ষীমন্ত লোক বাড়ীতে এলে সকল বিষয়ে কেমন সুসার হয়ে যায়, কাকেও কিছুতে বেগ্ পেতে হয় না। আর হাবাতে হতচ্ছাড়াগুলো এলে সকল বিষয়ে বেগ্ পেতে হয়; যে দিন ঘরে কিছু নেই, তার জন্য গেরস্থকে বিশেষ কষ্ট পেতে হবে, ঠিক্ সেই দিনেই সে এসে উপস্থিত হয়।"

শ্রীযুৎ প্রতাপ হাজরা নামক এক ব্যক্তি ঠাকুরের সময়ে দক্ষিণেশ্বরে অনেক কাল সাধুভাবে কাটাইয়াছেন। আমরা সকলে ইঁহাকে হাজরা মহাশয় বলিয়া ডাকিতাম। ইনিও মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের কলিকাতার ভক্তদিগের নিকট আগমনকালে, তাঁহার সঙ্গে আসিতেন। একবার ঐরূপে আসিয়া প্রত্যাগমন কালে নিজের গামছাখানি ভুলিয়া কলিকাতায় ফেলিয়া যান। দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া ঐ কথা জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলেন—"ভগবানের নামে আমার পোঁদের কাপড়ের হুঁস্ থাকে না, কিন্তু আমি তো একদিনও নিজের গামছা বা বেটুয়া কলিকাতায় ভুলিয়া আসি না। আর তোর একটু জপ করে এত ভুল!"

শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর শিখাইয়াছিলেন—'গাড়িতে বা নৌকায় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে, আর নামবার সময় কোন জিনিসটা নিতে ভুল হয়েছে কি না দেখে শুনে সকলের শেষে নামবে।' ঠাকুরের অতি সামান্য বিষয়েও এত নজর ছিল।

এইরূপে 'ভাবমুখে' নিরন্তর থাকিয়াও ঠাকুরের আবশ্যকীয় সকল বিষয়ের হুঁস্ থাকিত—যে জিনিসটি যেথানে রাখিতেন তাহা সর্ব্বদা সেইখানেই রাখিতেন, নিজের কাপড় চোপড় বেটুয়া প্রভৃতি সকল নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের

নিজে খোঁজ রাখিতেন, কোথাও যাইবার আসিবার সময় আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যাদি আনিতে ভুল হইয়াছে কি না সন্ধান লইতেন এবং ভক্তদিগের মানসিক ভাবসমূহের যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান রাখিতেন তেমনি তাহাদের সংসারের সকল বিষয়ের সন্ধান রাখিয়া কিসে তাহাদের বাহ্যিক সকল বিষয়ও সাধনার অনুকূল হইতে পারে তদ্বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা করিতেন।

ঠাকুরের কথা অনুধাবন করলে বুঝা যায় তিনি যেন সর্ব্বপ্রকার ভাবের মূর্ত্তিমান্ সমষ্টি ছিলেন। ভাবরাজ্যের অত বড় রাজা মানব জগতে আর কখনও দেখা যায় নাই। ভাবময় ঠাকুর 'ভাবমুখে'অবস্থান করিয়া নির্ব্বিকল্প অদ্বৈতভাব হইতে সবিকল্প সকল প্রকার ভাবের পূর্ণ প্রকাশ নিজে দেখাইয়া সকল শ্রেণীর ভক্তদিগকে স্বস্ব পথের ও গন্তব্য স্থলের সংবাদ দিয়া অন্ধকারে অপূর্ব্ব জ্যোতি, নিরাশায় অদৃষ্টপূর্ব্ব আশা এবং সংসারের নিদারুণ দুঃখকষ্টের ভিতর নিরুপম শান্তি আনিয়া দিতেন। ঠাকুর যে সকলের কি ভরসার স্থল ছিলেন তাহা বলিয়া বুঝান দায়। মনোরাজ্যে—তাঁহার যে কি প্রবল প্রতাপ দেখিয়াছি তাহা বলা অসম্ভব। স্বামি বিবেকানন্দ বলিতেন—'মনের বাহিরের জড় শক্তি সকলকে কোন উপায়ে আয়ত্ত করে কোন একটা অদ্ভুত (miracle) দেখান বেশী বড় কথা নয়—কিন্তু এই যে পাগলা বামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মত হাতে নিয়ে ভাঙ্গত, পিটত, গোড়ত, স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতন ভাবে পূর্ণ করত, এর বাড়া (miracle) আশ্চর্য্য আমি আর কিছুই দেখি না।'

ভাবরাজ্যের কথা বলিতে বলিতে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি। সাধারণ পাঠকের এ সকল কথা কতদূর রুচিকর হইবে বলিতে পারি না। অতএব আজ আমরা এখানেই ক্ষান্ত হইলাম। আগামীবারে শ্রীরামকৃষ্ণলীলার অন্যরূপ প্রসঙ্গ উঠাইবার ইচ্ছা রহিল।

ক্রমশঃ।

স্বামি-শিষ্য সংবাদ।

গঙ্গাবক্ষে।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।]

স্বামীজি বেলুড়ে ঠাকুর বাড়ী নির্ম্মাণ আরম্ভ করিয়াছেন। এখনো স্বামীজির দোতালাঘর তৈয়ারি হয় নাই। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মঠবাড়ী নির্ম্মাণের ভার লইয়া স্বামীজির অভিমতে কার্য্য করিতেছেন। স্বামীজির শরীর তত ভাল নয়, তাই ডাক্তারগণ তাঁহাকে গঙ্গার উপর সকাল সন্ধ্যা বেড়াইতে বলিয়াছেন। নড়ালের রায়বাবুদের বজরাখানি কিছুদিনের জন্য স্বামী নিত্যানন্দ চাহিয়া আনিয়াছেন। মঠের সামনে সেখানা বাধা রহিয়াছে। স্বামীজির ইচ্ছামত তিনি কখনো কখনো ঐ বজরায় ক'রে গঙ্গা-বক্ষে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

আজ রবিবার। শিষ্য মঠে আসিয়াছে এবং আহারান্তে স্বামীজির ঘরে বসিয়া স্বামীজির উপদেশামৃত পান করিয়া ধন্য হইতেছে।

স্বামীজি একটু বিশ্রাম করিয়া বল্‌ছেন, "দেখ্, গেরস্তদের গায়ে কাপড়ে আজকাল কেমন একটা মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ গন্ধ পাই; তাই মঠে নিয়ম করেছি, গেরস্তরা সাধুদের বিছানায় না বসে, শোয় ইত্যাদি। আগে শাস্ত্রে পড়তুম যে, ঐরূপ পাওয়া যায় এবং সেজন্য সন্ন্যাসীরা গৃহস্থদেব গন্ধ সহিতে পারে না; এখন দেখ্‌ছি, ঠিক কথা। কেমন ওকথা শাস্ত্রে পড়িস্‌নি?"

শিষ্য—হাঁ, পড়েছি।

স্বামীজি—এই নিয়মগুলি প্রতিপালন করে চল্‌তে পার্‌লে এই বাল-ব্রহ্মচারীদের কালে ঠিক ঠিক সন্ন্যাস হবে।

শিষ্য—মশায, আমরা তবে কোথায় যাই?

স্বামীজি—তোদের ভাবনা কিরে বাপ? দেখ না, মঠের সব সাধুই তোকে কেমন ভালবাসে!

(এখানে এইটুকু বলা উচিত যে, মঠে এই সময় স্বামীজি সন্ন্যাসী ও বালব্রহ্মচারিগণের জন্য কতকগুলি নিয়ম বিধিবদ্ধ করেন, গৃহস্থদের সঙ্গে সম্পূর্ণ পৃথক্ থাকাই এই নীতিগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল; যথা, পৃথক্ আহারের স্থান, পৃথক্ বিশ্রামের স্থান ইত্যাদি।)

শিষ্য ঐ নিয়মের কঠোরতা স্মরণ করিয়া স্বামীজিকে বলিতেছে, "মশাই, যদি পাদপদ্মে আশ্রয়ই দিয়াছেন, তবে আর কঠোরতার ভ্রূ-ভঙ্গীতে ভীত করিবেন না—যথার্থ সন্ন্যাসী হ'তে হ'লে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে অতদূর কঠোর নিয়ম পালন করে চল্‌তে হয় শুনে গৃহস্থাশ্রমী আমাদের মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়।

স্বামীজি খানিকক্ষণ নীরবে থেকে পরে বলিতেছেন, "কি জানিস্, এক একটা নিয়মের গণ্ডীর মধ্যে না রাখিলে এসব কালে বিগ্‌ড়ে যাবে, তাই ভেবে চিন্তে কতকগুলি নিয়ম ক'রে দিলুম। তা বাবা তোর কোন ভয় নাই; তুই যে আমাদের।" শিষ্য আশ্বস্ত হইয়া স্বামীজির কৃপা অনুভব করিতেছে এবং অনিমেষদৃষ্টিতে স্বামীজির মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিয়া ধন্য হইতেছে।

শিষ্য বলিতেছে, 'মশাই, এই মঠ ও মঠস্থ যাবতীয় লোক আমার বাড়ী ঘর স্ত্রীপুত্রের চেয়ে অধিক আপনার বলে মনে হয়। যেন এসব কতকালের চেনা শুনা। মঠে আমি যেমন সর্ব্বতোমুখী স্বাধীনতা উপভোগ করি, জগতের কোথাও তেমন বোধ হয় না।' স্বামীজি বল্‌ছেন—'যত শুদ্ধসত্ব লোক আছে, সবারই এখানে ঐরূপ অনুভূতি হবে। যার হয় না, সে জান্‌বি, এখানকার লোক নয়, তাই দেখ্‌না কত লোক এসে এসে পালিয়ে যায়।'

শিষ্য—মশায়, এই সব চা খাওয়া, খোস্ গল্প করা দেখে শুনে অনেকে বলে, এই কি সন্ন্যাসীদের ধর্ম্ম?

স্বামীজি হাসিয়া বলিতেছেন, 'তা বেশ; দিন রাত মেয়েমানুষের সেবা ক'রে, দিন রাত অর্থ অর্থ ক'রে মরে বেড়াচ্চে, তারা এখানকার ভাব কি বুঝ্‌বে বল্? এই যে সব সন্ন্যাসীদের দেখ্‌ছিস্, এরা সব কেহই মানুষ নয়, তাঁর (ঠাকুরের) সঙ্গ দেহ ধরেছে। সেকেলে ছাই মাখা, মাথায় জটা, চিম্‌টে হাতে সন্ন্যাসীদের মত নয়; তাই লোকে দেখে শুনে কিছুই বুঝ্‌তে পারে না।'

শিষ্য—মশাই, এ অবতারে দেখ্‌ছি সবই নূতন! আগেকার মত সন্ন্যাসীদের চাল্‌চলন ত নাই, তার উপর আবার কখন কখন সেজে গুজে বক্তৃতা দেওয়া, বিলাত যাওয়া—এ সব কি?

স্বামীজি—যিনি দেহ ধ'রে এসেছিলেন, তাঁর সবই নূতন। তাই আমরাও সব নূতন রকমের; কখনো সেজে গুজে 'বক্তৃতা' দি, কখনো 'হর হর বোম্ বোম্' বলে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে তুলি। বুঝলি?

শিষ্য—এদেশে তো দেখ্‌তে পাই, যে কোন মত আগেকার ছাঁচে না ঢালা হয়, অমনি তার সম্বন্ধে চারদিক্ থেকে হৈ রৈ উঠে! সে দিন মঠে আস্‌বার কালে একটী উত্তরপাড়ার ব্রাহ্মণ আমি মঠে যাচ্ছি বলে আমায় অনেক ঠাট্টা কর্‌ছিল। বল্‌ছিল, বাপু, বামুনের ছেলে হয়ে ওসব খৃষ্টানদের কাছে যাচ্ছ কেন? আমি বল্লুম, বামুনের লক্ষণ কি? কথা শুনে ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটী শ্লোক আওড়ায়ে বল্লে যে, এই সব ব্রাহ্মণের লক্ষণ। আমি তার সংস্কৃত উচ্চারণে আর হাস্য সম্বরণ কর্ত্তে না পেরে বল্লুম, মশাই, যে ব্রাহ্মণ হয়, তার মুখে এমন বিতিকিচ্ছি সংস্কৃত উচ্চারণ হয় না। যখন আমি ঐ শ্লোকটী পড়ে তার মানে করে বুঝিয়ে দিলুম, তখন নৌকার সব লোক আমার দিক্ নিয়ে বল্‌লে—এমন সব পণ্ডিত লোক যখন ওখানে যায়, তখন অবশ্যই মঠের কোন উচ্চ ভাব আছে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তখন অপ্রতিভ হয়ে রেগে আমায় আর কিছু বল্লে না। আমি আবার তাকে কষ্ট দিয়েছি বলে মঠে নাম্‌বার সময় তার পদধূলি নিই।

স্বামীজি—বেশ করেছিস্। ও সব সেকেলে পাঁজি পুঁথির দোহাই দিলে এখন আর কি চলেরে বাপ্? এই পাশ্চাত্য সভ্যতার উদ্বেল প্রবাহ তর্ তর্ ক'রে এখন দেশ জুড়ে বয়ে যাচ্ছে। তার উপযোগিতা একটুও প্রত্যক্ষ না ক'রে পাহাড়ে বসে কেবল ধ্যানস্থ থাক্‌লে এখন আর কি চলেরে বাপ্? এখন চাই—গীতায় ভগবান্ যা বলেছেন—প্রবল কর্ম্মযোগ—হৃদয়ে অসীম সাহস, অমিত বল পোষণ ক'রে। তবে ত সব উঠ্‌বে, নতুবা 'তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে'।

কথা বল্‌তে বল্‌তে বেলা শেষ হয়ে আস্‌ছে। স্বামীজি গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণোপযোগী সাজ করে নীচে নামিবার উদ্যোগ করিতেছেন। শিষ্যও পিছু পিছু নাম্‌ছে। মঠের পূর্ব্ব দিকে রকে এখন যেখানে পোস্তা গাঁথা হয়েছে, তার সাম্‌নে এসে স্বামীজি পাইচালি ক'রে বেড়াচ্ছেন। নৌকা ঘাটে এসেছে। স্বামীজির সঙ্গে কে কে যাবে, তার এখনো নির্ণয় হয় নাই। মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সকলেই স্বামীজির আদেশের অপেক্ষায় আছেন। স্বামীজি সকলের মুখপানে তাকাইয়া শিষ্যকে বল্‌ছেন, "চল্, গঙ্গায় বেড়িয়ে আসি; তোর ত কল্‌কাতা যাবার দরকার নাই?"

শিষ্য প্রফুল্লচিত্তে বল্‌ছে, "না মশায়, আজ আর কল্‌কাতা যাব না।" স্বামী নির্ভয়ানন্দ ও নিত্যানন্দও সঙ্গে চলিলেন।

নৌকায় উঠে স্বামীজি ছাতে বসিলেন এবং শিষ্য তাঁহার পাদমূলে উপবেশন করিল। শিষ্যের ইচ্ছা হচ্চে -স্বামীজি যেন তাহাকে আজ পাদপীঠ করে উপবেশন করেন। গঙ্গার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ নৌকার তলদেশে প্রতিহত হইয়া কল্ কল্ শব্দ করিতেছে, মৃদুল মলয়ানিল প্রবাহিত হইয়া স্বামীজিকে ব্যজন করিতেছে, আকাশের পশ্চিম দিক্ এখনো সন্ধ্যার রক্তিম রাগে রঞ্জিত হয়নি। ভগবান্ মরীচিমালী অস্ত যেতে এখনো অর্দ্ধঘণ্টা বাকী। নৌকা উত্তর দিকে চলিয়াছে। স্বামীজির মুখে প্রফুল্লতা, নয়নে কোমলতা, কথায় উদাসীনতা এবং প্রতি হাব ভাবে জিতেন্দ্রিয়তা অভিব্যক্ত হইতেছে। সে এক ভাবপূর্ণ রূপ, যে না দেখেছে, তাকে বুঝান অসম্ভব।

দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়ে নৌকা অনুকূল বায়ুবশে আরো উত্তরে অগ্রসর হইতেছে। দক্ষিণেশ্বর দেখে শিষ্য ও অপর সন্ন্যাসীদ্বয় প্রণাম করিতেছে কিন্তু স্বামীজি যেন কোন গভীর ভাবে আত্মহারা হ'য়ে এলোথেলো হ'য়ে বসে আছেন। শিষ্য দক্ষিণেশ্বরের কত কথা বলিতেছে কিন্তু সেদিকে স্বামীজির কাণ নাই। দেখিতে দেখিতে নৌকা পেনেটীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পেনেটীতে ৺গোবিন্দকুমার চৌধুরীর বাগানবাটী একবার মঠের জন্য ভাড়া করিবার প্রস্তাব হয়। যখন নৌকা ঐ বাগানের সম্মুখীন, শিষ্য স্বামীজিকে বল্‌ছে, 'মশায়, যে বাগানে আপনি মঠ উঠিয়ে আন্‌বার জন্য ভাড়া নিতে চেয়েছিলেন, তা এই; একবার নামিবেন কি?' স্বামীজি সম্মতি জানাইলে নৌকা ঐ ঘাটে বাঁধা হইল। শিষ্যের সহিত স্বামীজি তথায় অবতরণ করিয়া বাগান ও বাটী বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পরম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন—'বাগানটী বেশ কিন্তু কলিকাতা থেকে অনেক দূর। ঠাকুরের শিষ্যদের যেতে আস্‌তে অনেক কষ্ট হতো।' শিষ্য বাগানের গাছ থেকে ফুল ও বিলাতি ডুমুর পেড়ে স্বামীজিকে দিতে লাগিল। ঐ বিলাতি ডুমুর মঠে লইয়া যাওয়া হয় এবং উহার ডাল্‌না স্বামীজিকে পরদিনে রেঁধে খাওয়ান হয়েছিল।

ভ্রমণান্তে নৌকা আবার মঠের দিকে চলিতে লাগিল। এ সময় আকাশে তারা ফুটিতেছিল। অন্ধকারে পৃথিবী কালিমা হইতেছিল, আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল জ্বল্ জ্বল্ জ্বলিতেছিল। ছাতের উপর বসিয়া শিষ্যের দৃষ্টি হঠাৎ ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডলে আকৃষ্ট হওয়ায় ঠাকুরের কথা তাহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। ঠাকুর বলিতেন, স্বামীজি সপ্ত ঋষির একতম—প্রধান ঋষি। শিষ্য বালকের মত স্বামীজিকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিতে উন্মুখ হইয়াছে। কিন্তু

প্রথমবারে যেন বাধ বাধ হইতেছে, পরে সাহসে ভর করিয়া স্বামীজিকে বলিতেছে, 'মশাই, ঐ যে দেদীপ্যমান সপ্তনক্ষত্র কুকুরের লেজের ন্যায় উত্তরাকাশে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহাই কি আমাদের সপ্তর্ষিমণ্ডল?' স্বামীজি মুখ ফিরাইয়ে একবার নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, "হাঁ।" শিষ্য বলিতেছে,"মশাই, শুনিয়াছি ঠাকুর আপনাকে বলিতেন,আপনি নাকি ওখান থেকে এসেছেন?" স্বামীজি শিষ্যের কথা শুনে নির্ব্বাক্ হ'য়ে বসে আছেন। শিষ্য ছাড়িবার পাত্র নহে। শিষ্য বল্‌ছে, "বলুন না—সত্যি কি না"। স্বামীজি গম্ভীর মুখে বল্‌ছেন, "হাঁ, ঠাকুর ওকথা বল্‌তেন বটে কিন্তু আমি ত বাবা কিছু টেরটুর পাচ্ছি না"। এ কথার পর শিষ্য আর ঐ বিষয়ে কোন প্রশ্ন না ক'রে ঠাকুর ও স্বামীজির বিষয় অনুধ্যান ক'রে অবাক্ হয়ে ব'সে রইল।

এবার নৌকা গঙ্গার পশ্চিম পার হয়ে আসিতেছিল। অন্ধকারে দক্ষিণেশ্বরের মন্দির অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। শিষ্য দক্ষিণেশ্বর প্রণাম করিয়া স্বামীজির কাছে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছে। স্বামীজি বল্‌ছেন, "দেখ্, কল্‌কাতা গিয়ে আর কি হবে? পচা গলির গন্ধ, মেয়েমানুষের গায়ের গন্ধে কল্‌কাতায় বায়ুমণ্ডল অশুচি হয়ে আছে; এ মঠের কেমন হাওয়া, এ হাওয়ায় ধ্যানবৃত্তিকে জাগ্রত করে; আত্মার বিকাশে সহায়তা করে। কি হবে আর কল্‌কাতায় গিয়ে? মঠেই থেকে যা।"

শিষ্য স্তব্ধ হয়ে স্বামীজির কথা শুনছে। আর ভাব্‌ছে, "হে আত্মারাম গুরুদেব! তুমি আমার ভববন্ধন জন্মের মত ঘুচিয়ে আমাকে জন্মে জন্মে তুমি যেখানে থাক সেখানে রাখো,আমি তোমার অনিন্দিত রূপরাশি প্রত্যক্ষ ক'রে তোমার অনবদ্য আত্মজ্ঞান-ঘোষ শ্রবণ ক'রে আমার ত্রিতাপসন্তপ্ত হৃদয় শীতল করি।" দেখিতে দেখিতে বজরা বেলুড় ঘাটে উপস্থিত হইল। স্বামীজির পশ্চাতে পশ্চাতে শিষ্য অবতরণ করিয়া মঠে উঠিল।

———

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাস।

গ্রীকদর্শনের মধ্যযুগ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীউপেন্দ্র নাথ মোদক বি, এ।

বর্ত্তমান প্রবন্ধ যাহাতে পূর্ব্বের সহিত অসংলগ্ন বোধ না হয়, তজ্জন্য প্রথমে আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, অতি সংক্ষেপে তাহার পুনরাবৃত্তি করিয়া লইব। গ্রীক্ দর্শন আমরা যতদূর অগ্রসর হইতে দেখিয়াছি, তাহার স্থূল কথাগুলি এই ঃ—

গ্রীকদর্শনের প্রথম যুগের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

মানবজাতির জ্ঞানলাভের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে আমরা এই একটী অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকন করিয়া থাকি যে, মানুষ কখনই একেবারে সম্পূর্ণ অজ্ঞানতা হইতে জ্ঞানের পদবীতে আরোহণ করে না। ভেদের চিহ্নমাত্র শূন্য ক্ষুদ্র বীজ হইতে বহু ভিন্ন অবয়ব বিশিষ্ট অঙ্কুরের উদ্গম হইলে, আমরা অভেদ হইতে ভেদের সৃষ্টি হইল মনে না করিয়া, বরং আপাত অভিন্ন অথচ বাস্তবিক সূক্ষ্মভেদসম্পন্ন বীজ হইতেই অঙ্কুরের ভিন্ন অবয়বসমূহ বিকশিত হইয়াছে, ইহাই যেমন মনে করিয়া থাকি, জ্ঞানের বিকাশ ব্যাপারটাও কতকটা ঐরূপ। ধরাধামে মনুষ্যসমাজে জ্ঞান জিনিষটা সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল, অথচ 'আকাশফলপাতের' * ন্যায় অথবা য়াহুদী শাস্ত্রবর্ণিত আদিম মানবদম্পতির জ্ঞানবৃক্ষের ফলভক্ষণের ফল-স্বরূপ, একদা অকস্মাৎ জ্ঞানালোকের প্রথম উন্মেষ হইল, এরূপ উৎকট কল্পনা ঠিক যুক্তি মানিয়া চলে বলিয়া বোধ হয় না। কাজেই খ্রীষ্টপূর্ব্ব কোন্ শতাব্দের কোন্ বর্ষের ঠিক কোন্ তারিখে মানবহৃদয়ে জ্ঞানারুণের প্রথম রশ্মি সম্পাত হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করিবার চেষ্টা হইতে বিরত থাকিলেই, সেটা অনুসন্ধিৎসার অভাব বলিয়া ধরিয়া লওয়া ঠিক নহে। দার্শনিক চিন্তার প্রথম আবির্ভাবের কাল নির্ণয় করিতে গেলেও ঠিক ঐ

* যাহা কার্য্যকারণশৃঙ্খলে আবদ্ধ নহে, অকস্মাৎ স্বতই আবির্ভূত হয়, এরূপ ঘটনার উদাহরণস্বরূপ শাস্ত্রকারেরা আকাশ হইতে ফলপাতের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন। যেমন বেদান্তবিরোধীরা বলিয়া থাকেন—বেদান্তিকের মুক্তি চেষ্টাসাধ্য নহে, পরন্তু 'আকাশফল-পাতবৎ'।'

সত্যেরই যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়। সুতরাং ঠিক কোন্ সময়ে গ্রীস দেশে দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা নিঃসংশয়িতরূপে বলা যায় না, যেহেতু কোনও কালবিশেষে যে ঐরূপ ঘটনা প্রথম সংঘটিত হইয়াছিল, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। তবে যখন বলা হয় যে, প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬০০ অব্দে থেল্‌স্ (Thales) নামধেয় কোন ব্যক্তি গ্রীস দেশে প্রথম দার্শনিক চিন্তার সূচনা করিয়া যান, তখন আমরা ইহাই বুঝিয়া থাকি যে, উক্ত সময়ে পাশ্চাত্য জগতে চিন্তা এতদূর অগ্রসর হইয়াছিল যে, থেল্‌স্ দার্শনিক প্রশ্নসমূহের মীমাংসা যত স্থূলভাবেই করুন না কেন, তিনিই কিন্তু প্রথম নিজের মীমাংসাকে একটা সঙ্গত আকার দান করিয়া জনসমাজে তাহাই প্রচার করেন, অন্ততঃ এ বিষয়ে ইতিহাস ইহার অধিক পূর্ব্বকালের সংবাদ দানে অসমর্থ। এই হিসাবে বলা হইয়া থাকে, থেল্‌স্ ইউরোপীয় দর্শনের আদিগুরু।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া থেল্‌স্ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক আদিভূত জলের বিকার মাত্র। এই সিদ্ধান্তটীকে একটু ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, আমরা গ্রীক্ দর্শন কিরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার একটা সূত্র খুঁজিয়া পাইব। এখন আসল কথাটা এই যে, দার্শনিক হিসাবে প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে খুব একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান নাই। ফল যেমন ফুলেরই রূপান্তর মাত্র, পূর্ব্বোক্ত উত্তরও তেমনি কিছু নয়, কেবল প্রশ্নেরই একরূপ পরিণতাবস্থা মাত্র। সেই জন্য প্রশ্নের মধ্যে যে সকল গুণদোষ প্রচ্ছন্ন থাকে, উত্তরেও সেই গুণদোষগুলি পরিস্ফুট ভাব ধারণ করে। অনেকে মনে করিতে পারেন যে, প্রশ্নের মধ্যে আবার গুণদোষ কি ? প্রশ্ন ত সংশয় মাত্র। কিন্তু এইমাত্র আমরা জ্ঞানবিকাশপদ্ধতির সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে এ সব কথা পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। আমরা ইতিপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, আমরা সম্পূর্ণ অজ্ঞান হইতে জ্ঞান লাভ করি না, কিন্তু অল্পজ্ঞানের সাহায্যে অধিকতর জ্ঞান আয়ত্ত করিয়া থাকি। সেজন্য যখন আমরা কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করি, তখন এক হিসাবে যদিও আমরা অজ্ঞতার পরিচয় দিই, তথাপি অন্য দিক্ দিয়া দেখিলে বুঝা যায়, প্রশ্ন কেবল প্রশ্নকর্ত্তার জ্ঞানেরই সূচনা করে। যেখানে জ্ঞান নাই, সেখানে প্রশ্নও নাই ; জ্ঞানহীনের আবার প্রশ্ন কি ? যে কিছুই জানে না, সে প্রশ্ন করিতেও জানে না। অতএব ইহা

সহজেই বুঝা যায় যে, পূর্ব্বে কতকটা জ্ঞান আছে, ইহা স্বীকার না করিলে প্রশ্নের অস্তিত্বই অসম্ভব হইয়া উঠে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে প্রশ্নকর্ত্তার পূর্ব্বজাত জ্ঞান যে দোষগুণ সম্পন্ন হইবে, তাহার প্রশ্নও সেই দোষগুণ-সম্পন্ন হইতে বাধ্য। প্রত্যেক প্রশ্নের মধ্যে ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত কতকগুলি ধারণা লুক্কায়িত থাকে। যেমন যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে, অমুক ঘটনার কারণ কি, তাহা হইলে তাহার প্রশ্নের মূলে এই ধারণা বিদ্যমান যে, ঘটনামাত্রেরই কারণ থাকিবে। এ ক্ষেত্রে ধারণা ঠিক। কিন্তু যদি কোনও বালককে বুঝান যায় যে, ঈশ্বর জগতের কারণ, আর সে যদি তখন প্রশ্ন করে যে, ঈশ্বরের কারণ কি, তাহা হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, তাহার ধারণা এই যে, সকল পদার্থেরই যখন কারণ আছে, তখন ঈশ্বরেরও কারণ থাকিবে। বলা বাহুল্য, এখানে প্রশ্নকর্ত্তার ধারণা ভ্রান্ত, অতএব তাহার প্রশ্নও অসঙ্গত ; এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের প্রশ্নের মধ্যে সাধারণতঃ কত শত অসঙ্গত ও অযৌক্তিক ধারণা লুক্কায়িত থাকে।

কিন্তু অধিকাংশ স্থলে প্রশ্নকর্ত্তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই ঐ সকল ভ্রান্ত ধারণা প্রশ্নের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে এবং অপরেও তাহা প্রশ্ন হইতে সহজে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। কারণ, প্রশ্নে সেগুলি সূক্ষ্ম বীজাকারে বর্ত্তমান থাকে। সেজন্য অনেক সময়ে উত্তর দেখিয়া প্রশ্নের প্রকৃতি বা প্রশ্নের মধ্যে কি ধারণা নিহিত ছিল, তাহা স্থির করিতে হয়, কারণ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, উত্তর প্রশ্নেরই পরিণতি মাত্র।

এইরূপে থেলসের সিদ্ধান্ত পরীক্ষা করিলে আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই যে, থেলসের মনে যে প্রশ্ন উদিত হইয়াছিল, তাহার গভীরতা কতদূর। যে মীমাংসায় তাহার জিজ্ঞাসা নিবৃত্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে তাহার প্রশ্নের যথার্থ মর্ম্ম অবগত হইতে পারা যায়। তিনি যখন প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, এই দৃশ্যমান জগতের কারণ কি, তখন সেই প্রশ্নের মূল তাৎপর্য্য ইহাই ছিল বুঝিতে হইবে যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূতসমূহের মধ্যে কোন বিশেষ ভূতটী পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান ছিল, যাহা রূপান্তরিত হইয়া পরবর্ত্তী কালে এই বৈচিত্র্যময় জগৎরূপে প্রকাশ পাইতেছে এবং তিনি যথাজ্ঞান এ প্রশ্নের উত্তরও দিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী দুইজন দার্শনিক ঐ একই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া, একই রকম প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তবে তাঁহারা থেলসের মীমাংসায় সন্তুষ্ট না হইয়া ভিন্ন মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের একজনের মতে

জগতের আদি কারণ জল নহে, কোন নির্ব্বিশেষ পদার্থ মাত্র। আর একজন বলিলেন, বায়ুই আদি কারণ, জলও নহে বা কোনও নির্ব্বিশেষ বস্তুও নহে।

পাইথাগোরাস্ (Pythagoras) হইতে প্রশ্নের মূলগত ধারণা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত হইল। আমরা যাহাকে উপাদান বা সমবায়ী কারণ (material cause) বলি, থেলস্‌প্রমুখ দার্শনিকগণ জগতের সেই ধরণের একটা কারণের সন্ধানে ছিলেন। পাইথাগোরাস্ দেখিলেন, কোনও বস্তু নির্ম্মাণের জন্য উপাদানই একমাত্র আবশ্যকায় পদার্থ নয়, উপাদানবস্তুর সমাবেশ সংস্থানও দরকার। এইরূপ ভাবের কারণকে আমাদের ভাষায় বলা হয়, অসমবায়ী কারণ। দ্রব্যসমূহের উপাদান সমাবেশ সংখ্যার দ্বারাই নিরূপিত হইয়া থাকে। কতকটা এইরূপ ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হইয়া পাইথাগোরাস্ বলিলেন, সংখ্যাই জগতের মূল। পাইথাগোরাস্ সম্বন্ধে আমাদের মতে ইহাই মনে রাখা দরকার যে, তাঁহার কারণতত্ত্ববিষয়ে কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না।

থেলসের প্রশ্নে আরও কতকগুলি ধারণা বিনা বিচারে মানিয়া লওয়া হইয়াছিল। থেলস্ ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, জগৎ পরিবর্ত্তনশীল, তাহা না হইলে জগতের কারণ কি, এ প্রশ্নের কোন সার্থকতা থাকিত না। কারণ, যেখানে পরিবর্ত্তন নাই, সেখানে কার্য্যকারণসম্বন্ধও নাই। অতএব জগৎ পরিবর্ত্তনশীল কি না, তাহার বিচার আবশ্যক। ইলিয়্যাটিকগণ বলিলেন, পরিবর্ত্তন মিথ্যা; সত্ত্বা এক, অপরিবর্ত্তনীয়। হেরাক্লাইটাস্ (Heraclitus) বলিলেন, পরিবর্ত্তনই একমাত্র সত্য, আর এক নিত্য সত্ত্বা কেবল কথার কথা মাত্র।

কিন্তু থেলসের দর্শনে আরও গোলোযোগ ছিল; তাঁহার এরূপ মনে করিবার কোন কারণ ছিল না যে, কেন একটী মাত্র আদিভূতই জগৎ রচনার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। অনেক আদিভূত স্বীকার না করিব কেন? এম্পিডক্লিস্ (Empedocles) বলিলেন, চরম ভূত চারি প্রকার। পরমাণু-বাদিগণ স্থির করিল, অসংখ্য পরমাণুই জগতের কারণ। কিন্তু শক্তি নহিলে উপাদানসমূহ বিশেষ বিশেষ ভাবে গঠিত হয় কি প্রকারে? তাই শেষোক্ত মতদ্বয়ে শক্তির অস্তিত্বও স্বীকৃত হইল। এইখানে থেলসের প্রশ্নসমূহের মূলীভূত ধারণাগুলির সম্যক্ বিচার শেষ হইল এবং সেই সঙ্গে গ্রীক্ দর্শনের প্রথম যুগের অবসান হইল।

গ্রীকদর্শনের মধ্যযুগের আরম্ভ।

ইতিহাসের দিক্ হইতে আলোচনা করিলে এই গ্রীকদর্শনের অভিব্যক্তির ভিতর হইতে আমরা একটী সুন্দর রহস্য আবিষ্কার করিতে পারি। এ যাবৎ বর্ণিত দর্শনসমূহ, যদিও গ্রীকদর্শন বলিয়া পরিচিত, তথাপি গ্রীস্ নামক ভূখণ্ডে এখনও পর্য্যন্ত কোনও দর্শন আবির্ভূত হয় নাই। যে সকল দর্শনের বিবরণ আমরা এ অবধি দিয়া আসিয়াছি, তাহাদের মধ্যে সবগুলিরই জন্মস্থান গ্রীক উপনিবেশে; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দর্শনসমূহে খাঁটি গ্রীকভাব না থাকারই কথা। কারণ, উপনিবেশ ও মাতৃভূমির মধ্যে সহস্র যোগ সত্ত্বেও নানা কারণে উভয়ের মধ্যে রীতি নীতি, আচার ব্যবহারের পার্থক্য অনিবার্য্য হইয়া উঠে। তাহা হইতে ক্রমে প্রকৃতিগত পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। তাহা ছাড়া গ্রীক ঔপনিবেশিকগণ প্রধানতঃ বাণিজ্যজীবী ছিলেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে বহু বিভিন্ন জাতির সংশ্রবে আসিতে হইত, তদ্বারা তাঁহাদের দর্শনে বৈদেশিক ভাবের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ইলিয়্যাটিক্ দর্শন গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই মত ও ভারতীয় বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত ও বিচারপ্রণালীর মধ্যে এমন অদ্ভুত ঐক্য দেখা যায় যে, ইলিয়্যাটিক্ দর্শন বেদান্তদর্শনের নিকট একেবারেই ঋণী নয়, অপক্ষপাতী লোকমাত্রেরই ইহা স্বীকার করিতে কেমন একটা স্বাভাবিক অপ্রবৃত্তি হয়। কিন্তু ঔপনিবেশিক গ্রীকদর্শন কি পরিমাণে খাঁটি গ্রীক ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়াছিল, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে গ্রীক ইতিহাসের কতকটা জ্ঞান থাকা আবশ্যক এবং গ্রীক ইতিহাস না জানিলে গ্রীসদেশে কেন এ পর্য্যন্ত কোন দর্শন উদ্ভূত হয় নাই, তাহাও জানা যায় না। অতএব এইবার আমরা গ্রীকজাতি ও গ্রীসদেশের বিষয় সংক্ষেপে দুচারিটী কথা বলিয়া লইব।

গ্রীসদেশ ও গ্রীকজাতি।

দার্শনিক চিন্তাবিকাশের অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থাসমূহ কখন কি ভাবে গ্রীসে প্রকাশ পাইয়াছিল, আমরা প্রধানতঃ গ্রীক ইতিহাসের সেই দিক্‌টার উপর লক্ষ্য রাখিব। কিন্তু তাহা হইলে প্রথমে জানা উচিত যে, দেশের এবং জাতির কিরূপ অবস্থা দার্শনিক চিন্তার উৎপত্তি ও পুষ্টিসাধনের উপযোগী। আমরা এই ইউরোপীয় দর্শন বিষয়ক প্রস্তাবের উপক্রমণিকায়

আভাসে উল্লেখ করিয়াছি যে, যে কোনওরূপ চিন্তার জন্য অবসর আবশ্যক, বিশেষতঃ দার্শনিক চিন্তার জন্য ত বটেই। কাজেই যখন জীবনসংগ্রামেই সমস্ত মন ও সমস্ত শক্তি নিযুক্ত রাখিতে হয়, তখন দার্শনিক চিন্তার অবসর থাকে না। আবার জীবনসংগ্রামের কঠোরতা অনুভব না করিলেও জীবনব্যাপারের গুরুত্ব আদৌ হৃদয়ঙ্গম হয় না, সুতরাং তজ্জন্য মস্তিষ্কচালনার কোন প্রয়োজন বোধ হয় না। তাহা হইলে বুঝা যাইতেছে যে, বহু বাত্যাঝঞ্ঝায় প্রপীড়িত হইবার পর মানুষ যখন জীবনসমুদ্রের কূল পায়, তখনি তাহার মন স্বতঃই নানা তত্ত্বচিন্তায় উদ্যত হয়।

গ্রীসদেশে এই তত্ত্বচিন্তার উপযুক্ত অবসর এতদিন ঘটিয়া উঠে নাই। গ্রীকজাতির রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ জগতের ইতিহাসে চির-প্রসিদ্ধ। এ স্বাধীনতার প্রতি অনুরাগ যদিও তাহাদের জাতীয় জীবনের প্রারম্ভ হইতে বর্ত্তমান ছিল, তথাপি অত্যাচারী রাজা বা অভিজাতবর্গের হাত হইতে আপনাদিগের স্বাধীনতা রত্ন উদ্ধার চেষ্টায় অনেক সময় ও উদ্যম ব্যয়িত হইয়াছিল। ইহার উপর পারস্যাধিপতির গ্রীস্ আক্রমণ ও গ্রীকগণের জাতীয় জীবনকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল। এইরূপে আপনার অস্তিত্বরক্ষার জন্য যখন গ্রীকজাতি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সেখানে দর্শন উৎপত্তির অবসর কোথায়? জীবনই যখন সঙ্কটাপন্ন, তখন তাহা কোনও রূপে বজায় রাখিতে না পারিলে, তাহার প্রকৃতির বিষয় অনুসন্ধান কিরূপেই বা চলিবে, কেই বা চালাইবে এবং যে কোন রকমে প্রাণধারণ করিতে পারিলেই গ্রীকগণ সন্তুষ্ট থাকিত না। পরাধীন জীবনের ভার বহিবার উপযোগী সহিষ্ণুতা তাহাদের প্রকৃতিতে একেবারেই ছিল না। তাই তাহারা আপনাদিগের স্বাধীনতারক্ষাই প্রকৃত আত্মার রক্ষা বলিয়া মনে করিত। সেই চিরবাঞ্ছিত স্বাধীনতা ধন যখন তাহাদের করায়ত্ত হইল, তখনই কেবল তাহারা অন্যদিকে মনোনিবেশ করিতে পারিয়াছিল এবং তখনই তাহাদের নিজের দেশে নিজের দর্শনের উৎপত্তি হইল। কিন্তু তাহাদের সকল কার্য্যেই যেমন প্রবল স্বাধীনতাপ্রিয়তার চিহ্ন দেখা যাইত, তাহাদের দর্শনেও সেই সর্ব্বগ্রাসী স্বাধীনতাপ্রিয়তার প্রভাব লক্ষিত হইল। এই দর্শনকার অ্যান্যাক্স্যাগোরাস্ (Anaxagoras)।

অ্যান্যাক্স্যাগোরাস্ (Anaxagoras) গ্রীস্‌দেশে সর্ব্বপ্রথম এই তত্ত্বপ্রচার

করিলেন যে, জগদ্ব্যাপার এক চেতন শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। * এইরূপে তিনিই প্রথম গ্রীস্‌ভূমিতে চৈতন্যের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিলেন এবং জড়ের উপর চৈতন্যের আধিপত্য স্থাপনা করিয়া মানবকে তাহার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহাই সর্ব্বপ্রথম খাঁটি গ্রীকভাবাপন্ন ও স্বাধীনতাপ্রিয় গ্রীকপ্রকৃতির অনুযায়ী দর্শন। ইঁহার সহিত তুলনা করিয়া অ্যারিষ্টট্‌ল্‌ (Aristotle) পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণকে 'স্বপ্নাবিষ্ট' (dreamers) এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন এবং অ্যান্যাক্স্যাগোরাসকে 'প্রবুদ্ধ' (Awake) এই সম্মানজনক অভিধানে অভিহিত করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে,অ্যান্যাক্স্যাগোরাস্‌ই প্রথম জড় ও চেতনের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করেন; পূর্ব্ব দার্শনিকগণের নিকট এই পার্থক্য সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল। এখন হইতেই প্রকৃত দর্শনের সূত্রপাত হইল ধরিতে হইবে। কারণ, পূর্ব্ববর্ণিত দর্শনসমূহ এই পরিদৃশ্যমান জগতের একরূপ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যামাত্র। কিন্তু অ্যান্যাক্স্যাগোরাস্‌ও যে এই দোষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না, তাহা আমরা শীঘ্রই দেখিতে পাইব। কিন্তু দর্শনের ইতিহাসে ইহা অতি সাধারণ ঘটনা যে, কোনও নূতন তত্ত্বের আবিষ্কারক সেই তত্ত্বকে সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারেন না অথবা

* Stirling সাহেব Gifford Lecturesএ ভাবের ঝোঁকে বলিয়া ফেলিয়াছেন যে, জগতে বোধ হয় Anaxagorasই সর্ব্বপ্রথম চৈতন্যের জগন্নিয়ন্তৃত্ব প্রচার করেন। কিন্তু কেন যে এই 'বোধ হয়' তাহা বিচারপূর্ব্বক স্থির করাও বোধ হয় পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার বলিয়া মনে হইতে পারে, এই ভয়েই সম্ভবতঃ সাহেব নিজের মতের স্বপক্ষে কোনও যুক্তি দেখান নাই। সাহেব বলিতেছেন, "There can be no doubt that, whatever others may seem to have said in the same direction, it was Anaxagoras who for the first time in Greece, perhaps in the world, spoke of the beauty and order in the universe being due to a designing mind." কিন্তু আমাদের ন্যায়দর্শনের কথা বাদ দিলেও কেবল উপনিষদ্‌ হইতে অনেক বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান যায়, ভারতে কত প্রাচীন কালে Anaxagoras প্রচারিত তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে জানা ছিল। বেদান্ত সূত্রে 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্‌' (১।১।৫) এই সূত্রের ভাষ্যধৃত 'সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ * * * তদৈক্ষত বহুস্যাং' ইত্যাদি বহু বচন উপনিষদ্‌ পাঠকমাত্রেরই কণ্ঠস্থ আছে। এরূপ অকাট্য প্রমাণের উত্তরে যদি কোনও ভারতবন্ধু বিদেশী প্রত্নতাত্ত্বিক বা তাঁহার দেশী চেলাগণ বলেন যে, উক্ত উপনিষদ্‌ অতি আধুনিক অথবা ঐ বচনগুলি প্রক্ষিপ্ত, তাহা হইলে আমরা সসম্ভ্রমে ও সত্রাসে বিতর্ক হইতে নিরস্ত রহিব বলিয়া তাঁহাদের নিকট প্রতিশ্রুত রহিতেছি।

পূর্ব্ববর্ত্তী দর্শনকারগণের ত্রুটীসমূহ হইতে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত রাখিতে প্যারেন না। যেহেতু তাঁহাকে পূর্ব্বমতবাদসমূহের উপর আপনার মত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, সেই হেতু তাহাদের অসম্পূর্ণতাসকল তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হয় না।

ক্রমশঃ।

৺রামেশ্বর।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মল্লিক।

পরদিন প্রাতে আমরা ২০।২৫ জন যাত্রী একত্র হইয়া ধনুস্তীর্থ দেখিবার জন্য বাসা হইতে বাহির হইয়া, এক মাইল দূরে সমুদ্রোপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে একখানি নৌকা বা মেচুয়া ভাড়া করিয়া ১৪।১৫ মাইল দূরে রামেশ্বর দ্বীপের শেষ সীমায় ধনুস্তীর্থে যাত্রা করিলাম। রামেশ্বর মন্দির হইতে ধনুস্তীর্থ পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইবারও রাস্তা আছে কিন্তু তাহাতে দুইদিন সময় লাগে। পথে জটায়ুতীর্থের নিকট একটী ধরমশালা আছে। হাঁটাপথে যাইলে অগস্ত্যতীর্থ, জটায়ুতীর্থ প্রভৃতি কয়েকটী তীর্থ দর্শন হয়, নৌকাযোগে যাইলে তাহা আর হয় না। এখানকার নৌকাসকল সমুদ্রের কিনারায় কিনারায় যে দিকেই বাতাস থাকুক না কেন, একখানি পালের সাহায্যে খুব দ্রুতবেগে গমনাগমন করে। আমরা নৌকা হইতে সমুদ্রজলের স্বচ্ছতা হেতু সমুদ্রের তলদেশ পর্য্যন্ত দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলাম। সমুদ্র-তলে স্থানে স্থানে বড় বড় পাথর পড়িয়া রহিয়াছে এবং মাছ সকল খেলা করিতেছে। মধ্যে মধ্যে এক একটী উড্ডীয়মান মৎস্য (flying fish) জল হইতে উঠিয়া শূন্যমার্গে ২।৩ রশি পথ গিয়া পুনরায় জলে পড়িতেছে। এই সকল দেখিতে দেখিতে তিন ঘণ্টা বাদে আমরা ধনুস্তীর্থ বা ধনুষ্কোটি তীর্থে উপস্থিত হইলাম। এখানে ৪।৫ ঘর পাণ্ডা খড়ো ঘর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন। আমরা ঐ পাণ্ডাদের সাহায্যে এই স্থানে সোনা রূপার তীর ধনুক দিয়া সমুদ্রের পূজাদি করিলাম। যাত্রীদিগকে এই স্থানে স্নান, দান ও শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়।

এই স্থানের মাহাত্ম্যপ্রচারসম্বন্ধে পাণ্ডাদের মুখে দুইটী মত শুনিলাম—

(১) শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে করিতে এই পর্য্যন্ত আসিলে, সমুদ্র আর কিছুতেই সেতুনির্ম্মাণকার্য্য অগ্রসর হইতে দিতেছিল না। বানরগণ যতই পাথরাদি ফেলিয়া সেতু বাঁধিতে চেষ্টা করিতে লাগিল, সমুদ্র সে সমুদায় ভাঙ্গিয়া দিতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রের এই অত্যাচার দেখিয়া ধনুকে বাণ যোজনা করিয়া সমুদ্রকে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলে সমুদ্র ভয়ে অর্ঘ্য হস্তে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং 'সেতু-নির্ম্মাণে আর ব্যাঘ্যাত করিব না' বলিয়া তাঁহার ক্রোধ শান্তি করিলেন। এই কারণ এই স্থানের নাম ধনুস্তীর্থ হইয়াছে। (২) শ্রীরামচন্দ্র সেতুবন্ধন করিয়া লঙ্কায় গমন এবং তথায় রাবণ বধ ও সীতা উদ্ধার করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন কালে সমুদ্র এই সেতু নিজ বক্ষের উপর থাকিলে আপামর সকলেই পরপারে যাইতে পারিবে, এজন্য দুঃখিত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে এই সেতু ভঙ্গ করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। শ্রীরামচন্দ্র সমুদ্রকে এ বিষয়ের জন্য দুঃখিত দেখিয়া নিজ ধনুর্ব্বাণের দ্বারায় সেতুর এই স্থান ভগ্ন করিয়া সমুদ্রের মর্য্যাদা রক্ষা করেন। এজন্য ইহার ধনুস্তীর্থ বা ধনুষ্কোটি নাম হইয়াছে।

ধনুস্তীর্থ হইতে ২।৩ মাইল দূরে মান্নার দ্বীপ বা সেতুর অপর অংশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেতুর এই ভগ্ন স্থান টুকু জলমগ্ন বটে; কিন্তু এখানে খুব বেশী জল নাই। ইহার মধ্য দিয়া নৌকা ভিন্ন জাহাজাদি যাইতে পারে না। এ স্থানের দৃশ্য বেশ রমণীয়। বামদিকে শান্তমূর্ত্তি বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণ-দিকে প্রবল তরঙ্গায়িত ভারত মহাসাগর। উভয় দিকের সমুদ্র এই ধনুস্তীর্থে পরস্পর মিলিত হইয়া উগ্র ও শান্ত ভাবের যেন একত্র সমবায় হইয়াছে দেখা যায়। আমরা ধনুস্তীর্থ দেখিয়া পুনরায় নৌকাযোগে রামেশ্বরে বৈকাল বেলায় ফিরিয়া আসিলাম। রামেশ্বরের নিকট সমুদ্রে মুক্তা জন্মে। এই সমুদ্রে মুক্তা বা জোঙ্গড়া তুলিতে ব্যস্ত ডুবুরিদের অনেক নৌকা দেখিতে পাওয়া যায়। চৈত্র বৈশাখ ও ভাদ্র আশ্বিন জোঙ্গড়া তুলিবার কাল। ঐ সময় প্রায় এক শত নৌকা সমুদ্রমধ্যে নঙ্গর ফেলিয়া অবস্থান করে। ডুবুরিদের পৃষ্ঠে দীর্ঘে অর্দ্ধ হাত ও প্রস্থে এক পোয়া পাথর বাঁধা। হাতে চামড়া জড়ান ও অস্ত্র। গলায় জালের থলি ও তাহাতে দীর্ঘ রশি লাগান এবং পায়ের তলে একখান বড় পাথর। পৃষ্ঠের পাথরের বলে তরঙ্গে ভাসিয়া যায় না ও চল্লিশ হাত জলের নীচে হাঁটিয়া বেড়ায়। হাতে চামড়ার জন্য জোঙ্গড়া তুলিতে কষ্ট পায় না এবং গলার থলিতে প্রায় ৫০০ করিয়া জোঙ্গড়া তুলিয়া

আনে। প্রায় আধঘণ্টা থাকিয়া নিশ্বাস ফেলিবার প্রয়োজন বুঝিলে ডুবুরি নিজ গলার রশিতে টান দেয় এবং নৌকার লোকে তাহাকে টানিয়া উঠায়। সেজন্য গলার রশির এক প্রান্ত নৌকার লোকের হাতে থাকে। পদতলের প্রস্তরের ঝোঁকে শীঘ্র জলের নিম্নে গিয়া পহুঁছে। সাগরের জল স্বচ্ছ ও পরিষ্কৃত, সেজন্য সাগরতলে অবস্থিত সকল পদার্থ ডুবুরীরা নিম্নে গিয়া সুন্দর দেখিতে পায়। হাঙ্গরে আক্রমণ করিলে ডুবুরীরা জল ঘোলা করিয়া রক্ষা পায় অথবা অস্ত্র দ্বারা তাহাকে বধ করে। সময়ে সময়ে গবর্ণমেণ্ট ঝিনুকের হাজার, ত্রিশ টাকা দরে বিক্রয় করেন। কাহারও অদৃষ্টে উত্তম মুক্তা বাহির হয়, কেহবা কিছুই পায় না।

পরদিন প্রাতে আমরা পাণ্ডার সহিত চব্বিশ তীর্থে স্নান করিতে গমন করিলাম। প্রথমে রামেশ্বরের মন্দিরে গিয়া উক্ত মন্দিরমধ্যস্থ পুষ্করিণী, কুণ্ড ও কয়েকটী কূপে স্নান করতঃ মন্দির হইতে অৰ্দ্ধ মাইল দূরে সমুদ্র-কূলে গমন করিলাম। এই স্থানে ২।৩টী মঠ বা মন্দির আছে। আমরা এই সকল দেখিয়া এবং এইখানে সমুদ্রে ও পার্শ্ববর্ত্তী দুই তিনটী কুণ্ড বা কূপে স্নান করিয়া চব্বিশ তীর্থ-স্নান শেষ করিলাম ও বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। পাণ্ডারা এখন এইরূপে সংক্ষেপে এক স্থানেই চব্বিশ তীর্থ নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, কিন্তু উক্ত চব্বিশ তীর্থ বাস্তবিক ভারত হইতে লঙ্কা পর্য্যন্ত সেতুর চব্বিশটি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত। যথা :—ভারতে সংলগ্ন সেতুপ্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথমে চক্রতীর্থ, এই স্থানে ধৰ্ম্ম পুষ্করিণী, দেবীপট্টন ও নবপাষাণ স্থান। ইহাই সেতুমূল। ইহার পশ্চিমেই রামের দর্ভশয্যা স্থান। চক্রতীর্থের দক্ষিণে গন্ধমাদন, উত্তরে বৈতাল বা বরদ তীর্থ। গন্ধমাদন সমস্ত সেতু আচ্ছন্ন করিয়া আছে বলিয়া প্রথিত। ইহার উপর পাপবিনাশাখ্য সীতাসর, মঙ্গল, অমৃতকূপ, ব্রহ্মকুণ্ড, হনুমৎকুণ্ড, অগস্ত্যতীর্থ, রামকুণ্ড, লক্ষ্মণ, জটা, লক্ষ্মী, অগ্নি, চক্র, শিব, শঙ্খ, যমুনা, গঙ্গা, গয়া, কোটি, সাধ্যামৃত, মানস ও ধনুষ্কোটি অবশিষ্ট এই ২২ তীর্থ পরে পরে আছে।

পর দিবস শিবরাত্র ব্রত। আমরা রাত্রজাগরণ ও রামেশ্বরের পূজা করিবার জন্য উপবাসী রহিলাম। আমি ইতিপূৰ্ব্বে গঙ্গোত্রি গিয়াছিলাম এবং তথা হইতে গঙ্গোত্রির জল টিনের কুপার মধ্যে আনিয়াছিলাম উহা আমার সঙ্গেই ছিল। অদ্য রামেশ্বর মহাদেবের মস্তকে উক্ত জল

চড়াইতে হইবে, এজন্য বৈকালে পাণ্ডার বাটীতে গমন করিলাম। এখানে অনেক যাত্রী পাণ্ডার নিকট হইতে গঙ্গোত্রির জল রামেশ্বরকে দিবার জন্য খরিদ করিতেছে। দেখিলাম, এখানে গঙ্গোত্রি জলের ১৵০ হিঃ তোলা বিক্রয় হইতেছে। পাণ্ডা আমাকে গঙ্গোত্রি জল লইবার কথা বলায় আমি সেই টিনের কুপা ভরা গঙ্গোত্রির জল বাহির করিলাম। পাণ্ডা টিনের কুপায় জল রহিয়াছে দেখিয়া বলিলেন যে, টিনের কুপা রামেশ্বরের গৃহে যাইবে না; এ কারণ, আমি পাণ্ডার নিকট হইতে একটী তামার কুপা চাহিয়া লইয়া তাহাতে উক্ত জল ভরিয়া লইলাম। আমরা ৩।৪ জন যাত্রী এইরূপে গঙ্গোত্রি জল লইয়া এবং বাজার হইতে পূজার অপরাপর দ্রব্যাদি খরিদ করিয়া পাণ্ডার সহিত মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। আমরা প্রথমেই মন্দিরমধ্যে রামনদপুরের রাজার কাচারী গৃহে উপস্থিত হইলাম এবং প্রত্যেকে ১৮০ হিসাবে জল চড়াইবার কর জমা দিয়া অনুমতি পত্র লিখাইয়া লইলাম। পরে সন্ধ্যার সময় সকলে গঙ্গোত্রি জল ও পূজোপকরণাদি লইয়া লোকের ভিড় ঠেলিয়া রামেশ্বরের গৃহের দ্বারে গিয়া পৌঁছিলাম। দ্বারদেশে রামেশ্বরের পূজারীরা আমাদের প্রত্যেকে জল চড়াইবার অনুমতি পত্র আনিয়াছি কি না দেখিয়া, গঙ্গোত্রির জল ও পূজোপকরণাদি এবং আমাদের নাম ও গোত্রাদি জানিয়া লইলেন। ঐ সকল দ্রব্যসম্ভার লইয়া পূজারী মহাদেবের পূজা করিলেন এবং আমাদের এক এক জনের নাম পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ করিয়া আমাদের প্রত্যেকের প্রদত্ত গঙ্গোত্রির জল রামেশ্বরের মস্তকে ঢালিতে লাগিলেন। শিবরাত্রে সমস্ত রাত মহাদেবের সোনার টোপ খোলা থাকে, এ কারণ, অদ্য রামেশ্বরের মূর্ত্তি বেশ দর্শন হইল। লিঙ্গটী কাল প্রস্তরের, উর্দ্ধে অর্দ্ধ হস্ত বা তিন পোয়া হইবে। পূজারিগণ মধ্যে মধ্যে কর্পূরের আরতি করিতেছিল। আরতির সময় লিঙ্গটি বেশ সুস্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল। মন্দিরমধ্যে যেরূপ অন্ধকার, তাহাতে আরতির সময় ভিন্ন রামেশ্বরজিকে ভালরূপ দেখা যায় না। পূজারীরা বলিয়া থাকেন—রামেশ্বরের মাথায় গঙ্গোত্রির জল ঢালিবার সময় লিঙ্গ ঈষৎ উচ্চ হয়; কিন্তু আমাদের অদৃষ্টে তাহা দেখিতে পাইলাম না। তবে রামেশ্বরের মাথায় একটী বড় ফুলের মালা জড়ান ছিল, জল চড়াইবার সময় ঐ মালা মাথা হইতে খুলিয়া কপালে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল; তাহাতেই লিঙ্গটীকে

পূর্ব্বাপেক্ষা একটু বড় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, এই মাত্র। রামেশ্বরের পূজা ও জল চড়াইবার জন্য আমরা প্রত্যেকে পূজারীকে চারি আনা হিসাবে দক্ষিণা দিলাম এবং সমস্ত রাত্র জাগিয়া কখন মন্দিরে, কখন বাসায় বসিয়া ভগবানের জপ ধ্যান করিতে লাগিলাম। মন্দিরে চারি প্রহরে চারিবার আরতি দর্শন করিলাম। আরতির সময় খুব ধুমধাম হয়। এখানে শিবরাত্রের মেলায় প্রায় ৫০ হাজার লোকের সমাগম দেখিলাম। পাণ্ডাদের মুখে শুনিলাম যে, কার্ত্তিক মাসে রামেশ্বরে এক মেলা হয়, তাহাতে প্রায় দুই লক্ষ স্থানীয় লোক সমবেত হয়। শিবরাত্রের মেলায় অধিকাংশ আর্য্যাবর্ত্তের লোকই গিয়া থাকে, স্থানীয় লোক সংখ্যায় খুব কম। পরদিন প্রাতে এখান হইতে বিদায় লইয়া গরুর গাড়ি করিয়া আমরা পাম্বান্ হইয়া পুনরায় মদুরা যাত্রা করিলাম।

শঙ্কর-প্রসঙ্গ।

পূর্ব প্রকাশিতের পর] [শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ।

এই বিশ্বাশঙ্কর মন্দিরটী যে কেবল শিল্পবিদ্যার নিদর্শন তাহা নহে। ইহার গঠনপ্রণালী অত্যাশ্চর্য্যকর। এক পক্ষে ইহা সাধারণ দেবমন্দির-তুল্য আবার অন্য পক্ষে যেন একটা মানমন্দিরবিশেষ। যেন নিবি[illegible] অ[illegible] তপস্যার মাস তিথি প্রভৃতি নির্ণয়ের জন্য ইহা নির্ম্মিত। কারণ, এই মন্দিরের নাটমন্দিরটী এমন ভাবে নির্ম্মিত যে, প্রতি মাসে প্রত্যহ প্রাতে এই নাটমন্দিরের ১২টী স্তম্ভের এক একটী মাত্র ক্রমান্বয়ে সূর্য্যালোকে আলোকিত হয়। সূর্য্যালোক মন্দিরের প্রবেশদ্বার দিয়া প্রবিষ্ট হইয়াই থাকে, অন্য কোন পথে ইহার প্রবেশোপায় নাই। যেমন একটী মাস অতীত হয় অমনি আর একটী স্তম্ভ আলোকিত হয়। কখন কোন মাসে ইহার কোনরূপ ব্যতিক্রম হয় না এবং এই নাটমন্দিরে ঐ বারটি ছাড়া আর অন্য স্তম্ভ নাই। মন্দিরগাত্রে, ভিতরে বাহিরে, যাবতায় দেবদেবীর লীলাসূচক

পাথরের খোদাই করা প্রতিমূর্ত্তি এমন ভাবে সাজান যে, দর্শকের নিকট ঐ সকলের নূতনত্ব কিছুকাল অপনীত হয় না।

যাহা হউক, এই প্রকার নানাকথা সংগ্রহ করিতে করিতে আহারার্থ নিজ বাসস্থানোদ্দেশে প্রস্থান করিলাম। শাস্ত্রীজীও পশ্চাতে পশ্চাতে আসিতে-ছিলেন। ক্রমে তাঁহাদের বাগানটী অতিক্রম করিয়া আবার তুঙ্গানদীর তীরে আসিলাম। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইহার তীরদেশ ছোট বড় নানাবিধ পাথরের নুড়ি দ্বারা আবৃত ; আমরা সেই নুড়ির উপর দিয়া সরু পথ ধরিয়া নদীর গর্ভে নামিলাম এবং সুপারি বৃক্ষের কাণ্ডনির্ম্মিত পুলের উপর দিয়া পরপারে আসিলাম। এপারে পাথরের বাধান ঘাট। সিঁড়িগুলি দেখিলে কাশীর ঘাটের কথা মনে পড়ে। কারণ, এখানে জল হইতে তীর খুব উচ্চ এবং ঘাটটীও খুব বিস্তৃত। বোধ হয়, সহস্রাধিক লোক এই ঘাটে একত্র হইলে সংকুলান হয়। এইখানে একটী ছোট ৬।৭ হাত উচু দুই বা আড়াই হাত লম্বা চওড়া নহবৎখানার মত একটী প্রস্তরের মন্দির ছিল। শাস্ত্রীজী উহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন যে, ইহার সম্বন্ধে শুনিবার কিছু আছে। মন্দিরটার মূর্ত্তি দেখিয়া আমার ওকথায় প্রথমতঃ বড় আগ্রহ হয় নাই। কিন্তু একটু পরেই ইহার গুরুত্ব বুঝিলাম। আচার্য্য শঙ্করের শৃঙ্গেরীতে মঠস্থাপনের যে উপলক্ষ হইয়াছিল, এই মন্দিরটা তাহারই স্মৃতি-চিহ্ন।

গল্পটী এই ঃ—

আচার্য্য শঙ্কর সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর কেরল হইতে ক্রমাগত উত্তরদিকে আসিতে আসিতে শৃঙ্গেরীর গহন অরণ্যমধ্যস্থলে আসিয়া উপস্থিত হন। এখানে তখন বহুদূর পর্য্যন্ত লোকজনের বসতি ছিল না। আচার্য্য পথ-শ্রান্ত, তুঙ্গানদীর নির্ম্মল জল পান করিয়া এই স্থানের নিকটে একটী বৃক্ষমূলে বিশ্রাম করিতেছিলেন। সময় দ্বিপ্রহর ও সূর্য্যের উত্তাপও তখন যার পর নাই প্রখর হইয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে এদিক্ ওদিকে দেখিতে দেখিতে হঠাৎ এই স্থানের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। দেখিলেন, যেন একটী বিশাল বিষধর নিজ ফণা বিস্তৃত করিয়া কতিপয় ভেককে সূর্য্যকিরণ হইতে রক্ষা করিতেছে। দৃশ্যটী দেখিবামাত্র তিনি ভাবিলেন, সর্পটী বুঝি ভেকগুলি ভক্ষণের কৌশল করিতেছে। পরে দেখিলেন যে, উহা তাহার ভক্ষণের কৌশল নহে, বস্তুতই সে তাহাদিগকে সূর্য্যের উত্তাপ হইতে ছায়াদান করিয়া রক্ষা

করিতেছে। আচার্য্য ইহা দেখিয়া যারপর নাই বিস্মিত হইয়া নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, যাহারা স্বভাবতঃ বৈরীভাবাপন্ন তাহারা এরূপ বিরুদ্ধ আচরণ করে কি কারণে? অতঃপর অনুমান করিলেন যে, নিশ্চয়ই এস্থানের কোন মাহাত্ম্য আছে, যে মাহাত্ম্যবলে ইহারা সে বৈরী-ভাব ত্যাগ করিয়াছে! এইরূপ অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি তথা হইতে উঠিলেন এবং অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু সে গভীর বনে কেহই নাই, কে তাঁহার জিজ্ঞাস্যের উত্তর দিবে? কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া একটী গোলাকার পর্ব্বত-শৃঙ্গ দেখিতে পাইলেন এবং বহুদূর দৃষ্টি করিবার বাসনায় তাহারই উপর আরোহণে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্রমে যখন ইহার শিরোপরি আসিলেন, দেখিলেন, একটী পর্ণকুটীরে একটী তপস্বী বাস করিতেছেন। বহুক্ষণ পরে এই নিবিড় অরণ্যে তপস্বীর দর্শনলাভ করিয়া তিনি যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন এবং অন্য কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া অগ্রেই তাঁহাকে সেই স্থানের মাহাত্ম্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তপস্বী, বালক শঙ্করের ঐরূপ রহস্যপূর্ণ প্রশ্ন শুনিয়া, আহ্লাদসহকারে সমস্ত কথাই বলিলেন। আচার্য্য তাঁহার কথায় বুঝিলেন, ইহা সেই বিভাণ্ডকের আশ্রম, এইখানেই মহর্ষি ঋষ্যশৃঙ্গ তপস্যা করিয়াছিলেন। কাজেই এখানে বৈরীভাব না থাকিবারই কথা। একদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, অপরদিকে ঐরূপ স্থান মাহাত্ম্য, এই উভয় চিন্তায় তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্য বিমুগ্ধ করিয়া রাখিল। অতঃপর তাঁহার মনে হইল, জগতে যদি কোথাও বাস করিতে হয় ত এইরূপ স্থলেই বাস করা উচিত। যদি কাহারো তপস্যার অনুকূল স্থান প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সে যেন এইরূপ স্থানেই অবস্থিতি করে। বালক শঙ্করের হৃদয়ে যে ভাব উদয় হইল, তাহারই ফলে পরে তিনি এখানে মঠস্থাপনা করেন। এই মঠই আজ আচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গেরী মঠ। ইহাই তাঁহার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত নিজ গৌরব অক্ষুণ্ণ রক্ষা করিয়া আসিতে সমর্থ হইয়াছে।

শৃঙ্গেরী মঠের ম্যানেজার শ্রীকণ্ঠ শাস্ত্রীর সহিত কথাবার্ত্তায় যাহা অবগত হইলাম, তাহার প্রধান কতিপয় বিষয়ের সার প্রদত্ত হইল। অতঃপর মঠের অন্যান্য পুরাতন কর্ম্মচারীগণের নিকট হইতে যাহা জ্ঞাত হইলাম, তাহাও উল্লেখযোগ্য বিবেচনা করি। আমি যাহাদিগের নিকট হইতে সংবাদ সংগ্রহ করি, তাহার মধ্যে যাহারা মঠের মিত্র, তাহাদিগের কথা ইতিপূর্ব্বে একপ্রকার

বলিয়াছি। এক্ষণে যাহারা মঠের প্রতি একটু ঈর্ষান্বিত, এস্থলে তাহাদেরই কথা কিঞ্চিৎ বলিব। দেখিলাম, মঠে একটী শ্রীবৈষ্ণব কর্ম্মচারী থাকেন, ইনি মধ্যে মধ্যে আমার তত্ত্বাবধারণে আসিতেছিলেন। আমি ভাবিলাম, রামানুজ সম্প্রদায় স্বভাবতঃই শঙ্কর সম্প্রদায়ের যখন বিরোধী, তখন ইঁহার নিকট হইতেই মঠাধিপতি শঙ্করাচার্য্যের আচারব্যবহার প্রভৃতি ব্যক্তিগত যাবতীয় বিষয় অবগত হওয়া উচিত। কারণ, ম্যানেজার শ্রীকণ্ঠ শাস্ত্রী প্রমুখ ব্যক্তিগণ মঠের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত বলিয়া হয়ত দোষগুলি ঢাকিয়া গুণগুলিই বলিবেন; এ ব্যক্তি তাহা না করিয়া, দোষগুণ উভয়েরই উল্লেখ করিতে পারেন। যাহা হউক, এই অনুমানের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত শ্রীবৈষ্ণব কর্ম্মচারিটীকে নিকটে আহ্বান করিয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, সত্যই ইনি মঠের প্রতি তাদৃশ শ্রদ্ধাবান্ নহেন, সত্যসত্যই ইনি উদরান্নের জন্য মঠে কর্ম্ম করিতেছেন মাত্র। কিন্তু ইঁহার মুখেও বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্যের যেরূপ চরিত-কথা শুনিলাম, তাহাতে এই বর্ত্তমান শঙ্করাচার্য্যের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা না উৎপন্ন হইয়া যায় না। শুনিলাম, আচার্য্য দিনান্তে একবারমাত্র আহার করেন। তাও আহার অন্য কিছু নহে—খই, দুধ ও কলা এবং কদাচিৎ ফল মূল উপকরণ মধ্যে মধ্যে গৃহীত হয়। তিনবার স্নান করেন। রাত্রে মাত্র ২।৩ ঘণ্টা নিদ্রা যান। শয্যা ইঁহার কাষ্ঠাসন ও মৃগচর্ম্ম মাত্র। খাট, গদি বা লেপ বস্ত্রাদি ব্যবহৃত হয় না। রাত্রি প্রায় ৩টার সময় শয্যাত্যাগ করিয়া শৌচাদি সমাপন করিয়া প্রথম স্নান করেন এবং তৎপরে ধ্যাননিমগ্ন অবস্থায় প্রভাত পর্য্যন্ত থাকেন। পরে নিজ বাসভবনে আচার্য্য শঙ্করের পিতলের যে বিগ্রহ আছেন এবং অন্যান্য দেবতার যে সমস্ত বিগ্রহাদি আছেন, তাঁহাদের পূজা করেন। তৎপরে কতিপয় ছাত্রকে বেদান্তাদিশাস্ত্র অধ্যাপনা করেন। এইরূপে প্রায় ৮টা ৯টা কাটিয়া যায়। ইহার পর যাহারা আচার্য্যের দর্শনার্থী, তাহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করেন এবং ম্যানেজারের সহিত মঠসংক্রান্ত কথাবার্ত্তা করিয়া থাকেন। পরে প্রায় ১২টার সময় পুনরায় স্নান করেন এবং পুনরায় পূজায় বসেন। এ সময় জপ কার্য্যই অধিক হয়। ২।৩ টার সময় দুধ, খৈ ও কলা আহার করেন এবং স্বেচ্ছামত পুস্তকাদি অধ্যয়ন করেন। মধ্যে মধ্যে মঠসংক্রান্ত বিষয়েও এ সময় আচার্য্যকে মনোনিবেশ করিতে হয়। পরে সন্ধ্যার সময় আবার স্নান ও ধ্যানযোগাদি সাধনে নিরত থাকেন। এইরূপে মধ্যরাত্রি

অতীত হইলে শয়নার্থ গমন করেন। আচার্য্যের বাটীটীও বেশ, ইহাতে এমন ভাবে ঘর দুয়ার আছে যে, তাঁহার আচারের কোন বিশেষ অসুবিধা হয় না। অবশ্য যাঁহার বৎসরে ১॥০ লক্ষ টাকা আয়, তাঁহার এরূপ বাসভবন না হইবেই বা কেন? আমার সংবাদদাতাকে অনেক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অনেক জিজ্ঞাসা করিলাম, দেখিলাম, আচার্য্যচরিতে মঠাধিপতি অনেকানেক মোহান্তগণের স্থায় দুরাচারের গন্ধ পর্য্যন্তও নাই। অতঃপর আরও কয়েক জন কর্ম্মচারীর সহিত আলাপ পরিচয় করিলাম এবং স্বামীজীর সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, দেখিলাম, সকলেই একরূপই বলিল, কাহারো নিকট কাহারো প্রতিবাদ শুনিলাম না।

মধ্যাহ্ন রৌদ্রের প্রখরতা কমিলে মঠের চারিদিক্ দেখিতে লাগিলাম। সঙ্গে ক্যামেরা ছিল, সুতরাং কয়েকখানি ফটোও তুলিলাম। অতঃপর বিভাণ্ডকের আশ্রমোদ্দেশে চলিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এটি একখানি নৈবিদ্যের আকৃতির মত প্রায় সহস্র হস্ত উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গ। ইহার চারিপার্শ্বে একটী প্রশস্ত পথ গোলাকারে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। ঐ পথের একদিকে সহরের একটী প্রান্ত, অপর দিক্‌টা একটু নিভৃত প্রদেশ। পথ হইতে একটী যথেষ্ট প্রশস্ত প্রস্তরনির্ম্মিত সিঁড়ি পর্ব্বতচূড়া পর্য্যন্ত গিয়াছে। যেখানে সিঁড়ি শেষ হইয়াছে, ঠিক সেইখানেই বিভাণ্ডকের আশ্রমের প্রাচীরের দ্বার এই স্থানটীতে উঠিলে শৃঙ্গেরীর চারিদিক্ বেশ দেখা যায়। মনে হয়, যেন ঠিক একখানি ছবি। পূর্ব্বে এ স্থানের বৃত্তান্ত যথাসাধ্য প্রদান করিয়াছি, সুতরাং এস্থলে আর পুনরুল্লেখ করিব না। যাহা হউক, এ স্থানের পূর্ব্ব কথা স্মরণ করিতে এবং লোকমুখে ইহার বৃত্তান্ত শুনিতে শুনিতে প্রায় দুই তিন ঘণ্টা কাল অতিবাহিত করিলাম। অদ্যাবধি এ স্থানের মাহাত্ম্য-স্মৃতি দেহ মনকে যেন পবিত্র করিয়া তুলে। আচার্য্য শঙ্কর ভ্রমণ করিতে করিতে এই স্থানে তুঙ্গানদীতটে সর্প ও ভেকের নির্ব্বৈর ভাব দেখিয়া যখন স্থানমাহাত্ম্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন এই আশ্রমের কোন মহাত্মা তাঁহাকে ইহার প্রাচীনত্ব ও মহত্ব কীর্ত্তন করেন। এ আশ্রমের অধিষ্ঠাতৃদেবতা দুর্গা। অদ্যাবধি আশ্রমমন্দিরে সেই আদ্যাশক্তিরই পূজা হইয়া থাকে। এখানেও একখানি ফটো লইলাম• এবং সন্ধ্যার প্রাক্কালেই বাসায় ফিরিলাম। পথে একটী বৃহৎ ধর্ম্মশালা দেখিলাম। শৃঙ্গেরী স্বামীর যত্নে এই ধর্ম্মশালাটী নির্ম্মিত এবং অতিথি অভ্যাগতকে এই ধর্ম্মশালায় স্থান দেওয়া হয়। আমি

যে সময় শৃঙ্গেরীতে, সে সময় সকলে প্লেগভয়ে নগর ছাড়িয়া পলায়ন করায় এ স্থানে কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না; শুনিলাম মাত্র, এ স্থানে প্রায়ই লোকসমাগম হইয়া থাকে। অনেকক্ষণ পরে কেবল মাত্র একটী দণ্ডী সন্ন্যাসীকে এই দিকে আসিতে দেখিলাম।

রাত্রে আমি আর কোথাও যাইলাম না। প্লেগের ভয়ে সময় সময় চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিতেছিল, সুতরাং কাগজ পত্র বাহির করিয়া যথাসাধ্য শ্রুত ও দৃষ্ট বিষয় লিপিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এজেণ্ট শ্রীকণ্ঠ শাস্ত্রী মহাশয় আমার জন্য যথেষ্ট সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। একটু পরেই পাচক ব্রাহ্মণ খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া আহারার্থ আহ্বান করিল এবং আমিও যৎকিঞ্চিৎ ভোজন করিয়া সমস্ত দিনের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য শয়ন করিলাম। পরন্তু এই স্থলেই শেষ হইল না। দেখি, একটু পরে একটী ভৃত্য আসিয়া আমার নিকট থাকিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল, প্রয়োজন—আমি একলা একটী বাটীতে থাকিব, যদি রাত্রে কোন আবশ্যক হয়। তাহার পর আর একটী কর্ম্মচারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশয়, কল্য পথে খাদ্যের অভাব বোধ করিতে পারেন, সুতরাং কিছু প্রসাদ দিব কি?" আমি ভাবিলাম, মন্দ কি? বাস্তবিকই পথে খাদ্যের অভাব অনুভূত হয়, যদি পাই ভালই সুতরাং আমি অসম্মতি প্রকাশ করিলাম না এবং কিয়ৎক্ষণ পরে প্রায় ১৬।১৭টী অতি উৎকৃষ্ট জগন্নাথের মুসৃজি নাড়ুর ন্যায় সুজীর লাড্ডু আসিয়া উপস্থিত হইল।

যে ভৃত্যটী রাত্রে আমার নিকট রহিল, তাহারই সঙ্গে পরদিন প্রভাতে ডাকের গাড়ির আড্ডায় যাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। কারণ, ডাক গাড়ি প্রায় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ছাড়ে। যাহা হউক, পরদিন প্রাতে যথাসময়ে আমরা সেই নির্জ্জন পুরীর মধ্য দিয়া ডাক গাড়ির আড্ডায় আসিলাম। দেখিলাম, এজেণ্ট শাস্ত্রীজী আমার জন্য পূর্ব্ব হইতেই গাড়িতে একটী স্থান ঠিক করিয়া রাখিবার আদেশ পাঠাইয়াছেন বলিয়া, ডাক গাড়িটা বাসা হইতে আমাকে তুলিয়া লইবার জন্য অন্য পথ দিয়া পূর্ব্বরাত্রে বাসার নিকট গিয়াছে। সেখানে আমাকে না পাইয়া এখনি ফিরিবে ভাবিয়া পথিমধ্যেই অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে গাড়ি ফিরিয়া আমাদের নিকট উপস্থিত হইল। আমি ভৃত্যটীকে কিঞ্চিৎ পুরস্কার দিয়া প্লেগভীতিপূর্ণ স্থান ত্যাগ করিয়া কিছু প্রকৃতিস্থ হইলাম। সহরের যতই প্রান্তে আসিতে লাগিলাম,

ততই শৃঙ্গেরীর পার্ব্বত্য শোভা আমার চিত্তহরণ করিতে লাগিল। নানাবিধ বৃক্ষলতাদিতে সজ্জিত হইয়া পর্ব্বতগাত্রের নানাস্থানে কত প্রকার অদৃষ্টপূর্ব্ব শোভা যে দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করিতে অক্ষম। কোথাও প্রভাতের রবিকিরণ পার্ব্বত্য ভূমির শৈত্য নাশ করায় ঈষদুষ্ণ শারদীয় প্রভাতের স্মৃতি জাগরূক করিয়া দিল, কোথায় বা ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ বৃক্ষগুল্মাদি লতাবিজড়িত হইয়া এমন নিবিড় নিকুঞ্জে পরিণত যে, সূর্য্যরশ্মি তথায় প্রবেশ করিতে না পারায় শীত ঋতুর স্মৃতি উদিত করিল। এই স্থলে শৃঙ্গেরীর রাজপথ পর্ব্বত ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এ স্থানটী এতই আমার চিত্তহরণ করিল যে, তাহার বর্ণনা আমার পক্ষে অসম্ভব। যাহা হউক, পুনর্ব্বার পূর্ব্ব পথে ক্রমে মধ্যাহ্নে কোপ্পা নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। মধ্যে ২।৩টী মাত্র গ্রাম একটু শ্রীসম্পন্ন দেখিলাম, নতুবা কেবল নিবিড় অরণ্যমধ্য দিয়াই আসিতে হইতেছিল। কোপ্পা নামক স্থানটীতে ডাকঘর, তারঘর, হাসপাতাল প্রভৃতি সবই আছে, এই স্থানে আমার গাড়ি বদলাইবার কথা। কারণ, ডাক গাড়ির ঠিকাদারের তখন এইরূপ ব্যবস্থা যে, শৃঙ্গেরী হইতে কোপ্পা পর্য্যন্ত একজনের ঠিকা এবং কোপ্পা হইতে টেরিকেরে নামক রেল ষ্টেসন পর্য্যন্ত আর একজনের ঠিকা লইতে হইবে।

কোপ্পায় আসিয়া আমাকে এক মহা অসুবিধা ভোগ করিতে হইল। দেখি, পরবর্ত্তী ঠিকাদার আমাদের আগমনের পূর্ব্বেই ডাক গাড়ির লোক সব ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং স্থানাভাব নিবন্ধন আর সে দিন আমার যাওয়া হইল না। অগত্যা পোষ্ট মাষ্টারের আশ্রয় ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইলাম। পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়ের আশ্বাসবাণী শুনিয়া আহারের চেষ্টায় যাইলাম। এবারও এক ব্রাহ্মণের বাটীতে ৵০ আনা দিয়া ডাল, ভাত ও এক তরকারীর সাহায্যে কোনমতে উদরপূর্ত্তি করিলাম। ব্রাহ্মণ আমাকে ব্রাহ্মণ নহি জানিয়া আমার জন্য পিঁয়াজের তরকারি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি "ব্রাহ্মণ পিঁয়াজ খায়" এই কথা জিজ্ঞাসা করায়, একটু লজ্জিত হইয়া অন্য তরকারি দিল। এই ব্রাহ্মণগণ অতি দরিদ্র ও নামে ব্রাহ্মণ বলিলেই চলে। আচারবিচার দেখিলে চিত্ত কুণ্ঠিত হয়।

যাহা হউক, অল্পক্ষণ পরে পোষ্ট আফিসে আসিলাম ও ক্রমে পোষ্ট মাষ্টারের সহিত কথাবার্ত্তায় সময় কাটাইতে লাগিলাম। কিন্তু এ দিন বিলাতি মেলের দিন বলিয়া পোষ্ট মাষ্টার কফি চাষের সাহেবদিগের স্তূপাকার ডাক

বিতরণে বড়ই বিব্রত ছিল। কাজেই আমি একাকীই ইতস্ততঃ ভ্রমণে বাহির হইবার সংকল্প করিয়াছি মাত্র, এমন সময় পোষ্ট মাষ্টারটী অপরাহ্নে এক সঙ্গে ভ্রমণের প্রস্তাব করিল। অগত্যা আমি তাহাতে সম্মত হইলাম ও অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

প্রায় ২।৩ ঘণ্টার পর পোষ্ট মাষ্টারটী নিষ্কৃতি পাইল এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া ভ্রমণে বহির্গত হইল। এই পোষ্ট মাষ্টারের সহিত আলাপ হওয়ায় আমি এদেশে শৈববৈষ্ণবের সম্বন্ধ বিষয়ে একটু জ্ঞানলাভ করিলাম। এ সম্বন্ধ এত অপ্রিয় ও অবাঞ্ছনীয় যে, তাহা আমি এক মুখে বলিয়া শেষ করিতে পারি না। দেশের বিশেষ বিশেষ স্থানে অত্যন্ত বিদ্বেষসম্পন্ন হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ যেরূপ, তদ্ভিন্ন এ সম্বন্ধ তুলনার অন্য স্থল আছে কি না, সহজে মনে পড়ে না। উভয়েই ব্রাহ্মণ, উভয়েই সদাচারসম্পন্ন, অথচ এক-জন স্মার্ত্ত যদি একজন মাধ্বমতাবলম্বী বৈষ্ণবের বাটীর প্রাঙ্গনদ্বারাভ্যন্তরে প্রবেশ করে, তবে বৈষ্ণবটী হাঁড়িকুড়ি ফেলে গোবর জল ছড়া দেয় ও বৃথা গালিবর্ষণ করিতে থাকে। পোষ্ট মাষ্টারটী মাধ্বমতাবলম্বী বৈষ্ণব কিন্তু তাহার একটী অধস্তন কর্ম্মচারী স্মার্ত্ত। আমি একটু পানীয় জলের জন্য কর্ম্মচারীটীকে নিকটস্থ পোষ্ট মাষ্টারের বাটী হইতে একটু জল আনিতে বলিলে অতি বিনীত ভাবে সে আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিল এবং কারণানুসন্ধানে উক্ত ভীষণ বিদ্বেষভাবের সব কথা বলিতে লাগিল। যাহা হউক, পথিমধ্যে পোষ্ট মাষ্টারটী আমার সঙ্গে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মতামতের কথায় প্রবৃত্ত হইল এবং নিজ সম্প্রদায়ের এমন অদ্ভুত ধারণার পরিচয় দিতে লাগিল যে, তাহা শুনিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া রহিলাম। হিন্দুর ভিতরে, বিশেষ ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে এরূপ তীব্র জাতিভেদ এরূপ তীব্র বিদ্বেষবহ্নি, তাহা ইতিপূর্ব্বে আমি দেখা দূরে যাউক, থাকা সম্ভব স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমি সাধ্যমত এই ভাবের বিরুদ্ধে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম কিন্তু আমার কথা বোধ হইল, যেন ভাসিয়া গেল।

সন্ধ্যার একটু পরে স্বস্থানে ফিরিলাম এবং রাত্রে পোষ্ট আফিসের একটী বৃহদায়তন সিন্ধুকের উপর শয়ন করিলাম। পরদিন আর ডাক গাড়িতে স্থানাভাব ঘটিল না, সুতরাং পরদিন সন্ধ্যাকালে "টেরিকেরে" নামক স্থানে আসিয়া পঁহুছিলাম। আমার এইরূপ কষ্ট দেখিয়া পোষ্ট মাষ্টারটী আমাকে এই উপদেশ দিলেন যে, এ পথে পথিকের পূর্ব্ব হইতে পত্রদ্বারা স্থানসংগ্রহ করাই প্রথা, সুতরাং ভবিষ্যতে যেন তাহাকে পত্র লেখা হয়।

যাহা হউক, এবার আর অন্য দিকে যাইবার বাসনা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। সোজা ব্যাঙ্গালোরেই ফিরিয়া আসিলাম এবং সেখানে রামকৃষ্ণসম্প্রদায়ের মঠে আশ্রয় লইয়া পথশ্রান্তি দূর করিয়া মাদ্রাজে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলাম। মাদ্রাজেও আমার আশ্রয় আর কিছু ছিল না, এখানেও সেই রামকৃষ্ণদেবসম্প্রদায়ের মঠ। উভয় মঠেই ২।৪ দিন থাকিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম। বস্তুতই এদেশে যদি রামকৃষ্ণদেবের মঠ না থাকিত, তাহা হইলে আমার ভাগ্যে যে কি ঘটিত, তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। ইঁহারা এইরূপ দেশে দেশে মঠ স্থাপন করিয়া যে কেবল তত্তদ্দেশে ধর্ম্মপ্রচার করিতে-ছেন, তাহা নহে, ইঁহাদের আশ্রমগুলি বাঙ্গালীর পরম পবিত্র আশ্রয়। ইঁহা-দের যত্ন, সৌজন্য, ইঁহাদের উদারতা, অমায়িকতা আমাকে বোধ হয় চিরকাল মুগ্ধ করিয়া রাখিবে।

আচার্য্য শঙ্কর, রামানুজ, মধ্ব, নিম্বার্ক ও বল্লভ, এই পাঁচ জন আচার্য্যের জীবনী প্রভৃতি অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া, এক শঙ্করাচার্য্যের বিষয় অনুসন্ধানই এত দুষ্কর বলিয়া বোধ হইল যে, অন্য চারি জনের দিকে এক্ষেত্রে মনোযোগ প্রদান অসাধ্য বোধ করিলাম। সুতরাং এ যাবৎ পাঠকবর্গকে কেবল আচার্য্য শঙ্করের কথাই নিবেদন করিয়া আসিতেছি। আজ ৪ বৎসর হইতে চলিল, এখনও অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। যদি তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে এ কার্য্যটী সম্পন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে ভারতের অন্য চারি জন আচার্য্যের কথা অনুসন্ধানের চেষ্টা করিব।

ভক্তিরহস্য।

[স্বামী বিবেকানন্দ।]

প্রথম অধ্যায়।

ভক্তির সাধন।

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥

অজ্ঞ ব্যক্তিগণের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের প্রতি যেরূপ প্রগাঢ় প্রীতি আছে, তোমাকে স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতে সেইরূপ প্রীতি যেন কখন দূর না হয়।

ভক্তির লক্ষণ।

বিষ্ণুপুরাণোক্ত প্রহ্লাদের এই উক্তিটীই ভক্তির সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংজ্ঞা বলিয়া আমাদের মনে হয়।

আমরা দেখিতে পাই, সাধারণ মানবগণের ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে—ধন, বেশভূষা, স্ত্রীপুত্র, বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য বিষয়ে—কি বিজাতীয় প্রীতি, কি ঘোর আসক্তি! তাই ভক্তরাজ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে বলিতেছেন, আমি কেবল তোমার প্রতি ঐরূপ প্রবল অনুরাগসম্পন্ন হইব, কেবল তোমাকে ঐরূপ প্রাণের সহিত ভালবাসিব, আর কাহাকেও নহে। এই প্রীতি, এই আসক্তি ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইলেই তাহাকে ভক্তি আখ্যা প্রদান করা হয়। ভক্তির আচার্য্যগণ আমাদের প্রবৃত্তিসমূহকে উচ্ছেদ করিতে বলেন না—তাঁহারা বলেন, আমাদের কোন প্রবৃত্তিই বৃথা নহে, বরং ঐগুলির সহায়তায়ই আমরা স্বাভাবিক উপায়ে মুক্তিলাভ করিয়া থাকি। ভক্তিসাধনে কোন প্রবৃত্তিকে জোর করিয়া চাপিয়া রাখিতে হয় না, উহাতে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে হয় না, উহা কেবল প্রবৃত্তির মোড় ফিরাইয়া উহাকে উচ্চতর পথে বেগে প্রধাবিত করিয়া দেয়।

প্রবৃত্তিসমূহের মোড় ফিরান অর্থাৎ ঈশ্বরাভিমুখী গতিই ভক্তি।

আমরা ত ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহকে স্বভাবতঃই ভালবাসিয়া থাকি, আর আমরা উহাদিগকে না ভালবাসিয়াও থাকিতে পারি না, কারণ, ওগুলি আমাদের নিকট একমাত্র পরম সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। আমরা সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে উচ্চতর বস্তুর সত্যতা বুঝিতে পারি না। ভক্তির আচার্য্যগণ বলেন, যখন মানব ইন্দ্রিয়াতীত—পঞ্চেন্দ্রিয়াবদ্ধ জগতের বহির্দ্দেশে অবস্থিত—সত্য বস্তু কিছু দেখিতে পাইবে, তখনও তাহার আসক্তিকে রাখিতে হইবে, কেবল উহাকে বিষয়ে আবদ্ধ না রাখিয়া সেই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে। আর পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়ে যে প্রীতি বা অনুরাগ ছিল, তাহা যখন ঈশ্বরের প্রতি প্রযুক্ত হয়, তাহাকেই ভক্তি বলে। রামানুজাচার্য্যের মতে এই প্রবল অনুরাগ বা ভক্তিলাভের জন্য নিম্নলিখিত সাধনপ্রণালী অর্থাৎ উপায়গুলির অনুষ্ঠান করিতে হয়।

প্রথমতঃ 'বিবেক'। এই 'বিবেক' সাধনটী, বিশেষতঃ পাশ্চাত্যদেশীয়গণের নিকট একটী অপূর্ব্ব জিনিষ। রামানুজের মতে ইহার অর্থ "খাদ্যাখাদ্যের বিচার।" যে সকল শক্তিতে দেহ ও মনের সমুদয় বিভিন্ন শক্তি

ভক্তির সাধন—
(১) বিবেক।

গঠিত হয়, খাদ্যের মধ্যে সেইগুলি বর্ত্তমান—আমি এক্ষণে যেরূপ শক্তির প্রকাশ করিতেছি, তাহার সমুদয়ই আমার ভুক্ত খাদ্যের মধ্যে ছিল—আমার দেহমনের ভিতর যাইয়া উহা অন্য আকারে পরিণত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু আমার ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের সহিত আমার দেহমনের স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। যেমন বহির্জ্জগতের জড় ও শক্তি আমাদের ভিতর দেহ ও মনের আকার ধারণ করে, তদ্রূপ স্বরূপতঃ দেহ, মন ও খাদ্যের মধ্যেও প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে। তাহাই যদি হইল, অর্থাৎ যদি আমাদের খাদ্যের জড়পরমাণুসমূহ হইতে আমরা চিন্তাশক্তির যন্ত্র প্রস্তুত করি, আর ঐ পরমাণুগুলির মধ্যবর্ত্তী সূক্ষ্মতর শক্তিসমূহ হইতে আমরা স্বয়ং চিন্তাকেই গঠন করি, তবে ইহাও স্বভাবতঃই প্রতীত হইবে যে, এই চিন্তাশক্তি ও চিন্তাশক্তির যন্ত্র উভয়ই আমাদের ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের প্রভাবে প্রভাবিত হইবে—বিশেষ বিশেষ প্রকার খাদ্যে মনের ভিতর বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তন উৎপাদন করিবে। আমরা প্রতিদিনই এ বিষয় স্পষ্টতঃই দেখিয়া থাকি। আর কতক প্রকার খাদ্য আছে, তাহারা শরীরে পরিণামবিশেষ উৎপাদন করে, আখেরে মনের উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। এ একটী বিশেষ আবশ্যকীয় শিক্ষার জিনিষ, আমরা যে দুঃখভোগ করিয়া থাকি, তাহার অধিকাংশই কেবল আমরা যেরূপ আহার করি, তাহাতেই হইয়া থাকে। আপনারা দেখিতে পান, অতিরিক্ত ও গুরুপাক ভোজনের পর মনকে সংযম করা বড়ই কঠিন; তখন মন কেবল এদিক ওদিক দৌড়িতে থাকে। আবার কতকগুলি খাদ্য উত্তেজক—সেইগুলি খাইলেও দেখিবেন, আপনারা মনকে সংযম করিতে পারিবেন না। অধিক পরিমাণে মদ্যপান করিলে লোকে স্পষ্টই দেখিতে পায়, সে সহজে তাহার মনকে সংযম করিতে পারে না, উহা যেন তাহার আয়ত্তের বাহিরে যাইয়া দৌড়িতে থাকে। রামানুজাচার্য্যের মতে খাদ্য-সম্বন্ধীয় ত্রিবিধ দোষ পরিহার করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ জাতিদোষ। জাতি-

জাতিদোষ

দোষ অর্থে সেই খাদ্যবিশেষের প্রকৃতিগত দোষ। সর্ব্বপ্রকার উত্তেজক খাদ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, যথা মাংস। মাংসাহার ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ, স্বভাবতঃই উহা অপবিত্র। আমরা অপরের প্রাণবিনাশ ব্যতীত মাংস লাভ করিতে পারি না। মাংস খাইয়া আমরা ক্ষণিক সুখলাভ করিয়া থাকি আর

আমাদের সেই ক্ষণিক সুখের জন্য একটী প্রাণীকে তাহার প্রাণ দিতে হয়। শুধু তাহাই নহে, মাংসভোজনের দ্বারা আমরা অপরাপর অনেক মানবের অবনতির কারণ হইয়া থাকি। মাংসাশী প্রত্যেক ব্যক্তি যদি নিজে নিজে সেই প্রাণীটীকে হত্যা করিত, তাহা হইলে বরং ভাল হইত। তাহা না করিয়া সমাজ একদল লোক সৃষ্টি করিয়া তাহাদের দ্বারা তাঁহাদের এই কায করাইয়া লন, আবার সেই কার্য্যের জন্যই সমাজ তাহাদিগকে ঘৃণা করেন। এখানকার আইনের কি বিধান জানি না, কিন্তু ইংলণ্ডে কসাই কখন জুরির আসন গ্রহণ করিতে পারে না—আইনকর্ত্তাগণের মনের ভাব এই, সে স্বভাবতঃই নিষ্ঠুর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাকে নিষ্ঠুর করিয়াছে কে? সমাজই যে তাহাকে নিষ্ঠুর করিয়াছে। আমরা যদি মাংস ভক্ষণ না করিতাম, তবে সে কখনই কসাই হইত না। মাংসভক্ষণ কেবল তাহা-দেরই চলিতে পারে, যাহাদের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিতে হয়, আর যাহারা ভক্তিযোগসাধনে প্রবৃত্ত নহে। কিন্তু ভক্ত হইতে গেলে মাংসভোজন পরি-ত্যাগ করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য উত্তেজক খাদ্য যথা, পেঁয়াজ, রসুন প্রভৃতি এবং সাওয়ারক্রট (Sauerkraut) * প্রভৃতি দুর্গন্ধ খাদ্য পরি-ত্যাগ করিতে হইবে। আরও পূতি, পর্য্যুষিত এবং যাহার স্বাভাবিক রস প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে, এরূপ সমুদয় খাদ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে।

আশ্রয়দোষ।

খাদ্যসম্বন্ধে দ্বিতীয় দোষের নাম আশ্রয়দোষ। আশ্রয় শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি বা যে বস্তুতে কোন বিশেষ গুণ আশ্রিত রহিয়াছে। অতএব আশ্রয়-দোষ অর্থে বুঝিতে হইবে, যে ব্যক্তির নিকট হইতে খাদ্য আসিতেছে, তাহার দোষে খাদ্যে যে দোষ জন্মে। হিন্দু-দের এই অদ্ভুত মতটী পাশ্চাত্যগণের পক্ষে বুঝা আরো কঠিন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের চতুর্দ্দিকে সূক্ষ্ম পদার্থবিশেষ রহিয়াছে। তিনি যাহা কিছু স্পর্শ করেন, তাহাতেই যেন তাঁহার প্রভাব, তাঁহার মনের, তাঁহার চরিত্র বা ভাবের অংশবিশেষ গিয়া পড়ে। যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরমাণু বহির্গত হইতেছে, তেমনি তাঁহার ভাব, তাঁহার চরিত্রও তাঁহা হইতে বহির্গত হইতেছে আর তিনি যাহা স্পর্শ করেন, তাহাতেই সেই ভাব লাগিয়া যায়। অতএব রন্ধনের সময় কে আমাদের খাদ্য স্পর্শ করিল, সেই দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে—কোন

* ইহা একপ্রকার জর্ম্মানদেশীয় চাটনি। ব্রহ্মদেশীয় ঞাপির ন্যায় ইহা অতিশয় দুর্গন্ধ।

দুশ্চরিত্র বা মন্দ ব্যক্তি যেন উহা স্পর্শ না করে। যিনি ভক্ত হইতে চান, তিনি, যাহাদিগকে অসচ্চরিত্র বলিয়া জানেন, তাহাদের সহিত একসঙ্গে খাইতে বসিবেন না, কারণ, খাদ্যের মধ্য দিয়া তাঁহার ভিতর অসদ্ভাব সংক্রমিত হইবে। তৃতীয়, নিমিত্ত দোষ। এই দোষ পরিত্যাগ করা খুব সহজ।

নিমিত্ত দোষ :

নিমিত্ত দোষ অর্থে খাদ্যে ধূলি ইত্যাদি সংস্পর্শ হওয়া – তাহা যেন কখন না হয়। বাজার হইতে ছত্রিশ রাজ্যের ধূলি-যুক্ত খাবার আনিয়া উত্তমরূপে পরিষ্কার না করিয়া টেবিলের উপর দেওয়া ঠিক নয়। আর এক কথা—লালা দ্বারা কিছু স্পর্শ করা উচিত নয়। ঈশ্বর আমাদিগকে সব জিনিষ ধুইবার জন্য যথেষ্ট জল দিয়াছেন, অতএব ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকাইয়া লালা দ্বারা সব জিনিষ ছোঁয়া ঘোর কু অভ্যাস —ইহার মত কদর্য্য অভ্যাস আর কিছু নাই! শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী (Mucous membrane) শরীরের মধ্যে অতি কোমলাংশ; এতদুৎপন্ন লালা দ্বারা অতি সহজে সমুদয় ভাব সংক্রমিত হয়। সুতরাং মুখে খাবার তুলিবার সময় ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকান বড় দোষাবহ। তার পর একজন কোন জিনিষ আধ-খানা কামড়াইয়া খাইয়াছে, অপরের তাহা খাওয়া উচিত নহে। একজন একটা আপেলে এক কামড় দিয়া খাইল ও অপরকে বাকিটা খাইতে দিল — এরূপ করা উচিত নয়। খাদ্যসম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত দোষগুলি বর্জ্জন করিলে খাদ্য শুদ্ধ হয়। তাহার শুদ্ধি হইলে মনও শুদ্ধ হয়, মন শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধ মনে সর্ব্বদা ঈশ্বরের স্মৃতি অব্যাহত থাকে। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।"

রামানুজাচার্য্য উপনিষদুক্ত উক্ত শ্লোকের পূর্ব্বকথিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়া-ছেন। তিনি আহার শব্দ খাদ্য অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্যের মতানু-যায়ী 'আহারশুদ্ধি' পদের অর্থ।

উপনিষদের অন্য ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য কিন্তু আহার শব্দের অন্য অর্থ ধরিয়া ঐ বাক্যের অন্য প্রকার অর্থ করিয়াছেন। তিনি বলেন, আহ্রিয়তে ইতি আহারঃ। যাহা কিছু গ্রহণ করা হয়, তাহাই আহার—সুতরাং তাঁহার মতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহই আহার। আর আহারশুদ্ধি অর্থে নিম্নলিখিত দোষসমূহ বর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহের গ্রহণ। প্রথমতঃ, আসক্তিরূপ দোষ ত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বর ব্যতীত অন্য সমুদয় বিষয়ে প্রবল আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। সব দেখুন, সব করুন, সব স্পর্শ করুন, কিন্তু আসক্ত

হইবেন না। যখনই মানুষের কোন বিষয়ে তীব্র আসক্তি হয়, তখনই সে নিজেকে হারাইয়া ফেলে, সে আর আপনি আপনার প্রভু থাকে না, সে দাস হইয়া যায়। যদি কোন রমণী কোন পুরুষের প্রতি প্রবলভাবে আসক্ত হয়, তবে সে সেই পুরুষের দাসী হইয়া পড়ে; পুরুষও তদ্রূপ রমণীর প্রতি আসক্ত হইলে তাহার দাসবৎ হইয়া যায়। কিন্তু দাস হইবার ত কোন প্রয়োজন নাই। একজনের দাস হওয়া অপেক্ষা এই জগতে অনেক বড় বড় জিনিষ করিবার আছে। সকলকেই ভালবাসুন, সকলেরই কল্যাণ সাধন করুন, কিন্তু কাহারও দাস হইবেন না। প্রথমতঃ, উহা ত আমাদের নিজেদের হীন করিয়া দেয়, দ্বিতীয়তঃ, উহাতে আমাদিগকে ঘোরতর স্বার্থপর করিয়া তুলে। এই দুর্ব্বলতার দরুণ আমরা, যাহাদিগকে ভালবাসি, তাহাদের ভাল করিবার জন্য অপরের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করি। জগতে যত কিছু অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহার অধিকাংশ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আসক্তিবশতঃ ঘটিয়া থাকে। অতএব এইরূপ সমুদয় আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে, কেবল সৎকর্ম্মে আসক্তি রাখিতে হইবে; কিন্তু সকলকেই ভালবাসিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, কোনরূপ ইন্দ্রিয়বিষয় লইয়া যেন আমাদের দ্বেষ উৎপন্ন না হয়। দ্বেষহিংসাই সমুদয় অনিষ্টের মূল আর উহাকে জয় করা বড়ই কঠিন। প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা ঈর্ষাবিষে জর্জ্জরিত হইতেছি—ইহাই আমাদের প্রায় সমুদয় কার্য্যের অভিসন্ধির মূলে। তৃতীয়তঃ, মোহ। আমরা সর্ব্বদাই এক বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া ভ্রম করিতেছি ও তদনুসারে কার্য্য করিতেছি আর তাহার ফল এই হইতেছে যে, আমরা নিজেদের দুঃখকষ্ট নিজেরাই সৃজন করিতেছি। আমরা মন্দকে ভাল বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। যাহা কিছু ক্ষণকালের জন্য আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে উত্তেজিত করে, তাহাকেই সর্ব্বোত্তম বস্তু মনে করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া মাতিতেছি কিছু পরেই দেখিলাম, তাহা হইতে একটা খুব ঘা খাইলাম, কিন্তু তখন আর ফিরিবার পথ নাই। প্রতিদিনই আমরা এই ভ্রমে পড়িতেছি আর অনেক সময় সারা জীবনটাই আমরা ঐ ভুল লইয়াই থাকি। মুহূর্ত্তকালের জন্য ইন্দ্রিয়সুখবিধায়ক বলিয়া আমরা অনেক বিষয়কে ভাল বলিয়া মনে করিয়া তাহাতে নিযুক্ত হই আর অনেক বিলম্বে আমাদের ভুল বুঝিতে পারি। শঙ্করাচার্য্যের মতে এই পূর্ব্বোক্ত রাগদ্বেষমোহরূপ ত্রিবিধ দোষবর্জ্জিত হইয়া ইন্দ্রিয়-

বিষয়সমূহের গ্রহণকে আহারশুদ্ধি বলে। এই আহারশুদ্ধি হইলেই সত্ত্ব-শুদ্ধি হয়, অর্থাৎ তখন মন ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহকে গ্রহণ করিয়া রাগদ্বেষমোহ-বর্জ্জিত হইয়া উহাদের সম্বন্ধে চিন্তা করিতে পারে। আর এইরূপ সত্ত্বশুদ্ধি হইলেই সেই মনে সর্ব্বদা ঈশ্বরের স্মৃতি বিরাজিত থাকে।

'আহারশুদ্ধির উভয় প্রকার অর্থই (শঙ্কর ও রামানুজের ব্যাখ্যা) গ্রহণীয়।

স্বভাবতঃই আপনারা সকলেই বলিবেন যে, এইটীই উৎকৃষ্টতর অর্থ। তাহা হইলেও ইহার সহিত প্রথমোক্ত অর্থটীকেও গ্রহণ করিতে হইবে। স্থূল খাদ্য শুদ্ধ হইলে তার পর অবশিষ্ট-গুলি হইবে। ইহা অতি সত্য কথা যে, মনই সকলের মূল, কিন্তু আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই আছেন, যাঁহার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বদ্ধ নহেন। আপনাদের মধ্যে এমন লোক কে এখানে আছেন, যিনি এক বোতল মদ খাইয়া না টলিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন? ইহাতেই বুঝা যাইতেছে যে, জড়পদার্থের শক্তিতে আমরা এখনও পরিচালিত, আর যতদিন আমরা জড়পদার্থের শক্তির দ্বারা পরিচালিত, ততদিন আমাদিগকে জড়ের সাহায্য লইতেই হইবে, তার পর আমরা যখন সমর্থ হইব, তখন যাহা খুসি, খাইতে পারি। আমাদিগকে রামানুজের অনুসরণ করিয়া আহারপানসম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে আবার সঙ্গে সঙ্গে মানসিক খাদ্যের দিকেও আমাদিগের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। জড়খাদ্য সম্বন্ধে সাবধান হওয়া ত অতি সহজ, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ব্যাপারের দিকেও দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন। তাহা হইলে ক্রমশঃ আমাদের আধ্যাত্মিক প্রকৃতি সবল হইতে সবলতর হইতে থাকিবে, ভৌতিক প্রকৃতি আপনা আপনিই নষ্ট হইয়া যাইবে। তখনই এমন সময় আসিবে যে, আপনি দেখিবেন, কোন খাদ্যেই আপনার কিছু অনিষ্ট করিতে পারিতেছে না, শত শত অজীর্ণরোগেও আর আপনাকে চঞ্চল করিতে পারিতেছে না। এক্ষণে যকৃতের সামান্য গোলমালেই আপনাকে পাগল করিয়া তুলে! মুস্কিল এইটুকু যে, সকলেই একেবারে লাফ দিয়া উচ্চতম আদর্শকে ধরিতে চায়, কিন্তু লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া কিছু ত হইবে না। তাহাতে আমাদেরই পা খোঁড়া হইয়া আমরা পড়িয়া মরিব। আমরা এখানে বদ্ধ রহিয়াছি, আমা-দিগকে ধীরে ধীরে আমাদের শিকল ভাঙ্গিতে হইবে। রামানুজের মতে এই বিবেক অর্থাৎ খাদ্যাখাদ্যবিচারই ভক্তির প্রথম সাধন।

ভক্তির দ্বিতীয় সাধনের নাম 'বিমোক'। বিমোক অর্থে বাসনার

ভক্তির সাধন—
(২) বিমোক।

দাসত্ব মোচন। যিনি ভগবৎপ্রেম লাভ করিতে চান, তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকার প্রবল বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুর কামনা করিবেন না। এই জগৎ আমাদিগকে সেই উচ্চতর জগতে লইয়া যাইবার জন্য যতটুকু সাহায্য করে, ততটুকুই ভাল। ইন্দ্রিয়বিষয়সকল উচ্চতর বিষয় লাভে যে পরিমাণে সাহায্য করে, সেই পরিমাণে ভাল। আমরা সর্ব্বদাই ভুলিয়া যাই যে, এই জগৎ উদ্দেশ্যবিশেষ লাভের উপায়স্বরূপ, স্বয়ং উদ্দেশ্য নহে। যদি এই জগৎ আমাদের চরম লক্ষ্য হইত, তবে আমরা এই স্থূলদেহেই অমরত্বলাভ করিতাম, আমরা কখনই মরিতাম না। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের চতুর্দ্দিকে লোক মরিতেছে, তথাপি মূর্খতাবশতঃ আমরা ভাবিতেছি, আমরা কখন মরিব না। ঐ ধারণা হইতেই আমরা ভাবিয়া থাকি, এই জীবনই আমাদের চরম লক্ষ্য—আমাদের মধ্যে শতকরা নিরনব্বই জন লোকের এই অবস্থা। এই ভাব এখনই পরিত্যাগ করিতে হইবে। এই জগৎ যতক্ষণ আমাদের পূর্ণতালাভের উপায়স্বরূপ হয়, ততক্ষণই ইহা ভাল আর যখনই উহা দ্বারা তাহা না হয়, তখন উহা মন্দ, মন্দ বই আর কিছুই নহে। এইরূপ স্বামী স্ত্রী পুত্র কন্যা টাকা কড়ি বা বিদ্যা আমাদের ভগবৎপথে উন্নতির সহায়ক হইলে ভাল, কিন্তু যখনই তাহা না হয়, তখনই সেগুলি মন্দ বই আর কিছুই নয়। যদি স্ত্রী আমাদিগকে ঈশ্বরপথে সহায়তা করে, তবে তাহাকে সাধ্বী স্ত্রী বলা যায়। এইরূপ পতিপুত্রাদিসম্বন্ধেও। অর্থও যদি মানুষকে অপরের কল্যাণসাধনে সহায়তা করে, তবেই তাহার মূল্য আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়। নতুবা উহা কেবল অনিষ্টের মূল আর যত শীঘ্র আমরা উহা ছাড়িয়া দিতে পারি, ততই আমাদের কল্যাণ।

তৎপরে সাধন অভ্যাস। আমাদের কর্ত্তব্য—মন যেন সর্ব্বদাই ঈশ্বরাভিমুখে গমন করে, অপর কোন বস্তুর আমাদের মনে প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। মন যেন সদাসর্ব্বদা অবিশ্রান্ত তৈলধারার ন্যায় ঈশ্বরচিন্তা করে। ইহা বড় কঠিন কার্য্য; কিন্তু ক্রমাগত অভ্যাসের দ্বারা তাহাও করিতে পারা যায়। আমরা এক্ষণে যাহা রহিয়াছি, তাহা অতীত অভ্যাসের ফলস্বরূপ। আবার এখন যেরূপ অভ্যাস করিব, ভবিষ্যতে তদ্রূপ হইব। অতএব আপনাদের যেরূপ অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাহার বিপরীত অভ্যাস করুন।

ভক্তির সাধন—
(৩) অভ্যাস।

একদিকে ফিরিয়া আমাদের অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে, অন্যদিকে ফিরুন আর যত শীঘ্র পারেন, ইহার বাহিরে চলিয়া যান। ইন্দ্রিয়বিষয়ের চিন্তা করিতে করিতে আমাদিগকে এমন এক অবস্থায় আনয়ন করিয়াছে যে, আমরা এক মুহূর্ত্ত হাসিতেছি, পরক্ষণেই কাঁদিতেছি, সামান্য তরঙ্গেই আমরা বিচলিত হইতেছি—সামান্য একটা বাক্যের দাস, সামান্য এক টুকরা খাদ্যের দাস হইয়াছি। ইহা অতি লজ্জার বিষয়—আর তথাপি আমরা আপনাদিগকে আত্মা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকি আর অনর্থক অনেক বড় বড় কথা বলিয়া থাকি। আমরা সংসারের দাসস্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়াভিমুখে যাইয়া আমরা আপনাদিগকে এই অবস্থায় আনয়ন করিয়াছি। এক্ষণে অন্যদিকে গমন করুন—ঈশ্বরের চিন্তা করিতে থাকুন—মন কোনরূপ ভৌতিক বা মানসিক ভোগের চিন্তা না করিয়া যেন কেবল ঈশ্বরের চিন্তা করে। যখন উহা অন্য কোন বিষয়ের চিন্তায় উদ্যত হইবে, তখন উহাকে এমন ধাক্কা দিন, যেন উহা ফিরিয়া আসিয়া ঈশ্বরের চিন্তায় প্রবৃত্ত হয়। "যেমন তৈল একপাত্র হইতে অপর পাত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে অবিচ্ছিন্ন ধারায় পড়িতে থাকে, যেমন দূরে ঘণ্টাধ্বনি হইলে উহার শব্দ কর্ণে এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় আসিতে থাকে, তদ্রূপ এই মনও এক অবিচ্ছিন্ন ধারায় যেন ঈশ্বরের দিকে প্রধাবিত হয়।" এই অভ্যাস আবার শুধু মনে মনে করিলেই হইবে না, ইন্দ্রিয়গুলিকেও এই অভ্যাসে নিযুক্ত করিতে হইবে। বাজে কথা না শুনিয়া আমাদিগকে ঈশ্বরসম্বন্ধে শুনিতে হইবে; বাজে কথা না কহিয়া ঈশ্বরবিষয়ক আলাপ করিতে হইবে; বাজে বই না পড়িয়া ভাল বই—যে সব বইএ ঈশ্বরের কথা আছে—সেই সব বই পড়িতে হইবে।

ঈশ্বরকে স্মৃতিপথে রাখিবার জন্য এই অভ্যাসের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সহায়ক সম্ভবতঃ শব্দ—সঙ্গীত। ভগবান্ ভক্তির শ্রেষ্ঠ আচার্য্য নারদকে বলিতেছেন,

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥

হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, যোগীদিগের হৃদয়েও বাস করি না, যেখানে আমার ভক্তগণ গান করেন, আমি তথায়ই অবস্থান করি।

অভ্যাসের প্রধান অঙ্গ—সঙ্গীত।

মনুষ্যমনের উপর সঙ্গীতের অসাধারণ প্রভাব—উহা মুহূর্ত্তে মনের একাগ্রতা বিধান করিয়া দেয়। আপনারা দেখিবেন, অতিশয় তামসিক জড়প্রকৃতি ব্যক্তিরা—যাহারা এক

মুহূর্ত্তও নিজেদের মনকে স্থির করিতে পারে না—তাহারাও উত্তম সঙ্গীতশ্রবণে মোহিত হইয়া থাকে। এমন কি, কুক্কুর বিড়াল সর্প সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণও সঙ্গীতশ্রবণে মোহিত হইয়া থাকে।

তৎপরের সাধন ক্রিয়া—পরের হিতসাধন। স্বার্থপর ব্যক্তির হৃদয়ে ঈশ্বর-স্মৃতি আসিবে না। আমরা যতই অপরের কল্যাণসাধনে চেষ্টা করিব, ততই আমাদের হৃদয় শুদ্ধ হইবে এবং তাহাতে ঈশ্বর বাস করিবেন। আমাদের শাস্ত্রমতে ক্রিয়া পঞ্চবিধ—উহাদিগকে পঞ্চমহাযজ্ঞ বলে। প্রথম, ব্রহ্মযজ্ঞ—অর্থাৎ স্বাধ্যায়—প্রত্যহ শুভ ও পবিত্রভাবোদ্দীপক কিছু কিছু পড়িতে হইবে। দ্বিতীয় দেবযজ্ঞ। ঈশ্বর বা দেবতা বা সাধুগণের পূজা বা উপাসনা। তৃতীয়—পিতৃযজ্ঞ—আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য। চতুর্থ নৃযজ্ঞ—মনুষ্যজাতির প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য। মানুষ যদি দরিদ্র বা অভাব-গ্রস্তদের জন্য গৃহনির্ম্মাণ না করে, তবে তাহার নিজের গৃহে বাস করিবার অধিকার নাই। যে কেহ দরিদ্র ও দুঃখী, তাহার জন্যই যেন গৃহীর গৃহ উন্মুক্ত থাকে—তবেই সে যথার্থ গৃহী। যদি সে কেবল নিজে আর নিজের স্ত্রীর ভোগের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করে, তবে সে আর তাহাদের দুজন ছাড়া জগতে আর কাহারও জন্য চিন্তাও করিল না—ইহা অতি ঘোর স্বার্থপর কার্য্য হইল, সুতরাং সে ব্যক্তি কখন ভগবদ্ভক্ত হইতে পারিবে না। কোন ব্যক্তির নিজের জন্য পাক করিবার অধিকার নাই, অপরের জন্যই তাহাকে পাক করিতে হইবে—অপরের সেবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে,তাহাতেই তাহার অধিকার। ভারতে সাধারণতঃই ইহা ঘটিয়া থাকে যে, যখন বাজারে নূতন নূতন জিনিষ যথা—আম, কুল প্রভৃতি উঠে, তখন কোন ব্যক্তি খুব বেশী পরিমাণে উহা কিনিয়া গরিবদের বিলাইয়া থাকেন। গরিবদের বিলাইবার পর তবে তিনি খাইয়া থাকেন আর এদেশে (আমেরিকায়) ঐ সৎ দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা বিশেষ কর্ত্তব্য। এইরূপ ভাবে জীবন নিয়মিত করিতে থাকিলে মানুষ ক্রমশঃ নিঃস্বার্থ হইতে থাকে আবার স্ত্রীপুত্রাদিরও ইহাতে সর্ব্বদা শিক্ষা হয়। প্রাচীনকালে হিব্রুরা প্রথমজাত ফল ভগবান্‌কে নিবেদন করিত, কিন্তু আজকাল আর বোধ হয় তাহা করে না। সকল বস্তুর অগ্রভাগ দরিদ্রগণের প্রাপ্য—আমাদের উহার অবশিষ্টাংশে মাত্র অধি-কার। দরিদ্রগণ—যাহারা কোনরূপ দুঃখকষ্ট পাইতেছে—তাহারাই ঈশ্বরের

ভক্তির সাধন—(৪) ক্রিয়া বা পঞ্চমহাযজ্ঞ।

প্রতিনিধিস্বরূপ। অপরকে না দিয়া যে ব্যক্তি নিজ রসনার তৃপ্তিসাধন করে, সে পাপ ভোজন করে। পঞ্চম, ভূতযজ্ঞ অর্থাৎ তির্য্যগ্‌জাতির প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য। এই সকল প্রাণীকে মানুষ মারিয়া ফেলিবে, তাহাদিগকে লইয়া যাহা খুসি করিবে—এই জন্যই তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে, একথা বলা মহাপাপ। যে শাস্ত্রে এই কথা বলে, তাহা শয়তানের শাস্ত্র, ঈশ্বরের নহে। শরীরের মধ্যে স্নায়ুবিশেষ নড়িতেছে কি না দেখিবার জন্য জন্তুসমূহকে কাটিয়া দেখা—কি বীভৎস ব্যাপার ভাবুন দেখি। এমন সময় আসিবে, যখন সকল দেশেই যে ব্যক্তি এরূপ করিবে, সেই দণ্ডনীয় হইবে। আমরা যে বৈদেশিক গভর্ণমেণ্টের শাসনাধীনে রহিয়াছি, তাহার নিকট হইতে ইহারা যেরূপ উৎসাহপ্রাপ্ত হউক না হিন্দুরা এ বিষয়ে সহানুভূতি করেন না, ইহাতে আমি পরম সুখী। যাহা হউক, আহারের একভাগ পশুগণেরও প্রাপ্য। তাহাদিগকে প্রত্যহ খাদ্য দিতে হইবে। এ দেশের প্রত্যেক সহরে অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, অশ্ব, গো, কুক্কুর, বিড়ালের জন্য হাঁসপাতাল থাকার প্রয়োজন—তাহাদিগকে খাওয়াইতে হইবে এবং তাহাদের যত্ন করিতে হইবে।

তার পরের সাধন—কল্যাণ অর্থাৎ শুচিতা। নিম্নলিখিত গুণগুলি 'কল্যাণ' শব্দবাচ্য। ১ম, সত্য। যিনি সত্যনিষ্ঠ, তাঁহার নিকট সত্যের ঈশ্বর প্রকাশিত হন—কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণরূপে সত্যসাধন করিতে হইবে। ২য়, আর্জ্জব—অকপটভাব, সরলতা—হৃদয়ের মধ্যে কোনরূপ কুটিলতা থাকিবে না—মন মুখ এক করিতে হইবে। যদিও একটু কর্কশ ব্যবহার করিতে হয়, তথাপি কুটিলতা ছাড়িয়া সরল সিধা পথে চলা উচিত। ৩য়, দয়া। ৪র্থ, অহিংসা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে কোন প্রাণীর অনিষ্টাচরণ না করা। ৫ম, দান। দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম আর নাই। সেই সর্ব্বাপেক্ষা হীনতম ব্যক্তি, যে নিজের দিকে হাত ফিরাইয়া আছে, সে প্রতিগ্রহ করিতে, অপরের নিকট দান লইতে ব্যস্ত আর সেই শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি, যাহার হাত অপরের দিকে ফিরান রহিয়াছে—যে অপরকে দিতেই ব্যাপৃত। হস্ত নির্ম্মিত হইয়াছে ঐ জন্য—কেবল দিবার জন্য। উপবাসে মরিতে হয় সেও শ্রেয়ঃ, কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত এক টুকরা রুটি আপনার

ভক্তির সাধন—(৫) কল্যাণ অর্থাৎ সত্য, আর্জ্জব, দয়া, অহিংসা, দান ও অনভিধ্যা।

নিকট থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত দিতে বিরত হইবেন না। যদি অপরকে দিতে গিয়া অনাহারে আপনার মৃত্যু হয়, তবে আপনি এক মুহূর্ত্তেই মুক্ত হইয়া যাইবেন। তৎক্ষণাৎ আপনি পূর্ণ হইয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনি ঈশ্বর হইয়া যাইবেন। যাহাদের এক পাল ছেলে, তাহারা পূর্ব্ব হইতেই বদ্ধ। তাহারা দান করিতে পারে না। তাহারা ছেলেদের লইয়া সুখী হইতে চায়, সুতরাং তাহাদিগকে সেই ভোগের জন্য পয়সা খরচ করিতে হইবে। জগতে কি যথেষ্ট ছেলেপিলে নাই? কেবল স্বার্থপরতাবশেই লোকে বলিয়া থাকে, 'আমার নিজের একটি ছেলে দরকার'। ৬ষ্ঠ, অনভিধ্যা—পরের দ্রব্যে লোভ পরিত্যাগ বা নিষ্ফল চিন্তা পরিত্যাগ বা পরকৃত অপরাধ সম্বন্ধে চিন্তা পরিত্যাগ।

ভক্তির সাধন—৬। অনবসাদ।

তৎপরের সাধন—অনবসাদ—ইহার ঠিক শব্দার্থ—চুপ করিয়া বসিয়া না থাকা, নৈরাশ্যগ্রস্ত না হওয়া। অর্থাৎ সন্তোষ; নৈরাশ্য আর যাহাই হউক, উহা ধর্ম্ম নহে। সর্ব্বদাই সন্তোষে, সর্ব্বদাই হাস্যবদনে থাকিলে কোন স্তবস্তুতি বা প্রার্থনা অপেক্ষা শীঘ্র ঈশ্বরের নিকট লইয়া যায়। যাহাদের মন সর্ব্বদা বিষণ্ণ ও তমোভাবাচ্ছন্ন, তাহারা আবার ভক্তিপ্রেম করিবে কি করিয়া? যদি তাহারা ভক্তি বা প্রেমের কথা কয়, তবে জানিবেন, উহা মিথ্যা—তাহারা প্রকৃত পক্ষে অপরকে খুন করিতে চায়। এই সব গোঁড়াদের বিষয় ভাবিয়া দেখুন, তাহাদের সর্ব্বদা মুখ ভার হইয়াই আছে—তাহাদের সমুদয় ধর্ম্মটাই এই যে, বাক্যে ও কার্য্যে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করা। ইতিহাসে তাহাদের সম্বন্ধে কি বলে, তাহা ভাবিয়া দেখুন এবং এখনই বা তাহারা বাগে পাইলে কি করিত, তাহাও ভাবুন। তাহারা সমগ্র জগৎকে শোণিতস্রোতে ভাসাইয়া দিতে পারে, যদি তাহাতে তাহারা ক্ষমতা লাভ করিতে পারে, কারণ, পৈশাচিক ভাবই তাহাদের ঈশ্বর। তাহার উপাসনা করিয়া ও সর্ব্বদা মুখভার করিয়া থাকিয়া তাহাদের হৃদয়ে আর প্রেমের লেশমাত্র থাকে না, তাহাদের কাহারও প্রতি এক বিন্দু দয়া থাকে না। অতএব যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই আপনাকে দুঃখিত বোধ করে, সে কখনই ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিবে না। 'হায়, আমার কি কষ্ট' এরূপ সর্ব্বদা বলা ধার্ম্মিকের লক্ষণ নহে, ইহা পৈশাচিকতা। সকল ব্যক্তিকেই নিজের নিজের দুঃখের বোঝা বহন করিতে হয়। যদি আপনার বাস্তবিকই দুঃখ থাকে, সুখী হইবার

চেষ্টা করুন, দুঃখকে জয় করিবার চেষ্টা করুন। দুর্ব্বল ব্যক্তি কখন ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না—অতএব দুর্ব্বল হইবেন না। আপনাকে বীর্য্যবান্ হইতে হইবে—অনন্ত শক্তি যে আপনার ভিতরে। বীর্য্যশালী না হইলে আপনি কোন কিছু জয় করিবেন কিরূপে? আপনি ঈশ্বরলাভ করিবেন কিরূপে?

সঙ্গে সঙ্গে আবার অনুদ্ধর্ষ সাধন করিতে হইবে। উদ্ধর্ষ অর্থে অতিরিক্ত আমোদ প্রমোদ—উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে—অতিরিক্ত আমোদে মাতিলে মন কথনই শান্ত হয় না, চঞ্চল হইয়া থাকে আর পরিণামে সর্ব্বদাই দুঃখই আসিয়া থাকে। কথায়ই বলে. 'যত হাসি তত কান্না'। মানুষ একবার একদিকে ঝুঁকিয়া আবার তাহার চূড়ান্ত বিপরীত দিকে গিয়া থাকে। এইরূপ সদাসর্ব্বদাই হইতেছে। মনকে আনন্দপূর্ণ অথচ শান্ত রাখিতে হইবে। মন কথন যেন কোন কিছুর বাড়াবাড়ি না করে, কারণ, বাড়াবাড়ি করিলেই পরিণামে তাহার প্রতিক্রিয়া হইবে।

ভক্তির সাধন—
(৭) অনুদ্ধর্ষ।

রামানুজের মতে এইগুলিই ভক্তির সাধন।

ক্রমশঃ।

"নমো বিবেকানন্দায়।"

গুরু-পূজা।

(৩য় পল্লব)

(১)

বাজিল দুন্দুভি-নাদ, গেল বাদ বিসম্বাদ,
জাগ জাগ প্রেমময়ী ধরা!
শুন মা নূতন কথা সুসন্তান গায় গাথা
নব রস, নব তত্ত্বে ভরা!

(২)

উঠ হে জগতবাসী ধর জ্ঞান অবিনাশী

তত্ত্ব-সুধা ত্রিদিববাঞ্ছিত !

গুরুদত্ত মহাধন বিলাইছে মহাজন

"সমন্বয়" জগৎ-ঈপ্সিত।

(৩)

যেথানে যে ভাবে থাক বিভুরে যে নামে ডাক,

পাবে তাঁরে ইথে নাহি আন।

বাঁকা কিম্বা সোজা পথে, রুচি হয় যেই মতে,

"যত মত তত পথ" জ্ঞান।

(৪)

'উঠ জাগ' মহাগান যাহার মাতান তান

বেদ-শেষ 'তত্ত্বমসি' কথা।

প্রতি জনে দেন গুরু মহাবীর কল্পতরু

সমস্বরে পাও গুরুগীতা।

(৫)

জীবে শিবে নাহি ভেদ, সতত কহিছে বেদ,

নিত্য দাও নরে দেব-সেবা।

ভুলে যাও আত্ম-পর ভাই ভাই হৃদে ধর

এক ভিন্ন দ্বিতীয় বা কেবা ?

(৬)

এক বিভূ সনাতন, ঘটে ঘটে নারায়ণ,

মিছে কেন ভেদ-দ্বন্দ্ব মাঝে ?

ধর গুরু-উপদেশ, হইবে মোহের শেষ,

ওই শুন শুভ শঙ্খ বাজে।

(৭)

ভাঙ্গ সুখ-স্বপ্ন-ঘোর, ছিন্ন কর মায়া-ডোর,

বীরভাবে হও আগুয়ান !

কামিনী কাঞ্চন কায়া, সকলি মিছার ছায়া,

গুরু দেন সত্যের সন্ধান !

(৮)

ওই শুন গুরু কয়, ত্যাগে শুধু মোক্ষ হয়,
'ত্যাগ' শুনে হ'ওনা চকিত!
ত্যাগেই পরম ভোগ, সদানন্দ সনে যোগ,
নিত্যানন্দ কার না বাঞ্ছিত?

(৯)

ত্যাগী বলে—মিথ্যা ছাড়ি সত্যেরে আশ্রয় করি,
হও তুমি মহা ধনবান।
সত্যের বিমল জ্যোতি, জ্ঞানের অপূর্ব্ব ভাতি,
উজ্জ্বলিবে তোমার পরাণ!

(১০)

'সাজে না তোমার আর,' কন গুরু বারম্বার,
'মোহাবেশে জীবন যাপন।
স্বার্থ মানে পদে দলি, সিংহ সম গর্জ্জি চলি,
লভ আজ(ই) পরমার্থ ধন।'

(১১)

অমৃত-সন্তান মোরা, অমৃতে হৃদয় ভরা,
এস ভাই অমৃত বিতরি।
ফুটুক অদ্বৈত-তত্ত্ব, বেদান্তের মহা সত্য
ধন্য হই জগতে প্রচারি।

(১২)

যাঁর শুভ আগমনে ভাসে দেশ মহাজ্ঞানে,
আসে সেই জ্ঞান গরীয়ান্।
এস আছ কে কোথায়, দীন অভাগার প্রায়
গুরুপদে অর্ঘ্য করি দান!

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

মধুর রস ও বৈষ্ণব কবি।

[পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

শ্রীকৃষ্ণের ভালবাসা—ভগবানের ভালবাসা বৈষ্ণব কবি যেমন বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন, জগতে আর কোনও কবি বা দার্শনিক তেমন বুঝাইতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য, মধুর রসের সাধনা ভগবানের ভালবাসার সম্পূর্ণ আস্বাদ পাইবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। ভক্ত ভগবান্‌কে ভালবাসিতে জানে, আত্মসমর্পণ করিতে পারে সত্য, কিন্তু ভগবানের তুল্য ভালবাসা ভক্তের হৃদয়ে আসিতে পারে না, আসা সম্ভবও নহে। যাঁহার হ্লাদিনী শক্তির কণামাত্রলাভে ভক্তের হৃদয় তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই অসীম শক্তিমানের ভালবাসা যে কত গভীর, কত অমেয়, কত অমৃতময়, তাহা আত্মারাম ভক্ত ভিন্ন কেহ উপলব্ধি করিতে পারেন না ও আত্মবিলোপকারিণী নিষ্কাম অহেতুকী ভক্তির সাহায্য ভিন্ন তাহা চিত্রিত হইবার অন্য উপায় নাই। যতক্ষণ মনে ঐশ্বর্য্যবোধ বিদ্যমান থাকিবে, ততক্ষণ শ্রীভগবান্‌কে সম্পূর্ণরূপে আপনার বলিয়া অনুভব করিতে পারা যাইবে না এবং ততক্ষণ সে ভালবাসা কখনই সম্পূর্ণ বোঝা যাইবে না। যতক্ষণ মনে হইবে যে, ভগবান কৃপা করিয়া ভক্তকে অনুগ্রহদানে পরিতৃপ্ত করেন, যতক্ষণ মনে ভগবানের অচিন্তনীয় মহত্ত্ব জাগরূক থাকিবে, ততক্ষণ ভগবানের উপর ভক্তের ভালবাসার জোর বা আবদার চলিবে না। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যচিন্তা মানবমনে ভক্ত্যুদ্রেকের সহায়ক বলিয়া প্রথম প্রথম আবশ্যক হইলেও ভালবাসার প্রগাঢ়তায় ঐ চিন্তা ভুলিয়া যতক্ষণ পর্য্যন্ত না ভক্ত ভগবান্‌কে প্রেমিকমাত্র বলিয়া ভাবিতে শিখিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের আস্বাদ লাভ করিয়া বৈষ্ণব কবির অপূর্ব্ব গীতির মর্ম্ম গ্রহণ করা তাহার সাধ্যায়ত্ত হইবে না। বৈষ্ণব কবির কাছে শ্রীকৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি, শ্রীরাধা নায়িকার শিরোমণি। তাই বৈষ্ণব কবি অসঙ্কুচিত হৃদয়ে নিঃশঙ্কভাবে নির-ঙ্কুশ তুলিকার স্পর্শে শ্রীকৃষ্ণরূপী শ্রীভগবানের অপরূপ ভালবাসার সজীব চিত্র আমাদিগের শিক্ষার, আশার ও আনন্দের আধারস্বরূপ করিয়া আঁকিতে পারিয়াছেন। এই ভালবাসা যে পাইয়াছে, যে বুঝিয়াছে, যে প্রাণ ঢালিয়া শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসিয়াছে, সেই শুধু বুঝাইতে পারে ও বলিতে পারে যে,

শ্রীরাধার জন্য শ্রীকৃষ্ণের কত লালসা, কত আগ্রহ, শ্রীরাধার রূপের জন্য শ্রীকৃষ্ণের কত উন্মত্ত আকাঙ্ক্ষা।

মোর রূপে আপ্যায়িত করে ত্রিভুবন
রাধার দর্শনে মোর জুড়ায় জীবন। (১)

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই সূত্র অবলম্বনে মহাকবি বিদ্যাপতির অমর গীতি শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের প্রথম নিদর্শনসূচক—

স্বজনি ভাল করি পেখন না ভেল
মেঘমালাসনে তড়িত লতা জনু হৃদয়ে শেল দোয় গেল।
আধ আঁচর খসি আধ বদনে হাসি
আধহি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তব ধরি দগধে অনঙ্গ॥
একে তনু গোরা কনককটোরা
অতনু কাঁচলা উপাম।
হারে হরিল মন জনু বুঝি ঐছন
ফাঁস পসারল কাম॥
দশন মুকুতা পাঁতি অধরু মিলায়ত
মৃদু মৃদু কহ তহিঁ ভাষা।
বিদ্যাপতি কহ অত এসে দুখ রহ
হেরি হেরি না পূরল আশা॥

রূপের আকর্ষণে জগতে কে মুগ্ধ হয় না? এই রূপের আকর্ষণের সহিত যখন ভালবাসা আসিয়া মিশে, তখন সে আকর্ষণ অমৃতময় হইয়া উঠে। বাহ্যিক রূপের আকর্ষণ তখন মনে ভাবের সৃষ্টি করে—মনস্তত্ত্ববিৎ কবি-কুল সর্ব্বদাই ইহা স্বীকার করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব কবি প্রণয়শাস্ত্রে লব্ধপ্রবেশ। তাঁহারা রূপের জয় সর্ব্বদা ঘোষণা করিয়াছেন। রূপ ভাল-বাসার জন্মদাতা—প্রেমচিত্রাঙ্কনে সে রূপ অবহেলা করিলে চলিবে কেন? তাই শ্রীরাধার রূপে ভগবান্ স্বয়ং মুগ্ধ ও সেই মোহ হইতে তাঁহার মনে ভাবের উদয়—বৈষ্ণব কবি বর্ণনা করিতে ভুলেন নাই। বিদ্যাপতি কহিয়াছেন—

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—আদি, ৪র্থ

ধনি ধনি রমণী জনম ধনি তোর
সবজন কানু কানু করি ঝুরায়
সো তুয়া ভাবে বিভোর॥
চাতক চাহি তিয়াসল অম্বুদ
চকোর চাহি রহু চন্দা—
তরু লতিকা অবলম্বনকারী
মঝুমনে পাগল ধন্ধা॥

ভগবানের ভালবাসার যে কতটা তন্ময়ত্ব, এই কবিতা তাহার পূর্ব্বাভাষ। ইহার সুন্দর ও পূর্ণতর বিকাশের পরিচয় আমরা "শ্রীরাধার রসোদ্‌গার" শীর্ষক কবিতাগুলি হইতে পাইয়া থাকি। এমন স্বাভাবিক ভাবে নায়কের প্রেমবর্ণনা আর কোথাও দেখিয়াছি কি না, বলিতে পারি না।

হাসিয়া হাসিয়া মুখ নিরখিয়া
মধুর কথাটী কয়।
ছায়ার সহিতে ছায়া মিশাইতে
পথের নিকটে রয়॥
আলো সই সে জন মানুষ নয়
তাহার সঙ্গে যে করে পিরীতি
কি জানি কি তার হয়
সহজে রসের আকর সে যে
ভাবের অঙ্কুর তায়
বাতাসে বসন উড়িতে আপন
অঙ্গেতে ঠেকাইয়া যায়॥
চমক চলনি ও গীম দোলনি
রমণী মানস চোর
জ্ঞানদাস কহে সো পিয়া পিরীতি
মরমে পশিল তোর॥

প্রণয়ের কি সুন্দর অভিব্যক্তি! আসঙ্গলিপ্সার কি মনোরম চিত্র! যাহাকে ভালবাসি, তাহাকে পাইবার, তাহাকে স্পর্শ করিবার লালসা যদি হৃদয়ে প্রবলবেগে প্রবেশ না করে, তাহা হইলে আমার মনে ভালবাসা আসে নাই, ইহা ধ্রুব সত্য।

দূরে রও ঊর্দ্ধে রও দেবী হয়ে পূজা লও
পূজিবার দেহ অধিকার।
এর বেশী নাহি চাই এও কেন নাহি পাই
এও কেন অদেয় তোমার। (১)

এই কবিতাটী খুব পবিত্র প্রেম ব্যক্ত করিতেছে, বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহাও যথার্থ ভালবাসা নয়, একটা ক্ষণস্থায়ী ভাবমাত্র বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, জগতের সকল শ্রেষ্ঠ কবিগণই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন যে, প্রেম রূপজই হউক অথবা গুণজই হউক, প্রণয়পাত্রের আসঙ্গলিপ্সা প্রেমের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যে ভালবাসায় লালসা নাই, সে ভালবাসা এখনও জন্মে নাই—তাহা মনের কামজ বিকারমাত্র। এই সহজ কথাটুকু প্রণয়তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণব কবি বিস্মৃত হন নাই; হইলে—তাঁহাদের গীতাবলী কখনই এমন স্বাভাবিক, এমন মর্ম্মস্পর্শী হইত না। শ্রীমতীর রসোদ্গারে বড় বড় কথা, বড় বড় ভাব, আদর্শ প্রেমের জটিল বাক্যাবলী কিছুই নাই, কিন্তু ঐ পদগুলির ভিতর এমন একটী সরল স্বাভাবিকতা, এমন একটী নৈসর্গিক প্রেম-প্রবণতা বিদ্যমান আছে যে, তাহা আমাদিগকে শুধু আকর্ষণ করে না, মুগ্ধ করিয়া ফেলে।

সই পিরীতি পিয়া সে জানে
যে দেখি যে শুনি চিতে অনুমানি
নিছনি দিয়ে পরাণে॥
মো যদি সিনানে আগিলা ঘাটে
পিছিলা ঘাটে সে নায়।
মোর অঙ্গের জল পরশ লাগিয়া
বাহু পাসরিয়া রয়॥
বসনে বসন লাগিবে লাগিয়া
একাই রজকে দেয়।
মোর নামের আধ আখর পাইলে
হরিষ হইয়া লয়॥

(১) কামিনী রায়—আলো ও ছায়া।

ছায়ায় ছায়ায় লাগিবে লাগিয়া
ফিরায় কতেক পাকে।
আমার অঙ্গের বাতাস যে দিকে
সে মুখে সেদিনে থাকে॥
মনের আকুতি বেকত করিতে
কত না সন্ধান জানে।
পায়ের সেবক রায় শেখর
কিছু বুঝে অনুমানে॥

কি অপূর্ব্ব ভালবাসা! কি মধুর আকাঙ্ক্ষা! প্রিয়ের ভালবাসা ব্যক্ত করিতে শ্রীরাধার কি অপার আনন্দ—

কহিতে কানুর বিলাস কথা।
ছল ছল ভেল নয়ন পাতা॥
গদ গদ কণ্ঠে না সরে বাণী।
বিবরণ ভেল কি হৈল জানি॥
পুলকে পূরল সকল দেহ।
স্তবধ হইল না চলে সেহ॥
* * *
রাই কহে মোর জীবন কানু।
সে গুণ কহিতে অবশ তনু॥

পরিশেষে কবি যথার্থ কহিয়াছেন—

শেখর কহয়ে বহিয়া তাই।
এমন প্রেমের বালাই যাই॥

ভক্তের আনন্দ এত উপাদেয়, এত পবিত্র যে, তাহা ভগবানেরও লোভনীয়। বৈষ্ণব দার্শনিক ঐ বিষয়ে কহিয়াছেন—

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥ (১)

ভক্তই বুঝিতে পারেন, ভগবানের ভক্ত-প্রেম কত প্রগাঢ়, তাই ভক্ত কবি শ্রীরাধার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—আদি, ৪র্থ।

যবে দেখা দেখি হেয়ে, হেন তার মনে লয়ে
নয়নে নয়নে মোরে পিয়ে।
পিরীতি আরতি দেখি, হেন মনে লয় সখি,
আমি তাহে চাহিলে সে জীয়ে॥

বৈষ্ণব কবির এই সরস ও প্রগাঢ় উক্তি আমাদিগকে সর্ব্বদা কালিদাসকে মনে করাইয়া দেয়।

পপৌ নিমেষালসপক্ষ্মপংক্তি
রুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্॥ *

রূপ হইতে এই অলৌকিক ভালবাসার সৃষ্টি ও গুণে ইহার পুষ্টি ও স্থায়িত্ববিধান—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।

তাই বৈষ্ণব কবি রূপের পক্ষপাতী; তাই ভক্ত ভগবানের স্বরূপ ও তাঁহাদের দৈহিক এবং মানসিক সৌন্দর্য্য তাঁহাদের চিরলোভনীয় প্রত্যক্ষ করিবার বিষয়। অশেষ সাধনার বলে তাই ঐ দুই মূর্ত্তি তাঁহাদের হৃদয়ে প্রতিফলিত করিবার উদ্দাম আকাঙ্ক্ষা। ভক্ত তাই যুগলমূর্ত্তি চিত্রিত করিতে যুগলবিগ্রহের প্রত্যেক সৌন্দর্য্য ভক্তিবিগলিত তুলিকাস্পর্শে সজীব করিয়া তুলিতে সতত প্রয়াসী ও অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য। রূপ বর্ণনায় বৈষ্ণব কবি সিদ্ধহস্ত। প্রেমিকের মুখে প্রণয়িনীর রূপ বর্ণনা যেমন মধুর, প্রেমিকার মুখে প্রণয়ভাজনের রূপবিবৃতিও তেমনি উপাদেয়। সুচতুর শিল্পী বৈষ্ণব কবি তাই শ্রীরাধার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা করাইয়াছেন। অপূর্ব্ব কৌশল! যাহা তৃতীয় লোকের মুখে হয়তো অস্বাভাবিক, তাহা প্রেমিকপ্রেমিকার মুখে অত্যন্ত স্বাভাবিক। কাব্যে উপমার সার্থকতা আমরা এইখানে বেশ বুঝিতে পারি। প্রণয়াস্পদের রূপ-বর্ণনায় প্রেমিকপ্রেমিকা জগতের সকল সৌন্দর্য্য একত্র সমাবেশ করিতে চায়—তাহাতেও সে রূপের তুলনা মিলে না। রাশি রাশি উপমা একত্র পুঞ্জীভূত হইলেও এরূপ ক্ষেত্রে রূপবর্ণনা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না।

যখন কালিদাসের বিরহ বিধুর যক্ষ নিজ প্রিয়তমার পরিচয়চ্ছলে মেঘকে বলিতেছে—

* রঘুবংশ—২য় সর্গ।

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাম্
যা তত্র স্যাদ্যুবতীবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ॥
তাং জানীয়াঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু চ দিবসেষু গচ্ছৎসুবালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্॥ (১)

তখন এই উপমাগুলি আমাদিগের অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। অথবা যখন দুষ্মন্ত শকুন্তলার বর্ণনায় বলিতেছেন—

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ-
রনাবিদ্ধং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখণ্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং।
ন জানে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ॥ (২)

তখনও ইহাতে অস্বাভাবিকতার বিকটমূর্তি প্রকাশ পায় না। কবিকুল, কে—কবে—উপমার সাহায্য ব্যতিরেকে প্রিয়-মূর্তির বর্ণনা প্রিয়ের মুখ দিয়া করাইয়াছেন? Shakespeare, Milton প্রভৃতি ইংরাজ কবিগণও এই পথাবলম্বী। জুলিয়েটকে গবাক্ষপথে দেখিয়া প্রেমিক রোমিও বলিয়াছিল-

It is the East and Juliet is the Sun.
Arise fair Sun and kill the envious Moon
Who is already sick and pale with grief,
That thou her maid is more fair than she. (৩)

এ বিষয়ে উদাহরণ-বাহুল্যের প্রয়োজন নাই, কেবল প্রসিদ্ধ মার্কিন পণ্ডিত ইমার্সন (Emerson) এই সম্বন্ধে যে গুটিকতক সারগর্ভ কথা বলিয়াছেন, তাহা বিদেশীয় পণ্ডিতোক্তি হইলেও শ্রবণযোগ্য মনে করিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিব—

(১) মেঘদূত—উত্তর মেঘ।
(২) অভিজ্ঞানশকুন্তলম্—২য় অঙ্ক।
(৩) Romeo and Juliet—Act II. Sc. II

"The lover can not paint his maiden to his fancy poor and solitady....... So that the maiden stands to him for a representative of all select things and virtues. The lover sees no resemblance except to summer evenings and diamond mornings to rainbow and songs of birds." (১)

বৈষ্ণব কবিও উপমার সাহায্যে রূপবর্ণনা করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি; আর একটী মাত্র কবিতা এখানে উদ্ধৃত করিব। মহাকবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন—

কবরীভয়ে চামরী গিরিকন্দরে।
মুখভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়নভয়ে স্বরভয়ে কোকিল
গতিভয়ে গজ বনবাসে॥
সুন্দরি! কাহে তু না মোহে সম্ভাষি যাসি
তুয়া ডরে ইহ সব দূরে পলাওয়ল
তুঁহু পুন কাহে ডরাসি॥
কুচভয়ে কমলকোরক জলে মুদি রহু।
ঘট পরবেশে হুতাশে।
দাড়িম্ব শ্রীফল গগনে বাসকরু
শম্ভু গরল করে গ্রাসে॥
ভুজভয়ে কনক মৃণাল পঙ্কে রহু
করভয়ে কিসলয় কাঁপে।
বিদ্যাপতি কহ কত কত ঐ ছন।
কহব মদন পরতাপে॥

প্রেমিক-শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণের মুখে শ্রীরাধার এইরূপ অত্যুক্তিপূর্ণ বর্ণনাও অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

কি রূপ দেখিনু মধুর মূরতি।
নাগর রসের সার।
হেন মনে হয় এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক তার॥

(১) Essay on Love.

অনেকে প্রশ্ন করিতে পারেন যে, ভগবান্ ভক্তের রূপে মুগ্ধ হইলেন কিরূপে? ভক্ত ভগবানের রূপে মুগ্ধ হইবে বিচিত্র নহে, কিন্তু ভগবানের কি ঐরূপ হওয়া সম্ভব?—তবে বুঝি এক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলী শুধু প্রেমিক-প্রেমিকার গান, ভক্তভগবানের গান নহে। এ সন্দেহের কোনও কারণ থাকিতে পারে না। যিনি ভগবানের আনন্দদায়িনী শক্তি, তিনি কখনও কুরূপা হইতে পারেন না—উহা বৈষ্ণবভক্ত কবিগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মূর্ত্তিমতী হ্লাদিনীর অনন্ত গুণ, তন্মধ্যে রূপ একটী প্রধান গুণ। শ্রীরূপ গোস্বামী কহিয়াছেন—

"মধুরেয়ং নববয়াশ্চলাপাঙ্গোজ্জ্বলস্মিতা॥ (১)

সে সৌন্দর্য্য অমানুষ, অপরিমেয়, সে সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে ভগবানেরও তৃপ্তি হয় না—

তুমি মোর নিধি রাই তুমি মোর নিধি।
না জানি কি দিয়া তোমায় নিরমিল বিধি॥
বসিয়া দিবস রাতি অনিমিখ আঁখি।
কোটী কল্প যদি নিরবধি দেখি॥
তবু তিরপিত নহে এ দুই নয়ান।
জাগিতে তোমারে দেখি স্বপন সমান॥

ঠিক এমনি মনোহর ভাব, ঠিক এমনি তৃপ্তিহীন দর্শনাকাঙ্ক্ষা বিদ্যাপতি শ্রীরাধার মুখ দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—

"জনম জনম হাম রূপ নিরখিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥

ক্রমশঃ।

(১) উজ্জ্বলনীলমণি—শ্রীরাধিকা গুণকথন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

[স্বামী সারদানন্দ।]

ভক্তসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ।

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংংশসম্ভবম্॥ শ্রীগীতা-

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত চরিত্র কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝিতে হইলে ভক্তসঙ্গে তাঁহাকে দেখিতে হইবে। কিরূপে কতভাবে ঠাকুর তাঁহার নানা প্রকৃতির ভক্তবৃন্দের প্রত্যেকের সহিত প্রতিদিন উঠা বসা, কথাবার্ত্তা, হাসি তামাসা, ভাব সমাধিতে থাকিতেন, তাহা শুনিতে ও তলাইয়া বুঝিতে হইবে—তবেই তাঁহাকে একটু আধটু বুঝিতে পারা যাইবে। কারণ, আমরা যতদূর দেখিয়াছি, এ অলোকসামান্য মহাপুরুষের অতি সামান্য চেষ্টাদিও উদ্দেশ্যবিহীন বা অর্থশূন্য ছিল না! এমন অপূর্ব্ব দেব ও মানবভাবের একত্র সম্মিলন আর কোথাও দেখা দুর্ল্লভ—অন্ততঃ পৃথিবীর নানা স্থানে এই পঁচিশ বৎসর ধরিয়া ঘুরিয়াও আমাদের চক্ষে আর একটিও পড়ে নাই! কথায় বলে—'দাঁত থাক্‌তে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না!'—ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের অনেকের ভাগ্যেই তাহা হইয়াছে! গলার অসুখের চিকিৎসা করাইবার জন্য ভক্তেরা যখন ঠাকুরকে কিছুদিন কলিকাতায় শামপুকুরে আনিয়া রাখেন, তখন শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদিন তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া আমাদিগকে নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেন; শ্রীযুত বিজয় ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে ঢাকায় অবস্থান কালে একদিন নিজের ঘরে খিল দিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ দর্শন পান এবং উহা আপনার মাথার খেয়াল কি না জানিবার জন্য সম্মুখাবস্থিত দৃষ্ট মূর্ত্তির শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি বহুক্ষণ ধরিয়া স্বহস্তে টিপিয়া টিপিয়া দেখিয়া যাচাইয়া লন—সে কথাও ঐ দিন ঠাকুরের ও আমাদের সম্মুখে তিনি মুক্তকণ্ঠে বলেন! শ্রীযুত বিজয়—"দেশ বিদেশ পাহাড় পর্ব্বত ঘুরে ফিরে অনেক সাধু মহাত্মা দেখ্‌লাম, কিন্তু (ঠাকুরকে দেখাইয়া) এমনটি আর কোথাও দেখ্‌লাম না; এখানে যে ভাবের পূর্ণপ্রকাশ দেখ্‌ছি, তাহারই কোথাও দুআনা, কোথাও এক আনা,

কোথাও এক পাই, কোথাও আধ পাই মাত্র; চার আনাও কোন জায়গায় দেখ্‌লাম না!" ঠাকুর—(মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে আমাদিগকে) 'বলে কি!' শ্রীযুত বিজয়—(ঠাকুরকে) "সেদিন ঢাকাতে যেরূপ দেখেছি, আর 'না' বল্‌লে আমি শুনি না; অতি সহজ হয়েই আপনি যত গোল করেছেন। কল্‌কাতার পাশেই দক্ষিণেশ্বর; যখনি ইচ্ছা তখনি এসে আপনাকে দর্শন কর্‌তে পারি; আস্‌তে কোন কষ্টও নাই—নৌকা, গাড়ী যথেষ্ট; ঘরের পাশে এইরূপে এত সহজে আপনাকে পাওয়া যায় ব'লেই আমরা আপনাকে বুঝ্‌লাম না। যদি কোন পাহাড়ের চূড়োয় বসে থাক্‌তেন, আর পথ হেঁটে অনাহারে গাছের শিকড় ধরে উঠে আপনার দর্শন পাওয়া যেত, তাহলে আমরা আপনার কদর কর্‌তাম; এখন মনে করি ঘরের পাশেই যখন এই রকম, তখন না জানি বাহিরে দূর দূরান্তরে আরও কত ভাল ভাল সব আছে; তাই আপনাকে ফেলে ছুটোছুটি করে মরি, আর কি!"

বাস্তবিকই তাহা! করুণাময় ঠাকুর যেই তাঁহার নিকট আসিত, তাহাদের প্রায় সকলকেই আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতেন, একবার গ্রহণ করিলে সে ছাড়ি ছাড়ি করিলেও আর ছাড়িতেন না এবং কখন কোমল, কখন কঠোর হস্তে তাহার জন্মজন্মার্জ্জিত সংস্কার-রাশিকে শুষ্ক, দগ্ধ করিয়া নিজের নূতন ভাবে অদৃষ্টপূর্ব্ব, অমৃতময় ছাঁচে নূতন করিয়া গঠন করিয়া তাহাকে চিরশান্তির অধিকারী করিতেন! ভক্তেরা বুকে হাত দিয়া আপনাপন জীবনকথা খুলিয়া বলিলে, এ কথার আর সন্দেহ থাকিবে না। তাই দেখিতে পাই—শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ স্বগৃহে অবস্থান কালে কোন সময়ে সংসারাদি দুঃখ কষ্টে অভিভূত হইয়া এবং 'এতদিন ধরিয়া শ্রীভগবানের শরণাপন্ন থাকিয়াও তাঁহার সাক্ষাৎকার পাইলাম না ঠাকুরও কিছুই করিয়া দিলেন না' ভাবিয়া অভিমানে লুকাইয়া গৃহত্যাগে উদ্যত হইলে, ঠাকুর তখন তাঁহাকে তাহা করিতে দিতেছেন না। দৈবশক্তি প্রভাবে তাঁহার উদ্দেশ্য জানিতে পারিয়া বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে সেদিন দক্ষিণেশ্বরে সঙ্গে আনিয়া তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ভাবাবেশে গান ধরিয়াছেন—"কথা কহিতেও ডরাই, না কহিতেও ডরাই; আমার মনে সন্দ হয় বুঝি তোমায় হারাই—হা, রাই!" ও নানাপ্রকারে বুঝাইয়া সুঝাইয়া তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিতেছেন! আবার দেখি—'বকলমা' লাভে কৃতার্থ হইয়াও যখন শ্রীযুত গিরিশ পূর্ব্বসংস্কারের প্রতাপ স্মরণ করিয়া নিশ্চিন্ত ও ভয়শূন্য হইতে পারিতেছেন

-না, তখন তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিতেছেন, "এ কি ঢোঁড়া সাপে তোকে ধরেছে রে শালা? জাত্ সাপে ধরেছে—পালিয়ে বাসায় গেলেও মরে থাক্‌তে হবে! দেখিস্ নে?—ব্যাঙ্‌গুলোকে যখন ঢোঁড়া সাপে ধরে, তখন ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ করে হাজার ডাক ডেকে তবে ঠাণ্ডা হয় (মরে যায়), কোনটা বা ছাড়িয়ে পালিয়েও যায়; কিন্তু যখন কেউটে গোখ্‌রোতে ধরে, তখন ক্যাঁ-ক্যাঁ-ক্যাঁ তিন ডাক ডেকেই আর ডাক্‌তে হয় না, সব ঠাণ্ডা! যদি কোনটা দৈবাৎ পালিয়েও যায় তো গর্ত্তে ঢুকে মরে থাকে!—এখানকার সেইরূপ জান্‌বি!" কিন্তু কে তখন ঠাকুরের ঐ সব কথা বা ব্যবহারের মর্ম্ম বুঝে? সকলেই ভাবিত, ঠাকুরের মত পুরুষ বুঝি সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। ঠাকুর যেমন সকলের সকল আবদার সহিয়া বরাভয় হস্তে সকলের দ্বারে অযাচিত হইয়া ফিরিতেছেন, সর্ব্বত্রই বুঝি এইরূপ! করুণাময় ঠাকুরের স্নেহের অঞ্চলে আবৃত থাকিয়া ভক্তদের তখন জোর কত, আবদার কত, অভিমানই বা কত! প্রায় সকলেরই মনে হইত, ধর্ম্মকর্ম্মটা অতি সোজা সহজ জিনিস। যখনি ধর্ম্মরাজ্যের যে ভাব দর্শনাদি লাভ করিতে ইচ্ছা হইবে, তখনি তাহা পাইব—নিশ্চিত। ঠাকুরকে একটু ব্যাকুল হইয়া জোর করিয়া ধরিলেই হইল—ঠাকুর তখনি তাহা অনায়াসে স্পর্শ বা বাক্য বা কেবলমাত্র ইচ্ছা দ্বারাই লাভ করাইয়া দিবেন—বস্। এই আর কি। ইহার কতই বা দৃষ্টান্ত দিব! লেখাপড়ার ভিতর দিয়া কটাই বা বলা যায়!

শ্রীযুত বাবুরামের (স্বামী প্রেমানন্দের) ইচ্ছা হইল, তাঁহার ভাবসমাধি হউক। ঠাকুরকে যাইয়া কান্নাকাটি করিয়া সটেপটে ধরিলেন—"আপনি ক'রে দেন"। ঠাকুর তাঁহাকে শান্ত করিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, মাকে বল্‌ব; আমার ইচ্ছাতে কি হয় রে?"—ইত্যাদি। কিন্তু ঠাকুরের সে কথা কে শোনে? বাবুরামের ঐ এক কথা—'আপনি ক'রে দেন'। এইরূপ আবদারের কয়েক দিন পরেই শ্রীযুত বাবুরামকে কার্য্যবশতঃ নিজেদের বাটী আঁটপুরে যাইতে হইল। এদিকে ঠাকুর তো ভাবিয়া আকুল—কি করিয়া বাবুরামের ভাবসমাধি হইবে! একে বলেন, ওকে বলেন—"বাবুরাম ঢের করে কাঁদাকাটা করে বলে গেছে যেন তার ভাব হয়—কি হবে? যদি না হয়, তবে সে আর এখানকার কথা মান্‌বে নি।" তারপর মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) বলিলেন, 'মা, বাবুরামের যাতে একটু ভাবটাব হয়, তাই করে দে'। মা বলিলেন, 'ওর ভাব হবে না; ওর জ্ঞান হবে।' ঠাকুরের শ্রীশ্রীজগদম্বার ঐ বাণী

শুনিয়া আবার ভাবনা! আমাদের কাহার কাহার কাছে বলিলেনও—"তাইতো বাবুরামের কথা মাকে বল্লুম, তা মা বল্লে, 'ওর ভাব হবে নি, ওর জ্ঞান হবে;' তা যাই হোক, একটা কিছু হয়ে তার মনে শান্তি হলেই হ'ল, না হলে সে আর এখানে মানবে নি; তার জন্যে মনটা কেমন কর্‌চে—অনেক কাঁদা কাটা করে গেছে"—ইত্যাদি! আহা সে কতই না ভাবনা, যাতে বাবুরামের কোনরূপ সাক্ষাৎ ধর্ম্মোপলব্ধি হয়! আবার সেই ভাবনার কথা বলবার সময় ঠাকুরের কেমন বলা—'এটা না হলে ও আর মানবে নি!'—যেন তার মানা না মানার উপর ঠাকুরের সকলই নির্ভর করিতেছে!

আবার কখন কখন বলা হইত—"আচ্ছা বল্ দেখি, এই সব এদের (বালক ভক্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া) জন্যে এত ভাবি কেন? এর কি হ'ল না হ'ল, ওর কি হ'ল না হ'ল, এত সব ভাবনা হয় কেন? এরা তো সব ইস্কুল-বয় (school boy); কিছুই নেই—এক পয়সার বাতাসা দিয়ে যে আমার খবরটা নেবে, সে শক্তি নেই; তবু এদের জন্যে এত ভাবনা কেন? কেউ যদি দুদিন না এসেছে তো অমনি তার জন্যে প্রাণ আঁচোড় পাঁচোড় করে, তার খবরটা জানতে ইচ্ছা হয়—এ কেন?" জিজ্ঞাসিত বালক হয়ত বলিল—'তা কি জানি মশাই, কেন হয়। তবে তাদের মঙ্গলের জন্যই হয়।' ঠাকুর—"কি জানিস্, এরা সব শুদ্ধসত্ত্ব, কাম-কাঞ্চন এদের এখনও স্পর্শ করে নি, এরা যদি ভগবানে মন দেয় তো তাঁকে লাভ করতে পারবে, এইজন্যে! এখানকার যেন গাঁজাখোরের স্বভাব; গাঁজাখোরের যেমন, একলা খেয়ে তৃপ্তি হয় না—একটান টেনেই কল্‌কেটা অপরের হাতে দেওয়া চাই, তবে নেশা জমে—সেই রকম! তবু আগে আগে নরেন্দরের জন্যে যেমনটা হ'ত, তার মত এদের কারুর জন্যে হয় না। দু দিন যদি আসতে দেরি করেছে তো বুকের ভিতরটায় যেন গামছায় মোচড় দিত! লোকে কি বলবে বলে, ঝাউতলায় * গিয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতুম। হাজরা † (এক সময়ে) বলেছিল, 'ও কি তোমার স্বভাব? তোমার পরমহংস অবস্থা, তুমি সর্ব্বদা তাঁতে (শ্রীভগবানে) মন দিয়ে সমাধি লাগিয়ে তাঁর সঙ্গে এক হয়ে

---

* রাণী রাসমণির কালীবাটীর উত্তরাংশে অবস্থিত ঝাউ বৃক্ষগুলি। উদ্যানের ঐ অংশ শৌচাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকায় ঐ দিকে কেহ অন্য কোন কারণে যাইত না।

† শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ হাজরা—ইতিপূর্ব্বে ইঁহার নাম শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলায় উল্লিখিত হইয়াছে।

থাক্‌বে, তা না নরেন্দ্র এলো না কেন, ভবনাথের কি হবে—এ সব ভাব কেন?' শুনে ভাবলুম, 'ঠিক বলেছে, আর অমনটা করা হবে নি; তার পর ঝাউতলা থেকে আসচি আর (শ্রীজগদম্বা) দেখাচ্চে কি, যেন কল্‌কাতাটা সামনে আর লোকগুলো সব কাম-কাঞ্চনে দিন রাত ডুবে রয়েছে আর যন্ত্রণা ভোগ কচ্চে! দেখে দয়া এলো। মনে হ'ল, লাখ জন্ম কষ্ট পেয়েও যদি এদের মঙ্গল হয়, উদ্ধার হয় ত তা করবো! তখন ফিরে এসে হাজরাকে বল্লুম—বেশ করেছি, এদের জন্যে সব ভেবেছি, তোর কি রে শালা? * * * নরেন্দর একবার বলেছিল, 'তুমি অত নরেন্দর নরেন্দর কর কেন? অত নরেন্দর নরেন্দর কর্‌লে তোমায় নরেন্দ্রের মত হতে হবে। ভরত রাজা হরিণ ভাব্‌তে ভাব্‌তে হরিণ হয়েছিল'—নরেন্দরের কথায় খুব বিশ্বাস কি না? শুনে ভয় হল! মাকে বল্‌লুম। মা বল্‌লে, 'ও ছেলে মানুষ; ওর কথা শুনিস কেন? ওর ভিতরে নারায়ণকে দেখতে পাস্, তাই ওর দিকে টান হয়।' শুনে তখন বাঁচলুম! নরেন্দরকে এসে বল্‌লুম—তোর কথা আমি মানি না; মা বলেছে, তোর ভিতর নারায়ণকে দেখি বলেই তোর উপর টান হয়; যে দিন তা না দেখতে পাব, সে দিন থেকে তোর মুখও দেখব না রে শালা!" এইরূপে অদ্ভুত ঠাকুরের অদ্ভুত ব্যবহারের প্রত্যেকটিরই অর্থ ছিল আর আমরা তাহা না বুঝিয়া বিপরীত ভাবিলে পাছে আমাদের অকল্যাণ হয়, সেজন্য এইরূপে বুঝাইয়া দেওয়া ছিল!

গুণীর গুণের কদর, মানীর মান রক্ষা ঠাকুরকে সর্ব্বদাই করিতে দেখিয়াছি। বলিতেন, 'ওরে মানীকে মান না দিলে ভগবান্ রুষ্ট হন; তাঁর (শ্রীভগবানের) শক্তিতেই তো তারা বড় হয়েছে, তিনিই তো তাদের বড় করেছেন—তাদের অবজ্ঞা কর্‌লে তাঁকে (শ্রীভগবান্‌কে) অবজ্ঞা করা হয়।' তাই দেখিতে পাই, যখনই ঠাকুর কোথাও কোন বিশেষ গুণী পুরুষের খবর পাইতেন, অমনি তাঁহাকে কোন না কোন উপায়ে দর্শন করিতে ব্যস্ত হইতেন। উক্ত পুরুষ যদি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে তো কথাই নাই, নতুবা স্বয়ং তাঁহার নিকট অনাহুত হইয়াও গমন করিয়া তাঁহাকে দর্শন, প্রণাম ও আলাপ করিয়া আসিতেন! বর্দ্ধমানরাজের সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কাশীধামের প্রসিদ্ধ বীণকার মহেশ, শ্রীবৃন্দাবনে সখিভাবে ভাবিতা গঙ্গামাতা, ভক্তপ্রবর কেশব সেন—ঐরূপ আরও কত লোকেরই না নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে—ইঁহাদের

প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ গুণের কথা শুনিয়া দর্শন করিবার জন্য অনুসন্ধান করিয়া ঠাকুর স্বয়ং ইঁহাদের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন! অবশ্য ঠাকুরের ঐরূপে অযাচিত হইয়া কাহারও দ্বারে উপস্থিত হওয়াটা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে—কারণ, 'আমি এত বড়লোক, আমি অপরের নিকট এইরূপে যাইলে খেলো হইতে হইবে, মর্য্যাদাহানি হইবে', এ সব ভাব তো ঠাকুরের মনে কখন উদয় হইত না? অহঙ্কার অভিমানটাকে তিনি যে একেবারে ভস্ম করিয়া গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন! কালীবাটিতে কাঙ্গালী ভোজনের পর কাঙ্গালীদের উচ্ছিষ্ট পাতাগুলি মাথায় করিয়া বহিয়া বাহিরে ফেলিয়া আসিয়া স্বহস্তে ঐ স্থান পরিষ্কার করিয়াছিলেন; সাক্ষান্নারায়ণ জ্ঞানে কাঙ্গালীদের উচ্ছিষ্ট পর্য্যন্ত কোন সময়ে গ্রহণ করিয়াছিলেন; কালীবাটির চাকর বাকর-দিগের জন্য যে স্থান শৌচাদির জন্য নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহাও এক সময়ে স্বহস্তে ধৌত করিয়া নিজকেশ দ্বারা মুছিতে মুছিতে (ঠাকুরের তখন [সাধনকালে] নিজের শরীরের দিকে আদৌ দৃষ্টি না থাকায়, মাথায় বড় বড় চুল হইয়াছিল ও ধূলি লাগিয়া উহা আপনা আপনি জটা পাকাইয়া গিয়াছিল) জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'মা, উহাদের চাইতে বড়, এ ভাব আমার যেন কখন না হয়'! তাই ঠাকুরের জীবনে অদ্ভুত নিরভিমানতা দেখিলেও আমাদের বিস্ময়ের উদয় হয় না, কিন্তু অপর সাধারণের যদি এতটুকু অভিমান কম দেখি তো 'কি আশ্চর্য্য' বলিয়া উঠি! কারণ, ঠাকুর তো আর আমাদের এ সংসারের লোক ছিলেন না! ঠাকুর কালীবাটির বাগানে কোঁচার খুট্‌টি গলায় দিয়া বেড়াইতেছেন, কৈলাসবাবু তাঁহাকে সামান্য মালী জ্ঞানে বলিলেন, 'ওহে, আমাকে ঐ ফুলগুলি তুলিয়া দাও তো', ঠাকুরও দ্বিরুক্তি না করিয়া তদ্রূপ করিয়া দিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া গেলেন! মথুর বাবুর পুত্র পরলোকগত ত্রৈলোক্য বাবু এক সময়ে ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদুর (হৃদয় নাথ মুখোপাধ্যায়) উপর বিরক্ত হইয়া হৃদয়কে অন্যত্র গমন করিতে হুকুম করেন। সে সময় নাকি ঠাকুরেরও আর কালীবাটিতে থাকিবার আবশ্যকতা নাই, রাগের মাথায় তিনি এইরূপ ভাব অপরের নিকট প্রকাশ করেন। ঠাকুরের কাণে ঐ কথা উঠিবামাত্র তিনি হাসিতে হাসিতে গামছাখানি কাঁধে ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে যাইতে উদ্যত হইলেন। প্রায় গেট্ পর্য্যন্ত গিয়াছেন, এমন সময় ত্রৈলোক্য বাবু আবার অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীত হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন ও 'আপনাকে ত আমি যাইতে বলি নাই, আপনি

কেন যাইতেছেন' ইত্যাদি বলিয়া ঠাকুরকে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুরও যেন কিছুই হয় নাই, এরূপ ভাবে পূর্ব্বের ন্যায় হাসিতে হাসিতে আপনার কক্ষে আসিয়া উপবেশন করিলেন! এরূপ আরও কত ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে—ঐ সকল ব্যবহারে আমরা যত আশ্চর্য্য না হই, সংসারের অপর কেহ যদি অতটাও না করিয়া এতটুকু ঐরূপ কাজ করে তো একেবারে ধন্য ধন্য করি! কেননা, আমরা মুখে বলি আর নাই বলি, মনের ভিতরে ভিতরে একেবারে ঠিক দিয়া রাখিয়াছি যে, সংসারে থাকিতে গেলেই 'নিজের কোলে ঝোল টানিতে হইবে,' দুর্ব্বলকে সবল হস্তে সরাইয়া নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে, আপনার কথা ষোলকাহন করিয়া ডঙ্কা বাজাইতে হইবে, নিজের দুর্ব্বলতাগুলি অপরের চক্ষুর অন্তরালে যত পারি লুকাইয়া রাখিতে হইবে, আর সরল ভাবে ভগবানের বা মানুষের উপর ষোল আনা বিশ্বাস করিলে একেবারে 'কাজের বার' হইয়া 'বয়ে' যাইতে হইবে! হায় রে সংসার, তোমার আন্তর্জাতিক নীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও ব্যক্তিগত ধর্ম্মনীতি—সর্ব্বত্রই এইরূপ! তোমার 'দীল্লিকা লাড্ডু' যে খাইয়াছে, সে তো পশ্চাত্তাপ করিতেছেই—যে না খাইয়াছে, সেও তদ্রূপ করিতেছে!

কোন কোন গুণীপুরুষ আবার ঠাকুরের অদ্ভুত জীবনকথায় আকৃষ্ট হইয়া স্বয়ং দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়াছিলেন—যথা, পণ্ডিত শশধরাদি। পণ্ডিত শশধর, আমাদের যতদুর মনে হইতেছে, দক্ষিণেশ্বরেই ঠাকুরের প্রথম দর্শন লাভ করেন। সেটা ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ। ঐ সময়ে ঠাকুরের বিশেষ প্রকট ভাব। তাঁহার অদ্ভুত আকর্ষণে তখন নিত্য কত নূতন নূতন লোক দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইতেছে। কলিকাতার ছোট বড় সকলে তখন 'দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসের' নাম শুনিয়াছে এবং অনেকে তাঁহাকে দর্শনও করিয়াছে। আর কলিকাতার জনসাধারণের মন অধিকার করিয়া ভিতরে ভিতরে যেন একটা ধর্ম্মস্রোত নিরন্তর বহিয়া চলিয়াছে! হেথায় হরিসভা হোথায় ব্রাহ্মসমাজ, হেথায় নাম সঙ্কীর্ত্তন হোথায় ধর্ম্মব্যাখ্যা, ইত্যাদিতে তখন কলিকাতানগরী পূর্ণ! আর সকলে ঐ বিষয়ের কারণ না বুঝিলেও ঠাকুর বিলক্ষণ বুঝিতেন এবং তাঁহার স্ত্রী-পুরুষ উভয়বিধ ভক্তের নিকটই ঐ কথা অনেকবার বলিয়াছিলেন। আমাদের জনৈক পরমবন্ধু বলেন, ঠাকুর একদিন তাঁহাকে বলিতেছেন—'ওগো এই যে সব দেখ্‌ছ, এত

হরিসভা টরিসভা, এ সব জান্‌বে (নিজ শরীর দেখাইয়া) এইটের জন্যে। এ সব কি ছিল? কেমন এক রকম সব হয়ে গিয়েছিল। (পুনরায় নিজ শরীর দেখাইয়া) এইটে আসার পর থেকে এসব এত হয়েছে, ভিতরে ভিতরে একটা ধর্ম্মের স্রোত বয়ে যাচ্ছে!' আবার এক সময়ে বলিয়াছিলেন —"এই যে দেখ্‌ছ সব 'ইয়াং বঙ্গাল্‌' (Young Bengal) এরা কি ভক্তি টক্তির ধার ধারতো? মাথা নুইয়ে পেন্নামটা (প্রণাম) করতেও জানতো না! মাথা নুইয়ে আগে পেন্নাম করতে করতে তবে এরা ক্রমে ক্রমে মাথা নোয়াতে শিখেছে! কেশবের বাড়ীতে দেখা করতে গেলুম, দেখি চেয়ারে বসে লিখ্‌ছে। মাথা নুইয়ে পেন্নাম কর্‌লুম, তাতে অমনি ঘার নেড়ে একটু সায় দিলে! তারপর আসবার সময় একেবারে ভুঁয়ে মাথা ঠেকিয়ে পেন্নাম করলুম। তাতে হাত জোড় করে একবার মাথায় ঠেকালে! তারপর যত যাওয়া আসা হতে লাগলো, আর মাথা হেঁট করে পেন্নাম করতে লাগ্‌লাম, তত ক্রমে ক্রমে তার মাথা নীচু হয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো। নইলে আগে আগে ওরা কি এসব ভক্তিটক্তি করা জান্‌তো, না মান্‌তো!" যাক্‌ এখন সে সব কথা। নববিধান ব্রাহ্মসমাজে ঠাকুরের সঙ্গলাভ করিয়া যখন খুব জমজমাট চলিয়াছে, সেই সময়েই পণ্ডিত শশধরের হিন্দুধর্ম্ম ব্যাখ্যা করিতে কলিকাতাগমন ও পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের দিক্‌ দিয়া হিন্দুদিগের নিত্যকর্ত্তব্য অনুষ্ঠানগুলি বুঝাইবার চেষ্টা। 'নানা মুনির নানা মত' কথাটি সর্ব্ববিষয়ে সকল সময়েই সত্য; পণ্ডিতজীর বৈজ্ঞানিক-ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা সম্বন্ধেও ঐ কথা মিথ্যা হয় নাই। কিন্তু তাই বলিয়া শ্রোতার হুড়াহুড়ির অভাব ছিল না। আফিসের ফেরতা বাবু ভায়া ও স্কুল কলেজের ছাত্রদিগের ভিড় লাগিয়া যাইত। আল্‌বর্ট হলে স্থানাভাবে ঠেশাঠেশি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইত। সকলেই স্থির, উদ্‌গ্রীব—কোনরূপে পণ্ডিতজীর অপূর্ব্ব ধর্ম্মব্যাখ্যা যদি কতকটাও শুনিতে পায়! আমাদের মনে আছে, আমরাও একদিন কিছুকাল ঐ ভাবে দাঁড়াইয়া দুই পাঁচটা কথা শুনিতে পাইয়াছিলাম এবং ভিড়ের ভিতর মাথা গুঁজিয়া কোনরূপে প্রৌঢ়বয়স্ক পণ্ডিতজীর কৃষ্ণশ্মশ্রুরাজি-শোভিত সুন্দর মুখখানি এবং গৈরিক রুদ্রাক্ষ শোভিত বক্ষঃস্থলের কিয়দংশের দর্শন পাইয়াছিলাম! কলিকাতার অনেক স্থলেই তখন ঐ এক আলোচনা, শশধর পণ্ডিতের ধর্ম্মব্যাখ্যা!

বলে কথা কাণে হাঁটে, কাজেই দক্ষিণেশ্বরের মহাপুরুষের কথা পণ্ডিত-

জীর নিকটে এবং পণ্ডিতজীর গুণপনা ঠাকুরের নিকট পৌঁছিতে বড় বিলম্ব হইল না। ভক্তদিগেরই কেহ কেহ আসিয়া ঠাকুরের নিকট গল্প করিতে লাগিলেন—'খুব পণ্ডিত, বলেনও বেশ; বত্রিশাক্ষরি হরিনামের সেদিন দেবীপক্ষে অর্থ করিলেন, শুনিয়া সকলে বাহবা বাহবা করিতে লাগিল' ইত্যাদি। ঠাকুরও ঐকথা শুনিয়া বলিলেন, 'বটে ? ঐটি বাবু একবার শুন্‌তে ইচ্ছা করে।' তারপর শুন্‌তে পাই ঠাকুর নাকি ভাবাবেশে শশধর পণ্ডিতকে দেখিবার ইচ্ছা শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট প্রকাশ করেন।

দেখা যাইত, ঠাকুরের শুদ্ধ মনে যখন যে বাসনার উদয় হইত, তাহা কোন না কোন উপায়ে পূর্ণ হইতই হইত। কে যেন ঐ বিষয়ের যত প্রতিবন্ধক-গুলি ভিতরে ভিতরে সরাইয়া দিয়া উহার সফল হইবার পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিত! পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম বটে, কায়মনোবাক্যে সত্যপালন ও শুদ্ধ পবিত্র ভাব মনে নিরন্তর রাখিতে রাখিতে মানুষের এমন অবস্থা হয় যে, তখন সে আর কোন অবস্থায় কোন প্রকার মিথ্যাভাব চেষ্টা করিয়াও মনে আনিতে পারে না—যাহা কিছু সংকল্প তাহার মনে উঠে, সে সকলই সত্য হয়। কিন্তু সেটা মানুষের শরীরে যে এতদূর হইতে পারে, তাহা কখনই বিশ্বাস করিতে পারি নাই। এখন ঠাকুরের মনের সংকল্পসকল এইরূপে অতর্কিত-ভাবে সিদ্ধ হইতে পুনঃপুনঃ দেখিয়াই ঐ কথাটায় আমাদের ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস জন্মে। তাই কি ছাই, পূরাপূরি বিশ্বাস ঠাকুরের শরীর বিদ্যমানে জন্মিয়াছিল ? তিনি বলিয়াছিলেন—"কেশব বিজয়ের ভিতর দেখ্‌লাম, এক একটি বাতির শিখার মত (জ্ঞানের) শিখা জ্বল্‌ছে আর নরেন্দরের ভিতর দেখি জ্ঞান-সূর্য্য রয়েছে!" "কেশব একটা শক্তিতে জগৎ মাতিয়েছে, নরেনের ভিতর অমন আঠারটা শক্তি রয়েছে!"—এসব তাঁর নিজের সঙ্ক-ল্পের কথা নয়, ভাবাবেশে দেখা শুনার কথা; কিন্তু ইহাতেই কি তখন বিশ্বাস ঠিক ঠিক দাঁড়াইত ? কখনও ভাবিতাম—হবেও বা, ঠাকুর লোকের ভিতর দেখিতে পান; তিনি যখন বলিতেছেন, তখন ইহার ভিতর কিছু গূঢ় ব্যাপার আছে; আবার কখনও ভাবিতাম, জগদ্বিখ্যাত বাগ্মীভক্ত কেশবচন্দ্র সেন কোথা আর শ্রীযুত নরেন্দ্রের মত একটা স্কুলের ছোঁড়া কোথা!—ইহা কি কখন হইতে পারে ? ঠাকুরের দেখাশুনা কথার উপরেই যখন ঐরূপ সন্দেহ আসিত তখন, 'এইটি ইচ্ছা হয়' বলিয়া ঠাকুর যখন তাঁহার মনোগত সঙ্কল্পের কথা বলিতেন তখন যে সন্দেহ আসিত না, ইহা কেমন করিয়া বলি। যাক্

এ ক্ষেত্রে কিন্তু ঠাকুরের মনে পণ্ডিত শশধরকে দেখিবার সঙ্কল্প উঠিবার কয়েক দিনের মধ্যেই সংবাদ আসিল যে, পণ্ডিতজী ঠাকুরের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিবেন। ক্রমে পণ্ডিত শশধর কোন্ দিন আসিবেন, তাহারও খবর পাওয়া গেল।

বালকস্বভাব ঠাকুরের অনেক সময় বালকের ন্যায় ভয়ও হইত। কোন একজন বিশেষ গুণী তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিবেন শুনিলেই ভয় পাইতেন। ভাবিতেন, তিনি তো লেখা পড়া কিছুই জানেন না, তার উপর কখন কিরূপ ভাবাবেশ হয়, তাহার তো কিছুই ঠিক ঠিকানা নাই, আবার তার উপর ভাবের সময় নিজের শরীরেরই হুঁস থাকে না তো পরিধেয় বস্ত্রাদির!—এরূপ অবস্থায় আগন্তুক কি ভাবিবে ও বলিবে, ইত্যাদি। আমাদের মনে হইত, আগন্তুক যাহাই কেন ভাবুক না, তাহাতে তাঁহার আসিয়া গেল কি? তিনি তো নিজেই বারবার কতলোককে শিক্ষা দিতেছেন, 'লোক না পোক (কীট), লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাক্‌তে নয়,' ইত্যাদি? তবে কি ইনি যশের কাঙ্গালী? কিন্তু যাচাইয়া দেখিতে যাইলেই দেখিতাম—বালক যেমন কোন একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিলে ভয়ে লজ্জায় জড় সড় হয় আবার একটু পরিচয় হইলেই সেই ব্যক্তিরই কাঁধে পিঠে চড়িয়া চুল টানিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে নানারূপ মিষ্ট অত্যাচার করে—ঠাকুরের এ ভাবটিও ঠিক তদ্রূপ। নতুবা মহারাজ যতীন্দ্রমোহন, সুবিখ্যাত কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতির সহিত তিনি যেরূপ স্বাধীনভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, তদ্রূপ কখনই কহিতে পারিতেন না। * তবে কখন কখন আবার দেখা গিয়াছে, ঠাকুর আগন্তুকের পাছে অকল্যাণ হয় ভাবিয়া ভয়ও পাইতেন। কারণ, তাঁহার আচরণ ব্যবহার প্রভৃতি বুঝিতে পারুক বা নাই পারুক, তাহাতে ঠাকুরের কিছু আসিয়া যাইত না সত্য, কিন্তু বুঝিতে না পারিয়া বা বুঝিতে চেষ্টা না করিয়া আগন্তুক যদি ঠাকুরের অযথা নিন্দাবাদ করিত, তাহাতে

* মহারাজ যতীন্দ্রমোহনকে প্রথমেই বলিয়াছিলেন 'তা বাবু, আমি কিন্তু তোমায় রাজা বল্‌তে পারব না'। আবার মহারাজ যতীন্দ্রমোহন নিজের কথা বলিতে বলিতে যখন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত আপনার তুলনা করেন, তখন ঠাকুর বিশেষ বিরক্তির সহিত তাঁহার ঐরূপ বুদ্ধির নিন্দা করিয়াছিলেন। শ্রীযুত কৃষ্ণদাস পালও যখন জগতের উপকার করা ছাড়া আর কোন ধর্ম্মই নাই ইত্যাদি বলিয়া ঠাকুরের সহিত তর্ক উত্থাপন করেন, তখন ঠাকুর বিশেষ বিরক্তির সহিত তাঁহার বুদ্ধির দোষ দর্শাইয়া দেন।

তাহারই অকল্যাণ নিশ্চিত জানিয়াই ঠাকুর ঐরূপ ভয় পাইতেন। তাই শ্রীযুত গিরিশ অভিমান আবদারে কোন সময়ে ঠাকুরের সম্মুখে তাঁহার প্রতি নানা কটূক্তি প্রয়োগ করিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন —"ওরে ও আমাকে যা বলে বলুকগে, আমার মাকে কিছু বলেনি তো?" যাক্ এখন সে কথা।

পণ্ডিত শশধর তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিবেন শুনিয়া ঠাকুরের আর ভয়ের সীমা পরিসীমা নাই। শ্রীযুত যোগেন (স্বামী যোগানন্দ), শ্রীযুত ছোট নরেন ও আর আর অনেককে বলেন, 'ওরে তোরা সে দিন থাকিস্' ইত্যাদি! ভাবটা এই যে, তিনি মূর্খ মানুষ, পণ্ডিতের সহিত কথা কহিতে কি বলিতে কি বলিবেন, তাই আমরা সব উপস্থিত থাকিয়া পণ্ডিতজীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিব ও ঠাকুরকে সামলাইব! আহা সে ছেলে মানুষের মত ভয়ের কথা অপরকে বুঝানও দুষ্কর। কিন্তু পণ্ডিত শশধর যখন বাস্তবিক উপস্থিত হইলেন, তখন ঠাকুর যেন আর একজন! স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে দেখিতে দেখিতে তাঁহার ভাবাবেশ হইল এবং একটু বাহ্যদশা লাভের পর ভগবৎ-পাদপদ্মে ভক্তিলাভের সম্বন্ধে এত নিগূঢ় কথা সরলভাবে বুঝাইতে লাগিলেন যে, পণ্ডিতজী সে সকল শুনিতে শুনিতে প্রথম স্তম্ভিত, তারপর আর্দ্রহৃদয়, তারপর ভগবদ্বস্তু জীবনে লাভ হইল না ভাবিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। আমাদের একজন পরম বন্ধু, পণ্ডিত শশধরের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পরদিন ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলে, ঠাকুর যে ভাবে ঐ বিষয় তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন, তাহাই আমরা এখন এখানে বলিব। ঠাকুর—"ওগো, দেখ্ছইতো এখানে ও সব (লেখা পড়া) কিছু নেই, মুখ্যু শুখ্যু মানুষ, পণ্ডিত দেখা করতে আস্‌বে শুনে বড় ভয় হলো। এই তো দেখ্ছ, পোঁদের কাপড়েরই হুঁস্ থাকে না, কি বলতে কি বল্‌ব ভেবে একেবারে জড় সড় হলুম। মাকে বল্লুম—'দেখিস্ মা, আমি তো তোকে ছাড়া শাস্তর (শাস্ত্র) মাস্তর, কিছুই জানি না, দেখিস্'। তার পর একে বলি তুই তখন থাকিস্, ওকে বলি তুই তখন আসিস্—তোদের সব দেখ্‌লে তবু ভরসা হবে! পণ্ডিত যখন এসে বস্‌লো, তখনও ভয় রয়েছে—চুপ্ করে বসে তার দিকেই দেখ্ছি, তার কথাই শুন্‌ছি, এমন সময় দেখ্ছি কি—যেন তার (পণ্ডিতের) ভিতরটা—মা দেখিয়ে দিচ্ছে—শাস্তর (শাস্ত্র) মাস্তর পড়লে কি হবে, বিবেক বৈরাগ্য না হলে ওসব কিছুই নয়! তার পরেই সড়্ সড়্ করে (নিজ শরীর দেখাইয়া) একটা

মাথার দিকে উঠে গেল, আর ভয় ডর সব কোথা চলে গেল! একেবারে বিভ্‌ভুল হয়ে গেলুম! মুখ উঁচু হয়ে গিয়ে তার ভিতর থেকে যেন একটা কথার ফোয়ারা বেরুতে লাগ্‌ল—এমনটা বোধ হতে লাগ্‌ল—যত বেরুচ্চে, তত ভিতর থেকে যেন কে ঠেলে ঠেলে জোগান্ দিচ্চে—ওদেশে (কামার পুকুরে) ধান্ মাপ্‌বার সময় যেমন একজন 'রামে রাম, দুইয়ে দুই' করে মাপে, আর একজন তার পিছনে বসে রাশ্‌ (ধানের রাশি) ঠেলে দেয়, সেইরূপ! কিন্তু কি যে সব বলেছি, তা কিছুই জানি না! যখন একটু হুঁস্ হ'ল, তখন দেখ্‌ছি কি যে, সে (পণ্ডিত) কাঁদছে, একেবারে ভিজে গেছে! এই রকম একটা আবস্থা (অবস্থা) হয়। কেশব যে দিন খবর পাঠালে, জাহাজে করে গঙ্গায় বেড়াতে নিয়ে যাবে, একজন সাহেবকে (ভারতভ্রমণে আগত পাদ্রি কুক্) সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌চে, সেদিনও ভয়ে কেবলই ঝাটতলার দিকে (শৌচে) যাচ্চি! তার পর যখন তারা এলো আর জাহাজে উঠ্‌লুম, তখন এই রকমটা হয়ে গিয়েছিল! আর কত কি বলেছিলুম! পরে এরা (আমাদের দেখাইয়া) সব বল্‌লে, 'খুব উপদেশ দিয়েছিলেন'! আমি কিন্তু বাবু কিছুই জানিনি!" অদ্ভূত ঠাকুরের এই প্রকার অদ্ভুত অবস্থার কথা কেমন করিয়া বুঝিব? আমরা অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া শুনিতাম মাত্র! কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব শক্তি যে তাঁহার শরীর-মনটাকে আশ্রয় করিয়া এই সকল অপূর্ব্ব লীলার বিস্তার করিত, অভূতপূর্ব্ব আকর্ষণে যাহাকে ইচ্ছা টানিয়া আনিয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত করিত ও ধর্ম্ম-রাজ্যের উচ্চতর স্তরসমূহে আরোহণে সামর্থ্য-প্রদান করিত, তাহা দেখিয়াও বুঝা যাইত না! তবে ফল দেখিয়া বুঝা যাইত, সত্যই ঐরূপ হইতেছে, এই পর্য্যন্ত! কতবারই না আমাদের চক্ষুর সম্মুখে দেখিয়াছি, অতি দ্বেষী ব্যক্তি দ্বেষ করিবার জন্য ঠাকুরের নিকট আসিয়াছে এবং ঠাকুরও ঐ শক্তি-প্রভাবে আত্মহারা হইয়া ভাবাবেশে তাহাকে স্পর্শ করিয়াছেন আর সেই-ক্ষণ হইতে তাহার ভিতরের স্বভাব আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া সে নবজীবন লাভে ধন্য হইয়াছে! বেশ্যা মেরীকে স্পর্শমাত্রে ঈশা নূতন জীবন দান করিলেন, ভাবাবেশে শ্রীচৈতন্য কাহারও স্কন্ধে আরোহণ করিলেন ও তাহার ভিতরের সংশয়, অবিশ্বাস প্রভৃতি পাষণ্ড ভাব সকল দলিত হইয়া সে ভক্তি লাভ করিল, ভগবদবতারদিগের জীবন পাঠে ঐ সকল ঘটনার বর্ণনা দেখিয়া পূর্ব্বে পূর্ব্বে ভাবিতাম, শিষ্য প্রশিষ্যগণের গোঁড়ামী ও

দলপুষ্টি করিবার হীন ইচ্ছা হইতেই ঐরূপ মিথ্যা কল্পনাসমূহ লিপিবদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম-রাজ্যের যথাযথ সত্যলাভের পথে বিষম অন্তরায়স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে! আমাদের মনে আছে, হরিনামে শ্রীচৈতন্যের বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইত, নববিধান সমাজ হইতে প্রকাশিত ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা নামক গ্রন্থে এ কথাটি সত্য বলিয়া স্বীকৃত দেখিয়া আমরা তখন ভাবিয়াছিলাম, গ্রন্থকারের মস্তিষ্কের কিছু গোল হইয়াছে! কি কূপমণ্ডুকই না আমরা তখন ছিলাম এবং ঠাকুরের দর্শন না পাইলে কি দুর্দ্দশাই না আমাদের হইত! ঠাকুরের দর্শন পাইয়া এখন 'ছাইতে না জানি গোড় চিনি' অন্ততঃ এ অবস্থাটাও হইয়াছে। এখন নিজের পাজি মন যে নানা সন্দেহ তুলিয়া বা অপরে যে নানা কথা কহিয়া একটা যা তা কে ধর্ম্ম বলিয়া বুঝাইয়া যাইবে, সেটার হাত হইতে অন্ততঃ নিষ্কৃতি পাইয়াছি; আর ভক্তিবিশ্বাসাদি অন্যান্য বস্তুর ন্যায় যে হাতে হাতে অপরকে সাক্ষাৎ দেওয়া যায়, একথাটিও এখন জানিতে পারিয়া 'অহেতুক কৃপাসিন্ধু' ঠাকুরের কৃপাকণা লাভে অমৃতত্ব পাইব ধ্রুব, বুঝিয়া আশাপথ চাহিয়া পড়িয়া আছি!

* * * * *

পণ্ডিত শশধরের ঠাকুরের সহিত প্রথম দর্শনের কয়েক দিন পরেই রথ-যাত্রা উপস্থিত। নয় দিন ধরিয়া রথোৎসব নির্দ্দিষ্ট থাকায় উহা 'নবযাত্রা' বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের নবযাত্রার সময় ঠাকুরের সম্বন্ধে অনেকগুলি কথা আমাদের মনে উদয় হইতেছে। এই বৎসরেরই নবযাত্রার শেষ ভাগের কথা বা উল্টা রথের সময়ের কথা আমরা 'গোপালের মা' শীর্ষক প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। এইবার উহার প্রথম ভাগের বা সোজা রথের সময়ের কথাটা এখানে বলিতে আরম্ভ করিব। ঘটনাবলীর উল্লেখটা উল্টা পাল্টা হইল, কিন্তু তাহাতে বড় একটা আসিয়া যায় না— পাঠক, ঐ সকলের সন্নিবেশ পর পর এইরূপে ভাবিয়া লইলেই হইবে; যথা— রথের কিছুদিন পূর্ব্বে ঠাকুরের দর্শনে পণ্ডিত শশধরের আগমন; সোজা রথের দিন প্রাতে ঠাকুরের ঠনঠনিয়ায় শ্রীযুত ঈশান চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে নিমন্ত্রণ রক্ষায় গমন এবং সেখান হইতে অপরাহ্নে পণ্ডিত শশধরকে দেখিতে যাওয়া; সন্ধ্যার পর ঠাকুরের বাগবাজারে শ্রীযুত বলরাম বাবুর বাটীতে রথোৎসবে যোগদান ও সে রাত্রি তথায় অবস্থান; পরদিন প্রাতে কয়েকটী ভক্ত সঙ্গে নৌকায় করিয়া ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে পুনরা-

গমন। উল্‌টা রথের দিন প্রাতে ঠাকুরের পুনরায় বাগবাজারে বলরাম বাবুর বাটীতে আগমন এবং সে দিন রাত ও তৎপর দিন রাত তথায় ভক্তগণের সঙ্গে আনন্দে অবস্থান করিয়া তৃতীয় দিবস প্রাতে 'গোপালের মা' প্রভৃতি ভক্তগণের সঙ্গে নৌকায় করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্ত্তন। উল্টা রথের দিনে বা তৎপর দিন পণ্ডিত শশধর ঠাকুরকে দর্শন করিতে বলরাম বাবুর বাটীতে স্বয়ং আগমন করেন ও সজলনয়নে করযোড়ে ঠাকুরকে নিবেদন করেন—"দর্শনের চর্চ্চা ক'রে আমার হৃদয়টা শুষ্ক হয়ে গেছে, আমায় একটু ভক্তিদান করুন" ইত্যাদি। ঠাকুরও ভাবাবিষ্ট হইয়া পণ্ডিতজীকে ঐ দিন স্পর্শ করিয়াছিলেন।

উল্টা রথে লোক পাঠাইয়া কামারহাটী হইতে গোপালের মাকে বাগবাজারে আনয়ন করিয়া ঠাকুরের গোপাল ভাবাবিষ্ট হওয়ার বিবরণ আমরা পূর্ব্বেই পাঠককে উপহার দিয়াছি। এখন সোজা রথের সময়ের কয়েকটা কথাই বলিতেছি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ রথের দিন প্রাতে ঠাকুর কলিকাতায় ঠন্‌ঠনিয়ায় ঈশানের বাটীতে আগমন করেন—সঙ্গে শ্রীযুত যোগেন (স্বামী যোগানন্দ), হাজরা প্রভৃতি কয়েকটী ভক্ত। শ্রীযুত ঈশানের মত দয়ালু, দানশীল ও ভগবদ্‌বিশ্বাসী ভক্তের দর্শন সংসারে দুর্ল্লভ। তাঁহার তিন চারিটী পুত্র, সকলেই কৃতবিদ্য। তৃতীয় পুত্র সতীশ শ্রীযুত নরেন্দ্রের (স্বামী বিবেকানন্দ) সহপাঠী। আবার শ্রীযুত সতীশের পাখোয়াজে অতি সুমিষ্ট হাত থাকায় শ্রীযুত নরেন্দ্রের সুকণ্ঠের তান অনেক সময় ঐ বাটীতে শুনিতে পাওয়া যাইত। ঈশান বাবুর দয়ার বিষয় উল্লেখ করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে একদিন বলেন যে, উহা "পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের অপেক্ষা কিছুতেই কম ছিল না।" স্বামিজী স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, ঈশান বাবু নিজের অন্নব্যঞ্জনাদি কতদিন (বাটীতে তখন কিছু আহার্য্য প্রস্তুত না থাকায়) অভুক্ত ভিখারীকে সমস্ত অর্পণ করিয়া যাহা তাহা খাইয়া দিন কাটাইয়া দিলেন! আর অপরের দুঃখ কষ্টের কথা শুনিয়া উহা দূর করা নিজের সাধ্যাতীত দেখিয়া কতদিন যে তিনি (স্বামিজী) অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে তাঁহাকে (ঈশান বাবুকে) দেখিয়াছেন, তাহাও বলিতেন। শ্রীযুত ঈশান যেমন দয়ালু, তেমনি জপপরায়ণও ছিলেন। তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে নিয়মপূর্ব্বক উদয়াস্ত জপ করার কথাও আমরা অনেকে জানিতাম। জাপক ঈশান ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় ও অনুগ্রহপাত্র ছিলেন। আমাদের মনে হয়, জপ সমাধান করিয়া

ঈশান যখন ঠাকুরের চরণে একদিন সন্ধ্যাকালে প্রণাম করিতে আসিলেন, তখন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ ঈশানের মস্তকে প্রদান করিলেন! পরে বাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া জোর করিয়া ঈশানকে বলিতে লাগিলেন, 'ওরে বামুন, ডুবে যা, ডুবে যা' (অর্থাৎ কেবল ভাষা ভাষা জপ না করিয়া শ্রীভগবানের নামে তন্ময় হইয়া যা) ইত্যাদি। ইদানীং প্রাতের পূজা ও জপেই শ্রীযুত ঈশানের প্রায় অপরাহ্ণ চারিটা হইয়া যাইত। পরে কিঞ্চিৎ লঘু আহার করিয়া অপরের সহিত কথাবার্ত্তা বা ভজন শ্রবণাদিতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাটাইয়া পুনরায় সান্ধ্যজপে উপবেশন করিয়া কত ঘণ্টা কাল কাটাইতেন। আর বিষয়কর্ম্ম দেখা পুত্রেরাই ভার লইয়াছিল। ঠাকুর ঈশানের বাটীতে মধ্যে মধ্যে শুভাগমন করিতেন এবং ঈশানও কলিকাতায় থাকিলে প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে দর্শন করিতে আগমন করিতেন। নতুবা পবিত্র দেবস্থান ও তীর্থাদি দর্শনে যাইয়া তপস্যায় কাল কাটাইতেন।

এ বৎসর (১৮৮৫ খৃঃ) রথের দিনে শ্রীযুত ঈশানের বাটীতে আগমন করিয়া ঠাকুরের ভাটপাড়ার কতকগুলি ভট্টাচার্য্যের সহিত যে সকল কথাবার্ত্তা হয় এবং পরে পণ্ডিত শশধরকে দেখিতে যাইয়া ঠাকুর যে সকল অমূল্য উপদেশ পণ্ডিতজীকে প্রদান করেন, আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ কথামৃতকার নিজ গ্রন্থে সে সকলের সবিস্তার লিপিবদ্ধ করিয়া ইতিপূর্ব্বেই পাঠককে উপহার দিয়াছেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট হইতে "চাপরাস্" বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাইলে, উহা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয় ও কখন বা প্রচারকের অভিমান অহঙ্কার বাড়াইয়া তুলিয়া তাহার সর্ব্বনাশের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়, এ সকল কথা ঠাকুর পণ্ডিতজীকে এই দ্বিতীয়বার দর্শনকালেই বলিয়াছিলেন। এই সকল জ্বলন্ত শক্তিপূর্ণ মহাবাক্যের ফলেই যে পণ্ডিতজী কিছু কাল পরেই প্রচার কার্য্য ছাড়িয়া ৺ কামাখ্যাপীঠে তপস্যায় গমন করেন, ইহা আর বলিতে হইবে না।

পণ্ডিতজীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ঠাকুর সেদিন শ্রীযুত যোগেনের সহিত সন্ধ্যাকালে বাগবাজারে বলরাম বসুর বাটিতে উপস্থিত হইলেন। যোগেন তখন আহারাদিতে বিশেষ 'আচারী', কাহারও বাটীতে জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করেন না। কাজেই সামান্য জলযোগ মাত্র করিয়া ঠাকুরের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে কোথাও খাইতে অনুরোধ করেন নাই—কারণ, যোগেনের নিষ্ঠাচারিতার বিষয় ঠাকুরের অজ্ঞাত ছিল না।

কেবল বলরাম বাবুর শ্রদ্ধাভক্তি ও ঠাকুরের উপরে বিশ্বাস প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার বাটিতে ফলমূল-দুগ্ধ-মিষ্টান্নাদি গ্রহণ শ্রীযুত যোগেন পূর্ব্বাবধি করিতেন—একথাও ঠাকুর জানিতেন। সেজন্য পৌঁছিবার কিছু পরেই ঠাকুর বলরাম প্রভৃতিকে বলিলেন, 'ওগো, এর (যোগেনকে দেখাইয়া) আজ খাওয়া হয় নাই, একে কিছু খেতে দাও'। বলরাম বাবুও যোগেনকে সাদরে অন্দরে লইয়া যাইয়া জলযোগ করাইলেন। ভাবসমাধিতে আত্মহারা ঠাকুরের ভক্তদিগের শারীরিক ও মানসিক প্রত্যেক বিষয়েই কতদূর লক্ষ্য থাকিত, তাহারই অন্যতম দৃষ্টান্ত বলিয়াই আমরা এ কথার এখানে উল্লেখ করিলাম।

ক্রমশঃ।

সংবাদ।

গত ২৪শে মাঘ ৬ই ফেব্রুয়ারী রবিবার বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব হইয়া গিয়াছে। বহুসংখ্যক "দরিদ্র নারায়ণ"গণের সেবা করা হইয়াছিল। অনেক ভদ্রলোকেরও সমাগম হইয়াছিল।

আগামী ৬ই চৈত্র ইংরাজী ২০শে মার্চ্চ রবিবার বেলুড় মঠে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব হইবে। সর্ব্বসাধারণের যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়।

বেলুড় মঠ হইতে প্রেরিত হইয়া স্বামী বোধানন্দ আমেরিকার পিট্স্বর্গ সহরে আজ কয়েক বৎসর যাবৎ বেদান্ত প্রচার করিতেছেন—ইহা উদ্বোধন-পাঠকমাত্রেই জানেন। সম্প্রতি ১৯০৯ অক্টোবর হইতে ১৯১০ জুন মাস পর্য্যন্তর একটী কার্য্যতালিকা পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে প্রকাশ যে, তিনি প্রতি মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৮টায় গীতা সম্বন্ধে, প্রতি বৃহস্পতিবার ঐ সময়ে ধ্যান-ধারণা শিক্ষা ও যোগশিক্ষা সম্বন্ধে, এবং প্রতি শনিবার দিবা ১০॥ ঘটিকায় পাতঞ্জল দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতাদি দিতেছেন। এতদ্ব্যতীত প্রতি রবিবার অপরাহ্ণ ৩টার সময় সর্ব্বসাধারণের জন্য তত্রস্থ বেদান্ত সমিতিগৃহে নানা-বিষয়ক বক্তৃতাদিও দিতেছেন।

ভক্তিরহস্য ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ।] [স্বামী বিবেকানন্দ ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

ভক্তির প্রথম সোপান—তীব্র ব্যাকুলতা ।

ভক্তিযোগের আচার্য্যগণ ভক্তির লক্ষণ করিয়াছেন—ঈশ্বরে পরম অনুরক্তি। কিন্তু মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসিবে কেন, এই সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত না আমরা ইহা বুঝিতেছি, ততক্ষণ ভক্তি-তত্ত্বের কিছুই ধারণা করিতে পারিব না। জগতে দুই প্রকার সম্পূর্ণ পৃথক্ জীবনের আদর্শ দেখা যায়। সকল দেশের সকল ব্যক্তিই—যাহারা কোনরূপ ধর্ম্ম মানে তাহারাই—স্বীকার করিয়া থাকে, মানুষ দেহ ও আত্মার সমষ্টি-স্বরূপ। কিন্তু মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশে বিশেষ মতভেদ দেখা যায়। পাশ্চাত্য দেশে সাধারণতঃ মানবের দেহভাগটার দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়া হয়—ভারতীয় ভক্তিতত্ত্বের আচার্য্যগণ কিন্তু মানবের আধ্যাত্মিক দিক্‌টার দিকে অধিক জোর দিয়া থাকেন আর ইহাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে সর্ব্বপ্রকার ভেদের মূল বলিয়া বোধ হয়। এমন কি, সাধারণ ব্যবহৃত ভাষায় পর্য্যন্ত এই ভেদ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। ইংলণ্ডে বলিয়া থাকে, অমুক ব্যক্তি 'তাহার আত্মাকে পরিত্যাগ করিল' (Gave up his ghost); ভারতে মৃত্যুর কথা বলিতে গেলে অমুক দেহ ত্যাগ করিল, এইরূপ বলিয়া থাকে। পাশ্চাত্যদিগের ভাব যেন মানুষ একটা দেহ, আর তাহার আত্মা আছে, আর প্রাচ্যভাব এই—মানুষ আত্মাস্বরূপ—তাহার দেহ আছে। এই পার্থক্য হইতে অনেক জটিল সমস্যা আসিয়া পড়ে। স্বভাবত:ই ইহা বুঝা যাইতেছে যে, যে মতে বলে—মানুষ দেহস্বরূপ আর তাহার একটী আত্মা আছে, সে মতে দেহের দিকেই সমুদয় ঝোঁক দেওয়া হয়। যদি ইহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয়, মানুষের জীবন কি জন্য, তাহারা বলিবে—ইন্দ্রিয়সুখভোগের জন্য; দেখিব, শুনিব, বুঝিব, ভোজনপান করিব, অনেক বিষয় ধনদৌলতের অধিকারী হইব—বাপ মা আত্মীয় স্বজন সব

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির মূল প্রভেদ - পাশ্চাত্য দেহবাদী, প্রাচ্য আত্মবাদী।

থাকিবে—তাঁহাদের সহিত আনন্দ করিব—ইহাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য—ইহার অধিক আর সে যাইতে পারে না। ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুর কথা বলিলেও সে উহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। তাহার পরলোকের ধারণা এই যে, এখন যে সকল ইন্দ্রিয়সুখভোগ হইতেছে, সেইগুলিই বরাবর চলিবে। ইহলোকেই যে সে চিরকাল এই ইন্দ্রিয়সুখভোগ করিতে পারিবে না, তাহাতে সে বড়ই দুঃখিত—সে মনে করে, যে কোনরূপে হউক, সে এমন এক স্থানে যাইবে, যেখানে এই সব সুখই পুনরায় চলিবে। সেই সব ইন্দ্রিয়ই থাকিবে, সেই সব সুখভোগ থাকিবে—কেবল সুখের তীব্রতা ও মাত্রা বাড়িবে মাত্র। সে যে ঈশ্বরের উপাসনা করিতে যায়, তাহার কারণ এই যে, ঈশ্বর তাহার এই উদ্দেশ্যলাভের উপায়স্বরূপ। তাহার জীবনের লক্ষ্য —বিষয়সম্ভোগ—সে কাহারও নিকট হইতে জানিয়াছে, একজন পুরুষ আছেন—তিনি তাহাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া এই সব সুখভোগ দিতে পারেন—তাই সে ঈশ্বরের উপাসনা করে। এই ত গেল এক ভাব। অপর ভাব এই যে, ঈশ্বরই আমাদের জীবনের লক্ষ্যস্বরূপ। ঈশ্বরের উপর অধিক আর কিছু নাই আর এই যে সব ইন্দ্রিয়সুখভোগ—এগুলির ভিতর দিয়া আমরা উচ্চতর বস্তু লাভের জন্য অগ্রসর হইতেছি মাত্র। শুধু তাহাই নহে; যদি ইন্দ্রিয়সুখ ছাড়া আর কিছু না থাকিত, তবে ভয়ানক ব্যাপার হইত। আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে দেখিতে পাই, যে ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সুখভোগ যত অল্প, তাহার জীবন ততই উচ্চতর। ঐ কুকুরটার কথা ধরুন—ও এখন খাইতেছে—কোন মানুষ অত তৃপ্তির সহিত খাইতে পারে না। ঐ শূকরশাবকটার দিকে দেখুন—সে খাইতে খাইতে কি আনন্দসূচক ধ্বনি করিতেছে! এমন কোন মানুষ জন্মায় নাই, যে ঐরূপে খাইতে পারে। তির্য্যগ্-জাতির দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতি কতদূর প্রবল ভাবিয়া দেখুন—তাহাদের সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলিই পরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত। মানুষের ঐরূপ ইন্দ্রিয়শক্তি কখন হইতে পারে না। পশুগণের ইন্দ্রিয়সুখভোগে বিজাতীয় আনন্দ —তাহারা আনন্দে একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠে। আর মানুষ যত অনুন্নত হয়, সে ইন্দ্রিয়সুখভোগে তত অধিক আনন্দ পাইয়া থাকে। যতই উচ্চতর অবস্থায় যাইতে থাকিবেন, ততই যুক্তিবিচার ও প্রেম আপনাদের লক্ষ্য হইবে —দেখিবেন—আপনার বিচারশক্তি ও প্রেমের বিকাশ হইতেছে আর আপনারা ইন্দ্রিয়সুখভোগের শক্তি হারাইতেছেন। এই বিষয়টী আমি

বিস্তৃতভাবে বুঝাইতেছি। যদি আমরা স্বীকার করি যে, মানুষের ভিতর একটা নির্দ্দিষ্ট শক্তি আছে, আর সেই শক্তিটা হয় দেহের উপর, নয় মনের উপর, নয় আত্মার উপর প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তবে যদি উহাদের এক-তরের উপর সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করা যায়, তবে অন্য গুলির উপর প্রয়োগ করিবার ততটুকু কম পড়িয়া যাইবে। সভ্য জাতিদিগের অপেক্ষা অজ্ঞ ব্যক্তিগণের বা অসভ্য জাতিদের ইন্দ্রিয়শক্তি তীক্ষ্ণতর—আর বাস্তবিক পক্ষে আমরা ইতিহাস হইতে এই একটী শিক্ষা পাইতে পারি যে, কোন জাতি যতই সভ্য হয়, ততই তাহার স্নায়ু তীক্ষ্ণতর হইতে থাকে—আর তাহার শরীর দুর্ব্বলতর হইয়া যায়। কোন অসভ্য জাতিকে সভ্য করুন—দেখিবেন—ঠিক এই ব্যাপারটী ঘটিতেছে। তখন অন্য কোন অসভ্য জাতি আসিয়া আবার তাহাকে জয় করিবে। দেখা যায়, বর্ব্বর জাতিই প্রায় সর্ব্বদাই জয়শালী হয়। তাহা হইলেই আমরা দেখিতেছি, যদি আমাদের বাসনা হয়, আমরা সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিব—তবে বুঝিতে হইবে আমরা অসম্ভব বিষয়ের প্রার্থনা করিতেছি—কারণ, তাহা পাইতে গেলে আমাদিগকে পশু হইতে হইবে। মানুষ যখন বলে, সে এমন এক স্থানে যাইবে, যথায় তাহার ইন্দ্রিয়-সুখভোগ তীব্রতর হইবে, তখন সে জানে না—সে কি চাহিতেছে—মনুষ্যজন্ম ঘুচিয়া পশু হইতে পারিলে তবেই তাহার পক্ষে এরূপ সুখভোগ সম্ভবপর। শূকর কখন মনে করে না, সে অশুচি বস্তু ভোজন করিতেছে। উহাই তাহার স্বর্গ। আর যদি ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হন, সে তাঁহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিবে না। ভোজনেই তাহার মনপ্রাণ—সমগ্র সত্তা নিয়োজিত।

সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগ-শক্তির হ্রাস।

মানবের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। তাহারা শূকরশাবকের মত বিষয়রূপ গভীর পঙ্কে লুণ্ঠিত হইতেছে—উহার বাহিরে কি আছে, তাহা আর দেখিতে পাইতেছে না। তাহারা ইন্দ্রিয়সুখভোগই চায়, আর উহার অপ্রাপ্তি তাহাদের নিকট স্বর্গচ্যুতিস্বরূপ। উচ্চতম অর্থে ধরিলে এইরূপ ব্যক্তিগণ ভক্তশব্দবাচ্য হইতে পারে না—তাহারা কখন প্রকৃত ভগবৎ-প্রেমিক হইতে পারে না। আবার ইহাও বলি, যদি এই নিম্নতর আদর্শের অনুসরণ করা যায়, তবে কালে এই আদর্শটীই বদলিয়া যাইবে। প্রত্যেক ব্যক্তিই বুঝিবে, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর এমন কোন বস্তু রহিয়াছে, যাহার সম্বন্ধে আমি জানিতাম না—

তখন জীবনের উপর এবং বিষয়সমূহের উপর প্রবল মমতা ধীরে ধীরে নষ্ট হইবে। বাল্যকালে যখন আমি স্কুলে পড়িতাম, তখন অপর একটী সহপাঠীর সঙ্গে একটা খাবার লইয়া ঝগড়া হইয়াছিল—তার গায়ে আমার চেয়ে বেশী জোর ছিল—কাজে কাজেই সে ঐ খাবারটা আমার হাত হইতে কাড়িয়া লইল। তখন আমার মনে যে ভাব হইল, তাহা এখনও আমার স্মরণ আছে। আমার মনে হইল, তাহার মত দুষ্ট ছেলে আর জগতে জন্মায় নাই—আমি যখন বড় হইব, তখন তাহাকে জব্দ করিব। মনে হইতে লাগিল, সে এত দুষ্ট, তাহার যে কি শাস্তি দিব, তাহা ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না—তাহাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত—তাহাকে চার টুকরো করিয়া ফেলা উচিত। এখন আমরা উভয়েই বড় হইয়াছি—উভয়ের মধ্যেই এখন পরম বন্ধুত্ব। এইরূপ এই সমগ্র জগৎ অল্পবয়স্ক শিশুতুল্য জনগণে পূর্ণ—পানাহারকেই তাহারা সর্ব্বস্ব বলিয়া জানে—লুচি মণ্ডাই তাহাদের সর্ব্বস্ব—উহার যদি একটুকু এদিক্ ওদিক্ হয়, তবেই তাহাদের সর্ব্বনাশ। তাহারা কেবল ঐ লুচি মণ্ডারই স্বপন দেখিতেছে আর তাহাদের ধারণা—স্বর্গ এমন জিনিষ, যেখানে প্রচুর লুচি মণ্ডা আছে। আমেরিকান ইণ্ডিয়ানগণের ধারণা—স্বর্গ একটী বেশ ভাল মৃগয়ার স্থান—তাহাদের বিষয় ভাবিয়া দেখুন। আমাদের সকলেরই নিজেদের বাসনানুযায়ী স্বর্গের ধারণা—কিন্তু কালে আমাদের বয়স যতই বাড়িতে থাকে এবং উচ্চতর বস্তু দর্শনের শক্তি হয়, ততই আমরা সময়ে সময়ে এই সমুদয়ের অতীত উচ্চতর বস্তুর চকিত আভাস পাইতে থাকি। আধুনিক কালে সাধারণতঃ যেমন সকল বিষয়ে অবিশ্বাস করিয়া এই সব ধারণা অতিক্রম করা হয়, আমি সেরূপ ভাবে এই সকল ধারণা পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি না—তাহাতে সব উড়াইয়া দেওয়া হইল—সব ভাবগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলা হইল—নাস্তিক যে এইরূপে সমুদয় উড়াইয়া দেয়, সে ভ্রান্ত, কিন্তু ভক্ত যিনি, তিনি উহা অপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্ব দর্শন করিয়া থাকেন। নাস্তিক স্বর্গে যাইতে চাহে না, কারণ, তাহার মতে স্বর্গই নাই আর ভগবদ্ভক্ত স্বর্গে যাইতে চাহেন না, কারণ, তিনি উহাকে ছেলে-খেলা বলিয়া মনে করেন। তিনি চাহেন কেবল ঈশ্বরকে আর ঈশ্বরব্যতীত জীবনের শ্রেষ্ঠতর লক্ষ্য আর কি হইতে পারে? ঈশ্বর স্বয়ংই মানবের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য—তাঁহাকে দর্শন করুন, তাঁহাকে সম্ভোগ করুন। আমরা

আমাদের স্বর্গের ধারণা।

ঈশ্বর হইতে শ্রেষ্ঠতর বস্তুর ধারণাই করিতে পারি না, কারণ, ঈশ্বর পূর্ণ-স্বরূপ। প্রেম হইতে কোনরূপ উচ্চতর সুখ আমরা ধারণা করিতে পারি না, কিন্তু এই শব্দ নানা বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উহাতে সংসারের সাধারণ স্বার্থপর ভালবাসা বুঝায় না—ঐ ভাল-বাসাকে প্রেম নামে অভিহিত করা নাস্তিকতা বই আর কিছুই নহে। আমাদের পুত্র-কলত্রাদির প্রতি ভালবাসা পাশবিক ভালবাসা মাত্র। যে ভালবাসা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ তাহাই একমাত্র প্রেমশব্দবাচ্য এবং তাহা কেবল ঈশ্বরের প্রতিই হওয়া সম্ভব। এই প্রেম লাভ করা বড় কঠিন ব্যাপার।

ঈশ্বর প্রেম ব্যতীত সকল ভালবাসাই কপটতাময়।

আমরা পিতামাতা পুত্রকন্যা ও অন্যান্য সকলকে ভাল-বাসিতেছি—এই সকল বিভিন্ন প্রকার ভালবাসা বা আসক্তির ভিতর দিয়া চলিতেছে। আমরা ধীরে ধীরে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন করিতেছি, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা এ বৃত্তির পরিচালনা হইতে কিছুই শিখিতে পারি না—কেবল একটী মাত্র সোপানে আরোহণ করিয়াই আমাদের গতি অবরুদ্ধ হয়, আমরা এক ব্যক্তিতে আসক্ত হইয়া পড়ি। কখন কখন মানব এই বন্ধন অতিক্রম করিয়া বাহিরে আসিয়া থাকে। লোকে এই জগতে চিরকাল ধরিয়া স্ত্রী পুত্র ধন মান এই সবের দিকে দৌড়িতেছে—সময়ে সময়ে তাহারা বিশেষ ধাক্কা খাইয়া সংসারটা যথার্থ কি, তাহা বুঝিতে পারে। এই জগতে কেহই ঈশ্বর ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। মানুষ দেখিতে পায়, মানুষের ভালবাসা সব ভুয়া। মানুষে ভালবাসিতে পারে না—কেবল বচন ঝাড়িয়া থাকে। 'আহা প্রাণনাথ, আমি তোমায় বড় ভালবাসি' বলিয়া পত্নী পতিকে চুম্বন করিয়া অবিরলধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া পতি-প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকে, কিন্তু স্বামীর যেই মৃত্যু হয়, অমনি সে তাঁহার টাকার সিন্ধুকের চাবির সন্ধান করে, আর কাল তাহার কি গতি হইবে, এই ভাবিয়া আকুল হয়। স্বামীও স্ত্রীকে খুব ভালবাসিয়া থাকেন, কিন্তু স্ত্রী অসুস্থ হইলে, রূপ-যৌবন হারাইয়া কুৎসিতাকৃতি হইলে, অথবা সামান্য দোষ করিলে আর তাহার দিকে চাহিয়াও দেখেন না। জগতের সব ভালবাসা অন্তঃসারশূন্য ও কপটতাময় মাত্র।

সান্ত জীব কখন ভালবাসিতে পারে না অথবা সান্ত জীবও ভালবাসার যোগ্য হইতে পারে না। প্রতি মুহূর্ত্তেই যখন যাহাকে ভালবাসা যায়,

তাহার দেহের পরিবর্ত্তন এবং সঙ্গে সঙ্গেই মনেরও পরিবর্ত্তন হইতেছে, তখন এই জগতে অনন্ত প্রেমের আর কি আশা করেন? ঈশ্বর ব্যতীত আর কাহারও প্রতি প্রেম হইতে পারে না। তবে এ সব ভালবাসাবাসি—এগুলির অর্থ কি? এগুলি কেবল ভ্রমমাত্র। মহাশক্তি আমাদের পশ্চাদ্দেশ হইতে আমাদিগকে ভালবাসিবার জন্য প্রেরণা করিতেছেন—আমরা জানি না—কোথায় সেই প্রেমাস্পদ বস্তু খুঁজিব—কিন্তু এই প্রেমই আমাদিগকে উহার অনুসন্ধানে সম্মুখে অগ্রসর করিয়া দিতেছে। আমরা বারম্বার আমাদের ভ্রম প্রত্যক্ষ করিতেছি। আমরা একটা জিনিষ ধরিলাম—উহা আমাদের হাত ফস্‌কিয়া গেল, তখন আমরা আর কিছুর জন্য হাত বাড়াইলাম। এইরূপ অনেক টানাপড়েনের পর আলোক আসিয়া থাকে। তখন আমরা ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হই—একমাত্র যিনি আমাদিগকে যথার্থ ভালবাসিয়া থাকেন। তাঁহার ভালবাসার কোনরূপ পরিবর্ত্তন নাই—আর তিনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। আমি আপনার অনিষ্ট করিতে থাকিলে আপনাদের মধ্যে যে কেহই হউন, কতক্ষণ আমার অত্যাচার সহ্য করিবেন? যাঁহার মনে ক্রোধ, ঘৃণা বা ঈর্ষ্যা নাই, যাঁহার সাম্যভাব কখন নষ্ট হয় না, যিনি অজ, অবিনাশী, ঈশ্বর ব্যতীত তিনি আর কি? তবে ঈশ্বরকে লাভ করা বড় কঠিন—এবং তাঁহার নিকট যাইতে হইলে বহু দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিতে হয়—অতি অল্প লোকেই তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে। ঈশ্বর-পথে আমরা শিশুতুল্য হাত পা ছুঁড়িতেছি মাত্র। লক্ষ লক্ষ লোকে ধর্ম্মের ব্যবসাদারি করিয়া থাকে—খুব অল্প লোকেই প্রকৃত ধর্ম্মলাভ করিয়া থাকে। সকলেই ধর্ম্মের কথা কয়, কিন্তু খুব কম লোকেই ধার্ম্মিক হইয়া থাকে। এক শতাব্দীর ভিতর অতি অল্প লোকেই সেই ঈশ্বর-প্রেমলাভ করিয়া থাকে, কিন্তু যেমন এক সূর্য্যের উদয়ে সমুদয় অন্ধকার তিরোহিত হয়, তদ্রূপ এই অল্প সংখ্যক যথার্থ ধার্ম্মিক ও ভগবদ্ভক্ত পুরুষের অভ্যুদয়ে সমগ্র দেশ ধন্য ও পবিত্র হইয়া যায়। জগদম্বার সন্তানের আবির্ভাবে দেশকে দেশ পবিত্র হইয়া যায়। এক শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র জগতে এরূপ লোক খুব কম জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু আমাদের সকলকেই ঐরূপ হইবার চেষ্টা করিতে হইবে আর আপনি বা আমিই যে সেই অল্প কয়েক জনের মধ্যে নই,

অনন্ত নির্ব্বিকার ঈশ্বরই যথার্থ প্রেমের পাত্র।

ঈশ্বরলাভ অতি কঠিন ব্যাপার।

তাহা কে বলিল? অতএব আমাদিগকে ভক্তিলাভের জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা বলিয়া থাকি, স্ত্রী তাহার স্বামীকে ভালবাসিতেছে—স্ত্রীও ভাবে, আমি স্বামিগতপ্রাণা। কিন্তু যেই একটা ছেলে হইল, অমনি অর্দ্ধেক বা তাহারও অধিক ভালবাসা ছেলেটার প্রতি গেল। সে নিজেই টের পাইবে যে, স্বামীর প্রতি তাহার আর পূর্ব্বের মত ভালবাসা নাই। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, যখন অধিক ভালবাসার বস্তু আমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তখন পূর্ব্বের ভালবাসা ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়। যখন আপনারা স্কুলে পড়িতেন, তখন আপনারা আপনাদের কয়েকজন সহপাঠীকেই জীবনের পরম প্রিয়তম বন্ধু বলিয়া মনে করিতেন অথবা বাপ মাকে ঐরূপ ভালবাসিতেন, তারপর বিবাহ হইল—তখন স্বামী বা স্ত্রীই পরম প্রীতির আস্পদ হইল—পূর্ব্বের ভাব চলিয়া গেল—নূতন প্রেম প্রবলতম হইয়া দাঁড়াইল। আকাশে একটা তারা উঠিয়াছে, তারপর তদপেক্ষা একটা বৃহত্তর নক্ষত্র উঠিল, তারপর তদপেক্ষা আর একটা বৃহত্তর নক্ষত্রের উদয় হইল—অবশেষে সূর্য্য উঠিল—তখন সূর্য্যের প্রকাশে ক্ষুদ্রতর জ্যোতিগুলি ম্লান হইয়া গেল। ঈশ্বরই সেই সূর্য্য। এই তারাগুলি আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাংসারিক ভালবাসা। আর যখন ঐ সূর্য্যের উদয় হয়, তখন মানুষ উন্মাদ হইয়া যায়—এইরূপ ব্যক্তিকে এমার্সন "ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ত মানব' (A God-intoxicated man) বলিয়াছেন। তখন তাঁহার নিকট মানুষ জীব জন্তু সব রূপান্তরিত হইয়া গিয়া ঈশ্বররূপে পরিণত হয়—সমুদয়ই সেই এক প্রেম-সমুদ্রে ডুবিয়া যায়। সাধারণ প্রেম কেবল পাশব আকর্ষণমাত্র। তাহা না হইলে প্রেমে স্ত্রী পুরুষ ভেদের কি প্রয়োজন? মূর্ত্তির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া হাত জোড় করিলে তাহা ঘোর পৌত্তলিকতা, কিন্তু স্বামীর বা স্ত্রীর সামনে ঐরূপে হাঁটু গাড়িয়া হাত জোড় অনায়াসে করা যাইতে পারে—তাহাতে কোন দোষ নাই!

এই সবের ভিতর দিয়া গিয়া আমাদিগকে উহাদের বাহিরে যাইতে হইবে। প্রথমে আপনাদের পথ পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে—আপনি জীবনটাকে যে দৃষ্টিতে দেখিবেন, তদনুসারে আপনার ভালবাসাও দাঁড়াইবে। এই সংসারই জীবনের চরম গতি—এইটা ভাবাই পশুজনোচিত ও মানবের ঘোরতর অবনতিসাধক। যে কোন ব্যক্তি এই ধারণা লইয়া জীবন-সংগ্রামে অগ্রসর হয়, সেই ক্রমে হীনত্ব প্রাপ্ত হয়। সে কখনও উচ্চভাবে আরোহণ করিতে পারিবে না, সে সেই জগতের অন্তরালে অবস্থিত তত্ত্বের চকিত

আভাসও কখন পাইবে না, সে সর্ব্বদাই ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া থাকিবে। সে কেবল টাকার চেষ্টা করিবে—যাহাতে সে ভাল করিয়া লুচি মণ্ডা খাইতে পারে। এরূপ জীবনযাপনাপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। সংসারের দাস, ইন্দ্রিয়ের দাস—আপনারা জাগুন—ইহাপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্ব আরও কিছু আছে। আপনারা কি মনে করেন, এই মানবের—এই অনন্ত আত্মার চক্ষু কর্ণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদি ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া থাকিবার জন্যই জন্ম? ইহার পশ্চাতে অনন্ত সর্ব্বজ্ঞ আত্মা রহিয়াছেন, তিনি সব করিতে পারেন, সব বন্ধন ছেদন করিতে পারেন—প্রকৃতপক্ষে আপনিই সেই আত্মা আর প্রেমবলেই আপনার ঐ শক্তির উদয় হইতে পারে। আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত, ইহা আমাদের আদর্শ-স্বরূপ। মনে করিলেই ফস্ করিয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা কল্পনায় মনে করিতে পারি, আমরা ঐ অবস্থা পাইয়াছি, কিন্তু তাহা কল্পনামাত্র বই আর কিছুই নহে—এ অবস্থা এখন বহু, বহু দূরে। মানব এক্ষণে যে অবস্থায় রহিয়াছে, তাহার অবস্থা ও অধিকার বুঝিয়া যদি সম্ভব হয়, তাহার উচ্চপথে গতির জন্য সাহায্য করিতে হইবে। মানব সাধারণতঃ জড়বাদী—আপনি আমি সকলেই জড়বাদী। আমরা ঈশ্বর সম্বন্ধে, আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকি, বেশ ভাল কথা, কিন্তু বুঝিতে হইবে, সেগুলি আমাদের পক্ষে আমাদের সমাজে প্রচলিত কতকগুলি কথার কথা—আমরা তোতা পাখীর মত সেগুলি শিখিয়াছি আর মধ্যে মধ্যে আওড়াইয়া থাকি মাত্র। অতএব আমরা যে অবস্থায় ও অধিকারে অবস্থিত, আমাদের সেই অবস্থা ও অধিকার—অর্থাৎ আমরা যে এক্ষণে জড়বাদী—এইটী বুঝিতে হইবে—সুতরাং আমাদিগকে জড়ের সাহায্য অবশ্যই লইতে হইবে—এইরূপে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আমরা প্রকৃত আত্মবাদী হইব—আপনাদিগকে আত্মা বলিয়া বুঝিব, আত্মা বা চৈতন্য যে কি বস্তু তাহা বুঝিব আর তখন দেখিব—এই যে জগৎকে আমরা অনন্ত বলিয়া থাকি, তাহা ইহার অন্তরালে অবস্থিত সূক্ষ্ম জগতের একটী স্থূল বাহ্যরূপ মাত্র।

আমাদের চরম লক্ষ্য ইন্দ্রিয়সুখ নহে—পরমাত্মা—তাহা হইলেও আমাদের অধিকার ও অবস্থা বুঝিয়া জড়ের সাহায্য লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইবে।

কিন্তু ইহা ব্যতীত আমাদের আরো কিছু প্রয়োজন। আপনারা বাইবেলে যীশুখ্রীষ্টের শৈলোপদেশে (Sermon on the Mount) পাঠ করিয়া-

ছেন, "চাও, তবেই তোমাদিগকে দেওয়া হইবে ; ঘা দাও, তবেই খুলিয়া দেওয়া হইবে ; খোঁজ, তবেই তোমরা পাইবে।" মুস্কিল এইটুকু যে, চায় কে, খোঁজে কে ? আমরা সকলেই বলি, আমরা ঈশ্বরকে জানিয়া বসিয়া আছি। একজন ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রতিপাদনের জন্য এক বৃহৎ পুস্তক লিখিলেন, আর একজন তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য মস্ত একখানি বই লিখিলেন। একজন সারা জীবন তাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করাই নিজের কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন—অপরে তাঁহার অস্তিত্ব খণ্ডন করাই নিজ কর্ত্তব্য মনে করেন আর তিনি মানব জাতিকে এই উপদেশ দিয়া বেড়ান যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ নাই। কিন্তু আমি বলি, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থ লিখিবার কি প্রয়োজন ? ঈশ্বর থাকুন বা নাই থাকুন, অনেক লোকের পক্ষেই তাহাতে কি আসিয়া যায় ? এই সহরে অধিকাংশ ব্যক্তি প্রাতঃ-কালে উঠিয়াই প্রাতরাশ ক্রিয়া সম্পন্ন করেন—ঈশ্বর আসিয়া তাঁহার পোষাক করিবার বা আহারের কোন সাহায্য করেন না। তারপর তিনি কাযে যান ও সারাদিন কায করিয়া টাকা রোজকার করেন। ঐ টাকা ব্যাঙ্কে রাখিয়া তিনি বাড়ী আসেন, তার পর উত্তমরূপে ভোজন ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিয়া শয়ন করিয়া থাকেন। এ সকল কার্য্যই তিনি যন্ত্রবৎ নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন—ঈশ্বরের চিন্তা মোটেই করেন না—ঈশ্বরের জন্য তাঁহার কোন প্রয়ো-জনই বোধ হয় না। তাঁহার চারিটী নিত্য কর্ত্তব্য আছে—আহার, পান, নিদ্রা ও বংশবৃদ্ধি। তারপর এক দিন শমন আসিয়া বলেন, "সময় হই-য়াছে—চল।" তখন সেই ব্যক্তি বলিয়া থাকে—'মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা করুন—আমি আর একটু সময় চাই—আমার ছেলে হরিশটী আর একটু বড় হোক।" কিন্তু শমন বলেন—"এখনই চল—এখনই দেহ ছাড়িতে হইবে।" এইরূপেই জগৎ চলিতেছে। এইরূপে হরিশের বাপ বেচারা সংসারে ফিরিতেছে। আমরা আর সে বেচারাকে কি বলিব—সে ঈশ্বরকে সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব বলিয়া বুঝিবার কোন সুযোগ পায় নাই। হয়ত পূর্ব্বজন্মে সে একটী শূকর ছিল—মানুষ হইয়া তদপেক্ষা সে অনেক ভাল হইয়াছে। কিন্তু সমুদয় জগৎ ত আর 'হরিশের বাপ' নয়—কতক কতক লোক আছেন, যাঁহারা একটু আধটু চৈতন্য লাভ করিয়াছেন। হয়ত একটা কষ্ট আসিল,

তীব্র ব্যাকুলতার প্রয়োজন।

তবে সাধারণ লোকের সংসারের অতীত বস্তুতে কোন প্রয়োজন বোধ নাই।

একজন ব্যক্তি যাহাকে সে খুব ভাল বাসে, সে মরিয়া গেল। যাহার উপর সে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিল, যাহার জন্য সে সমুদয় জগৎকে, এমন কি, নিজের ভাইকে পর্য্যন্ত ঠকাইতে পশ্চাৎপদ হয় নাই, যাহার জন্য সর্ব্বপ্রকার ভয়ানক কার্য্য করিয়াছে, সে মরিয়া গেল—তখন তাহার হৃদয়ে একটা ঘা লাগিল। হয়ত সে তাহার অন্তরাত্মার এক বাণী শুনিল—'তার পর কি?' যে ছেলের জন্য সে সকলের সহিত প্রতারণা করিতে নিযুক্ত ছিল এবং নিজেও কখন ভাল করিয়া খায় নাই, সে হয়ত মারা গেল—তখন সেই ঘা খাইয়া তাহার চৈতন্য হইল। যে স্ত্রীকে লাভ করিবার জন্য সে উন্মত্ত বৃষভের ন্যায় সকলের সহিত বিবাদ করিতেছিল, যাহার নূতন নূতন বস্ত্র ও অলঙ্কারের জন্য সে টাকা জমাইতেছিল, সে একদিন হঠাৎ মরিয়া গেল—তখন তাহার মনে স্বভাবতঃই উদয় হইল—তার পর কি? কাহারও কাহারও অবশ্য মরণ দেখিয়াও মনে কোন আঘাত লাগে না, কিন্তু খুব অল্পস্থলেই এরূপ ঘটিয়া থাকে। আমাদের অধিকাংশের পক্ষেই যখন কোন জিনিষ আমাদের আঙ্গুল গলিয়া চলিয়া যায়, আমরা বলিয়া থাকি, তাই ত, হল কি। আমরা এরূপ ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত! আপনারা শুনিয়াছেন—জনৈক ব্যক্তি জলে ডুবিতেছিল—সে সম্মুখে আর কিছু না পাইয়া একটা খড় ধরিয়াছিল। সাধারণ মানুষও প্রথমে ঐরূপ খড়ের ন্যায় যাহাকে তাহাকে অবলম্বন করিয়া তাহাকে ভালবাসিয়া থাকে আর যখন তাহা দ্বারা কোন কায হইবার সম্ভাবনা দেখে না, তখনই বলিয়া থাকে, হে ভগবান্, আমায় রক্ষা কর। তথাপি উচ্চতর অবস্থা লাভ করিবার পূর্ব্বে মানুষকে অনেক 'আমড়ার অম্বল' খাইতে হয়।

কাহারও কাহারও কষ্টে পড়িয়া চৈতন্য হয়।

কিন্তু এই ভক্তিযোগ একটা ধর্ম্ম। আর ধর্ম্ম বহুর জন্য নহে, তাহা হওয়াই অসম্ভব। হাত যোড় করা, ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়া, হাটু গেড়ে বসা, ওঠা বসা—এসব কসরত সর্ব্বসাধারণের জন্য হইতে পারে, কিন্তু ধর্ম্ম অতি অল্প লোকের জন্য। সকল দেশেই হয়ত ৩।৪ শত লোকের যথার্থ ধর্ম্ম করিবার অধিকার আছে। অপরে ধর্ম্ম করিতে পারে না, কারণ, তাহারা অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইবে না—তাহারা ধর্ম্ম চায়ই না। প্রধান কথা হচ্চে ভগবান্‌কে চাওয়া। আমরা ভগবান্ ছাড়া আর সব জিনিষ চাহিয়া থাকি; কারণ, আমাদের সাধারণ অভাবসমূহ বাহ্য জগৎ হইতেই

পূরণ হইয়া থাকে। কেবল যখন বাহ্য জগৎ দ্বারা আমাদের অভাব কোন মতে পূর্ণ না হয়, তখনই আমরা অন্তর্জ্জগৎ হইতে—ঈশ্বর হইতে—আমাদের অভাব পূরণার্থ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকি। যত দিন আমাদের প্রয়োজন এই জড় জগতের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে, ততদিন আমাদের ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন থাকিতে পারে না। কেবল যখনই আমরা এখানকার সমুদয় বিষয় ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হই, এবং এতদতিরিক্ত কিছু চাহিয়া থাকি, তখনই আমরা ঐ অভাব পূরণের জন্য জগতের বহির্দ্দেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। কেবল যখনই আমাদের প্রয়োজন হয়, তখনই তাহার জন্য জোর তলব হইয়া থাকে; যত শীঘ্র পারেন, এই সংসারের ছেলেখেলা সারিয়া ফেলুন—তখনই এই জগদতীত কিছুর প্রয়োজন বোধ করিবেন—তখনই ধর্ম্মের প্রথম সোপান আরম্ভ হইল।

খুব কম লোকেই ভক্ত হইতে পারে।

এক রকম ধর্ম্ম আছে—উহা ফ্যাশান বলিয়াই প্রচলিত। আমার বন্ধুর বৈঠকখানায় হয়ত যথেষ্ট আসবাব আছে—এখনকার ফ্যাশান—একটী জাপানী পাত্র (Vase) রাখা—অতএব হাজার টাকা দাম হইলেও আমার উহা অবশ্যই চাই। এইরূপ আমাদের অল্প স্বল্প ধর্ম্মও চাই—একটা সম্প্রদায়েও যোগ দেওয়া চাই। ভক্তি এরূপ লোকের জন্য নহে। ইহাকে প্রকৃত 'ব্যাকুলতা' বলে না। ব্যাকুলতা তাহাকে বলে, যাহা ব্যতীত মানুষ বাঁচিতেই পারে না। আমাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বায়ু চাই, খাদ্য চাই, কাপড় চাই, এগুলি ব্যতীত আমরা জীবন ধারণ করিতে পারি না। পুরুষ যখন কোন স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হয়, তখন সময়ে সময়ে সে এরূপ বোধ করে যে, তাহাকে ছাড়িয়া সে ক্ষণমাত্র বাঁচিবে না, যদিও ভ্রমবশতই সে এরূপ ভাবিয়া থাকে। স্বামী মরিলে স্ত্রীরও কিছুক্ষণের জন্য মনে হয়, সে স্বামীকে ছাড়িয়া বাঁচিতে পারিবে না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে ত বাঁচিয়াই থাকে দেখা যায়। আমার আত্মীয়গণের মৃত্যু হইলে অনেক সময় আমিও ভাবিয়াছি, আমি আর বাঁচিব না, কিন্তু তবুও ত আমি বাঁচিয়া আছি। প্রকৃত প্রয়োজনের ইহাই রহস্য—তাহাই আমাদের যথার্থ প্রয়োজন বা অভাব বলা যায়, যাহা ব্যতীত আমরা বাঁচিতেই পারি না; হয় আমাদের উহা পাইতে হইবে, নতুবা আমরা মরিব। যখন এমন সময় আসিবে যে, আমরা ভগবানেরও

ফ্যাশানের ধর্ম্ম করিলে চলিবে না—প্রকৃত প্রয়োজন বোধ চাই।

ঐরূপ প্রয়োজন বা অভাব বোধ করিব, অন্য কথায় যখন আমরা এই জগতের—সমুদয় জড়শক্তির—অতীত কিছুর অভাব বোধ করিব, তখন আমরা ভক্ত হইতে পারিব। যখন আমাদের হৃদয়াকাশ হইতে ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান মেঘ সরিয়া যায়, আমরা সেই সর্ব্বাতীত সত্তার একবার চকিত দর্শন লাভ করি, এবং সেই মুহূর্ত্তের জন্য সকল নীচ বাসনা যেন সিন্ধুতে বিন্দুর ন্যায় ডুবিয়া যায়, তখন আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের সংবাদ কে রাখে? তখনই আত্মার বিকাশ হয়, সে ভগবানের অভাব বোধ করে—তখন সে এমন বোধ করে যে, তাঁহাকে না পাইলেই আর চলিবে না। সুতরাং ভক্ত হইবার প্রথম সোপান এই—দিবারাত্র বিচার করা—আমরা কি চাই। প্রত্যহ নিজ মনকে প্রশ্ন করিতে হইবে—আমরা কি ঈশ্বরকে চাই? আপনারা জগতের সব গ্রন্থ পড়িতে পারেন, কিন্তু বক্তৃতাশক্তি দ্বারা বা উচ্চতম মেধাশক্তি দ্বারা বা নানাবিধ বিজ্ঞান অধ্যয়নের দ্বারা এই প্রেম লাভ করা যায় না। তিনি যাহাকে ইচ্ছা করেন, সেই তাঁহাকে লাভ করে। তাহার নিকটই ভগবান্ আত্মপ্রকাশ করেন।* একজন ভালবাসিলে অপরকেও ভালবাসিতে হইবে। আমি আপনাকে ভালবাসিলে আপনাকেও আমাকে ভালবাসিতেই হইবে। আপনি আমাকে ঘৃণা করিতে পারেন আর আপনাকে আমি ভালবাসিতে যাইলে আপনি আমাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইতে পারেন। কিন্তু যদি আমি তাহাতে আপনাকে ভালবাসিতে বিরত না হইয়া আপনাকে ভালবাসিয়াই যাই, তবে আপনাকে আমায় এক মাসে হউক, এক বৎসরে হউক অবশ্যই ভালবাসিতে হইবে। মানসিক জগতের ইহা একটী চিরপরিচিত ঘটনা। ভগবান্ যাহাকে ভালবাসেন, সেও ভগবান্‌কে ভালবাসিয়া থাকে, সে সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাকে আঁকড়িনা ধরিয়া থাকে। যেমন প্রেমিকা স্ত্রী তাহার মৃত পতির উদ্দেশে চিন্তা করে, পুত্রকে আমরা যেরূপ ভাবে ভালবাসিয়া থাকি, ঠিক সেই ভাবে আমাদিগকে ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইতে হইবে। তবেই আমরা ভগবান্‌কে লাভ করিব—আর এই সব বই, এই সব বিজ্ঞান—আমাদিগকে কিছুই শিখাইতে পারিবে না। যে ব্যক্তি প্রেমের এক অক্ষর পাঠ করিয়াছে, সেই প্রকৃত পক্ষে পণ্ডিত।

গ্রন্থাদি পাঠে ভগবান্ লাভ হয় না, তীব্র ব্যাকুলতা দ্বারাই ভগবান্ লাভ হয়।

* কঠোপনিষৎ, দ্বিতীয়া বল্লী, ২৩শ শ্লোক দেখুন।

অতএব আমাদিগকে প্রথমে এই ব্যাকুলতাসম্পন্ন হইতে হইবে। প্রত্যহ নিজের মনকে প্রশ্ন করিতে হইবে, আমরা কি ভগবান্‌কে বাস্তবিক চাই। যখন আমরা ধর্ম্মের সম্বন্ধে কথা কহিতে থাকি, বিশেষতঃ যখন আমরা উচ্চাসনে বসিয়া অপরকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করি, তখন আপনার মনকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে হইবে। আমি অনেক সময় দেখিতে পাই, আমি ভগবান্ চাই না, বরং তদপেক্ষা খাবার ভালবাসি। এক টুকরা রুটি না পাইলে আমি পাগল হইয়া যাইতে পারি—অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলারা একটা হীরার আলপিন না পাইলে পাগল হইয়া যাইবেন। তাঁহারা এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে একমাত্র সত্য বস্তু রহিয়াছে, তাঁহাকে জানেন না। আমাদের চলিত কথায় বলে—

মারি ত গণ্ডার।
লুটি ত ভাণ্ডার॥

গরিবের ঘর লুট করিয়া অথবা পিঁপড়ে মারিয়া কি হইবে? অতএব যদি ভালবাসিতে চান, ভগবান্‌কে ভালবাসুন। সংসারের এ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষকে ভালবাসিয়া কি হইবে? আমি স্পষ্টবাদী মানুষ—তবে এ সব কথা আপনাদের ভালর জন্যই বলিতেছি—আমি সত্য কথা বলিতে চাই—আমি তোষামোদ করিতে চাহি না—আমার তা কায নয়। তা যদি আমার উদ্দেশ্য হইত, তবে আমি সহরের ভাল যায়গায় সৌখীনলোকের উপযোগী একটা চার্চ্চ খুলিয়া বসিতাম। আপনারা আমার ছেলের মতন—আমি আপনাদিগকে সত্য কথা বলিতে চাই। এই জগৎ সম্পূর্ণ মিথ্যা, জগতের সমুদয় শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণই তাহা অনুভব দ্বারা জানিয়া বলিয়া গিয়াছেন। আর ঈশ্বরব্যতীত এই সংসারপারের আর উপায় নাই। তিনিই আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য—এই জগৎ যে জীবনের চরম লক্ষ্য—এরূপ ধারণা ঘোর অনিষ্টকর। এই জগৎ, এই দেহ—সেই চরম লক্ষ্য লাভের উপায়স্বরূপ হইতে পারে এবং উহাদের গৌণ মূল্য থাকিতে পারে, কিন্তু এই জগৎ যেন আমাদের চরম লক্ষ্য না হয়। দুঃখের বিষয়, আমরা অনেক সময় এই জগৎকেই উদ্দেশ্য করিয়া ঈশ্বরকে ঐ সংসারসুখলাভের উপায়স্বরূপ করিয়া থাকি। আমরা দেখিতে পাই, লোকে মন্দিরে গিয়া ভগবানের নিকট রোগমুক্তি ও অন্যান্য নানা প্রকার কাম্যবস্তু প্রার্থনা করিতেছে। তাহারা

ছোট খাট জিনিষকে ভাল না বাসিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু ভগবান্‌কে ভালবাসিতে হইবে।

সুন্দর সুস্থ দেহ চায়, আর যেহেতু তাহারা শুনিয়াছে যে, কোন একজন পুরুষ কোন স্থানে বসিয়া আছেন এবং তিনি ইচ্ছা করিলেই তাহাদের ঐ কামনা পূর্ণ করিয়া দিতে পারেন, সেই হেতু তাহারা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকে। ধর্ম্মের এইরূপ ধারণা অপেক্ষা নাস্তিক হওয়া ভাল। আমি আপনাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই ভক্তিই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ। লক্ষ লক্ষ বৎসরে আমরা এই আদর্শ অবস্থায় উপনীত হইতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু ইহাকেই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ করিতে হইবে—আমাদের ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠতম বস্তুলাভের চেষ্টায় নিযুক্ত করিতে হইবে। যদি একেবারে শেষ প্রান্তে পঁহুছান না যায়, অন্ততঃ কতকদূর পর্য্যন্ত ত যাওয়া যাইবে। আমাদিগকে ধীরে ধীরে এই জগৎ ও ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে অগ্রসর হইয়া ঈশ্বরের নিকট পঁহুছিতে হইবে।

ক্রমশঃ।

মধুর রস ও বৈষ্ণব কবি।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

পূর্ব্বদর্শিত অনির্ব্বচনীয় অপূরণীয় অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, ঐ উন্মাদ বাসনা যে অগাধ ভালবাসার সৃষ্টি করে তাহা, ক্ষুদ্র মানুষ আমরা, আমরা কি বুঝিব? ভক্তভগবানের এই নিগূঢ় চিরসম্বন্ধ ভক্ত ভিন্ন কে ধারণা করিতে পারে? "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—এই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিবার জন্য চিরভক্তবৎসল শ্রীহরি কত না দৈন্য স্বীকার করিতে পারেন, কত না অগাধ ভালবাসা দিতে পারেন! জগতে কোনও নায়ক, নায়িকাতে এত অনুরক্ত হইতে পারে না, নায়িকাকে এত প্রেম দিতে পারে না। ভক্তিরস-প্রসূত ভগবৎ-প্রেমের উজ্জ্বল পতাকাস্বরূপ বৈষ্ণব কবির পদাবলী দীনজনের আশাপ্রদ, প্রেমিকের কাছে রত্নস্বরূপ, প্রেমপিপাসুর পিপাসার জল। মধুররসের পদাবলীতে ভগবান্ কৃপা বিতরণ করিতেছেন না—কৃপা

চাহিতেছেন। ভক্তিরূপিনী শ্রীরাধা আর শ্রীকৃষ্ণের চরণে মাথা কুটিয়া প্রেম যাচ্ঞা করিতেছেন না; তিনি গর্ব্বভরে বলিতেছেন—

"আমার অঙ্গের বরণ লাগিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করের মুরলী
লইতে আমারি নাম॥"

কখনও শ্রীকৃষ্ণ যাচক, শ্রীরাধা ধনী; কখনও আবার শ্রীরাধা যাচিকা শ্রীকৃষ্ণ দানী। আর ছোটবড় ভাব নাই, সাধ্যসাধকের ভাব নাই; এখন একাঙ্গী প্রেমে দুইয়ের অপরূপ সাম্য অপরূপ একতা সাধিত হইয়াছে। এই দেখুন, শ্রীরাধা কহিতেছেন—

শ্যাম সুন্দর স্মরণ আমার
শ্যাম শ্যাম সদা সার।
শ্যাম সে জীবন শ্যাম প্রাণধন
শ্যাম সে গলার হার॥
শ্যাম সে বেসর শ্যাম বেশ মোর
শ্যাম সাড়ী পরি সদা।
শ্যাম তনু মন ভজন পূজন
শ্যাম দাসী হ'ল রাধা॥
শ্যাম ধন বল শ্যাম জাতি কুল
শ্যাম সে সুখের নিধি।
শ্যাম হেন ধন অমূল্য রতন
ভাগ্যে মিলাইল বিধি॥
কোকিল ভ্রমর করে পঞ্চস্বর
বধুয়া পেয়েছি কোলে।
হিয়ার মাঝারে রাখিহ শ্যামেরে
দ্বিজ চণ্ডীদাসে কহে॥

আবার শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন—

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী হইল সারা।

কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী নয়ন তারা॥
গৃহ মাঝে রাধা কাননেতে রাধা
রাধাময় সব দেখি।
নয়নেতে রাধা গমনেতে রাধা
রাধাময় হ'লো আঁখি॥
স্নেহেতে রাধিকা প্রেমেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া রাধাবল্লভ নাম
পেয়েছি অনেক আশে॥

প্রেমের গভীরত্ব ইহার অধিক আর কোথাও দেখিয়াছি কি না জানিনা।

প্রেমে ভগবান্‌কে বশ করা যায় এ কথা সকল ধর্ম্মেই ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্তু প্রেমে ভগবান্‌কে যে দীনতা স্বীকার করান যায়, তাহা বৈষ্ণব কবি ভিন্ন জগতের আর কেহই ঘোষণা করিতে কি, বোধ হয় ভাবিতেও পারেন নাই! ভক্ত বৈষ্ণব অবিচলিতচিত্তে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমজ দৈন্য চিত্রিত করিয়াছেন—ভয়ে বা সম্ভ্রমে সঙ্কুচিত হন নাই।

রাধে ভিন্ন না ভাবিহ তুমি॥
সব তেয়াগিয়া ও রাঙ্গা চরণে
শরণ লইনু আমি।
তুয়া পদাশ্রিত করিয়ে মিনতি
সকলি সহিবি ক্ষমি॥
গলায় বসন আর নিবেদন
বলি যে তুঁহারি ঠাঁই।
চণ্ডীদাস ভণে ও রাঙ্গা চরণে
দয়া না ছাড়িও রাই॥

যে ভাল বাসিয়াছে, সে নিচু হইতে ভালবাসে; সে আর দূরে, উর্দ্ধে, মহত্ত্বের অন্তরালে, ঐশ্বর্য্যের ব্যবধানে আপনাকে রাখিতে পারে না। বৈষ্ণব কবি প্রণয়শাস্ত্রের এই সহজ তথ্যটুকু ভাল করিয়া জানিতেন।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেমের গভীরতা বৈষ্ণব কবি যেমন চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি। বোধ হয়, ইহার পরেও আর আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতে হইবে না যে, বৈষ্ণব কবির গান

প্রেমের গান, ইন্দ্রিয়াসক্তির গান নহে। ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি চিত্র করা বৈষ্ণব পদাবলীর লক্ষ্য নহে। কিন্তু বিশুদ্ধ প্রণয়ের প্রথম অধ্যায়ে দেহের মিলন প্রায়শঃ আসিয়া পড়ে, তাই বৈষ্ণব কবি দৈহিক মিলনকে তুচ্ছ করিতে পারেন নাই। তাঁহারা জানিতেন, প্রণয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম প্রণয়ীযুগলকে সর্ব্বতোভাবে মিলিত, সংযুক্ত ও একীভূত করা; প্রাণের মিলনই প্রধান "দেহের মিলন" তাহার একটি সামান্য অঙ্গ বা পরিচায়ক মাত্র। প্রেমের সম্পূর্ণ চিত্র দেখাইতে যাইয়া কাজেই তাঁহারা উহাও দেখাইতে বিরত হন নাই। জগতের কবিকুলচূড়ামণিরা কোথাও সে কথা ঢাকিতে চেষ্টা করেন নাই—তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন যে, প্রেমের স্বাভাবিক পরিণতিতে দেহের মিলন আসিয়া পড়িলেও প্রণয় উহাতেই আবদ্ধ থাকে না—উর্দ্ধে, আরও উর্দ্ধে প্রণয়ীযুগলকে লইয়া যাইয়া আত্মার একত্বানুভূতি পর্য্যন্ত আনয়ন করে। বৈষ্ণব কবি ভক্ত কবি; তাই তিনিই কেবল প্রণয়ের ঐ উচ্চ তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রকাশে সমর্থ হইয়াছিলেন। "না সো রমণ না হাম রমণী"—শ্রীরাধিকার এই অনুভূতি চিত্রিত করিয়া বৈষ্ণব কবি ঐ বিষয়ের যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। সেক্ষপীয়র প্রভৃতি সাংসারিক কবি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহাদের প্রেমচিত্রসকলের দৈহিক মিলনেই পরিসমাপ্তি। উদাহরণ-স্বরূপ দেখা যাউক—

ডেস্‌ডিমোনা, সেক্ষপীয়রসৃষ্ট নায়িকাগণের মধ্যে প্রধানা—একথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ডেস্‌ডিমোনার প্রণয় রূপজ নহে—গুণজ—অতএব বড় পবিত্র—একবাক্যে ইহা স্বীকৃত। ডেস্‌ডিমোনার প্রণয় আসঙ্গলিপ্সাবিহীন—এ কথা যদি সেক্ষপীয়র প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে আমরা বুঝিতাম যে, সেক্ষপীয়র মনুষ্যহৃদয়জ্ঞ নহেন। তিনি জানিতেন যে, ভালবাসা যে কারণেই জন্মাক, প্রিয়ের সঙ্গ কামনা, প্রিয়ের কাছে আপনার দেহ মন সমর্পণ, উহাতে স্বভাবতঃই আনিয়া দেয়। তাই তিনি দেখাইলেন যে, ডেস্‌ডিমোনার হৃদয়ে যখন ভালবাসা জন্মিল, তখন আর সে ওথেলোকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিল না। পিতার অজ্ঞাতসারে তাহাকে বিবাহ করিল ও পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রী পতির সঙ্গে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। পিতা পুত্রীর কথোপকথন একটু উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

Duke—What would you, Desdemona?

Desdemona—That I did love the Moor to live with him,

My downright violence and storm of fortunes

May trumpet to the world: My heart's subdued

Even to the very quality of my lord:

* * * * *

So that, dear lords, if I be left behind,

A moth of peace, and he go to the war,

The rites for which I love him are bereft me,

And I a heavy interim shall support

By his dear absence. Let me go with him.

Othello, Act. I. Sc. III.

কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। সাংসারিক কবি আরও ঊর্দ্ধে উঠিয়া ঐ প্রেমের পরিসমাপ্তি আত্মানুভূতিতে, ইহা আর দেখাইতে পারেন নাই। ঈর্ষা, দ্বেষ প্রভৃতি মানবমনের কুপ্রবৃত্তিসমূহ দ্বারা ঐ প্রণয় কিরূপে ফলবান্ হইতে না হইতে 'অঙ্কুরে ভাঙ্গল' হইল, তাহাই দেখাইতে ব্যস্ত হইয়াছেন! কাজেই সেক্ষপীয়রাদি সাংসারিক কবির কবিতা মনুষ্য-ভূমি ছাড়িয়া বৈষ্ণব কবির গীতিসকলের ন্যায় দেব-ভূমিতে উঠিতে সমর্থ হয় নাই এবং সেজন্যই উঁহাদের রচনাবলীসহায়ে কেহ কখন ধর্ম্মলাভের আশা পোষণ করেন না—সাময়িক আনন্দ বা সংসারের চাল চলন দেখিয়া ইহজীবনের অসারতাই একটু আধটু অনুভব করিয়া থাকেন। মহাকবি কালিদাসও ঐ বিষয়ে দোষী—সম্পূর্ণ না হইলেও কতকাংশে বটে। তৎকৃত জগৎপিতা ও জগদম্বা হরগৌরীর প্রেমচিত্র একটু অনুধাবন করিলেই উহা বুঝা যায়। স্মরহর মহাদেব যখন ভালবাসেন নাই, তখন গৌরীর অপূর্ব্ব মাধুর্য্যও তাঁহাকে বশীভূত করিতে পারে নাই; তিনি অবলীলাক্রমে বিশ্ববিজয়ী মদনকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তিনিই আবার যখন গৌরীর প্রেম-বশীভূত হইলেন, তখন দেবতাদের প্রার্থনায় মদনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া নিজাঙ্গে পুষ্পশরাঘাত করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। বেশ কথা—কিন্তু ইহার পরেই কবি সাধারণ পুরুষের ন্যায় মহাদেবে আসঙ্গলিপ্সা চিত্রিত করিয়া ঐ চিত্রের অবনতি করিয়াছেন বলিয়া বেশ অনুমিত হয়। মহাকবি কালিদাসের প্রেমের বিরাট্ কাব্য কুমারসম্ভবের এই মানবভূমিকে

পরিণতির বিষয় যাঁহারা ভাবিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, বৈষ্ণব কবির রচনাবলী কত উচ্চদরের। উহাতে মিলন চিত্রিত হইলেও উহা যে সাধারণ নায়কনায়িকার মিলন নহে—একথা বৈষ্ণব কবি যথাসাধ্য ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের যে লালসা উপরে কথিত হইয়াছে, তাহার ফল এই অপূর্ব্ব যুগলমিলন। ভক্তমাত্রেই এই যুগলমিলনের পক্ষপাতী, এই যুগলমিলনসাধনের জন্য কৃতসংকল্প ও অত্যুৎসাহী। এই মিলনের ভিতর নায়কনায়িকার কত ভাব, কত অবস্থান্তর, কত সুখ, কত আনন্দ, তাহা বৈষ্ণব কবি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শুধু বৈষ্ণব কবি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা নহে; শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এ সকল ভাবই নিজের জীবনে উদাহৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, উহা সাধারণ নায়ক-নায়িকার মিলনের মত নহে। নায়িকার উৎকণ্ঠিতাবস্থার একটী চিত্র গৌরাঙ্গ-জীবনে কেমন প্রতিফলিত তাহা দেখাইতেছি—

কি লাগিয়া মোর গৌর সুন্দর
বসিয়া গৃহের মাঝে।
বসন আসন রতন ভূষণ
সাজয়ে অঙ্গের মাঝে॥
আপন বপুর ছাহ হেরিয়া
চমকি উঠয়ে মনে।
কি লাগি অবহুঁ না মিলন পহুঁ
এত না বিলম্ব কেনে॥
কহে নরহরি মোর গৌরহরি
ভাবিয়ে রাইয়ের দশা।
সজল নয়নে চাহে পথপানে
কহে গদগদ ভাষা॥

এই মিলনের পরিতৃপ্তি নাই, এ মিলনে ক্লান্তি নাই, এ মিলনে প্রেমের পরিপুষ্টি ব্যতিরেকে প্রেমের নাশ নাই।

আদরে আগুসারি রাই হৃদয়ে ধরি
জানু উপরে পুন রাখি।
নিজ করকমলে চরণযুগ মোছই
হেরই চির থির আঁখি॥

পিরীতি মূরতি অধিদেবা।
যাকর দরশনে সব দুখ মিটল
সোই আপন কর সেবা ॥
হিমকর শীতল নীরহি তীতল
করতলে মাজই মুখ।
সজল নলিনী দলে মৃদু মৃদু বীজই
পুছই পহুকি দুখ ॥
অঙ্গুলে চিবুক ধরি বদনে তাম্বুল পূরি
মধুর সম্ভাষয়ি কান।
গোবিন্দ দাস কহে নিতি নব নূতন
রাইক অমিয়া সিনান ॥

এ মিলন যথার্থই "অমিয় সিনান"। ইহাতে যে নীচ ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি নাই, তাহার প্রমাণ দেখিতে চাও ত বৈষ্ণব কবির "প্রেমবৈচিত্ত্য" পাঠ কর; তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে যে, এ মিলন কোন জাতীয়।

শ্যামক কোরে যতনে ধনী শুতল
মদন আলসে দুহুঁ ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন নিবিড় আলিঙ্গন
যেন কাঞ্চন মণিজোড় ॥
কোরহি শ্যাম চমকি ধনী বোলত
কবে মোহে মিলব কান।
হৃদয়ক তাপ তবহুঁ মঝু মিটব
অমিয়া করিব সিনান ॥
সো মুখ মাধুরি বঙ্ক নেহারণি
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
সো তনু সরস পরশ যব পাওব
তবহিঁ মনোরথ পূর ॥
এত কহি সুন্দরী দীর্ঘ নিশাসই
মুরছি হরল গেয়ান।
আকুল রাই শ্যাম পর রোয়ই
গোবিন্দ দাস পরমাণ ॥

"দুহুঁ কোরে দুহুঁ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া"। যে প্রেমের মিলনে এমন অপরূপ ভাবের আবেশ হয়, সে মিলন কত পবিত্র, কত আনন্দের, তাহা ভক্ত বৈষ্ণবকবি বার বার প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণেরসম্ভোগ-রস উপলব্ধি করা পরম পুরুষার্থ, আজন্ম সাধনার ফল। তাই সেই সম্ভোগভাবনায় বিভোর জ্ঞানদাস বলিয়াছেন—

চঞ্চল চরণ　　কমলমণি নূপুর
সশবদ মঙ্গল তুর।
মনমথ কোটী　　মথন করু ঐছন
জ্ঞানদাস চিতে ফুর॥

কারণ, কামগন্ধহীন না হইলে উহার উপলব্ধি সুদূরপরাহত। সেজন্যই পুরাকালে পূজ্যপাদ্ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নবীন অসংযত বৈষ্ণবগণকে রাস-পঞ্চাধ্যায় পাঠ এবং শ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন চিন্তা করা হইতে দূরে থাকিতে উপদেশ করিতেন।

ফলতঃ ভক্ত বৈষ্ণবের কাছে শ্রীরাধামদনমোহনের "মদন" বিলাসই মদন-জয়ের একমাত্র উপায়। যুগলমূর্ত্তির পূর্ণালিঙ্গন ভাবনাই ভক্তের সর্ব্বোচ্চ সাধনা। তাই যুগলমিলনবর্ণনে বৈষ্ণব কবির হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয় এবং সেই অপার্থিব আনন্দ তাঁহাদের ছন্দোবন্ধে, কথায় কথায় উছলিয়া উঠে—যেন হৃদয়ের সহিত তাঁহাদের গীতগুলিও তালে তালে নাচিতে থাকে।

দেখিব সখি　　শ্যামচন্দ
ইন্দু-বদনী রাধিকা।
বিবিধ যন্ত্র　　যুবতী-বৃন্দ
গাওয়ে রাগ-মালিকা॥
মন্দ পবন　　কুঞ্জ ভবন
কুসুম গন্ধ মাধুরী।
মদন-রাজ　　নব সমাজ
ভ্রমর-ভ্রমণ চাতুরী॥
তরল তাল　　গতি দুলাল
নাচে নটিনী নটন সুর।
প্রাণনাথ　　করত হাত
রাই তাহে অধিক পূর॥

অঙ্গে অঙ্গে পরশে ভোর
কেহুঁ রহত কাহুঁক কোর।
জ্ঞান দাস কহত রাস
যৈছন জলদে বিজুরী জোর॥

কেহবা প্রেমে মগ্ন হইয়া দেখিতেছেন—

নব নায়রী নব নাযর
নৌতুন নব লেহা।
আঁখে আঁখে নিমিখে নিমিখে
বেছুরল নিজ দেহা॥

. . . .

চঞ্চল মণি কুণ্ডল চল
চঞ্চল পট বাস।
দুহোঁ দুহা কর ধরিয়ে নাচয়ে
হেরত অনন্ত দাস॥

আর একজন আনন্দোচ্ছ্বসিত স্বরে গাহিতেছেন—

মধুর মিলন খেলন হাস
মধুর মধুর রস বিলাস
মদন হেরই ধরণী লুঠই
বেদন ফুট ছাতিয়া।
মধুর মধুর চরিত রীত
বলরাম চিতে ফুরত নীত
দুহুঁক মধুর চরণ সেবন
ভাবন জনম যাতিয়া॥

যাঁহারা সর্ব্বদাই বৈষ্ণব কবির মিলনচিত্রে ইন্দ্রিয়োৎসব ভিন্ন আর কিছু দেখিতে চাহেন না, তাঁহাদেরও বোধ হয় স্বীকার করিতে হইবে যে, এইগুলি মিলনানন্দের পবিত্র চিত্র এবং যাঁহারা এগুলি লিখিয়াছেন, অন্ততঃ তাঁহাদের মনে কাব্যাতিরিক্ত অন্য একটী ভাবও বিদ্যমান্ ছিল।

আমরা এই মিলনানন্দ কথার প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাপ্রেমের প্রবল-

তার আরও দুই একটী উদাহরণ দিতে ইচ্ছা করি। শ্রীকৃষ্ণ নিজ ঐশ্বর্য্য একেবারে বিলুপ্ত করিয়া কতদূর দীনতা স্বীকার করিতে পারেন, তাহা এই মিলনাভ্যন্তরীণ চিত্রগুলিতে সমধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। এই মিলনচিত্রে ভক্তকবির হৃদয়ের সাহস ও প্রেমস্পৃক্ত কোমলতা উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া পড়িয়াছে।

কথিত আছে, মহাকবি জয়দেব মধুর রসের আদিকবি। জয়দেব "দেহিপদপল্লবমুদারম্" এই চরণটী লিখিতে সাহস করেন নাই; মধুর রসলোলুপ শ্রীগোবিন্দ আপনি নিজ ভক্তপ্রীতিপ্রকাশার্থ ঐ চরণটী পূরণ করিয়া দিয়াছিলেন।(১) কিন্তু চৈতন্যপরবর্ত্তী ভক্ত বৈষ্ণব কবি ভগবানের অপরূপ লীলা প্রত্যক্ষ করিতে পারিয়াছিলেন, তাই আর তাঁহাদের মনে জয়দেবের হৃদয়োথ সঙ্কোচ স্থান পায় নাই। তাঁহারা নিঃশঙ্কহৃদয়ে সম্ভ্রমবিহীন লেখনী ধারণ করিয়া অবিচলিত চিত্তে লিখিতে পারিয়াছেন—

রাস জাগরণে　　নিকুঞ্জ ভুবনে
এলাইয়া আলস-ভরে।
শুতলি কিশোরী　　আপনা পাশরি
পরাণনাথের কোরে॥
সখি হের দেখসিয়া বা—
চন্দ্রবদনা　　নিন্দ যায় ধনী
শ্যাম অঙ্গে দিয়ে পা॥
নাগরের বাহু　　শিথান করিয়া
বিথান বসন ভূষা।
নাসার নিঃশ্বাসে　　বেশর দুলিছে
হাসিখানি আছে মিশা॥
পাবহাস করি,　　নিতে চাহে হরি
সোয়াম না পায় মনে।

নায়কনায়িকার এই সহজ সমাবেশ কবির কল্পনার বিষয় নহে, ইহা তিনি, শুধু অনুভব নহে, সত্য প্রত্যক্ষ করিতেছেন; তাই তিনি অতি ধীর, অতি নিরুদ্ধ বচনে সকলকে সাবধান করিয়া দিতেছেন—

(১) শ্রীশ্রীভক্তমাল,—১২শ মালা চরিত্র, শ্রীজয়দেব।

ধীরি ধীরি বোল না করিহ রোল
দাস জগন্নাথ ভণে ॥

আর তাঁহার অনুশাসন যেন আমাদেরও প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিতেছে। এ মিলনে ক্লান্তি নাই—এ মিলন অনন্ত বৈচিত্র্যময়—

নিতুই নূতন পিরীতি দুজন
তিলে তিলে বাড়ি যায়।
ঠাঞি নাহি পায় তথাপি বাড়ায়
পরিণামে নাথি খায় ॥
সখি হে অদ্ভুত দুহুঁ প্রেম।
এতদিন ঠাঞি অবধি না পাই
ইথে কি কষিল হেম ॥
উপমার গণ সব কৈল আন
দেখিতে শুনিতে ধন্ধ।
একি অপরূপ তাহার স্বরূপ
সবারে করিল অন্ধ ॥
চণ্ডীদাস কহে দুহুঁ সম নহে
এখানে সে বিপরীত।
এ তিন ভুবনে হেন কোন জনে
শুনি না দরবে চিত ॥

এই মিলনের বৈচিত্র্যের মধ্যে "প্রেম-বৈচিত্ত্য" ও "মান" উল্লেখযোগ্য। প্রেম-বৈচিত্ত্য" এক অপূর্ব্ব ভাব। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জীবনে এই ভাব অত্যন্ত পরিস্ফুট। যখন তাঁহার হৃদয় শ্রীকৃষ্ণময়, যখন সর্ব্বদাই তাঁহার কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি, সেই সময়েই তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বেদনা নিরতিশয় প্রবল। যখন তাঁহার সকলি কৃষ্ণময়, তখনই তিনি "কোথা কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ" বলিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়াছেন।(১) শ্রীরাধার প্রেম-বৈচিত্ত্য আমরা দেখাইয়াছি, শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-বৈচিত্ত্যের একটী চিত্র দেখাইতে ইচ্ছা করি। এই চিত্রে বৈষ্ণব কবির কবিত্ব বড় উপাদেয়। ভাবী বিরহের রেখাপাতে এই চিত্রগুলি করুণ-রসের আধার—

(১) শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত, ১৭শ।

আর কি রে কনক কষিল তনু সুন্দরী
দরশ পরশ মঝু হোয়।
উর উর পাণি হানি ক্ষিতি শুতল
আকুল কণ্ঠে ঘন রোয়॥

সজনি না বুঝিয়ে প্রেমতরঙ্গ।
রাইক কোরে চমকি হরি বোলত
কবে হবে তাকর সঙ্গ॥

আর কি রে শ্রবণে শুনিব হাম তাকর
সো প্রিয় মধুরিম ভাষ।
নয়নে বয়ান চান্দ কি রে হেরব
কৌমুদী হাস বিকাশ॥

রাইক কোরে কানু ঐছে বিলপই
ব্রজবনিতাগণ হাস।
প্রেমক রীত বুঝই সংশয় ভেল
কহতহি গোবিন্দ দাস॥

ভক্ত ও ভগবানের প্রেমে এই প্রেমবৈচিত্ত্য কেন? এই বিরহাশঙ্কা কেন? কবি বলিয়াছেন, "প্রেমক রীত, বুঝই সংশয় ভেল,"—এ সংশয় কেন আসে? ভক্ত ভগবৎবিরহাশঙ্কায় সর্ব্বদাই শঙ্কিত—যখন পূর্ণমিলন, তখনই তাহার মনে বিরহাশঙ্কা প্রবল। কারণ, ভক্ত জানে যে, তাহার ও ভগবানের মাঝে এই বিরাট্ সংসার বিরাজিত—কে জানে, কখন সেই প্রবল শত্রু তাহার ও তাহার হৃদয়বল্লভের মাঝে বিরহ ঘটাইবে? প্রেমের আশঙ্কা এমনি মধুর!

যেখানে ভালবাসা আছে, সেইখানেই "মান" আছে। ভক্তিরাজ্যেও একথা চির-প্রসিদ্ধ। ভক্ত যে ভাবেই ভগবান্‌কে সাধনা করুক, ভক্তি থাকিলেই, আপনার বলিয়া ভালবাসিতে পারিলেই "মানের" অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী। ভক্ত রামপ্রসাদ মায়ের উপর অভিমান করিয়া বলিয়াছিলেন, "মা মা বলে আর ডাক্‌ব না।" অভিমান করিবার অধিকার না হইলে ভালবাসা পরিপক্ক হয় না—প্রেমতত্ত্বজ্ঞ সকল কবিই একথা জানেন। বৈষ্ণব আলঙ্কারিক "মানের" লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন—

স্নেহস্তূৎকৃষ্টতা ব্যাপ্তা মাধুর্য্যং মানয়ন্নবম্।
যো ধারয়ত্যদাক্ষিণ্যং স মান ইতি কীর্ত্ত্যতে॥ (১)

এবং বৈষ্ণব কবি "মানের" চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। মান দ্বিবিধ, সহেতুক ও অহেতুক। সহেতুক—যখন নায়ক অন্যাসক্তি লক্ষণযুক্ত। "সো বহুবল্লভকাম"—অনেকের মন রাখিতে গিয়া শ্রীরাধার "মান" উৎপাদন করেন। ভক্তের মনেও এ মান স্বাভাবিক—ভগবান্ যে "শত-ঘরিয়া," সে শত-ঘরিয়াকে একেবারে আপন আয়ত্তমধ্যে না পাইলেই প্রেমিক ভক্তের "মান" আসে। যে ভালবাসে, তারই "মান" আসা সম্ভব, অন্যের নহে।

স্নেহং বিনা ভয়ং ন স্যাৎ নের্ষ্যা চ প্রণয়ং বিনা।
তস্মান্মানপ্রকারোয়ং দ্বয়োঃ প্রেমপ্রকাশকঃ॥ (২)

কারণ, "ন মানিনীশং সহতেঽন্যসঙ্গমম্" (৩)। যাহা প্রণয়ের মান, তাহা প্রিয়ের বড় উপভোগ্য।

"প্রেমের আশ্চর্য্য গতি মান স্বাভাবিক।
জনমে কখনও স্বল্প কখনও অধিক॥
সেই দুই মত হেতু নির্হেতু উপজে।
কৃষ্ণচন্দ্র তাহাতে পরম সুখ ভূঞ্জে॥ (৪)

শ্রীনরহরিদাস গৌরাঙ্গের "মান" বর্ণন করিয়াছেন—

আরে মোর আরে মোর গৌরাঙ্গ রায়।
পূরব প্রেমভরে মৃদু চলি যায়॥
অরুণ নয়ন মুখে বিরস হইয়া।
কোপে কহয়ে পহুঁ গদ গদ হিয়া॥
জানলুঁ তোহারে তোর কপট পিরীতি।
যা সাঞে বঞ্চিলা নিশি তাহা কর নিতি॥

শ্রীরাধার "মান" চিত্রণে বৈষ্ণবকবি বড় পটু—বড় উৎসাহশালী। কেননা, এই "মানের" ব্যপদেশে শ্রীকৃষ্ণের দৈন্য বড় মনোরম ভাবে চিত্রিত হয়।

(১) উজ্জ্বল নীলমণি, স্থায়িভাব প্রকরণ।
(২) ঐ ঐ
(৩) ভট্টিকাব্য, ২য় সর্গ।
(৪) ভক্তমাল গ্রন্থ, ২৩শ মালা।

শুন মাধব রাধা স্বাধীন ভেল।
যতনহি কত পরকারে বুঝায়নু ধনী উতর না দেল॥
তোহারি নাম শুনায় যব সুন্দরী
শ্রবণে মুদয়ে দুই পাণি।
তোহারি পিরীতি যো নব নব মানই
সো অব না শুনায় বাণী॥

তোহারি কেশ কুসুম তৃণ তাম্বুল
ধরলহি রাইক আগে।
কোপে কমলমুখী পালটি না হেরই
বৈঠলি বিমুখ বিরাগে॥
হেন বুঝি কুলিশ সার তছু অন্তর
কৈছে মিটায়ব মান।
কহ বিদ্যাপতি বচন অব সমুচিত
আপ নিধারহ কান॥

দুর্জ্জয় মানের বশবর্ত্তিনা শ্রীরাধিকা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যাখ্যাত। প্রত্যাখ্যানের পর তিনি কি ভাবিতেছেন? তিনি জানেন, রাধা মান করুন, রাধার প্রাণে প্রেম সমুদ্রতুল্য অসীম অগাধ। তিনি জানিতেন যে, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া শ্রীরাধার অন্তরে কত ব্যথা লাগিবে। তাই তিনি বলিতেছেন—

মোরে উপেখি রাই কৈছে জীয়ব
সো দুখ করি অনুমান।
রসবতী হৃদয় বিরহ জ্বরে জারব
ইথে লাগি বিদরে পরাণ॥

ফলেও তাহাই হইল। শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় দিয়া শ্রীরাধার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল—

হাত কি লছমী চরণ পর ডারলু
অব কি করব পরকারি।
সো বহুবল্লভ সহজই দুর্লভ
দরশ লাগি মন ঝুর॥

সখিবৃত্ত কবি শ্রীরাধার সমদুঃখী, তাঁহার কষ্ট বুঝিয়া বলিতেছেন—

গোবিন্দ দাস যবে যতনে মিলায়ব
তবহি মনোরথ পূর॥

বৈষ্ণব কবির সখীর চরিত্র এইখানে সুন্দর রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যখন রাধিকা কৃষ্ণকে ফিরাইয়া কাঁদিতে বসিয়াছেন, তখন সখী তাঁহাকে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিতেছে—

আপনার মান বহুত করি মানসি
তাকর মান করি ভঙ্গ।
সো দুলহ নাহ উপেখি তুহুঁ অব
বঞ্চবি কাহুঁক সঙ্গ॥

আবার যখন সে বুঝিল যে, রাধার হৃদয়ে কত নিদারুণ ব্যথা জাগিয়াছে, তখন রাধিকা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বলিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকে ফিরাইতে না পারিলে

সো মুখ চাঁদ হৃদয়ে ধরি পৈঠব
কালিন্দী বিষহ্রদতীর।

তখন সখী কৃষ্ণকে আনয়ন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছে। রাধাকে কত প্রবোধ দিতেছে। শ্রীকৃষ্ণকে সাধাসাধনা করিয়া ভুলাইয়া আনিতেছে, আবার রাধাকে কৃত্রিম মানে বসাইতেছে, কৃষ্ণকে পায় ধরাইতেছে। বৈষ্ণব কবির সখীচরিত্র বড়ই উজ্জ্বল—বড়ই হৃদয়গ্রাহী। সখীর কৌশলে—

কর জোড়ি সাধায় কান।
হাম তুয়া কিঙ্কর পড়িয়ে চরণ তল
তেজ ধনি নিদারুণ মান॥
এত কহি নাগর অন্তর গর গর
ঢরকি ঢরকি পড়ু লোর।
হেরি সুধামুখী আকুল ভেল অতি
সো মুখ হেরি বিভোর॥

ছল ছল নয়নে শ্যাম কর কিশলয়ে
ধরি কহে গদ গদ ভাষ।
জলদে গোপন বিধু যৈছে উদয় ভেল
কহ যদুনন্দনদাস।

প্রেমের জন্য যে মান, তাহার এইরূপ মধুরতায় সমাপ্তি।

ক্রমশঃ

চিন্তামণি।

১

কাঠুরে প্রত্যুষে বিছানাটি ছাড়ি,
ঘুমাতে পারেনি রাতে।
বন অভিমুখে যায় তাড়াতাড়ি,
কুঠারী লইয়া হাতে॥

২

দারিদ্র্য যন্ত্রণা না পারি সহিতে,
মনে মনে ভাবে যেতে।
দামি কাঠ লয়ে যাব বাজারেতে
আজি বন খুঁজে পেতে॥

৩

ভাবি মনে মনে পরিবার-কথা,
ছেলের শুকানো মুখ।
নানা মতে তার জাগে মনে ব্যথা,
হৃদে শেল যেন দুঃখ॥

৪

গভীর বনেতে প্রবেশ করিয়া,
কাটিয়া চন্দন বাঁধিয়া বোঝা।

যাইতে লাগিল মাথায় করিয়া,
গৃহপানে পথ ধরিয়া সোজা ॥

৫

নিদাঘের কাল, দিবা দ্বিপ্রহর—
রোদে হা হা করে সবার প্রাণ।
চলিতে চলিতে ক্লান্ত কলেবর,
ক্ষুৎপিপাসায় কাঠুরে ম্লান ॥

৬

যাইতে যাইতে দেখিতে পাইল,
সম্মুখে তাহার পথের মাঝে।
পাথর টুকুরা অতীব উজ্জল,
বন আলো করি রূপে বিরাজে ॥

৭

যতনে তাহারে লইল তুলিয়া,
মনোহর দেখি রূপের খনি।
মনে করে ছেলে খেলিবে লইয়া,
জানেনাক সেটি "চিন্তামণি" ॥

৮

চিন্তামণি গুণ বিদিত সকলে,
মিলে, যাহা ভাব, সুখের তরে ;—
কাঠুরে ভাবিছে, বটগাছ হ'লে,
বাচি কিছুক্ষণ বিশ্রাম ক'রে ॥

৯

যেমনি ভাবিল অমনি শোভিল
সম্মুখে তাহার ঘন ছায়াযুত।
বটতরু এক ; আনন্দে ভাসিল
কাঠুরে ; বিষাদ হইল গত ॥

১০

তাড়াতাড়ি চলি ফেলে কাট-ভার,
বসিল কাঠুরে তরুর মূলে।

শীতলিল অঙ্গ, শ্রান্তি গেল তার
আলসেতে ভারি চক্ষুটি ঢুলে ॥

১১

"শয্যা যদি হত এমন সময় !
ঘুমিয়ে নিতুম্ ক্ষণেক তরে।"
এই মনে তার হইল উদয়,
ঢুলিতে ঢুলিতে খানিক পরে ॥

১২

অমনি দেখিল সম্মুখেতে তার
শোভিছে সুন্দর শয্যাটি বেশ।
আশে পাশে তার বালিশ আবার
ভেবে চিন্তে তায় শুইল শেষ ॥

১৩

ক্ষণেক ঘুমায়ে কাঠুরিয়া ভাবে
সুখেতে বিহ্বল বিছানা'পরে।
পাশে যদি র'ত পূর্ণ হাব ভাবে
সুন্দরী অঙ্কেতে চরণ ধরে ॥

১৪

যেমনি ভাবিল অমনি চকিতে
আসিয়া দাঁড়াল যুবতী বালা।
অতি মনোরমা, অপ্সরা রূপেতে
নিয়ে কাটে দিন, এমনি ভোলা ॥

১৫

ভুলে গেল কেন এসেছিল বনে,
ভুলে গেল তার দারা সুতাসুতে।
ম'জে রল সুধু সে নারীবদনে,
মোহেতে ভুলিল স্বগৃহে যেতে ॥

১৬

ক্রমে ক্রমে দিবা হ'ল অবসান ;
বিদায় লইয়া আকাশ হ'তে।

ধীরে ধীরে রবি করিল প্রয়াণ,
(যেন) না যেয়ে না পারে, না চায় যে'তে ॥

১৭

ক্রমে অন্ধকার ঘেরিল চৌধারে,
হিংস্র জন্তু যত ডাকিল বনে।
কাঠুরের মন ভয়ে থরথরে
কাঁপিল ভয়েতে ভাবিল মনে ॥

১৮

"কি করি হায় রে! এমন সময়,
বাঘ যদি এসে পড়ে।
কি করিব আমি হেন অসময়,
কেই বা উদ্ধার করে?"

১৯

যেমনি ভাবিল অমনি চকিতে
পড়ে বাঘ তার ঘাড়ে।
নিয়ে গেল তারে দেখিতে দেখিতে;
(হায়!) কে কোথা তাহারে তারে ॥

২০

ও মন-কাঠুরে! এই ভব-বনে
কাম-চিন্তামণি পেলি।
মরিলি মরিলি মরিলি পরাণে;
ঈশ্বরেরে অবহেলি ॥

শ্রীজগবন্ধু চৌধুরী।

পুরুষোত্তম।

[শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মল্লিক।]

সাধুসন্ন্যাসীদের মুখে ভারতবর্ষের চারিদিকে অবস্থিত ভগবানের যে চারি ধামের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অবস্থিত ভগবানের এই চারিধাম দর্শন করিলে, আমরা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অবস্থা ও অধিবাসীদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে মোটামুটি অনেকটা বুঝিতে পারি। কারণ, ভারতের সুদূর চারি প্রান্তে অবস্থিত থাকায়, সমুদয় ভারতবর্ষ ভ্রমণ না করিলে আর এই চারিধাম দেখা হয় না। কোথায় ভারতের উত্তরপ্রান্তের হিমালয়ের চির-তুষারমণ্ডিত শিখরোপরি বদ্রীনারায়ণ, আর কোথায় সুদূর দক্ষিণ প্রান্তের সেতুবন্ধে রামেশ্বর; কোথায় ভারতের পূর্ব্ব প্রান্তে উড়িষ্যাপ্রদেশস্থ নীলাচলে পুরুষোত্তম বা জগন্নাথ, আর কোথায় সুদূর পশ্চিম প্রান্তে সমুদ্রোপকূলে দ্বারকা। অতএব চারিধাম দেখিতে আসিয়া, আমরা ভিন্ন প্রদেশবাসী, ভিন্ন ভাষাভাষী এবং কতকাংশে ভিন্ন চিন্তা ও ধারণাবিশিষ্ট আমাদের স্বদেশীয় ভ্রাতাগণের সহিত আলাপ পরিচয় ও সংসর্গ হেতু যে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ করিব, ইহা বিচিত্র নহে। তবে রেলে না চড়িয়া পদব্রজে বেড়াইলে দেশের অবস্থা সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বুঝিতে পারা যায়। সাধুসন্ন্যাসিগণ এখনও পদব্রজে তীর্থ ভ্রমণ করেন বলিয়া, দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহাদের গৃহস্থদের অপেক্ষা অনেক অধিক জ্ঞাতব্য বিষয় জানা আছে। আমাদের দেশে পুরাকাল হইতেই সাধুসন্ন্যাসিগণ দেশহিতকর কার্য্য করিতেন এবং এই জন্যই বোধ হয়, সাধারণের তাঁহাদের উপর এখনও শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অগাধ। এ কারণ, তাঁহাদিগের পক্ষে দেশের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সমাচার রাখা নিতান্ত প্রয়োজন। এইরূপে ভারতসম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ জানা যায় ও দেশভ্রমণে শরীরও কষ্টসহিষ্ণু হয় বলিয়াই বোধ হয়, আমাদের দেশে অনেক কাল হইতে সাধুসন্ন্যাসী ও গৃহস্থদের ভগবানের চার ধাম ও অপরাপর তীর্থ দর্শন করা এবং স্থানে স্থানে সময়ে সময়ে কুম্ভাদি মেলা হইবার প্রথা প্রচলিত।

পূর্ব্বোক্ত চারি ধামের মধ্যে শ্রীক্ষেত্র বা পুরুষোত্তমেই ভগবান্

কলিকালে দারুব্রহ্মরূপে অবস্থিত হইয়া জীবের মুক্তি বিধান করিতেছেন, ইহা শাস্ত্র ও সাধুমহাত্মাগণ স্বীকার করেন। শ্রীক্ষেত্রেরই অপর নাম নীলাচল। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজ, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তয়িতা আচার্য্যগণ অন্য সকল ধামের ন্যায় এখানেও আগমন এবং নিজ নিজ মত প্রচারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্থাপিত মঠ সকল এখনও ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। আচার্য্যগণ স্থাপিত মঠ ছাড়া আরও মঠ মড়ি এখানে অনেক আছে। শুনিয়াছি, শ্রীক্ষেত্রে এইরূপে সর্ব্বসম্প্রদায় স্থাপিত প্রায় সাড়ে তিন শত মঠ আছে। ইতিহাসে শুনা যায়, পূর্ব্বে কোন সময়ে কালাপাহাড়ের অত্যাচারে জগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তিকে দক্ষিণ দেশে চিল্কা হ্রদের নিকট প্রোথিত করা হয় এবং বহুদিন পরে ইস্লামীদিগের ধর্ম্মদ্বেষ শান্তভাব ধারণ করিলে আবার ভূগর্ভ হইতে তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়া নীলাচলে আনিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়। ঐ অত্যাচারের পূর্ব্বে ৺জগন্নাথদেবের মন্দিরাদি কিরূপ ছিল, এখন তাহার নির্ণয় হওয়া সুকঠিন। পণ্ডিতেরা বলেন, বর্ত্তমান মন্দিরের প্রধানাংশ ৭০০।৮০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। কথিত আছে, শঙ্করাচার্য্য এখানে সমুদ্রোপকূলে গোবর্দ্ধন নামক মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া, প্রধান শিষ্য বিষ্ণুভক্ত পদ্মপাদকে মঠাধিপ করেন। তখন শঙ্কর মঠই পুরীতে প্রধান ছিল এবং জগন্নাথদেবের মন্দিরের ক্রিয়াকলাপাদি এই মঠের মতেই সম্পন্ন হইত। মন্দিরমধ্যস্থ বর্ত্তমান ভোগমণ্ডপে শঙ্কর মঠাধিপের অধীনে থাকিয়া ঐ সম্প্রদায়ের সাধুগণ বাস করিতেন এবং উহা ভোগবর্দ্ধন মঠ নামে কথিত হইত। পরে শ্রীরামানুজ নীলাচলে আসিয়া নিজ মতের প্রতিষ্ঠা করেন এবং শঙ্কর মঠাধিপের আধিপত্য নষ্ট করিয়া মন্দিরমধ্যস্থ ভোগবর্দ্ধন মঠের লোপ সাধন করেন। অধুনা ইহা ভোগমণ্ডপ মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ক্রমে রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রতাপ এখানে এতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, পুরীধাম রামানুজদিগের মঠে পূর্ণ হইয়া উঠিল। শুনা যায়, এখানকার রাজা ঐ মতাবলম্বী হইয়া বিস্তর ভূসম্পত্তি ঐ সম্প্রদায়কে প্রদান করেন। শ্রীরামানুজ পুরীধামে জগন্নাথদেবের পূজা ও সেবা-পদ্ধতির কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া দেন এবং শুনিলাম, এখনও জগন্নাথ-দেবের মন্দিরের প্রধান অনুষ্ঠানাদির প্রবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তন শ্রীরামানুজ সম্প্রদায়ের মতানুসারেই হইয়া থাকে। শ্রীরামানুজ-চরিতে দেখিতে পাওয়া

যায় যে, রামানুজ কাশ্মীর হইতে দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্ত্তনকালে শ্রীপুরুষোত্তমে উপনীত হইয়া, কিয়ৎকাল অবস্থান করেন এবং পরে আপনার মত এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য এক মঠ প্রস্তুত করাইয়া, স্বীয় শিষ্য এমার বা গোবিন্দের নামানুসারে 'এমার মঠ' নামে অভিহিত করেন। রামানুজ এখানে উপস্থিত হইয়া নিজ মতের প্রাধান্য স্থাপনের জন্য এখানকার পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পণ্ডিতেরা পরাস্ত হইবার ভয়ে তাঁহার সহিত বাদে প্রবৃত্ত হইলেন না। শুনা যায়, শ্রীরামানুজ জগন্নাথদেবের অর্চ্চকগণকে পঞ্চ-রাত্র অনুসারে শ্রীপুরুষোত্তমের সেবা করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহারা স্মার্ত্ত মত পরিত্যাগ করিয়া উক্ত নূতন মত গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলেন। ইহাতে তিনি অর্চ্চক বা সেবাইতগণের অগ্রণী রাজার নিকট বিচার আকাঙ্খা করিয়া উপস্থিত হইলেন। অর্চ্চকগণের অনেকে ইহাতে ভীত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তমের শরণাগত হন এবং সেই রজনীতে নিদ্রাবস্থায় রামানুজ শতযোজন দূরস্থ কূর্ম্মক্ষেত্রে ৺জগন্নাথদেব কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হ'ন। পূর্ব্বোক্ত গল্পটী হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীরামানুজের মতও এখানে নির্ব্বিবাদে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই এবং রাজা তাঁহার মতে দাক্ষিত হইলেও সেবাইতগণের অধিকাংশ অন্যমতাবলম্বী থাকায়, শ্রীশ্রীজগন্নাথের পূজাসেবাদি কতক কতক পরিবর্ত্তিত হইলেও স্মার্ত্তমতেই হইতে থাকে। শ্রীশ্রীজগন্নাথের ভোগের কিয়দংশ ৺বিমলাদেবীর মন্দিরে লইয়া যাইয়া ভোগ দিবার পরে, নিবেদিত অন্নাদির 'মহাপ্রসাদ' বলিয়া বাজারে বিক্রয়-প্রথাটি যে রামানুজ মতানুযায়ী নহে, ইহা নিঃসন্দেহ। এইরূপ আরও কতকগুলি প্রথা দৃষ্টে (যথা ৺দুর্গাপূজার সময় মহাষ্টমীর রাত্রে ৺বিমলাদেবীর সম্মুখে পশুবলি প্রদান ইত্যাদি) পূর্ব্বোক্ত গল্পের সত্যতা বুঝিতে পারা যায়। স্মৃত্যুক্ত পীঠমালায় দেখিতে পাওয়া যায়, সতীর নাভিদেশ এই স্থানে (উৎকলে) পতিত হইয়াছিল। এজন্য এখানে দেবী বিমলা ও ভৈরব জগন্নাথ বলিয়া স্মৃতিতে নির্দ্দিষ্ট এবং তজ্জন্যই দেবী ও ভৈরব উভয়কে নিবেদিত না হওয়া পর্য্যন্ত মহাপ্রসাদ হয় না, এই ধারণা-প্রসূত পূর্ব্বোক্ত প্রথা।

চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে, সন্ন্যাসগ্রহণান্তে জীবনের শেষ ২৪ বৎসর এই স্থানে অবস্থান করিয়া, এখানকার অধিকাংশ লোককে স্বীয় মতে আনয়ন করেন; এমন কি,

এখানকার তদানীন্তন রাজা প্রতাপরুদ্র ও তাঁহার পুত্র পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এখান হইতেই তিনি স্বীয় মত প্রচারের জন্য দক্ষিণ দেশে গমন করেন। এইস্থানে অবস্থানকালেই তিনি বাঙ্গালা হইতে আগত স্বীয় ভক্তবৃন্দের সহিত স্বহস্তে জগন্নাথের গুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জন ও রথযাত্রার সময় রথাগ্রে সংকীর্ত্তন করেন। এখান হইতেই তিনি এক সময়ে প্রাচীন গৌড় নগরের নিকট রামকেলী নামক গ্রাম পর্য্যন্ত গিয়া, রূপসনাতনকে কৃপা করিয়া পুনরায় এখানেই ফিরিয়া আসেন। এই স্থান হইতেই তিনি আবার বগড়িখণ্ডের রাস্তায় শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া, আসিবার কালে প্রয়াগ ও কাশীর মধ্য দিয়া এখানে ফিরিয়া আইসেন। এখানে অবস্থান-কালেই তিনি স্বরূপ ও রায় রামানন্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-কথার রসাস্বাদন করিয়া ভগবৎ-প্রেমে বিভোর থাকিতেন। এই স্থানেই তিনি বৃন্দাবন হইতে তাঁহার দর্শনার্থ আগত রূপ গোস্বামীকে শক্তি সঞ্চার করিয়া প্রচার-কার্য্যের জন্য বৃন্দাবনে পুনঃপ্রেরণ করেন। এই স্থানেই তিনি লোকশিক্ষার জন্য, প্রকৃতি-সম্ভাষণ হেতু ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন (ত্যাগ) করেন। এখা-নেই শ্রীযুত সনাতন গোস্বামী মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া দেহত্যাগ করিবার ইচ্ছায় বৃন্দাবন হইতে আগমন করিয়া নববলে বলীয়ান্ হইয়া বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ সকল প্রকট করিবার জন্য পুনরায় যাত্রা করেন। এখানেই প্রিয় ভক্ত রঘুনাথ দাসের সহিত মহাপ্রভুর মিলন হয় এবং তাহাকে গুঞ্জমালা দান ও স্বরূপের নিকট রাখিয়া শিক্ষা দেওয়াইয়া শেষে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। এই স্থানেই তিনি রামচন্দ্র পুরীর তিরস্কারে ভিক্ষা সঙ্কোচ, ও যবন হরিদাসের দেহত্যাগে তাহার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া ও মহোৎসব সম্পন্ন করেন। এখান হইতেই তিনি রঘুনাথ ভট্টকে বৃন্দাবনে প্রেরণ করেন। আবার এখানেই তিনি ভগবৎপ্রেমে বিভোর, উন্মাদ হইয়া চটক পর্ব্বত দর্শনে গিরি গোবর্দ্ধন ভ্রমে ছুটিয়া যাইতেন, পথিমধ্যে অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকিতেন, সমুদ্রদর্শনে যমুনা ভ্রমে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেন, শ্রীকৃষ্ণের বিরহপ্রলাপ বকিতে বকিতে গৃহপ্রাচীরে মুখ সঙ্ঘর্ষণ করিতেন এবং এইরূপে ২৪ বৎসর অবস্থানের পর, লীলাসম্বরণও করিয়াছিলেন।

পুরীতে রেল হইবার পূর্ব্বে আমাদের দেশের যাত্রিগণ মেদিনীপুর হইতে হাঁটাপথে পদব্রজে, গোরুর গাড়ীতে বা পাল্কীতে করিয়া, অথবা চাঁদবালি পর্য্যন্ত ষ্টীমারযোগে আসিয়া, হাঁটাপথ ধরিয়া এখানে আগমন করিত।

যাত্রিগণ হাঁটাপথে মেদিনীপুর পার হইয়া প্রথমে রেমুনাতে ৺ গোপীনাথ দর্শন করিত। এই গোপীনাথজীই নিজ ভক্ত মাধবেন্দ্র পুরীর জন্য ভোগের ক্ষীর চুরি করিয়াছিলেন বলিয়া, ইঁহার নাম ক্ষীরচোরাগোপীনাথ হইয়াছে। রেমুনার গোপীনাথ দর্শনের পর পথে দাঁতনে ৺জগন্নাথদেবের মন্দির। প্রবাদ আছে যে, শ্রীক্ষেত্র হইতে জগন্নাথ এখানে আসিয়া দাঁতন বা দন্ত ধাবন করিতেন এবং এখান হইতে গঙ্গাতীরে, শ্রীরামপুরের নিকট মাহেশে গিয়া, স্নান করিয়া পুনরায় শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া ভোগ আহার করিতেন। এখনও দাঁতনের মন্দিরের পার্শ্বে পাথরের একটী দাঁতন কাটি পড়িয়া আছে। দাঁতনের পর জাজপুরের নিকট বৈতরণী নদী পার হইতে হইত। শাস্ত্রের কথা বৈতরণী পার হইলেই পরলোকের সীমা আরম্ভ, সেজন্য এই নদীর পর-পারেও যমরাজের বাটী ইত্যাদি কল্পনা করিয়া এখানে বিরজা-মন্দির, সপ্ত-মাতৃকা মুক্তিমণ্ডপ, যমের মহল, চিত্রগুপ্তের কাছারী প্রভৃতি নির্ম্মিত হই-য়াছে। জাজপুরকে পার্ব্বতীক্ষেত্র বা দেবীক্ষেত্র অথবা বিরজাক্ষেত্র বলে। কারণ, এই পীঠের অধিষ্ঠাত্রী ৺বিরজাদেবী। জাজপুর হইতে কটক যাইতে পথে ৺ কৃষ্ণ বোসের ২৪ ক্রোশ ব্যাপী আমবাগান। পূর্ব্বে পূর্ব্বে এখানে চোর ডাকাইতের বড় ভয় ছিল। কটক হইতে ভুবনেশ্বর যাইতে পথে ভুবনেশ্বরের নিকট খণ্ডগিরি; পূর্ব্বে এই গিরিগুহাসকলে কতই না সাধুসন্ন্যাসীরা বাস করিতেন। এখন পর্ব্বতগাত্রে প্রস্তরমূর্ত্তিশোভিত অনেকগুলি গুফাই কেবল দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এগুলিকে বৌদ্ধদের নির্ম্মিত গুফা বলেন। এস্থান ৺ ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে তিন ক্রোশ। ভুবনেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দিরের পার্শ্বেই বিন্দু সরোবর অবস্থিত। মন্দিরটি প্রস্তরনির্ম্মিত, কারুকার্য্যখচিত, ও ৺ জগন্নাথদেবের মন্দিরের ন্যায় উচ্চ। এই মন্দির উৎকলাধিপতি ললিত ইন্দ্র কেশরী ৬৫৭ খৃঃ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ব্রহ্মপুরাণের মতে এই শিবক্ষেত্রের নাম একাম্র-কানন। ভুবনেশ্বরের পরে পথে সত্যবাদী নামক স্থানে, ৺ সাক্ষী-গোপালের মন্দির। প্রবাদ এইরূপ যে, পূর্ব্বে দুই ব্রাহ্মণ গুরুশিষ্য, শ্রীবৃন্দাবন দর্শন করিয়া, এখানে নিজ বাটীতে ফিরিয়া আসেন। বাটীতে আসিয়া উভয়ের মধ্যে বৃন্দাবনে যে সত্য প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল, তাহা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়। ভগবান্ গোপালজী এই বিবাদ মিটাইবার জন্য শ্রীবৃন্দাবন হইতে এই স্থানে সাক্ষ্য দিতে আসেন ও সেই অবধি তিনি এই

খানে অবস্থান করেন। এখনও বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দজীর পুরাতন মন্দিরের পার্শ্বে সাক্ষীগোপালের শূন্য মন্দির পড়িয়া আছে, দেখিতে পাওয়া যায়। সাক্ষীগোপালের নিকটেই 'দণ্ডভাঙ্গার মাঠ'। এই মাঠে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যের হস্তস্থিত দণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। সে কারণেই এই স্থানের 'দণ্ডভাঙ্গার মাঠ' নাম হইয়াছে। ইহার পরই পুরীর সীমানা ও আঠার নালা। পূর্ব্বে এই হাঁটাপথে চোর ডাকাত এবং বিসূচিকা প্রভৃতি মারীভয় অত্যন্ত প্রবল ছিল। তখন যাত্রিগণ যথার্থই জগদীশের প্রেমডুরির টানে আকৃষ্ট হইয়া, গৃহ-স্বজনাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই দুর্গম রাস্তা দিয়া 'ডাল-ভাঙ্গা' ক্রোশ সকল অতিক্রম করিতে করিতে, পথকষ্ট ও মারীভয় তুচ্ছজ্ঞান করিয়া, জগন্নাথ দর্শনে আগমন করিত। এখনও পাণ্ডাগণ যাত্রীদের গলায় জগন্নাথের ডুরি দিয়া থাকেন বটে; কিন্তু রেল হওয়ায় যাত্রীদের মধ্যে আর পূর্ব্বেকার ন্যায় জগদীশদর্শনে ব্যাকুলতা দেখিতে পাওয়া যায় না পূর্ব্বে অনেকেই পথভ্রান্ত বা সমভিব্যাহারী যাত্রী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, পথিমধ্যেই শ্রীজগন্নাথের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া চরিতার্থ হইত—এরূপ অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যাইত।

আমি একজন বন্ধুর সহিত প্রায় ৪।৫ বৎসর পূর্ব্বে বেঙ্গল নাগপুর রেল যোগে, পথে ৺ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া, পুরী ষ্টেশনে উপস্থিত হই। পুরী ষ্টেশন সমুদ্রের নিকট অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে সমুদ্রোপকূল, দেড় পোয়া পথ মাত্র। ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ি, গোরুর গাড়ি, পাল্কী প্রভৃতি সকল রকম সোয়ারী পাওয়া যায়। ষ্টেশন হইতে ৺ জগন্নাথদেবের মন্দির প্রায় ২ মাইল। ষ্টেশনে রেল গাড়ি আসিবার সময়, এখানকার অনেক পাণ্ডা যাত্রী সংগ্রহের জন্য উপস্থিত থাকে। আমরা উহাদের মধ্যে একজনকে পাণ্ডা ঠিক করিয়া, তাহার সহিত জগন্নাথের মন্দিরের নিকট আসিয়া, উক্ত মন্দিরের সিংহ দরজার সম্মুখে যে গলী আছে, সেই গলীমধ্যে একটী বাসাবাটীতে ৵০ রোজ হিসাবে একখানি ঘর ভাড়া করিলাম। এখানে যাত্রীদের থাকিবার জন্য Lodging house Act আইন বিধিবদ্ধ থাকায় পাণ্ডারা কিম্বা স্থানীয় অধিবাসীরা, তাহাদের নিজ নিজ বাটীতে ভাড়া লইয়া যাত্রীদের স্থান দিতে পারে না। স্থানীয় অধিবাসিগণ নিজ বাটীতে যাত্রী তুলিতে ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বাহ্নে মিউনিসিপালিটীতে সেজন্য দরখাস্ত করিতে হয়। দরখাস্ত করা হইলে মিউনিসিপালিটীর

ডাক্তার বা Health Officer স্থানীয় পুলিসের সহিত ঐ সকল বাটী যাত্রী-বাসোপযোগী কি না, তাহার তদারক করিতে আসেন এবং শৌচাদির স্থান পৃথক্ ভাবে নির্ম্মাণ করিতে হইবে, জলনিকাশের নালা পাকা করিতে হইবে ও যাত্রী তুলিলে ঐ বাটীতে আর বাটীওয়ালা বা স্থানীয় লোক থাকিতে পাইবে না, ইত্যাদি নানান্ ভজকট, উক্ত (Lodging house Act) আইন অনুসারে উত্থাপন করেন। এই সকল কারণে অতি অল্প লোকই বাটীতে যাত্রী তুলিবার হুকুম (sanction) পায়। যে সকল বাটী যাত্রী তুলিবার জন্য মঞ্জুর হয়, সেই সকল বাটীর কোন্ ঘরে কত যাত্রী থাকিবে, তাহা উক্ত ডাক্তার মহাশয় পরীক্ষা পূর্ব্বক, যাত্রীসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া, টিকিট লিখিয়া ঘরের দেয়ালে মারিয়া দেন। কিন্তু যেরূপে ৪।৫ হাত চওড়া ও ৯।১০ হাত লম্বা ঘরে Health Officer মহাশয় ১৫।২০ জন লোকের থাকিবার স্থান পরীক্ষান্তে নির্দ্দিষ্ট করেন, তাহাতে তাঁহার পরীক্ষার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। ঐরূপ পরিসর বিশিষ্ট ঘরে ১৫।২০ জন যাত্রীর প্রকৃতপক্ষে মোট রাখিবার স্থানেরই টানাটানি হয় থাকার কথা কি আর বলিব! তবে বাটীওয়ালাদের মায়ায় বশীভূত হইয়া ঐরূপ sanction দেওয়া হয় কি না, তাহা বলিতে পারি না। পুলিশ প্রভুগণও, দেখিতে পাই, যাত্রীতোলা বাটীওয়ালাদের মায়ায় যেন বশীভূত—আইনের দোহাই দিয়া, কোন গরীব যাত্রীকে রাস্তায় বা কাহারও দাওয়ায় কখন থাকিতে দেন না! এ কারণ, এখানে যাত্রিগণ বড় বড় মেলায়, যথা—রথযাত্রার সময় ১০৲ টাকা ও দোলযাত্রার সময় ৪।৫৲ টাকা হিসাবে প্রত্যেক লোক পিছু ভাড়া দিয়া, শুদ্ধ মেলার কয়দিনের জন্য ঐ সকল বাটীতে থাকিতে পান। অধিক দিন থাকিতে হইলে আরও অধিক ভাড়া লাগে। প্রত্যেক মেলাতেই মিউনিসিপালিটী আবার বড় রাস্তার পার্শ্বে কতকগুলি খোড়ো চালা, যাত্রীদিগের ভাড়া দিবার জন্য নির্ম্মাণ করেন। এইরূপ চালায় থাকিবার জন্য প্রত্যেক লোকপিছু ১৲ ভাড়া গৃহীত হয়। এই সকল চালায় পশুর ন্যায় যাত্রিগণকে থাকিতে হয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গভর্ণমেণ্ট, বিসূচিকা প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির বিস্তারভয়ে এইরূপ Lodging house Act আইন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু উহাতে উক্ত রোগের প্রাদুর্ভাব যে কমিয়াছে, এমন বোধ হয় না; কেবল যাত্রী ও স্থানীয় লোকের কষ্টবৃদ্ধি হইয়াছে মাত্র। তবে আমি ৫।৭ বৎসর পূর্ব্বের কথা বলিতেছি, আজকাল এ বিষয়ের অনেক পরিবর্ত্তন ও

সুবন্দোবস্ত হইয়া থাকিবে। এখন মাড়োয়ারীরা ও বাঙ্গালীরা কয়েকটী ধরমশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, গরীব যাত্রীদের অনেক উপকার করিয়াছেন; শুনিয়াছি, মাড়োয়ারীদের ধরমশালাটী খুব বড়।

আমরা প্রথমেই পাণ্ডার সহিত জগন্নাথের মন্দিরের উত্তর পার্শ্বস্থ রাস্তা দিয়া মন্দিরের অদূরে, মার্কণ্ড সরোবরে স্নান করিতে উপস্থিত হইলাম। এই সরোবরটী বড়, ইহার চারি পাড় পাথরের গজগিরি করা বা সিঁড়ি বাঁধা; পাড়ে ৩।৪টি দেবমন্দির আছে। সরোবরের জল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানায় পূর্ণ। এখানে যাত্রীদিগকে স্নান ও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিতে হয়। আমরা এখানে স্নানাদি করিয়া ও মন্দিরমধ্যস্থ দেবমূর্ত্তিসকল দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। বাসায় আর্দ্র বস্ত্র ত্যাগ করিয়া, আমরা পাণ্ডার সহিত ৺জগন্নাথদেবের মন্দির দর্শন করিতে গমন করিলাম। জগন্নাথ-দেবের মন্দির প্রায় এক পোয়া পরিমিত সমচতুষ্কোন স্থানের উপর নির্ম্মিত ও চতুর্দ্দিক প্রাচীরে বেষ্টিত। মন্দিরের চারিদিকেই প্রশস্ত রাজপথ ও চারিদিকে চারিটি ফটক। পূর্ব্বদিকে সিংহদ্বার, উত্তরে হস্তীদ্বার, দক্ষিণে অশ্বদ্বার, পশ্চিমে খঞ্জদ্বার। সিংহদ্বারে সিংহমূর্ত্তি, হস্তিদ্বারে হস্তীমূর্ত্তি, অশ্ব-দ্বারে অশ্বমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত; পশ্চিমদ্বারে কোন মূর্ত্তি নাই। মেলার সময় বহু যাত্রীর ভিড় হইলে, সকল ফটকই খুলিয়া দেয়, নচেৎ প্রত্যহ সিংহদ্বারই খোলা থাকে। সিংহদ্বারের সম্মুখে রাস্তার উপর অরুণ-স্তম্ভ। এই অতি মনোহর, অত্যাশ্চর্য্য, কারুকার্য্যপূর্ণ স্তম্ভটী কানারকের উজ্জ্বল চিহ্ন। বহু টাকা ব্যয়ে ইহা কানারক হইতে এখানে আনীত হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সিংহদ্বার দিয়া পশ্চিম মুখ হইয়া, মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই বাইশটি সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া, প্রথম মহল অতিক্রম পূর্ব্বক দ্বিতীয় মহলের দ্বারে উপস্থিত হইতে হয়। এই দ্বিতীয় দ্বার মধ্যে প্রবেশ না করিয়া, ডান হাতি যাইলে, প্রথম মহলে অবস্থিত আনন্দ বাজার দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কাঁচা প্রসাদ ভাত, দাল তরকারি প্রভৃতি সকল দ্রব্য বিক্রয় হয়। সকল বর্ণের যাত্রিগণই উক্ত ভাত দাল, তরকারি চাকিয়া খরিদ করিতেছে। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের এমনি মাহাত্ম্য যে এখানে উক্ত প্রসাদ সকল জাতী একত্রে অহার করে প্রথম মহলে উক্ত আনন্দ বাজারের অনতিদূরে, মন্দিরের পূর্ব্বদিকের প্রাচীরের গায়ে, জগন্নাথের প্রস্তর নির্ম্মিত স্নানমঞ্চ। স্নানযাত্রার দিন জগন্নাথদেব এই স্থানেই বিরাজ করেন। স্নানমঞ্চটী উচ্চ স্থানে নির্ম্মিত

বলিয়া যাত্রিগণ, মন্দিরের বাহিরে পূর্ব্বদিকের বড় রাস্তা হইতেও স্নানমঞ্চে অবস্থিত ৺জগন্নাথ দর্শন করিতে পায়। দ্বিতীয় মহলে যাইবার পূর্ব্বোক্ত ফটকেই জগন্নাথের মিষ্টান্ন প্রসাদ সকল বিক্রয় হয়। এই দ্বিতীয়মহলে প্রবেশ করিলে, প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে ৺জগন্নাথদেবের প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড উচ্চমন্দির বিরাজিত দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরটী পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা ভাবে অবস্থিত। নিজ মন্দির, জগমোহন, নাট মন্দির ও ছত্রভোগের মহল এই চারি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত; ও ভিতরে প্রবেশ করিবার জন্য পৃথক্ পৃথক্ স্থানে ৩।৪টী দ্বার আছে।

কয়েকটী সিঁড়ি দিয়া মন্দিরে উঠিলে প্রথমেই পূর্ব্বদিকে ছত্রভোগের ঘর। এই ঘরে জগন্নাথের প্রত্যহ ছত্রভোগ লাগে। যাত্রিগণের কেহ ইচ্ছা হইলে, এক শত টাকা ব্যয় করিয়া এই ঘরে জগন্নাথের পৃথক্ ছত্রভোগ দিতে পারেন। এই ঘরের পশ্চিমেই প্রকাণ্ড নাটমন্দির। ইহার মধ্যে ছত্র-ভোগ গৃহের দ্বারের সম্মুখে প্রস্তরনির্ম্মিত গরুড় স্তম্ভ আছে। শ্রীচৈতন্য এই গরুড় স্তম্ভের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া জগদীশ দর্শন করিতেন। এখনও স্তম্ভ-গাত্রে তাঁহার দুইটী অঙ্গুলির চিহ্ন বর্ত্তমান আছে এবং স্তম্ভতলে সেই গর্ত্ত যাহা শ্রীভগবান্‌কে দর্শনকালে গৌরাঙ্গদেবের প্রেমাশ্রু-জলে ভরিয়া যাইত। নাটমন্দিরের পশ্চিমেই ৺জগন্নাথদেবের মন্দিরের বহিঃপ্রকোষ্ঠ বা জগমোহন। নাটমন্দিরের ভিতর দিয়া এখানে প্রবেশ করিবার দ্বার আছে। ইহা ভিন্ন বাহির দিক্ হইতে প্রবেশ করিবার অপর দ্বারও আছে। এই জগমোহনের পার্শ্বস্থিত ঘরে জগন্নাথের বেশ বা পোষাকাদি, অলঙ্কার, পূজার তৈজসপত্রাদি পালকী, চতুর্দ্দোল প্রভৃতি সোয়ারী, এবং অপরাপর অনেক আসবাবপত্র মজুত আছে। এই জগমোহনের পশ্চিম দিকে একটী দ্বার আছে, উক্ত দ্বার দিয়াই জগন্নাথদেবের খাস মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। দ্বার পার হইয়া, কয়েকটী সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিলেই, মন্দিরের সর্ব্বপশ্চিম প্রান্তস্থিত এই গৃহে উপস্থিত হওয়া যায়। গৃহের সম্মুখস্থ ভিত্তির পার্শ্বেই রত্নবেদিকা নামক প্রস্তরনির্ম্মিত তিন হাত উচ্চ বেদিকার উপর ৺জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার শ্রীমূর্ত্তি বিরাজিত। এই বেদি পরিক্রমণ করিবার জন্য, পার্শ্ব ও পশ্চাৎ দিক্ দিয়া সংকীর্ণ গলি পথ আছে। মন্দিরমধ্যে অন্ধকার বলিয়া দিবারাত্র প্রদীপ জ্বলিতেছে। ৺জগন্নাথ-দেবের মূর্ত্তি খুব প্রকাণ্ড, গাত্রে সুবর্ণ ও মণিমুক্তার অলঙ্কার ও মস্তকে মুকুট

শোভা পাইতেছে। এই মুকুটে একখানি খুব বড় হীরকখণ্ড জ্বলিতেছে। প্রবাদ এইরূপ যে, এই হীরকখণ্ড পাঞ্জাব-কেশরী রণজিৎ সিংহ ৺জগন্নাথকে ভেট করেন। শুনা যায় যে এত বড় হীরক আজকাল ভারতে আর কাহারও নিকট নাই। তবে ইহা কহিনুর অপেক্ষা ছোট। ৺জগন্নাথের মুখারবিন্দ পদ্মকোরক সদৃশ নেত্রে শোভিত এবং অতিশয় কমনীয়। দর্শন-মাত্রেই শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠে। যেন ভগবান্ কলির জীবকে দর্শন-মাত্রই মুক্তি দিবার জন্য সাক্ষাৎ বিরাজ করিতেছেন। আমরা সচরাচর কলিকাতায় বা আমাদের দেশের অপরাপর স্থানে জগন্নাথের যে সকল মূর্ত্তি দেখিতে পাই, যে মূর্ত্তির সহিত উপমার ছলে ব্যক্তিবিশেষকে ঠাট্টা করিয়া "আহা যেন জগন্নাথ গো" বলিয়া তাহার চেহারার হেয়তা প্রতিপাদন করি, এখানকার মূর্ত্তি সেরূপ নহে। সে সকল মূর্ত্তি হইতে ইহা অনেক অংশে ভিন্ন। আমরা মন্দিরমধ্যে জগন্নাথের পূজা ও পাদস্পর্শ করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইয়া প্রাঙ্গণে আসিলাম। এই প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে ভোগ-রসুই মহল। এই মহলে সচরাচর যাত্রীদের প্রবেশ করিতে দেয় না। মন্দির-প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে শঙ্করাচার্য্যের ভোগবর্দ্ধন মঠ, এখন শূন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। প্রাঙ্গণের মধ্যে একটী বট বৃক্ষ ও উহার মূলে বটপত্রে শয়ান বটেকৃষ্ণ নামক নারায়ণ-মূর্ত্তি রহিয়াছে। প্রাঙ্গণের স্থানে স্থানে লক্ষ্মী, সত্যভামা প্রভৃতি দেবীদের পৃথক্ পৃথক্ মহল আছে। প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে বিমলা দেবীর মন্দিরই প্রধান। এই মন্দিরমধ্যে রোহিণী কুণ্ড আছে। প্রাঙ্গণের এক স্থানে একাদশী বন্ধন অবস্থায় রহিয়াছে। শ্রীক্ষেত্রে একাদশী বাঁধা থাকায় এখানে একাদশী ব্রত করিবার প্রথা নাই। আর প্রাঙ্গণের চতুর্দ্দিকে, বামনজী, নৃসিংহজী, প্রভৃতি যে কত দেবদেবীর মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে তাহার সংখ্যা করা যায় না। মন্দিরমধ্যে রাত্রে ৺জগন্নাথের সম্মুখে, মন্দির হইতে নিযুক্ত কয়েকটী স্ত্রীলোক নৃত্য গীত করে, ইহাদিগকে দেবনর্ত্তকী বা দেবদাসী কহে।

জগন্নাথের প্রকট সম্বন্ধে উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব কিরূপে প্রথমে চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তিতে শবরদিগের দ্বারা পূর্ব্বে নীলাচলে পূজিত হইতেন, পরে বহুকাল গত হইলে, কলির প্রারম্ভে উজ্জয়িনীর রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদেশ পাইয়া ঐ বিষয় জানিতে পারিয়া ঐ মূর্ত্তি দর্শন করিতে আসিয়া, বিফলপ্রযত্ন হন এবং পরিশেষে শ্রীভগবান্‌কে প্রসন্ন করিয়া বর্ত্তমান

মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া জীবোদ্ধারে প্রতিশ্রুত করিয়া এই মূর্ত্তির পূজা প্রচার করেন। প্রারম্ভে, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন এইরূপ স্বপ্নাদেশ পাইয়াছিলেন "কলিকালে আমার অবতার গ্রহণ করা শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ হইলেও, আমি নীলাচলে দারুময় বিগ্রহে অবস্থান করিয়া কলির পতিত জীবকে উদ্ধার করিব। আমি পূর্ব্বে যে দেহে অবতীর্ণ হইয়াছিলাম, (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণদেহ) তাহার অস্থি-পঞ্জর এক বৃক্ষের কোটরে আবদ্ধ ছিল। ঐ বৃক্ষ কিছুকাল পরে প্রভাসে সমুদ্র-গর্ভে পতিত হয়। এক্ষণে উক্ত বৃক্ষই সমুদ্রে ভাসিতে ভাসিতে নীলাচলের সমুদ্রোপকূলে চক্রতীর্থ নামক স্থানে আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছে। তুমি ঐ বৃক্ষ ও অস্থি উঠাইয়া আনিয়া, উক্ত বৃক্ষে আমার বিগ্রহ নির্ম্মাণ করিয়া, নীলাচলে প্রতিষ্ঠা কর। বিগ্রহ ও মন্দির নির্ম্মাণ সম্বন্ধে দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা তোমার সহায় হইবে।" রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভগবানের এই স্বপ্নাদেশ শুনিবার পর, লোকজন সমভিব্যাহারে চক্রতীর্থে আগমন পূর্ব্বক দেখিলেন যে, যথার্থই সমুদ্রোপকূলে একটী নিম বৃক্ষ সংলগ্ন রহিয়াছে; এবং উহাতে অস্থিপঞ্জরও আবদ্ধ আছে। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন ঐ বৃক্ষ তীরে উঠাইলেন এবং লোকজনের দ্বারায় সমুদ্রোপকূলস্থ জঙ্গল সাফ করাইয়া বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বকর্ম্মাকে স্মরণ করিলেন। স্মরণমাত্র বিশ্বকর্ম্মা রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রথমেই মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। মন্দির নির্ম্মাণের পর বিশ্বকর্ম্মা ভগবানের শ্রীবিগ্রহ নির্ম্মাণ করিবার জন্য, রাজার নিকট একটা সময় নির্দ্ধারণ করিয়া উক্ত অস্থি ও বৃক্ষ লইয়া মন্দির-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিয়া বহু দিবস রহিলেন। বিশ্বকর্ম্মা নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে শ্রীভগবানের মূর্ত্তি নির্ম্মাণে রাজার নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাকে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লন যে, তিনি (রাজা) যদি কোন কারণ বশতঃ উক্ত সময়ের মধ্যে মন্দির দ্বার খুলিয়া ফেলেন, তাহা হইলে তিনি আর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবেন না। এদিকে বিশ্বকর্ম্মাকে মন্দিরে প্রবেশ পূর্ব্বক ভগবানের ধ্যান করিয়া সুন্দর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়া, স্বর্গে দেবগণ মহা চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন বিশ্বকর্ম্মা যদি ভগবানের এইরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রমণীয় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন এবং শ্রীভগবানের তাহাতে আবির্ভাব হয় তাহা হইলে কলিকালের জীবগণ শ্রীভগবানের এই দারুময় মূর্ত্তি অবলোকন পূর্ব্বক অনায়াসেই মুক্তি লাভ করিবে। অতএব কলির মনুষ্যগণ আর আমাদের পূজা ও যাগ যজ্ঞ করিবে না। দেবতাগণ এই

সকল চিন্তা পূর্ব্বক ভীত হইয়া, মন্দিরমধ্যে বিশ্বকর্ম্মার নিকট উপস্থিত হইলেন; এবং তাঁহাকে নানান্ যুক্তি দেখাইয়া উক্ত মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিলেন। বিশ্বকর্ম্মা ইতিপূর্ব্বেই বিগ্রহের প্রধান ও ঊর্দ্ধ অঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে দেবগণের বাক্যে অপরাপর অঙ্গ নির্ম্মাণ করা বন্ধ করিয়া, যাহাতে অঙ্গবৈকল্য হেতু এই মূর্ত্তি কলির জীব দর্শন করিতে ইচ্ছা না করে, তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ কার্য্য বন্ধ করিলে, ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা, নির্ম্মাণ কার্য্যের শব্দ শুনিতে না পাওয়ায়, বিশ্বকর্ম্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান্ হইয়া মন্দিরের রুদ্ধ দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। বিশ্বকর্ম্মাও রাজার সহিত পূর্ব্ব সত্য মত উক্ত মূর্ত্তি অসম্পূর্ণ অবস্থায় রাখিয়াই স্বর্গে গমন করিলেন। পরে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কাতরতায় ঐ অসম্পূর্ণ মূর্ত্তিতেই শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হইতে স্বীকৃত হওয়ায়, রাজা ঐ অসম্পূর্ণ মূর্ত্তিরই প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং স্বীয় এই কীর্ত্তি নিজ পুত্র ও পৌত্র মুখে সাধারণে প্রচার হইলে, নিজ পুণ্য লোপ পাইবে এই ভয়ে, আপনার বংশধর ১৮ পুত্রের দেহ দ্বারা আঠার নালার সাঁকো নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া সাধারণের ভগবান্ দর্শনের পথ সুগম করিয়া দিলেন।

ব্রহ্মপুরাণেও উপরি উক্ত ঘটনা ও উৎকলমাহাত্ম্য সম্বন্ধে অপরাপর বিষয় লিখিত আছে। ঐতিহাসিকগণের মতে উৎকলের বা কটকের কেশরী বংশীয় রাজা যযাতি কেশরী ৪০৯ শকাব্দে ৺জগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্ত্তি স্থাপন করেন, এবং বর্ত্তমান মন্দির ১১৯৮ খৃঃ রাজা অনঙ্গ ভীমদেব ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকে আবার জগন্নাথদেবের মূর্ত্তিতে পূর্ব্বে বুদ্ধাবতারের পূজা হইত বলিয়া প্রতিপাদন করেন। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত তাঁহার ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায় গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকায় এই বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, "জগন্নাথের ব্যাপারটিও বৌদ্ধ-ধর্ম্মমূলক বা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম মিশ্রিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। জগন্নাথ বুদ্ধাবতার এইরূপ একটী জনশ্রুতি সর্ব্বত্র প্রচলিত আছে। চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী ফাহিয়ান ভারতবর্ষে বৌদ্ধতীর্থ-পর্য্যটনার্থ যাত্রা করিয়া, পথিমধ্যে তাতার দেশের অন্তর্গত খোটান নগরে একটী বৌদ্ধ মহোৎসব সন্দর্শন করেন। তাহাতে জগন্নাথের রথযাত্রার ন্যায় অবিকল এক রথে তিনটি প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্টি করিয়া আইসেন। মধ্যস্থলে বুদ্ধমূর্ত্তি ও তাহার দুই পার্শ্বে দুইটি বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত ছিল। খোটানের উৎসব যে সময়

ও যতদিন ব্যাপিয়া সম্পন্ন হইত, জগন্নাথের রথযাত্রাও প্রায় সেই সময়ে ও ততদিন ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মেজর জেনারেল্ কনিংহেম্ বিবেচনা করেন ঐ তিনটী মূর্ত্তি পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ ত্রিমূর্ত্তির অনুকরণ বই আর কিছুই নয়। সেই তিনটী মূর্ত্তি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ। বৌদ্ধেরা সচরাচর ধর্ম্মকে স্ত্রীরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে; তিনিই জগন্নাথের সুভদ্রা। শ্রীক্ষেত্রে বর্ণবিচার পরিত্যাগ প্রথা এবং জগন্নাথের বিগ্রহমধ্যে বিষ্ণুপঞ্জরের অবস্থিতি প্রবাদ এ দুটী বিষয় হিন্দুধর্ম্মের অনুগত নয়; প্রত্যুত নিতান্ত বিরুদ্ধ। কিন্তু এই উভয়ই সাক্ষাৎ বৌদ্ধ মত বলিলে বলা যায়। দশাবতারের চিত্রপটে বুদ্ধাবতারস্থলে জগন্নাথের প্রতিরূপ চিত্রিত হয়। কাশী এবং মথুরার পঞ্জিকাতেও বুদ্ধাবতারস্থলে জগন্নাথের রূপ আলেখিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিতে করিতে জগন্নাথের ব্যাপারটি বুদ্ধ-ধর্ম্মমূলক বলিয়া স্বতঃই বিশ্বাস হইয়া উঠে। জগন্নাথক্ষেত্রটি পূর্ব্বে একটী বৌদ্ধক্ষেত্রই ছিল, এই অনুমানটি জগন্নাথ-বিগ্রহস্থিত উল্লিখিত বিষ্ণুপঞ্জর বিষয়ক প্রবাদে একরূপ সপ্রমাণ করিয়া তুলিতেছে। যে সময়ে বৌদ্ধেরা অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া ভারতবর্ষ হইতে অন্তর্হিত হইতেছিল, সেই সময়ে, অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে জগন্নাথের মন্দির প্রস্তুত হয়, ইহা পূর্ব্বে সুস্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ঘটনাটিতেও উল্লিখিত অনুমানের সুন্দররূপ পোষকতা করিতেছে। চীন দেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন্‌থ্‌সঙ্গ উৎকলের পূর্ব্বদক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্র-তটে (অর্থাৎ উড়িষ্যার যে অংশে পুরী সেই অংশে) চরিত্রপুর নামে একটী সুপ্রসিদ্ধ বন্দর দেখিয়া যান। এই চরিত্রপুরই এক্ষণকার পুরী বোধ হয়। উহার নিকটে পাঁচটি অত্যুন্নত স্তূপ ছিল। শ্রীমান এ, কনিংহেম্ অনুমান করেন তাহারই একটী অধুনাতন জগন্নাথের মন্দির। স্তূপের মধ্যে বুদ্ধাদির অস্থিকেশাদি সমাহিত থাকে, এই নিমিত্তই জগন্নাথের বিগ্রহমধ্যে বিষ্ণুপঞ্জরের অবস্থিতি বিষয়ক উল্লিখিত প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে।"

পণ্ডিতগণ একথা বলিলেও হিন্দুরা ৺জগন্নাথকে হিন্দুদেবতা বলিয়াই স্বীকার করেন। ইদানিং ভারতের বৌদ্ধতীর্থ সকল দর্শন করিবার জন্য, চীন, জাপান ও সিংহল হইতে যে সকল বৌদ্ধ যাত্রী আগমন করেন, তাঁহারা জগন্নাথের নামও জানেন না। যদ্যপি জগন্নাথ বৌদ্ধদের ক্ষেত্র হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উক্ত দেশের বৌদ্ধগণ ইহার বিষয় অবগত থাকিত। পূর্ব্বে যাহাই থাকুক, এখন যে উহা হিন্দুদিগের একটি প্রধান তীর্থ এবং বৈষ্ণব-

প্রধান স্থান সে বিষয় নিঃসন্দেহ। এজন্য শ্রীযুত অক্ষয়কুমার দত্তও তাঁহার পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে রামানুজ সম্প্রদায়ের ইতিহাসে শ্রীক্ষেত্রকে বৈষ্ণবদিগের তীর্থের মধ্যে অন্যতম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা——"এ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ স্থানে স্থানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বিষ্ণু ও লক্ষ্মী, রাম ও কৃষ্ণ এবং তাঁহাদিগের অন্য অন্য মূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনা করিয়াছেন। দক্ষিণাপথে লক্ষ্মী, বালাজী, রামনাথ ও রঙ্গনাথ; উৎকলে জগন্নাথ; হিমালয়ে বদরীনাথ এবং দ্বারকাদি অন্য অন্য তীর্থস্থানে অনেকবিধ বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত আছে।" এখনও রামানুজ সম্প্রদায়ই এই মন্দিরে প্রভুত্ব করিতেছেন। উক্ত সম্প্রদায়ের এই স্থানে অবস্থিত এমার মঠের লোকেরাই এই মন্দিরের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। এই মন্দিরের শিখরদেশে ও ৺জগন্নাথের কপালে রামানুজ সম্প্রদায়ের তিলক অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের কর্ম্মচারী ও লোকজনকে রামানুজ সম্প্রদায়ের তিলক ধারণ করিতে হয়।

জগন্নাথদেবের মন্দিরটী উচ্চে ১৯২ ফিট; মন্দিরের সর্ব্বোচ্চ চূড়ার নাম নীলচক্র; মন্দিরের শিখরে ধ্বজা ও বিষ্ণুচক্র বিদ্যমান আছে। এরূপ প্রকাণ্ড ও উচ্চ মন্দির ভারতের আর কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। যাত্রী-সংখ্যাও এখানকার ন্যায় ভারতের আর কোন তীর্থস্থানে এত অধিক হয় না। আমরা মন্দিরমধ্যে এই সকল দেখিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন পাণ্ডার সহিত সহরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তস্থিত নরেন্দ্র বা চন্দন সরোবর দেখিতে গমন করিলাম। এই সরোবরটী এখানকার সকল সরোবর অপেক্ষা বড় এবং ইহার জলও সর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার। সহরের প্রান্তদেশ বলিয়া এখানে লোকজনের বসতি নাই। সরোবরটী চতুর্দ্দিকে গজগিরি করা বা পাথরের সিঁড়ি বাঁধান; জলমধ্যে একটী মহল বা মন্দির আছে। বৈশাখ মাসে চন্দনযাত্রা উৎসবে ৺মদনমোহনজী এই স্থানে আসিয়া জল-বিহার করেন। মেলার সময় এই সরোবরের জলই যাত্রীদের পানার্থ নির্দ্দিষ্ট হয়; এ কারণ এই সরোবরে যাত্রীদের বস্ত্রাদি কাচিতে দেয় না। আমরা এই সরোবর দেখিয়া এখান হইতে কিয়দ্দূরে সহরের প্রান্তভাগে গিয়া, আঠার নালায় উপস্থিত হইলাম। এই স্থানই পুরী সহরের সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। আঠার নালা একটী খাল বা জলা মাত্র। এই জলার উপর আঠার খিলান বিশিষ্ট একটী পাকা সেতু থাকায় ইহার নাম আঠার নালা হইয়াছে। পূর্ব্বে কাঙ্গাল যাত্রিগণ সহর প্রবেশ করিতে পাইত না।

কেবল ধনী যাত্রিগণ, কর জমা দিয়া পুরী প্রবেশ করিতে পাইত। কাঙ্গালেরা আঠার নালার বাহিরে থাকিয়াই ৺জগন্নাথদেব রথে আরোহণ করিলে এই স্থান হইতেই রথোপবিষ্ট শ্রীভগবান্‌কে দর্শন পূর্ব্বক আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া বাটী ফিরিয়া যাইত! কারণ বহুকাল ধরিয়াই এ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে "রথে চ বামনম্ দৃষ্ট্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে" অর্থাৎ রথে অবস্থিত ৺জগন্নাথকে দর্শন করিলে আর পুনর্ব্বার দেহ ধারণ করিতে হয় না। আমরা আঠার নালা দেখিয়া পুনরায় সহরে প্রবেশ করিয়া অল্পদূর আসিয়াই ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে উপস্থিত হইলাম। এই সরোবরটী অপেক্ষাকৃত ছোট। ইহার চতুর্দ্দিক্ পাথরের সিঁড়ি বাঁধান এবং এক পাড়ে ২৩টী দেবালয় আছে। এই সরোবরেও যাত্রীদিগকে পূজা, স্নান ও শ্রাদ্ধাদি করিতে হয়। কথিত আছে ৺জগন্নাথের প্রতিষ্ঠাতা ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা এই সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এ কারণ তাঁহার নামানুসারে ইহার ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর নাম হইয়াছে। আমরা এই সরোবরে স্নানাদি এবং মন্দিরে দেবদর্শন করিয়া এখান হইতে অদূরে গুণ্ডিচা মন্দিরে উপস্থিত হইলাম।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রী গুণ্ডিচা দেবীর নামানুসারে এই বাটীর নাম গুণ্ডিচা মন্দির হইয়াছে। গুণ্ডিচা মন্দির একটী পুষ্পোদ্যানের মধ্যে অবস্থিত; পার্শ্বেই সরোবর ও নিকটে নৃসিংহদেবের মন্দির আছে। ৺জগন্নাথদেব রথযাত্রা করিয়া এখানে আসিয়া বিশ্রাম করেন। গুণ্ডিচা মন্দির প্রস্তরনির্ম্মিত ও খুব বড়। মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলে একটী খুব বড় ঘর বা জগমোহন দেখিতে পাওয়া যায়। এই ঘরের চারিভিতে নানান্ চিত্র চিত্রিত আছে। ঘরের এক পার্শ্বে খুব উচ্চ প্রস্তর নির্ম্মিত বেদিকা নির্ম্মিত আছে। ইহার উপরই ৺ জগন্নাথ, বলদেব ও সুভদ্রা রথযাত্রা করিয়া আসিয়া উপবেশন করেন। এই গুণ্ডিচা মন্দিরই চৈতন্যদেব রথযাত্রার পূর্ব্বে নিজ শিষ্যগণসহ স্বহস্তে মার্জ্জনা করিতেন। ইহারই পার্শ্বস্থ পুষ্পোদ্যানে তিনি রথযাত্রার দিন কীর্ত্তনান্তে শিষ্যগণের সহিত বনভোজন ও রাজা প্রতাপরুদ্রকে কৃপাপূর্ব্বক আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন। আমরা এই সকল স্থান দেখিয়া গুণ্ডিচা মন্দির হইতে বাহির হইয়া পার্শ্বস্থিত পুষ্পোদ্যান পার হইলাম এবং শ্রীক্ষেত্রের সর্ব্বাপেক্ষা বড় রাস্তায় উপস্থিত হইলাম। এই রাস্তায় রথ চলে। ইহা উত্তরদক্ষিণে গুণ্ডিচা মন্দির হইতে ৺জগন্নাথদেবের মন্দিরের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও খুব প্রশস্ত। এত বড় চওড়া

রাস্তা ভারতের আর কোন সহরেও দেখা যায় না। আমরা এই রাস্তায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে বাল-গুণ্ডি নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। জগন্নাথ-দেব মন্দির হইতে রথে চড়িয়া গুণ্ডিচা আগমন কালে এই বালগুণ্ডিতে রথ দাঁড় করাইয়া ভোগ খাইয়া লন। আমরা বালগুণ্ডি হইতে বরাবর উক্ত বড় রাস্তার উপর দিয়া দক্ষিণাভিমুখে ৺জগন্নাথের মন্দিরের দিকে ফিরিয়া আসিতে লাগিলাম। এই রাস্তার পূর্ব্বদিকে ৺জগন্নাথের মন্দিরের নিকটই এখানকার রাজার রাজবাটী এবং রাজবাটীর সম্মুখেই পশ্চিম দিকে থানা বা পুলিশ দেখিতে পাইলাম। রাজবাটী হইতে জগন্নাথের মন্দির পর্য্যন্ত রাস্তার দুই দিকে বাজার ও সকল প্রকার দ্রব্যের দোকান, এমন কি রাস্তার মধ্যস্থানেও হোগলার ঘর করিয়া অনেক দোকান আছে। আমরা এই সকল দেখিতে দেখিতে বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

ক্রমশঃ।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

রামকৃষ্ণ মিশনের ১৯০৯ সেপ্টেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ঘাঁটাল বন্যাকার্য্যের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। উহাতে প্রকাশ যে, উক্ত কার্য্যের জন্য সর্ব্বশুদ্ধ মোট জমা—৪২২৭৸৴৫ এবং খরচ মোট—৩৪৪৯।/১০; হস্তে বাকি—৭৭৮॥/১৫! খরচের তালিকাটী যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল:—চাউল খরিদ—৪০২৸/০, চালাঘর তৈয়ারি এবং মেরামতে সাহায্য—২৫৫১৲, নগদ দান—৭৪॥৶০, কম্বল দান—২৫৮।৵০, রাহা খরচ—৪৯৶৫, সেবকদের খাইখরচ—৩৩৸/৫, সরঞ্জাম—৩৫৸/১০, পাচক, চাকর ইত্যাদির বেতন—১১৸৶০, পোষ্টেজ—১৪৸৵৫, ঔষধ—২৸৵১৫, মুটেভাড়া—১১।৶১০, খুচরা—১।৵০।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।]　　　　[স্বামী সারদানন্দ।

বলরাম বাবুর বাটীতে রথে ঠাকুরকে লইয়া কি আনন্দের তুফান ছুটিত, তাহার কিছু আভাস আমরা পাঠককে 'গোপালের মা' শীর্ষক অধ্যায়ে দিয়াছি। এজন্য এখানে আর ঐ বিষয়ের পুনরুল্লেখ করিলাম না। তবে একটি বিষয়, যাহা সেখানে বলা হয় নাই, সেইটি মাত্র বলি। সন্ধ্যার পর শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহকে মাল্যচন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া অন্দরের ঠাকুর-ঘর হইতে বাহিরে আনা হইল এবং বস্ত্রপতাকাদি দ্বারা ইতিপূর্ব্বেই সজ্জিত ছোট রথখানিতে বসাইয়া আবার পূজা করা হইল। বলরাম বাবুর পুরোহিতবংশজ ঠাকুরের ভক্ত শ্রীযুত ফকীরই * ঐ পূজা করিলেন। তার পর সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে রথের টান আরম্ভ হইল। ঠাকুরও স্বয়ং রথের রশি ধরিয়া অল্পক্ষণ টানিলেন। পরে ভাবাবেশে তালে তালে সুন্দরভাবে নৃত্য করিতে লাগিলেন। সে হুঙ্কারে, সে নৃত্যে ও সে ভাবে মুগ্ধ হইয়া সকলেই তখন আত্মহারা—ভগবদ্ভক্তিতে উন্মাদ! বাহির বাটীর দোতলার চক্‌-মিলান বারাণ্ডাটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেকক্ষণ অবধি এইরূপ নৃত্য, কীর্ত্তন ও রথের টান হইলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমতী রাধারাণী, শ্রীমহাপ্রভু ও তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ এবং পরিশেষে তদ্‌ভক্তবৃন্দ, সকলের পৃথক্ পৃথক্ নামোল্লেখ করিয়া জয়কার দিয়া প্রণামান্তে কীর্ত্তন সাঙ্গ হইল। পরে রথ হইতে ৺জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহকে অবরোহণ করাইয়া ত্রিতলে (চিলের ছাদের ঘরে) সাতদিনের মত স্থানান্তরিত করিয়া স্থাপন করা হইল। ইহার অর্থ—রথে চড়িয়া ৺জগন্নাথদেব যেন অন্যত্র আসিয়াছেন; সাতদিন

---

* শ্রীযুত ফকীর বলরাম বাবুর আশ্রয়ে থাকিয়া বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও আশ্রয়দাতার এক-মাত্র শিশুপুত্র রামকৃষ্ণের পাঠাভ্যাসাদির তত্ত্বাবধান করিতেন। ইনি বিশেষ নিষ্ঠাপরায়ণ ও ভক্তিমান্ ছিলেন এবং ঠাকুরের প্রথম দর্শনাবধি তাঁহার প্রতি বিশেষ ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। ঠাকুর কখন কখন ইঁহার মুখ হইতে স্তোত্রাদি শুনিতে ভালবাসিতেন এবং শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত কালীস্তোত্র কিরূপে ধীরে ধীরে প্রত্যেক কথাগুলি সম্পূর্ণ উচ্চারণ করিয়া আবৃত্তি করিতে হয়, তাহা শিখাইয়া দিয়াছিলেন। ঠাকুর সেদিন সন্ধ্যার সময় ফকীরকে নিজ কক্ষের উত্তর দিকের বারাণ্ডায় লইয়া গিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া স্পর্শ করেন ও ধ্যান করিতে বলেন। ফকীরের উহাতে কি দর্শনাদি হইয়াছিল।

পরে পুনঃ এখান হইতে রথে চড়িয়া আপনার পূর্ব্বস্থানে গমন করিবেন! ৺জগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহকে পূর্ব্বোক্ত স্থানে রাখিয়া ভোগ নিবেদন করিবার পর ঠাকুর ও পরে ভক্তেরা সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর ও তাঁহার সহিত আগত যোগেন সে রাত্রি বলরাম বাবুর বাটীতেই রহিলেন। অন্যান্য ভক্তেরা যে যাঁর স্থানে চলিয়া গেলেন।

* * * * * *

পরদিন প্রাতে ৮টা বা ৯টার সময় নৌকা ডাকা হইল—ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিবেন। নৌকা আসিলে ঠাকুর অন্দরে যাইয়া ৺জগন্নাথদেবকে প্রণাম করিয়া এবং ভক্তপরিবারবর্গের প্রণাম স্বয়ং গ্রহণ করিয়া বাহির বাটীর দিকে আসিতে লাগিলেন। স্ত্রী-ভক্তেরা সকলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে অন্দরের পূর্ব্বদিকের রন্ধনশালার সম্মুখের ছাদের শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া বিষণ্ণমনে ফিরিয়া যাইলেন; কারণ, এ অদ্ভুত জীবন্ত ঠাকুরকে ছাড়িতে কাহার প্রাণ চায়? উক্ত ছাদ হইতে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া তিন চারিটি সিঁড়ি উঠিলেই একটি দ্বার এবং ঐ দরজাটি পার হইয়াই বাহিরের দ্বিতলের চক্‌মিলান বারাণ্ডা। সকল স্ত্রী-ভক্তেরা ঐ ছাদের শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া ফিরিলেও একজন যেন আত্ম-হারা হইয়া ঠাকুরের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের চক্‌মিলান বারাণ্ডাবধি আসিলেন—যেন, বাহিরে অপরিচিত পুরুষেরা সব আছে, সে বিষয়ে আদৌ হুঁস্ নাই!

ঠাকুর স্ত্রী-ভক্তদিগের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণান্তে ভাবাবেশে এমন গোঁ-ভরে বরাবর চলিয়া আসিতেছিলেন যে, মেয়েরা যে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতদূর আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাদের একজন যে এখনও ঐ ভাবে তাঁহার সঙ্গে আসিতেছেন, সে বিষয়ে তাঁহার আদৌ হুঁস্ ছিল না। ঠাকুরের ঐরূপ গোঁ-ভরে চলা যাঁহারা চক্ষে দেখিয়াছেন, তাঁহারাই কেবল বুঝিতে পারিবেন; অপরকে উহা বুঝান কঠিন। দ্বাদশবর্ষব্যাপী, কেবল দ্বাদশবর্ষই বা বলি কেন—আজন্ম একাগ্রতা অভ্যাসের ফলে ঠাকুরের মন বুদ্ধি এমন একনিষ্ঠ হইয়া গিয়াছিল যে, যখন যেখানে বা যে কার্য্যে রাখিতেন, ঠিক সেইখানেই থাকিত—চারি পাশে উঁকি ঝুঁকি একেবারেই মারিত না। আর শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি এমন বশীভূত হইয়া গিয়াছিল যে, মনে যখন যে ভাবটি বর্ত্তমান, উহারাও তখন কেবলমাত্র সেই ভাবটিই প্রকাশ করিত!—একটুও এদিক্ ওদিক্ করিতে পারিত না! এ কথাটি বুঝান বড় কঠিন;

কারণ, আপনাপন মনের দিকে চাহিলেই আমরা দেখিতে পাই—নানা প্রকার পরস্পর বিপরীত ভাবনা যেন এককালে রাজত্ব করিতেছে এবং উহাদের ভিতর যেটি অভ্যাসবশতঃ অপেক্ষাকৃত প্রবল, শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির নিষেধ না মানিয়া তাহারি বশে ছুটিয়াছে! ঠাকুরের মনের গঠন আর আমাদের মনের গঠন এতই বিভিন্ন! দৃষ্টান্তস্বরূপ আরও অনেক কথা এখানে বলা যাইতে পারে। দক্ষিণেশ্বরে আপনার ঘর হইতে ঠাকুর মা কালীকে দর্শন করিতে চলিলেন। ঘরের পূর্ব্বের দালানে আসিয়া সিঁড়ি দিয়া ঠাকুরবাটীর উঠানে নামিয়া একেবারে সিধা মা কালীর মন্দিরের দিকে চলিলেন। এখন ঠাকুরের থাকিবার ঘর হইতে মা কালীর মন্দিরে যাইতে অগ্রে শ্রীরাধাগোবিন্দজীর মন্দির পড়ে। যাইবার সময় ঠাকুর উক্ত মন্দিরে উঠিয়া শ্রীবিগ্রহকে প্রণাম করিয়া মা কালীর মন্দিরে যাইতে পারেন; কিন্তু তাহা কখনও করিতে পরিতেন না। একেবারে সরাসর মা কালীর মন্দিরে যাইয়া প্রণামাদি করিয়া, পরে ফিরিয়া আসিবার কালে ঐ মন্দিরে উঠিতেন। আমরা তখন তখন ভাবিতাম ঠাকুর মা কালীকে অধিক ভালবাসেন বলিয়াই বুঝি ঐরূপ করেন। পরে একদিন ঠাকুর নিজেই বলিলেন—"আচ্ছা, এ কি বল্ দেখি? মা কালীকে দেখ্‌তে যাব মনে করেছি তো একেবারে সিধে মা কালীর মন্দিরে যেতে হবে! এদিক্ ওদিক্ ঘুরে বা রাধাগোবিন্দের মন্দিরে উঠে যে প্রণাম করে যাব, তা হবে না! কে যেন পা টেনে, সিধে মা কালীর মন্দিরে নিয়ে যায়—একটু এদিক্ ওদিক্ বেঁক্‌তে দেয় না! মা কালীকে দেখার পর, যেথায় ইচ্ছা যেতে পারি—এ কেন বল্ দেখি?" আমরা মুখে বলিতাম, 'কি জানি মশাই'; আবার মনে মনে ভাবিতাম, 'এও কি হয়? ইচ্ছা করিলেই আগে রাধাগোবিন্দকে প্রণাম করিয়া যাইতে পারেন। মা কালীকে দেখ্‌বার ইচ্ছাটা বেশী হয় বলেই বোধ হয়, অন্যরূপ ইচ্ছা হয় না' ইত্যাদি; কিন্তু এ সব কথা সহসা ভাঙ্গিয়া বলিতেও পারিতাম না। আবার ঠাকুরই ঐ বিষয়ের উত্তরে বলিতেন—'কি জানিস্? যখন যেটা মনে হয় ক'রবো, সেটা তখনই কর্‌তে হবে—এতটুকু দেরী সয় না!' কে জানে তখন একনিষ্ঠ মনের এই প্রকার গতি ও চেষ্টাদি এবং ঠাকুরের মনটার অন্তঃস্তর অবধি সমস্তটা, বহুকাল ধরিয়া একনিষ্ঠ হইয়া হইয়া, একেবারে একভাবে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে—উহাতে অন্য ভাবকে আশ্রয় করিয়া বিপরীত তরঙ্গরাজি আর উঠেই না! আবার কখন কখন বলিতেন—

'দেখ, নির্ব্বিকল্প অবস্থায় উঠ্‌লে তখন ত আর আমি তুমি, দেখা শুনা, বলা কহা কিছুই থাকে না; সেখান থেকে দুই তিন ধাপ্ নেমে এসেও এতটা ঝোঁক্ থাকে যে, তখনও বহু লোকের সঙ্গে বা বহু জিনিষ নিয়ে ব্যবহার চলে না! তখন যদি খেতে বসি আর পঞ্চাশ রকম তরকারী সাজিয়ে দেয়, তবু হাত সে সকলের দিকে যায় না; এক জায়গা থেকেই মুখে উঠ্‌বে! এমন সব অবস্থা হয়! তখন ভাত ডাল তরকারী পায়েস সব একত্রে মিশিয়ে নিয়ে খেতে হয়!' আমরা এই সমরস অবস্থার দুই তিন ধাপ্ নীচের কথা শুনিয়াই অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া থাকিতাম! আবার বলিতেন—'আবার এমন একটা অবস্থা হয়, তখন কাউকে ছুঁতে পারি না! (ভক্তদের সকলকে দেখাইয়া) এদের কেউ ছুঁলে যন্ত্রণায় চীৎকার ক'রে উঠি!' আমাদের ভিতর কেইবা তখন এ কথার মর্ম্ম বুঝে যে, শুদ্ধসত্ত্ব গুণটা তখন ঠাকুরের মনে এতটা বেশী হয় যে, এতটুকু অশুদ্ধতার স্পর্শ সহ্য করিতে পারেন না! পুনরায় বলিতেন—'ভাবে আবার একটা অবস্থা হয়, তখন খালি (শ্রীযুক্ত বাবুরাম মহারাজকে দেখাইয়া) ওকে ছুঁতে পারি; ও যদি তখন ধরে * ত কষ্ট হয় না। ও খাইয়ে দিলে তবে খেতে পারি।'—যাক্ এখন সে সব কথা। আমরা পূর্ব্বকথার অনুসরণ করি।

ঠাকুর গোঁ-ভরে চলিতে চলিতে বাহিরের বারাণ্ডায় (যেখানে পূর্ব্বরাত্রে রথ টানা হইয়াছিল) আসিয়া হঠাৎ পশ্চাতে চাহিয়া দেখেন, সেই স্ত্রীভক্তটী ঐরূপে তাঁহার পেছনে পেছনে আসিতেছেন। দেখিয়াই দাঁড়াইলেন এবং 'মা আনন্দময়ী, মা আনন্দময়ী' বলিয়া বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন। ভক্তটিও ঠাকুরের শ্রীচরণে মাথা রাখিয়া প্রতিপ্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র

* ভাবাবেশ হইলে ঠাকুরের শরীরজ্ঞান না থাকায়, অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি (হাত, মুখ, গ্রীবা ইত্যাদি) বাঁকিয়া যাইত এবং কখনবা সমস্ত শরীরটা হেলিয়া পড়িয়া যাইবার মত হইত। তখন নিকটস্থ ভক্তেরা ঐ সকল অঙ্গাদি ধরিয়া ধীরে ধীরে যথাযথ ভাবে সংস্থিত করিয়া দিতেন এবং পাছে ঠাকুর পড়িয়া গিয়া আঘাত প্রাপ্ত হন এজন্য তাঁহাকে ধরিয়া থাকিতেন। আর যে দেবদেবীর ভাবে ঠাকুরের ঐ অবস্থা, সেই দেবদেবীর নাম তখন তাঁহার কর্ণকুহরে শুনাইতে থাকিতেন, যথা, কালী কালী, রাম রাম, ওঁ ওঁ বা ওঁ তৎসৎ ইত্যাদি। ঐরূপ শুনাইতে শুনাইতে তবে ধীরে ধীরে ঠাকুরের আবার বাহ্য চৈতন্য আসিত। যে ভাবে ঠাকুর যখন আবিষ্ট ও আত্মহারা হইতেন, সেই নাম ভিন্ন অপর নাম শুনাইলে তাঁহার বিষম যন্ত্রণা বোধ হইত।

ঠাকুর তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'চ না গো মা, চ না!' কথাগুলি এমনভাবে বলিলেন এবং ভক্তটীও এমন এক আকর্ষণ অনুভব করিলেন যে, আর দিক্‌বিদিক্ না দেখিয়া (ইঁহার বয়স তখন ত্রিশ বৎসর হইবে এবং গাড়িপাল্কীতে ভিন্ন এক স্থান হইতে অপর স্থানে কখনও ইহার পূর্ব্বে যাতায়াত করেন নাই) ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে চলিলেন!—কেবল একবারমাত্র ছুটিয়া বাটীর ভিতর যাইয়া বলরাম বাবুর গৃহিণীকে বলিয়া আসিলেন, 'আমি ঠাকুরের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে চল্লুম'। পূর্ব্বোক্ত ভক্তটি এইরূপে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেছেন শুনিয়া আর একটি স্ত্রী-ভক্তও সকল কর্ম্ম ছাড়িয়া তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। এদিকে ঠাকুর ভাবাবেশে স্ত্রী-ভক্তটিকে ঐরূপে আসিতে বলিয়া আর পশ্চাতে না চাহিয়া শ্রীযুত যোগেন, ছোট নরেন প্রভৃতি বালক ভক্তদিগকে সঙ্গে লইয়া সরাসর নৌকায় যাইয়া বসিলেন। স্ত্রী-ভক্ত দুইটিও ছুটাছুটি করিয়া আসিয়া নৌকায় উঠিয়া বাহিরের পাটাতনের উপর বসিলেন। নৌকা ছাড়িল।

যাইতে যাইতে স্ত্রী-ভক্তটি ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন—'ইচ্ছা হয়, খুব তাঁকে ডাকি, তাঁতে ষোল আনা মন দি, কিন্তু মন কিছুতেই বাগ্ মানে না—কি করি?'

ঠাকুর—'তাঁর উপর ভার দিয়ে থাক না গো! ঝড়ের এঁটো পাতা হ'য়ে থাক্‌তে হয়—সেটা কি জান? পাতাখানা পড়ে আছে; য্যাম্‌নে হাওয়াতে নিয়ে যাচ্চে, ত্যাম্‌নে উড়ে যাচ্চে, সেই রকম; এই রকম ক'রে তাঁর উপর ভার দিয়ে পড়ে থাক্‌তে হয়—চৈতন্য বায়ু য্যাম্‌নে মনকে ফেরাবে, ত্যাম্‌নে ফিরবে, এই আর কি!'

এইরূপ প্রসঙ্গ চলিতে চলিতে নৌকা কালীবাটীর ঘাটে আসিয়া লাগিল। নৌকা হইতে নামিয়াই ঠাকুর কালীঘরে * যাইলেন। স্ত্রী-ভক্তেরা কালীবাটীর উত্তরে অবস্থিত নহবৎখানায় † শ্রীমার নিকটে যাইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া মা কালীকে প্রণাম করিতে মন্দিরাভিমুখে চলিলেন।

* মা কালীর মন্দিরকে ঠাকুর 'কালীঘর' ও রাধাগোবিন্দজীর মন্দিরকে 'বিষ্ণুঘর' বলিতেন।

† এই নহবৎখানায় উপরের ঘরে শ্রীশ্রীমা শয়ন এবং নিম্নের ঘরে দিনের বেলা বসা দাঁড়ান করিতেন ও সকল প্রকার দ্রব্যাদি রাখিতেন। নিম্নের ঘরের সম্মুখের রকে রন্ধনাদি হইত।

এদিকে ঠাকুর বালক ভক্তগণসঙ্গে মা কালীর মন্দিরে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া নাটমন্দিরে আসিয়া বসিলেন এবং মধুর কণ্ঠে গাহিতে লাগিলেন—

ভুবন ভুলাইলি মা ভবমোহিনি।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্য-বিনোদিনি॥
শরীরে শারীরি যন্ত্রে, সুষুম্নাদি ত্রয় তন্ত্রে,
গুণভেদ মহামন্ত্রে তিন গ্রাম সঞ্চারিণি॥
আধারে ভৈরবাকার, ষড়্‌দলে শ্রীরাগ আর
মণিপুরেতে মল্লার বসন্তে হৃদ্‌প্রকাশিনি॥
বিশুদ্ধে হিন্দোল সুরে, কর্ণাটক আজ্ঞাপুরে
তান মান লয় সুরে ত্রিসপ্ত সুরভেদিনি॥
শ্রীনন্দ কুমারে কয়, তত্ত্ব না নিশ্চয় হয়
তব তত্ত্ব গুণত্রয় কাকীমুখআচ্ছাদিনি॥

নাটমন্দিরের উত্তর প্রান্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার সাম্‌নে বসিয়া ঠাকুর এইরূপে গাহিতেছেন, সঙ্গী ভক্তেরা কেহ বসিয়া কেহ দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত হৃদয়ে উহা শুনিয়া মোহিত হইয়া রহিয়াছেন! গাহিতে গাহিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর সহসা দাঁড়াইয়া উঠিলেন, গান থামিয়া গেল, মুখের অদৃষ্টপূর্ব্ব হাসি যেন সেই স্থানে আনন্দ ছড়াইয়া দিল—ভক্তেরা নিস্পন্দ হইয়া এখন ঠাকুরের শ্রীমূর্ত্তিই দেখিতে লাগিলেন! তখন ঠাকুরের শরীর একটু হেলিয়াছে দেখিয়া, পাছে পড়িয়া যান ভাবিয়া, শ্রীযুত ছোট নরেন তাঁহাকে ধরিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তিনি স্পর্শ করিবামাত্র ঠাকুর যন্ত্রণায় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ছোট নরেন,তাঁহার স্পর্শ ঠাকুরের এখন অভিমত নয় বুঝিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুত রামলাল মন্দিরাভ্যন্তর হইতে ঠাকুরের পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত কষ্টসূচক শব্দ শুনিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ ধারণ করিলেন। কতক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া নাম শুনিতে শুনিতে ঠাকুরের ধীরে ধীরে বাহ্য চৈতন্য হইল; কিন্তু তখনও যেন বিপরীত নেশার ঝোঁকে সহজ ভাবে দাঁড়াইতে পারিতেছেন না! পা যেন্ডায় টলিতেছে!

এই অবস্থায় কোন রকমে, হামা দেওয়ার মত ক'রে, ঠাকুর নাটমন্দিরের উত্তরের সিঁড়িগুলি দিয়া মন্দিরের প্রাঙ্গণে নামিতে লাগিলেন ও ছোট শিশুর মত বলিতে লাগিলেন—'মা, পড়ে যাব না—পড়ে যাব না?"

বাস্তবিকই তখন ঠাকুরকে দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, তিনি যেন একটি ছোট তিন চারি বৎসরের ছেলে, মার দিকে চাহিয়া ঐ কথাগুলি বলিতেছেন, আর মার নয়নে নয়ন রাখিয়া ভরসান্বিত হইয়াই সিঁড়িগুলি নামিতে পারিতেছেন! অতি সামান্য বিষয়েও এমন অপরূপ নির্ভরের ভাব আর কি কোথাও দেখিতে পাইব!

প্রাঙ্গণ উত্তীর্ণ হইয়া ঠাকুর এইবার নিজ কক্ষে আসিয়া পশ্চিমের দিকের গোল বারাণ্ডায় যাইয়া বসিলেন—তখনও ভাবাবিষ্ট! সে ভাব আর ছাড়ে না! কখনও একটু কমে, আবার বাড়িয়া বাহ্য চৈতন্য লুপ্তপ্রায় হয়! এইরূপে কতক্ষণ থাকার পর, ভাবাবস্থায় ঠাকুর সঙ্গী ভক্তগণকে বলিতে লাগিলেন—'তোমরা সাপ্ দেখেছ? সাপের জ্বালায় গেনুম!' আবার তখনি যেন ভক্তদের ভুলিয়া সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনীকেই (তাঁহাকেই যে ঠাকুর বর্ত্তমান ভাবাবস্থায় দেখিতেছিলেন, একথা আর বলিতে হইবে না) সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—'তুমি এখন যাও বাবু; ঠাক্রুণ, তুমি এখন সর; আমি তামাক খাব, মুখ ধোব, দাঁতন হয় নি'—ইত্যাদি। এইরূপে কখন ভক্তদিগের সহিত এবং কখন ভাবাবেশে দৃষ্টমূর্ত্তির সহিত কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর ক্রমে সাধারণ মানবের মত বাহ্য চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন।

সাধারণ মানবের ন্যায় যখন থাকিতেন, তখন ঠাকুরের ভক্তদিগের নিমিত্তই চিন্তা। শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, ঘরে কিছু তরিতরকারী আছে কি না? শ্রীমা তদুত্তরে 'কিছুই নাই' বলিয়া পাঠাইলে, ঠাকুরের আবার ভাবনা হইল, 'কে এখন বাজার যায়'—কারণ, বাজার হইতে কিছু শাকসব্জি কিনিয়া না আনিলে কলিকাতা হইতে আগত স্ত্রী পুরুষ ভক্তেরা খাইবে কি দিয়া? ভাবিয়া চিন্তিয়া স্ত্রী-ভক্ত দুইটিকে বলিলেন—'বাজার কর্‌তে যেতে পার্‌বে?' তাঁহারাও বলিলেন, 'পার্‌বো'; এবং বাজারে যাইয়া দুটো বড় বেগুন, কিছু আলু ও কি শাক কিনিয়া আনিলেন। শ্রীশ্রীমা ঐ সকল রন্ধন করিলেন। কালীবাটি হইতেও ঠাকুরের নিত্য বরাদ্দ এক থাল মা কালীর প্রসাদ আসিল। পরে ঠাকুরের ভোজন সাঙ্গ হইলে ভক্তেরা সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

তৎপরে ঠাকুরের ভাবাবস্থার সময় শ্রীযুত ছোট নরেন ধরিতে যাইলে ঠাকুরের ওরূপ কষ্ট কেন হইল, সে কথার অনুসন্ধানে কারণ জানিতে পারা

গেল। ছোট নরেনের মস্তকে বাঁ দিক্‌কার রগে একটি ছোট আব্‌ হইয়াছিল ও ক্রমে ক্রমে সেটি বড় হইতেছিল। পরে সেটা যন্ত্রণাদায়ক হইবে বলিয়া ডাক্তারেরা ঔষধ দিয়া ঐ স্থানটিতে ঘা করিয়া দিয়াছিল। পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম বটে, শরীরে ক্ষত থাকিলে দেবমূর্ত্তি স্পর্শ করিতে নাই, কিন্তু কথাটার সত্যতা যে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে এইরূপে প্রমাণিত হইবে, তাহা আর কে ভাবিয়াছিল! দেবভাবে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া বাহ্যজ্ঞান একেবারে লুপ্ত হইলেও ঠাকুর যে কি অন্তর্নিহিত দৈবশক্তির বলে ঐরূপ করিয়া উঠিলেন, তাহা বুঝা সাধ্যায়ত্ত না হইলেও তাঁহার যে বাস্তবিকই কষ্ট হইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহ। ছোট নরেনকে ঠাকুর কত শুদ্ধস্বভাব বলিতেন, তাহা আমাদের জানা ছিল এবং সাধারণ অবস্থায় ঠাকুর অপর সকলের ন্যায় তাঁহাকেও ছুঁইতেছেন, পদস্পর্শ করিতে দিতেছেন ও তাঁহার সহিত একত্র বসা দাঁড়ান করিতেছেন, তিনিই বা কেমন করিয়া জানিবেন, ভাবের সময় ঠাকুর বাস্তবিকই দেবতা হইয়া যান? যাহা হউক, তদবধি তিনি যত দিন না উক্ত ক্ষতটি আরাম হইল, ততদিন আর ভাবাবস্থার সময় ঠাকুরকে স্পর্শ করিতেন না।

নানা সৎপ্রসঙ্গে ঠাকুরের সহবাসে সমস্ত দিন কোথা দিয়া কাটিয়া গেল। পরে সন্ধ্যা আগতপ্রায় দেখিয়া ভক্তেরা যে যাহারা বাটীর দিকে চলিলেন। স্ত্রীলোক দুইটিও ঠাকুরের ও শ্রীমার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পদব্রজে কলিকাতায় আসিলেন।

স্বামি-শিষ্য সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ]।

উৎসব।

স্বামীজি যে সময়ে ইংলণ্ড হ'তে প্রথমবার ফিরে আসেন, তখন আলম্‌বাজারে রামকৃষ্ণ-মঠ প্রতিষ্ঠিত ছিল। মঠের বাড়ীটা লোকে 'ভূতের বাড়ী' বলিত। কিন্তু সন্ন্যাসিগণের সংসর্গে ঐ ভূতের বাড়ী রামকৃষ্ণতীর্থরূপে পরিণত হইয়াছিল। তথায় কত সাধনভজন, কত জপতপস্যা, কত শাস্ত্র-প্রসঙ্গ ও নামকীর্ত্তন হইয়াছিল, তার পরিসীমা নাই। কলিকাতায়

রাজপ্রতিম অভ্যর্থনা লাভ করিয়া স্বামীজি ঐ ভগ্ন মঠেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। আর কলিকাতার অধিবাসিগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া একমাস কাল থাকিবার জন্য তাঁহার নিমিত্ত যে স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল, সে স্থানেও (গোপাললাল শীলের বাগানবাটীতে) মধ্যে মধ্যে আসিয়া অবস্থান করিয়া দর্শনোৎসুক জনসঙ্ঘের সহিত ধর্ম্মালাপাদি করিয়া তাহাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে লাগিলেন—কারণ, মঠে স্থানাভাব।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব নিকটবর্ত্তী। এবার দক্ষিণেশ্বরেই উৎসবের আয়োজন। ধর্ম্মপিপাসু, বিশেষতঃ রামকৃষ্ণসেবকগণের আনন্দ ও উৎসাহের পরিসীমা নাই। কারণ, বিশ্ববিজয়ী স্বামীজি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভবিষ্যৎ বাণী সফল করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছেন; তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণ আজ তাঁহাকে পাইয়া যেন শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্গসুখ অনুভব করিতেছেন। দক্ষিণেশ্বরে আজ উৎসবের বিপুল আয়োজন। মাকালী-মন্দিরের দক্ষিণে প্রসাদ প্রস্তুত হইতেছে। স্বামীজি তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণসহ বেলা ৯টা ১০টা আন্দাজ উপস্থিত হইয়াছেন। নগ্ন পদ; শীর্ষে গৈরিকবর্ণের উষ্ণীষ। জনসঙ্ঘ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে—তাঁহার সেই অনিন্দিত রূপ দর্শন করিবে, সেই পাদপদ্ম স্পর্শ করিবে ও তাঁহার শ্রীমুখের সেই জলন্ত অগ্নিশিখাসম বাণী শুনিয়া ধন্য হইবে বলিয়া; তাই আজ আর স্বামীজির তিলার্দ্ধ বিশ্রামের সময় নাই। মা কালীর মন্দিরের সামনে অসংখ্য লোক। স্বামীজি শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন—সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শির অবনত হইতেছে। পরে ৺রাধাকান্ত জীউকে প্রণাম করিয়া স্বামীজি এইবার ঠাকুরের বাসগৃহে আগমন করিলেন। সে প্রকোষ্ঠে এখন আর তিলমাত্র স্থান নাই। 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনিতে কালীবাটীর সর্ব্বত্র দিঙ্‌মুখসকল মুখরিত হইতেছে। শতসহস্র দর্শককে ক্রোড়ে করিয়া বার বার কলিকাতা হইতে হোর্‌মিলার কোম্পানীর জাহাজ যাতায়াত করিতেছে। নহবতের তানতরঙ্গে সুরধুনী নৃত্য করিতেছেন। উৎসাহ, আকাঙ্ক্ষা, ধর্ম্মপিপাসা ও অনুরাগ মূর্ত্তিমান্ হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্শ্বদগণরূপে ইতস্ততঃ বিরাজ করিতেছেন। এবারকার এই উৎসব প্রাণে বুঝিবার জিনিষ—ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

দুটী ইংরেজ মহিলাও এ উৎসবে আসিয়াছেন। তাঁহাদের সহিত পরিচয় শিষ্যের এখনও হয় নাই। স্বামীজি তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া পবিত্র পঞ্চবটি ও বিল্বমূল দর্শন করাইতেছেন। স্বামীজির সঙ্গেও শিষ্যের এখন তেমন

বিশেষ পরিচয় হয় নাই। কিন্তু শিষ্য ঐ অনিন্দিত রূপরাশি পান করিতে করিতে স্বামীজির পেছনে পেছনে যাইয়া তথাকার উৎসবসম্বন্ধীয় স্বরচিত একটি সংস্কৃত স্তব (উহা পূর্ব্বেই মুদ্রিত করা হইয়াছিল) স্বামীজির হস্তে প্রদান করিল। স্বামীজিও উহা পড়িতে পড়িতে উধাওমনে পঞ্চবটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঐরূপে যাইতে যাইতে এইবার শিষ্যের পানে তাকাইয়া বলিতেছেন, "বেশ হইয়াছে, আরো লিখ্‌বে।" পঞ্চবটীর একপার্শ্বে ঠাকুরের গৃহী ভক্তগণের সমাবেশ হইয়াছে, দেখা গেল। গিরিশ বাবু উত্তরদিকে গঙ্গামুখে বসিয়াছেন। তাঁহাকে ঘিরিয়া অন্যান্য ভক্তগণ অবস্থান করিতেছেন। আজ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনস্থলে যেন চাঁদের হাট বসিয়াছে। সকলেই শ্রীরামকৃষ্ণগুণগানে ও কথাপ্রসঙ্গে যেন আত্মহারা! ইত্যবসরে বহুজনসমভিব্যাহারে স্বামীজি গিরিশবাবুর নিকট উপস্থিত।

"এই যে—ঘোষজা!" বলিয়া স্বামীজি গিরিশবাবুকে প্রণাম করিতেছেন। গিরিশবাবুও করযোড়ে তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করিতেছেন। এই পবিত্র পঞ্চবটীমূলে এই দুই অদ্ভুতপ্রকৃতি ভক্তের সম্মিলন বহুকাল ধরিয়া হয় নাই; কারণ, ঠাকুরের অপ্রকট হইবার কয়েক বৎসর পরেই স্বামীজি বাঙ্গলা পরিত্যাগ করিয়া পরিব্রাজক ভিক্ষুর ভাবে নানা স্থান পর্য্যটনে বহির্গত হন এবং পাশ্চাত্য হইতে ফিরিয়াই আবার এদেশে আসেন। তাই গিরিশবাবুকে লক্ষ্য করিয়া স্বামীজি বলিতেছেন, "ঘোষজা, সেই একদিন আর এই একদিন"। গিরিশবাবুও স্বামীজির কথায় সম্মতি জানাইয়া বলিতেছেন—"তা জানি; তবুও এখনো সাধ যায়, আরো দেখি।" এইরূপে উভয়ের মধ্যে যে সকল কথা হইল, তাহার মর্ম্ম বাহিরের লোকের অনেকেই পরিগ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর স্বামীজি পঞ্চবটীর উত্তর দিকে অবস্থিত বিল্ববৃক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। স্বামীজি চলিয়া যাইলে গিরিশবাবু উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—"একদিন হরমোহন (মিত্র) কি খবরের কাগজ দেখে এসে বল্লে যে, স্বামীজির নামে এমেরিকায় কি একটা কুৎসা রটেছে। আমি তখন তাকে বলেছিলেম, "নরেন্‌কে যদি নিজ চক্ষে কিছু অন্যায় করতে দেখি, তবে বল্‌বো, আমার চক্ষের দোষ হয়েছে—অমন চোক্ উপ্‌ড়ে ফেল্‌বো"। গিরিশবাবুর সেই বীরত্বব্যঞ্জক অঙ্গভঙ্গি দর্শন করে দু একটী ভক্ত পেছনে হটে

যাচ্ছে ; যেন ভয়ে ভীত হয়েছে। আবার গিরিশবাবু বলছেন, "ওরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে তোলা মাখন, ওরা কি আর জলে মেশে ? ওদের যে কেউ দোষ ধর্ত্তে যাবে, তাদের নরক হবে।" এইরূপ কথা হইতেছে, এমন সময়ে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ গিরিশ ঘোষ মহাশয়ের কাছে আসিলেন এবং একটা থেলো হুঁকা লইয়া তামাক খাইতে খাইতে কলম্বো থেকে কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনকাল পর্য্যন্ত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জনসাধারণে শ্রীস্বামীজিকে যে অপূর্ব্বভাবে আদর অভ্যর্থনাদি করিয়াছে ও তিনি তাহাদের যে সকল অমূল্য উপদেশ বক্তৃতাচ্ছলে বলিয়াছেন, তাহার কতক কতক বর্ণন করিতে লাগিলেন। গিরিশবাবু শুনিতে শুনিতে স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া রহিলেন আর অন্যমনা হইয়া পানই খাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তখন শিষ্যের মনে হইতে লাগিল যেন গিরিশবাবু একটা অপূর্ব্ব ভাবে তন্ময় হইয়া রহিয়াছেন—আর পান চিবান, তামাক খাওয়া প্রভৃতি কাযগুলো যেন তাঁহার শরীর তাঁহার অজ্ঞাতে সম্পন্ন করিয়া যাইতেছে !

এইরূপে সেদিন দক্ষিণেশ্বরে যেন একটা দিব্য ভাবের বন্যা বহিয়া যাইতেছিল। এইবার সেই বিরাট্ জনসঙ্ঘ স্বামীজির বক্তৃতা শুনিতে উদ্গ্রীব হইয়া দণ্ডায়মান হইল। কিন্তু স্বামীজি বহু চেষ্টা করিয়াও লোকের ভিড় ও কলরব বশতঃ করিতে পারিলেন না। কেবল "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত" বলিয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন মাত্র! বক্তৃতায় উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া স্বামীজি আবার ইংরেজ মহিলা দুইটীকে সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের সাধনস্থান দেখাইতে ও শ্রীঠাকুরের বিশিষ্ট ভক্ত ও অন্তরঙ্গগণের সঙ্গে আলাপ করিয়া দিতে লাগিলেন। স্বামীজির সঙ্গে ইংরেজ মহিলারা ধর্ম্মশিক্ষার জন্য আসিয়াছেন দেখিয়া দর্শকগণের মধ্যে কেহ কেহ আশ্চর্য্য হইয়া তাঁহার অদ্ভুত শক্তির কথা বলাবলি করিতে লাগিল।

৩টার পর যখন ভিড় ক্রমশ: কমিয়াছে, তখন স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন, "একখানা গাড়ী দ্যাখ্—মঠে যেতে হবে।" শিষ্যকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া আবার ডাকিয়া বলিলেন, "ভাড়ার পয়সা তোর কাছে আছে ত?" শিষ্য "আছে" বলিয়া গাড়ী ডাকিতে ছুটিল। আলমবাজার পর্য্যন্ত যাইবার ভাড়া দুই আনা ঠিক করিয়া শিষ্য গাড়ী লইয়া উপস্থিত হইলে স্বামীজি স্বয়ং গাড়ীর একদিকে বসিয়া ও স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও শিষ্যকে অন্যদিকে বসাইয়া আলমবাজার মঠের দিকে আনন্দে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যাইতে

যাইতে শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন, "কেবল abstract idea (জীবনে ও কার্য্যে অপরিণত ভাব) নিয়ে পড়ে থাক্‌লে কি হবে? এই সকল উৎসব প্রভৃতিরও দরকার; তবে ত massএর ভেতর এই সকল ভাব ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়বে। এই যে হিন্দুদের বার মাসে তের পার্ব্বন—এর মানেই হচ্ছে, ধর্ম্মের বড় বড় ভাবগুলি ক্রমশঃ লোকের ভেতর প্রবেশ করিয়ে দেওয়া।"

শিষ্য—মশায় ওর একটা দোষও আছে।

স্বামীজি—কি দোষ?

শিষ্য—সাধারণ লোক ঐ সকলের ভাব না বুঝে ঐতে মত্ত হয়ে যায় আর ঐ উৎসব আমোদ থেমে গেলেই আবার যা, তাই হয়। সেজন্য ওগুলিকে ধর্ম্মের বহিরাবরণ বলে বোধ হয়। ওতে প্রকৃত ধর্ম্ম ও আত্মজ্ঞানকে ঢেকে রেখে দেয় বলে মনে হয়।

স্বামীজি—বটে, কিন্তু যারা 'ধর্ম্ম' কি, 'আত্মা' কি, এসব কিছুমাত্র বুঝ্‌তে পারে না—তারা ঐ উৎসব আমোদের মধ্য দিয়ে ক্রমে ধর্ম্ম বুঝ্‌তে চেষ্টা করে। মনে কর্, এই যে আজ ঠাকুরের জন্মোৎসব হয়ে গেল, এর মধ্যে এমন লোকও এসেছে, যারা ঠাকুরের বিষয় একবারও ভাব্‌বে। যাঁর নামে এত লোক একত্রিত হয়েছিল, তিনি কে, তাঁর নামেই বা এত লোক আসিল কেন—একথা কি কারু মনে উদয় হবে না? যাদের তা'ও না হবে,তারাও এই কীর্ত্তন দেখ্‌তে, এই প্রসাদ পেতে অন্ততঃ বছরে একবার আসবে আর ঠাকুরের ভক্তদের দেখে যাবে। তাতে তাদের উপকার বই অপকার ত হবে না?

শিষ্য—কিন্তু ঐ উৎসব কীর্ত্তনই যদি সার বলিয়া কেহ বুঝিয়া লয়, তবে সে আর অধিক অগ্রসর হতে পারে কি? যেমন আমাদের দেশের ষষ্ঠী পূজা, মঙ্গলচণ্ডীর পূজা, শালগ্রাম পূজা প্রভৃতি নিত্য নৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, ইহাও সেইরূপ একটা হয়ে দাঁড়াবে। মরণ পর্য্যন্ত লোকে ঐ সকল করে যাচ্ছে—কিন্তু কই? এমন লোক ত দেখ্‌লুম না, যে ঐ থেকে ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে উঠলো।

স্বামীজি—কেন? এই যে ভারতে এত ধর্ম্মবীর জন্মেছিলেন—তাঁরা ত সকলে ঐগুলিকে ধরে উঠেছেন, অত বড় হয়েছেন? তবে ঐগুলিকে ধরে সাধন করতে করতে যখন আত্মার দর্শন লাভ হয়, তখন আর ঐ সকলে আঁট থাকে না। তবু লোকসংস্থিতির জন্য অবতারকল্প মহাপুরুষেরাও ঐগুলি মেনে চলেন।

শিষ্য—লোকদেখানো মান্‌তে পারেন। কিন্তু আত্মজ্ঞের কাছে যখন এ সংসারই ইন্দ্রজালবৎ অলীক বোধ হয়, তখন তাঁদের কি আবার ঐ সকল বাহ্যিক লোকব্যবহারকে যথার্থ সত্য বলে মনে হতে পারে?

স্বামীজি—ওরে, সকল ব্যবহারেরই প্রয়োজন আছে, অধিকারী ভেদে। ঠাকুর যেমন বল্‌তেন, মা কোন ছেলেকে পোলাও কালিয়ে রেঁধে দেন; কোন ছেলেকে বা সাগু পথ্য দেন—সেরূপ।

শিষ্য কথাটী এতক্ষণে বুঝিয়া স্থির হইল। দেখিতে দেখিতে গাড়ী আলমবাজার মঠে উপস্থিত। শিষ্য গাড়ীভাড়া দিয়া স্বামীজির সঙ্গে মঠের ভিতরে চলিল এবং স্বামীজির পিপাসা পাওয়ায় জল আনিয়া দিল স্বামীজি জল পান করিয়া জামা খুলিয়া ফেলিলেন এবং মেজেতে পাতা সতরঞ্চির উপর অর্দ্ধ-শায়িত অবস্থায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। স্বামী নিরঞ্জনানন্দ পার্শ্বে বসিয়া বলিতে লাগিলেন—"এমন ভিড় উৎসবে আর কখন হয়নি। যেন ক'ল্‌কাতাটা ভেঙ্গে এসেছিল।"

স্বামীজি—তা হবে না? এর পর আরো কত কি হবে।

শিষ্য—মশায়, প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়েই দেখা যায়—কোন না কোন বাহ্যিক উৎসব আমোদ আছেই। কিন্তু কারো সঙ্গে কারো মিল নাই। এমন যে উদার মহম্মদের ধর্ম্ম, তার মধ্যেও দেখেছি, ঢাকা সহরে সিয়াসুন্নিতে লাঠালাঠি হয়।

স্বামীজি—সম্প্রদায় হলেই ওটা অল্লাধিক হবেই। তবে এখান্‌কার ভাব কি জানিস্? এরা সম্প্রদায় বিহীন। আমাদের ঠাকুর ঐটেই দেখাতে জন্মেছিলেন। তিনি সব মান্‌তেন—আবার কিছুই মান্‌তেন না।

শিষ্য—মশায়, আপনার এ dilemmaর মানে কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি না। আপনারাও ত এইরূপে উৎসব প্রচারাদি করে ঠাকুরের নামে আর একটা সম্প্রদায়ের সূত্রপাত কচ্ছেন। (শিষ্য তখনও স্বামীজির কাছে দীক্ষিত হয়নি)। আমি নাগ মশায়ের মুখে শুনেছি, ঠাকুর কোন দলভুক্ত ছিলেন না। শাক্ত, বৈষ্ণব, ব্রহ্মজ্ঞানী, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলের সকল ধর্ম্মকেই তিনি নাকি বহু মান দিতেন।

স্বামীজি—তুই কি করে জান্‌লি, আমরা দিই না।

এই বলিয়া স্বামীজি নিরঞ্জন মহারাজকে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌ছেন—"ওরে, এ বাঙ্গাল বলে কি?"

শিষ্য—মশায়, যাই বলি, আমায় বুঝিয়ে দিতে হবে ; নৈলে ছাড়্ছিনি।

স্বামীজি—তুই ত আমার বক্তৃতা পড়েছিস্। কৈ, কোথায় ঠাকুরের নাম করেছি? খাঁটি উপনিষদের ধর্ম্মই ত জগতে বলে বেড়িয়েছি।

শিষ্য—তা বটে। কিন্তু private lifeএ দেখি, আপনার রামকৃষ্ণগত প্রাণ। এর মানে কি? যদি ঠাকুরকে ভগবান্ বলেই জেনে থাকেন, তবে কেন রামবাবুর মত হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিন না।

স্বামীজি—রামবাবু যা বুঝেছেন, তাই বল্‌ছেন। আমি যা বুঝেছি, তা বল্‌ছি। তুইও যদি বেদান্তের ধর্ম্ম ঠিক বুঝে থাকিস্, তা হ'লে লোককে তা বুঝিয়ে দে না কেন?

শিষ্য—আমি আগে অনুভব করব, তবে ত বুঝাব। শুধু পড়েছি মাত্র।

স্বামীজি—তবে আগে অনুভূতি কর্। তার পরে লোককে বুঝিয়ে দিবি। এখন, লোকে প্রত্যেকে যে এক একটা বিশ্বাস ধরে চলে যাচ্ছে—তাতে তোর তো বল্‌বার কিছু নাই। কারণ, তুইও ত এখন তাদের মত একটা বিষয়ে বিশ্বাস করে চলেছিস্ বই ত নয়।

শিষ্য—হাঁ—আমিও একটা বিষয় বিশ্বাস ক'রে চলেছি বটে; কিন্তু আমার প্রমাণ—শাস্ত্র। আমি শাস্ত্রের বিরোধী মত মানি না।

স্বামীজি—শাস্ত্র মানে কি? উপনিষদ্ প্রমাণ হলে, বাইবেল্ জেন্দা-বস্তাই বা প্রমাণ হবে না কেন?

শিষ্য—তা হোক্। কিন্তু বেদের মত প্রাচীন গ্রন্থ ত আর নাই। আত্ম-তত্ত্ব-সমাধান বেদে যেমন, এমন আর ত কোথাও নাই।

স্বামীজি—বেশ, তোর কথা নয় মেনেই নিলুম। কিন্তু বেদ ভিন্ন আর কোথাও যে সত্য নাই, এ কথা বল্‌বার তোর কি অধিকার?

শিষ্য—তা হতে পারে। কিন্তু আমি উপনিষদের মতই মেনে যাব। আমার এতে খুব বিশ্বাস।

স্বামীজি—তবে আর কারো যদি ঐরূপ কোন মতে 'খুব' বিশ্বাস হয়, তবে তাকেও ঐ বিশ্বাসে চলে যেতে দিস্। দেখ্‌বি—পরে তুই ও আর সকলে এক যায়গায় পঁহুছিবি। মহিম্ন-স্তবে পড়িস্ নি?—

"ত্রয়ী সাংখ্যম্ যোগম্ * * ত্বমসিপয়সামর্ণবমিব।"

'নমো রামকৃষ্ণায়'

সপ্তসপ্ততিতম জন্মোৎসব।

আবার আসিল, জগৎ হাসিল,
আনন্দে ভাসিল প্রকৃতি-রাণী!
জয় রামকৃষ্ণ, জয় সমন্বয়,
চারিদিকে আজি উঠিল বাণী!
ভক্তজন কয়, ভক্তিমাত্র সার,
নাই অন্য পথ জগতে আর।
কর্ম্মী ক'ন কর্ম্ম, এক কর্ণধার,
এ ভবসমুদ্র করিতে পার॥
জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রচারে জ্ঞানীরা,
জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নাহিক হয়।
গোলকধাঁধায় পড়িয়া মানব
ইতস্ততঃ ঘুরে পথ না পায়!
এদিকে আবার নাস্তিকের দল,
ধরমের নামে শিহরি উঠে!
বিজ্ঞানবাদীরা রহস্য প্রকাশে,
ফলে কিন্তু জড়-মাহাত্ম্য রটে!
জিন, অমিতাভ, খৃষ্ট, মহম্মদ,
জগৎ মজিল যাদের প্রেমে,
রাম, কৃষ্ণ আদি শঙ্কর, নিমাই
রাখে নিজ কীর্ত্তি আপন নামে!
সকলে ডাকিল, সকলে মোহিল,
উদ্ধারিল কোটী মানব কুল!
হাত ধরি নরে, তুলিয়া সাদরে,
নিজ পথে ল'য়ে ভাঙ্গিল ভুল!

কিন্তু কোথা হ'তে এল আচম্বিতে
সাম্প্রদায়িকতা ভেদের জ্ঞান!
ধর্ম্ম কর্ম্ম সব দিয়া জলাঞ্জলি,
পরস্পরে নর হানিছে বাণ!
তাই ধর্ম্ম-গ্লানি, অধর্ম্ম প্রবল,
হাহাকার রব জগৎ-মাঝে!
ভেদিয়া অম্বর গেল সেই ধ্বনি
মহাবিশ্বপতি যথায় রাজে!
করুণাসাগরে উঠিল তরঙ্গ,
উঠে তথা হ'তে নূতন মূর্ত্তি!
মহিমা-ছটায় জগৎ মাতায়,
প্রেম-ঘন-কায়, মহান্ স্ফুর্ত্তি!
নহে গো নূতন, নহে পুরাতন,
পাইল মানব অপূর্ব্ব পথ!
ধর্ম্ম-সমন্বয়, ভাব বিপর্য্যয়,
পুরাতন মাঝে নূতন মত!
সকলি ত ছিল, ছিল না কেবল
ধর্ম্ম-মহাসভা মিলন গান!
দূরে পলাইল গোঁড়ামি অসার,
পাইল মানব নূতন প্রাণ!
তাই লোকময় লোকগুরু জয়,
সমস্বরে দেয় জগৎবাসী!
সমন্বয় গানে মত্ত ত্রিভুবন,
কে আছ কোথায় দেখ গো আসি!

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত।

ভক্তিরহস্য।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।　　　স্বামী বিবেকানন্দ।

তৃতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মাচার্য্য—সিদ্ধ গুরু ও অবতারগণ।

সকল আত্মাই বিধাতার অলঙ্ঘনীয় নিয়মে পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইবে—চরমে সকল প্রাণীই সেই পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। আমরা অতীতকালে যেরূপভাবে জীবন যাপন করিয়াছি অথবা যেরূপ চিন্তা করিয়াছি, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা তাহার ফলস্বরূপ আর এক্ষণে যেরূপ কার্য্য বা চিন্তা করিতেছি, তদনুসারে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইবে। এই কঠোর কর্ম্মবাদ সত্য হইলেও ইহার এই মর্ম্ম নহে যে, আত্মোন্নতিসাধনে সদাতিরিক্ত অপর কাহারও সাহায্য লইতে হইবে না। আত্মার মধ্যে যে শক্তি অব্যক্তভাবে রহিয়াছে, সকল সময়েই অপর আত্মার শক্তিসঞ্চারেই তাহা জাগ্রৎ হইয়া থাকে। এ কথা এতদুর সত্য যে, অধিকাংশক্ষেত্রে এরূপ অপরের সহায়তা না লইলে চলিতে পারে না বলিলেই হয়। বাহির হইতে শক্তি আসিয়া আমাদের আত্মাভ্যন্তরস্থ গূঢ়ভাবে অবস্থিত শক্তির উপর কার্য্য করিতে থাকে। তখনই আত্মোন্নতির সূত্রপাত হয়, মানবের ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়, চরমে মানব পরমশুদ্ধ ও পূর্ণ হইয়া যায়।

কর্ম্মবাদ সত্য হইলেও গুরুকরণ অত্যাবশ্যক।

বাহির হইতে যে শক্তি আসার কথা বলা হইল, উহা গ্রন্থ হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এক আত্মা অপর আত্মা হইতেই শক্তি প্রাপ্ত হইতে পারে, অপর কাহা হইতে নহে। আমরা সারা জীবন বই পড়িতে পারি, আমরা খুব বুদ্ধিজীবী হইয়া উঠিতে পারি, কিন্তু পরিণামে দেখিব, আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুমাত্র হয় নাই। বুদ্ধির খুব উচ্চবিকাশ হইলেও যে সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী আধ্যাত্মিক উন্নতিও হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই। বরং আমরা প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, বুদ্ধির যতটা উন্নতি হইয়াছে, আত্মার সেই পরিমাণ অবনতি ঘটিয়াছে। বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে গ্রন্থ হইতে অনেক সাহায্য পাওয়া

গ্রন্থ হইতে আধ্যাত্মিক শক্তিলাভ অসম্ভব।

যায় বটে. কিন্তু আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে গেলে গ্রন্থ হইতে কিছুই সাহায্য পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন কখন আমরা ভ্রমবশতঃ মনে করি, আমরা উহা হইতে আধ্যাত্মিক সহায়তা পাইতেছি, কিন্তু যদি বিশেষরূপে আমাদের অন্তর বিশ্লেষণ করিয়া দেখি, তবে বুঝিব, উহাতে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতির কিঞ্চিৎ সহায়তা হইয়াছে মাত্র, আত্মোন্নতির সহায়তা কিছুমাত্র হয় নাই। আমরা প্রায় সকলেই যে ধর্ম্মসম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারি, অথচ ধর্ম্মানুযায়ী জীবন যাপনের সময় আপনাদিগকে ঘোরতর অসমর্থ দেখিতে পাই, ইহাই তাহার কারণ। সেই কারণ এই যে, বাহির হইতে যে শক্তি সঞ্চারিত হইয়া আমাদিগকে ধর্ম্মজীবন যাপনে সমর্থ করে, শাস্ত্র হইতে তাহা পাওয়া যায় না। আত্মাকে জাগ্রৎ করিতে হইলে অপর আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হওয়া অবশ্যই আবশ্যক।

যে আত্মা হইতে শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে গুরু এবং যাঁহাতে সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে শিষ্য বলে। এই শক্তি সঞ্চার করিতে হইলে প্রথমতঃ যাঁহা হইতে শক্তি আসিবে, তাঁহার সঞ্চারের শক্তি থাকা আবশ্যক, দ্বিতীয়তঃ, যাঁহাতে সঞ্চারিত হইবে, তাঁহার উহা গ্রহণের শক্তি থাকা আবশ্যক। বীজ সজীব হওয়া আবশ্যক. ক্ষেত্রও সুকৃষ্ট হওয়া চাই. আর যথায় এই দুইটীই বর্ত্তমান. তথায়ই ধর্ম্মের অত্যদ্ভুত বিকাশ হইয়া থাকে। 'আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোঽস্যলব্ধা'—ধর্ম্মের বক্তাও অলৌকিক গুণসম্পন্ন হওয়া চাই, আর শ্রোতারও তদ্রূপ হওয়া প্রয়োজন। আর যখন প্রকৃতপক্ষে উভয়েই অলৌকিক গুণসম্পন্ন—অসাধারণ প্রকৃতি—হয়, তখনই অত্যদ্ভুত আধ্যাত্মিক বিকাশ দেখা যাইবে—নতুবা নহে। এইরূপ লোকই যথার্থ গুরু আর এইরূপ লোকই যথার্থ শিষ্য—অপরে ধর্ম্ম লইয়া ছেলেখেলা করিতেছে মাত্র। তাহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধে একটু জানিবার চেষ্টা, একটু সামান্য কৌতুহল হইয়াছে মাত্র; কিন্তু তাহারা এখনও ধর্ম্মের গণ্ডীর বহিঃসীমায় দাঁড়াইয়া আছে। অবশ্য ইহারও কিছু মূল্য আছে। সময়ে সবই হইয়া থাকে। কালে এই সকল ব্যক্তির হৃদয়েই যথার্থ ধর্ম্ম-পিপাসা জাগ্রৎ হইতে পারে আর প্রকৃতির ইহা অতি রহস্যময় নিয়ম যে, ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলেই বীজ আসিবেই আসিবে, জীবাত্মার যখনই ধর্ম্মের প্রয়োজন হইবে, তখনই ধর্ম্মশক্তিসঞ্চারক অবশ্যই আসিবেন। কথায় বলে,

গুরু ও শিষ্য।

"যে পাপী পরিত্রাতাকে খুঁজিতেছে, পরিত্রাতাও খুঁজিয়া গিয়া সেই পাপীকে উদ্ধার করেন।" গ্রহীতার আত্মায় ধর্ম্ম আকর্ষণীশক্তি যখন পূর্ণ ও পরিপক্ক হয়, তখন উহা যে শক্তিকে খুঁজিতেছে, তাহা অবশ্য আসিবে।

তবে পথে কতকগুলি বিঘ্ন আছে। গ্রহীতার সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসকে যথার্থ ধর্ম্মপিপাসা বলিয়া ভ্রম হইবার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। আমরা অনেক সময় আমাদের জীবনে ইহা দেখিতে পাই। আমরা কোন ব্যক্তিকে ভাল বাসিতাম—সে মরিয়া গেল—আমরা মুহূর্ত্তের জন্য আঘাত পাইলাম। আমরা মনে করিলাম—সমুদয় জগৎটা জলের মত আমাদের আঙ্গুল গলিয়া পলাইতেছে। তখন আমরা ভাবি—এই অনিত্য সংসার লইয়া আর কি হইবে, সংসার হইতে শ্রেষ্ঠ সারবস্তুর অনুসন্ধান করিতে হইবে—ধার্ম্মিক হইতে হইবে। কিছুদিন বাদে আমাদের মন হইতে সেই ভাবতরঙ্গ চলিয়া গেল—আমরা যেখানে ছিলাম, সেখানেই পড়িয়া রহিলাম। আমরা অনেক সময় এইরূপ সাময়িক ভাবোচ্ছ্বাসকে যথার্থ ধর্ম্মপিপাসা বলিয়া ভ্রমে পতিত হই, কিন্তু যতদিন আমরা এইরূপ ভুল করিব, ততদিন সেই অহরহব্যাপী, প্রকৃত প্রয়োজন বোধ আসিবে না—আর আমরা শক্তিসঞ্চারকেরও সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিব না।

শিষ্য যেন ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাসকে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসা বলিয়া ভ্রম না করেন।

অতএব যখন আমরা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলি যে, আমরা সত্যলাভের জন্য এত ব্যাকুল অথচ উহা লাভ হইতেছে না—তখন ঐরূপ বিরক্তিপ্রকাশের পরিবর্ত্তে আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হওয়া উচিত—নিজ নিজ অন্তরাত্মায় অনুসন্ধান করিয়া দেখা—আমরা যথার্থই ধর্ম্ম চাই কি না। তবে অধিকাংশস্থলেই দেখিব—আমরাই ধর্ম্মলাভের উপযুক্ত নহি—আমাদের ধর্ম্মের এখনও প্রয়োজন হয় নাই; অধ্যাত্মতত্ত্ব লাভের জন্য এখনও পিপাসা জাগে নাই। শক্তিসঞ্চারকের সম্বন্ধে আরও অধিক গোল।

অনেকে আছে, তাহারা যদিও স্বয়ং অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন, তথাপি অহঙ্কারবশতঃ আপনাদিগকে সবজান্তা মনে করে—আর শুধু তাহাই মনে করিয়া ক্ষান্ত হয় না, তাহারা অপরকে ঘাড়ে করিয়া লইয়া যাইতে চায়। এইরূপে অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় উভয়েই খানায় পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া থাকে। জগৎ এইরূপ জনগণে পূর্ণ। সকলেই গুরু হইতে চায়। এ

জ্ঞানাভিমানী অথচ অজ্ঞ গুরুগণ হইতে সাবধান।

যেন ভিখারীর লক্ষ মুদ্রা দানের প্রস্তাবের ন্যায়। যেমন এই ভিক্ষুকেরা হাস্যাস্পদ হয়, এই গুরুরাও তদ্রূপ।

প্রকৃত গুরুকে আপনিই চেনা যায়।

তবে গুরুকে চিনিব কিরূপে? প্রথমতঃ, সূর্য্যকে দেখিবার জন্য মশালের বা বাতির প্রয়োজন হয় না। সূর্য্য উঠিলেই আমরা স্বভাবতঃই জানিতে পারি যে, উহা উঠিয়াছে আর যখন আমাদের কল্যাণার্থে কোন লোকগুরুর অভ্যুদয় হয়, তখন আত্মা স্বভাবতঃই জানিতে পারে যে, সে সত্যবস্তুর সাক্ষাৎকার পাইয়াছে। সত্য স্বতঃসিদ্ধ—উহার সত্যতা সিদ্ধ করিবার জন্য অন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক করে না—উহা স্বপ্রকাশ। উহা আমাদের প্রকৃতির অন্তরতম দেশে পর্য্যন্ত প্রবেশ করে আর সমগ্র প্রকৃতি সমগ্র জগৎ—উহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উহাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকে।

সাধারণতঃ কিন্তু গুরুশিষ্যের কতকগুলি পরীক্ষা আবশ্যক।

অবশ্য এ কথাগুলি অতি শ্রেষ্ঠতম আচার্য্যগণের সম্বন্ধেই প্রযুজ্য, কিন্তু আমরা অপেক্ষাকৃত নীচু থাকের আচার্য্যগণের নিকটও সাহায্য পাইতে পারি। আর যেহেতু আমরাও সকল সময়ে এতাদৃশ অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন নহি যে, আমরা যাঁহার নিকট হইতে শক্তিলাভের জন্য যাইতেছি, তাঁহার সম্বন্ধে ঠিক ঠিক বিচার করিতে পারিব—সেই হেতু কতকগুলি পরীক্ষা থাকা দরকার। শিষ্যেরও কতকগুলি গুণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক গুরুরও তদ্রূপ।

শিষ্যের লক্ষণ।

শিষ্যের নিম্নলিখিত গুণগুলি থাকা আবশ্যক—পবিত্রতা, যথার্থ জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যবসায়। অপবিত্র ব্যক্তি কখন ধার্ম্মিক হইতে পারে না। ইহাই শিষ্যের পক্ষে একটী প্রধান আবশ্যকীয় গুণ। সর্ব্বপ্রকারে পবিত্রতা একান্ত আবশ্যক। দ্বিতীয় প্রয়োজন—যথার্থ জ্ঞানপিপাসা। জিজ্ঞাসা করি, ধর্ম্ম চায় কে। সনাতন বিধানই এই যে, আমরা যাহা চাহিব, তাহাই পাইব। যে চায়—সে পাইবে। ধর্ম্মের জন্য যথার্থ ব্যাকুলতা বড় কঠিন জিনিষ—আমরা সাধারণতঃ উহাকে যত সহজ মনে করি, উহা তত সহজ নহে। তারপর আমরা ত সর্ব্বদাই ভুলিয়া যাই যে, ধর্ম্মের কথা শুনিলেই বা ধর্ম্মগ্রন্থ পড়িলেই ধর্ম্ম হয় না—যতদিন না সম্পূর্ণ জয়লাভ হইতেছে, ততদিন অবিশ্রান্ত চেষ্টা, নিজ প্রকৃতির সহিত অবিরাম সংগ্রামই ধর্ম্ম। এ দুএক দিনের বা কয়েক বৎসর বা কয়েক জন্মেরও কথা নয়—হইতে পারে প্রকৃত ধর্ম্মলাভ করিতে শত শত জন্ম লাগিবে।

ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইবে। এই মুহূর্ত্তেই উহা আমাদের লাভ হইতে পারে অথবা শত শত জন্মেও লাভ না হইতে পারে—তথাপি আমাদিগকে উহার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। যে শিষ্য এইরূপ হৃদয়ের ভাব লইয়া ধর্ম্মসাধনে অগ্রসর হয়, সেই কৃতকার্য্য হইয়া থাকে।

গুরুর সম্বন্ধে আমাদিগকে প্রথমে দেখিতে হইবে, যেন তিনি শাস্ত্রের মর্ম্মাভিজ্ঞ হন। সমগ্র জগৎ বেদ, বাইবেল, কোরাণ ও অন্যান্য শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া থাকে—কিন্তু ওগুলি ত কেবল শব্দমাত্র—ধর্ম্মের শুক্‌নো হাড় কয়েকখানা মাত্র—লট লোট লঙ কৃৎ তদ্ধিত ডুকৃঞ্‌ করণে। গুরু হয়ত কোন গ্রন্থবিশেষের সময় নিরূপণে সমর্থ হইতে পারেন, কিন্তু শব্দ ত ভাবের বাহ্য আকৃতি বই আর কিছুই নহে। যাহারা শব্দ লইয়া বেশী নাড়াচাড়া করে এবং মনকে সর্ব্বদা শব্দের শক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হইতে দেয়, তাহারা ভাব হারাইয়া ফেলে। অতএব গুরুর পক্ষে শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। শব্দজাল মহা অরণ্যস্বরূপ—চিত্তভ্রমণের কারণ—মন ঐ শব্দজালের মধ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া বাহিরে যাইবার পথ দেখিতে পায় না।* বিভিন্ন প্রকারে শব্দযোজনার কৌশল, সুন্দর ভাষা কহিবার বিভিন্ন উপায়, শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিবার নানা উপায়, কেবল পণ্ডিতদের ভোগের জন্য—তাহাতে কখন মুক্তিলাভ হয় না।† তাহারা কেবল নিজেদের পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য উৎসুক—যাহাতে জগৎ তাহাদিগকে খুব পণ্ডিত বলিয়া প্রশংসা করে। আপনারা দেখিবেন, জগতের কোন শ্রেষ্ঠ আচার্য্যই এইরূপ শাস্ত্রের শ্লোকের বিবিধ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন নাই। তাঁহারা শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিবার চেষ্টা করেন নাই—তাঁহারা বলেন নাই, এই শব্দের এই অর্থ আর এই শব্দে আর ঐ শব্দে এইরূপ সম্বন্ধ ইত্যাদি। আপনারা জগতের সমুদয় শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণেরই চরিত্র পাঠ করিয়াছেন। দেখিয়াছেন ত—তাঁহাদের মধ্যে কেহই ঐরূপ করেন নাই। তথাপি তাঁহারাই যথার্থ শিক্ষা দিয়াছেন। আর যাঁহাদের কিছুই শিখাইবার নাই, তাঁহারা একটী শব্দ লইয়া সেই শব্দের কোথা হইতে উৎপত্তি, কোন্

গুরুর লক্ষণ।

গুরু যেন শাস্ত্রের শব্দমাত্রবিৎ না হইয়া মর্ম্মাভিজ্ঞ হন।

* শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণং। —বিবেকচূড়ামণি

† বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলং।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥

ব্যক্তি উহা প্রথম ব্যবহার করে, সে কি খাইত, কিরূপে ঘুমাইত, এই সম্বন্ধে এক তিন-খণ্ড গ্রন্থ লিখিলেন। মদীয় আচার্য্যদেব এক গল্প বলিতেন— "এক বাগানে দুজন লোক বেড়াতে গিছ্‌লো ; তার ভিতর যার বিষয়বুদ্ধি বেশী, সে বাগানে ঢুকেই কটা আঁব গাছ, কোন্ গাছে কত আঁব হয়েছে, এক একটা ডালে কত পাতা, বাগানটীর কত দাম হোতে পারে, ইত্যাদি নানা-রকম বিচার কর্ত্তে লাগ্‌লো। আর এক জন বাগানের মালিকের সঙ্গে আলাপ কোরে গাছতলায় বোসে একটী কোরে আঁব পাড়্‌তে লাগলো আর খেতে লাগ্‌লো। বল দেখি, কে বুদ্ধিমান্? আঁব খাও, পেট ভর্‌বে ; কেবল পাতা গুণে হিসাব কিতাব কোরে লাভ কি?" অবশ্য হিসাব কিতা-বেরও ক্ষেত্রবিশেষে উপযোগিতা আছে বটে, কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যে নহে। ঐরূপ কার্য্যের দ্বারা ঐ সকল ব্যক্তি কখন ধার্ম্মিক হইতে পারে না— এই সব 'পাতাগোণা' দলের ভিতর কি আপনারা কখন ধর্ম্মবীর দেখিয়াছেন? ধর্ম্মই মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য, উহাই মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চ গৌরব ; কিন্তু উহা আবার সর্ব্বাপেক্ষা সহজ—উহাতে পাতাগোণা হিসাব কিতাব করা প্রভৃতিরূপ মাথাবকানোর কোন প্রয়োজন হয় না। যদি আপনি খ্রীষ্টান হইতে চান, তবে কোথায় খ্রীষ্টের জন্ম হয়,—বেথলিহেমে বা জেরুজালেমে—তিনি কি করিতেন, অথবা ঠিক কোন্ তারিখে 'শৈলোপদেশ' (Sermon on the Mount) দিয়াছিলেন, তাহা জানিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি যদি কেবল ঐ উপদেশ প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, তবেই যথেষ্ট। কখন্ ঐ উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে ২০০০ কথা পড়িবার আপনার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। এ সব পণ্ডিতদের আমোদের জন্য— তাঁহারা উহা লইয়া আনন্দ করুন। তাঁহাদের কথায় শান্তিঃ শান্তিঃ বলিয়া আমরা আঁব খাই আসুন।

দ্বিতীয়তঃ, গুরুর সম্পূর্ণ নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। ইংলণ্ডে জনৈক বন্ধু একবার আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, "গুরুর ব্যক্তিগত চরিত্র—তিনি কি করেন না করেন, দেখিবার প্রয়োজন কি? তিনি যাহা বলেন, সেইটী লইয়া কার্য্য করিলেই হইল।" এ কথা ঠিক নয়। যদি কোন ব্যক্তি আমাকে গতিবিজ্ঞান রসায়ন বা অন্য কোন জড়বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছু শিখা-ইতে ইচ্ছা করে, সে যে চরিত্রের লোক হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই—সে অনায়াসে উহা শিক্ষা দিতে পারে।' ইহা সম্পূর্ণ সত্য—কারণ, জড়বিজ্ঞান শিখাইতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন, তাহা কেবল

দ্বিতীয়তঃ—গুরু যেন পূতচরিত্র হন।

বুদ্ধিবৃত্তিসম্বন্ধীয় বলিয়া বুদ্ধিবৃত্তির তেজের উপর নির্ভর করে—এরূপ ক্ষেত্রে আত্মার বিকাশ কিছুমাত্র না থাকিলেও সে একজন প্রকাণ্ড বুদ্ধিজীবী হইতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মবিজ্ঞানের কথা স্বতন্ত্র—যে ব্যক্তি অশুদ্ধচিত্ত, সেই আত্মায় যে কোনরূপ ধর্ম্মালোক প্রতিভাত হইতে পারে, তাহা অসম্ভব। তাঁহার নিজেরই যদি কোনরূপ ধর্ম্মভাব না রহিল, তবে তিনি কি শিক্ষা দিবেন? তিনি ত নিজেই কিছু জানেন না। চিত্তের পরম শুদ্ধিই একমাত্র আধ্যাত্মিক সত্য। "পবিত্রাত্মারা ধন্য—কারণ, তাহারা ঈশ্বরকে দেখিবে।" এই এক বাক্যের মধ্যেই ধর্ম্মের সমুদয় সার তত্ত্ব নিহিত। যদি আপনি এই একটী কথা শিখিয়া থাকেন, তবে অতীতকালে ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা কিছু উক্ত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা কিছু হইবার সম্ভাবনা, তাহা আপনি জানিয়াছেন। আপনার আর কিছু দেখিবার প্রয়োজন নাই—কারণ, আপনার যাহা কিছু প্রয়োজন, ঐ এক বাক্যের মধ্যে সমুদয় নিহিত রহিয়াছে। সমুদয় শাস্ত্র নষ্ট হইয়া গেলেও ঐ একমাত্র বাক্যই সমগ্র জগৎকে উদ্ধার করিতে সমর্থ। যতক্ষণ না জীবাত্মা শুদ্ধস্বভাব হইতেছেন, ততক্ষণ ঈশ্বরদর্শন বা সেই সর্ব্বাতীত তত্ত্বের চকিত দর্শনও অসম্ভব। অতএব ধর্ম্মাচার্য্যের পক্ষে শুদ্ধচিত্ততারূপ গুণ অবশ্যই আবশ্যক। প্রথমে আমাদিগকে দেখিতে হইবে—তিনি কি, তারপর তিনি কি বলেন, তাহা শুনিতে হইবে। লৌকিক বিদ্যার আচার্য্যগণের সম্বন্ধে অবশ্য ওকথা খাটে না। তাঁহারা কি চরিত্রের লোক, ইহা জানা অপেক্ষা তাঁহারা কি বলেন, এইটী জানা আমাদের অগ্রে প্রয়োজন। ধর্ম্মাচার্য্যের পক্ষে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমেই তিনি কিরূপ চরিত্রের লোক দেখিতে হইবে—তবেই তাঁহার কথার একটা মূল্য হইবে—কারণ, তিনি শক্তিসঞ্চারক। যদি তাঁহার মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি না থাকে, তবে তিনি কি সঞ্চার করিবেন? একটী উপমা দেওয়া যাইতেছে। যদি এই অগ্ন্যাধারে অগ্নি থাকে, তবেই উহা অপর পদার্থে তাপ সঞ্চারিত করিতে পারে, নতুবা নহে। ইহা একজন হইতে আর একজনে সঞ্চারের কথা কেবল আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে উত্তেজিত করা নহে। গুরুর নিকট হইতে একটা প্রত্যক্ষ কিছু আসিয়া শিষ্যের মধ্যে প্রবেশ করে—উহা প্রথমে বীজস্বরূপে আসিয়া বৃহৎ বৃক্ষাকারে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অতএব গুরুর নিষ্পাপ ও অকপট হওয়া আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ, গুরুর উদ্দেশ্য কি দেখিতে হইবে। দেখিতে হইবে—তিনি

যেন নাম, যশ বা অন্য কোন উদ্দেশ্য লইয়া শিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত না হন। কেবল ভালবাসা—আপনার প্রতি অকপট ভালবাসাই—যেন তাঁহার কার্য্য-প্রবৃত্তির নিয়ামক হয়। যখন গুরু হইতে শিষ্যে যে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহা কেবল ভালবাসারূপ মধ্যবর্ত্তীর মধ্য দিয়াই সঞ্চারিত করা যাইতে পারে। অপর কোন মধ্যবর্ত্তী দ্বারা উহা সঞ্চার করা যাইতে পারে না। কোনরূপ লাভ বা নামযশের আকাঙ্ক্ষারূপ অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকিলে তৎক্ষণাৎ ঐ শক্তিসঞ্চারক মধ্যবর্ত্তী বস্তু বিনষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব ভালবাসার মধ্য দিয়াই সমুদয় করিতে হইবে। যিনি ঈশ্বরকে জানিয়াছেন, তিনিই গুরু হইতে পারেন।

তৃতীয়তঃ শিষ্যের কল্যাণাকাঙ্ক্ষাই যেন গুরুর কার্য্যের প্রবর্ত্তক হয়—নাম যশ বা অন্য কিছু নহে।

যখন দেখিবেন, আপনার গুরুর এই সমুদয় গুণগুলি আছে, তখন আপনার আর কোন চিন্তা নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলে তাঁহার নিকট শিক্ষা লওয়ায় বিপদাশঙ্কা আছে। যদি তিনি সদ্ভাব সঞ্চার করিতে না পারেন, সময়ে সময়ে অসদ্ভাব সঞ্চার করিতে পারেন। ইহাই বিশেষ বিপদাশঙ্কা। ইহা হইতে সাবধান হইতে হইবে। অতএব, স্বভাবতঃই ইহা বোধ হইতেছে যে, যেখানে সেখানে, যাহার তাহার নিকট হইতে শিক্ষা-লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। নদী ও প্রস্তরাদির উপদেশ শ্রবণ অলঙ্কার হিসাবে সুন্দর কথা হইতে পারে, কিন্তু নিজের ভিতরে সত্য না থাকিলে কেহ উহার এক কণাও প্রচার করিতে সমর্থ নহে। নদীর উপদেশ শুনিতে পায় কে? যে জীবাত্মা—যে জীবনপদ্ম পূর্ব্বেই প্রস্ফুটিত হইয়াছে—কিন্তু গুরুই ঐ পদ্ম প্রস্ফুটিত করিয়া দেন—তাহার নিকট হইতেই জীবাত্মা জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হন। হৃৎপদ্ম একবার প্রস্ফুটিত হইলে তখন নদী বা চন্দ্রসূর্য্য-তারকার নিকট শিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে—ইহাদের সকলের নিকট হইতেই কিছু না কিছু ধর্ম্মশিক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু যাহার হৃৎপদ্ম এখনও প্রস্ফুটিত হয় নাই, সে তাহাতে শুধু নদী প্রস্তর তারাদিই দেখিবে। একজন অন্ধব্যক্তি চিত্রশালিকায় যাইতে পারে, কিন্তু তাহার কেবল যাওয়া আসাই সার—অগ্রে তাহাকে চক্ষুষ্মান্ করিতে হইবে—তবেই সে ঐ স্থান হইতে কিছু শিক্ষা পাইবে। গুরুই আধ্যাত্মিক রাজ্যের নয়ন-উন্মীলনকর্ত্তা। অতএব গুরুর সহিত আমাদের সেই সম্বন্ধ, পূর্ব্বপুরুষ ও পরবংশীয়গণের মধ্যে

যথার্থ গুরুশিষ্য সম্বন্ধ না থাকিলে প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ অসম্ভব।

যে সম্বন্ধ। গুরুই ধর্ম্মরাজ্যের পূর্ব্বপুরুষ এবং শিষ্য তাঁহার আধ্যাত্মিক সন্তান-সন্ততিতুল্য। স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্র্য ও এতদ্বিধ কথাসমূহ মুখে বলিতে বেশ ভাল শুনায় বটে, কিন্তু নিজ অন্তরে দৃষ্টি করিলে প্রকৃতপক্ষে আমরা স্বাধীন কি না, বেশ বুঝিতে পারা যায়। নম্রতা, বিনয়, বশ্যতা, ভক্তি, বিশ্বাস ব্যতীত কোন প্রকার ধর্ম্ম হইতে পারে না, আর আপনারা এই ব্যাপারটী বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, যেখানে গুরুশিষ্যের মধ্যে এতদ্রূপ সম্বন্ধ এখনও বর্ত্তমান, তথায়ই কেবল বড় বড় ধর্ম্মবীর জন্মাইয়া থাকেন, কিন্তু যাহারা এইরূপ সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিয়াছে, তাহারা ধর্ম্মকে বক্তৃতারূপে মাত্র পরিণত করিয়াছে। গুরু তাঁহার পাঁচটী টাকার প্রত্যাশী, আর শিষ্যও গুরুর বাক্যাবলী দ্বারা মস্তিষ্করূপ পাত্র পূর্ণ করিয়া লইবার আশা করেন—তারপর উভয়েই উভয়ের পথ দেখেন। এই সমস্ত জাতি ও এই সমস্ত চার্চ্চের ভিতর, যেখানে গুরুশিষ্যের মধ্যে এতদ্রূপ সম্বন্ধ আর নাই, তথায় ধর্ম্মের 'ধ' নাই বলিলেই হয়। গুরুশিষ্যের ভিতর ঐরূপ সম্বন্ধ না থাকিলে তাহা আসিতেই পারে না। প্রথমতঃ, সঞ্চার করিবারও কেহ নাই, দ্বিতীয়তঃ এমন কেহ নাই, যাহার ভিতর উহা সঞ্চারিত হইবে—কারণ, সকলেই যে স্বাধীন! তাহারা আর শিখিবে কাহার নিকট হইতে? আর যদিই তাহারা শিখিতে আসে, তাহাদের মতলব এই যে, পয়সা দিয়া উহা কিনিবে। আমাকে এক টাকার ধর্ম্ম দাও! আমরা কি আর টাকা খরচ করিতে পারি না? কিন্তু উক্ত উপায়ে ধর্ম্মলাভ হইবার নহে।

গুরুলাভ এবং শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার উপদেশানুসরণেই সত্যতত্ত্বলাভ—গ্রন্থপাঠে নহে।

এই ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞান হইতে শ্রেষ্ঠতর ও পবিত্রতর আর কিছু নাই—উহা মানবাত্মায় আবির্ভূত হইয়া থাকে। মানব সম্পূর্ণ যোগী হইলেই ঐ জ্ঞান আপনা আপনি আসিয়া থাকে, কিন্তু গ্রন্থ হইতে উহা লাভ করা যায় না। যতদিন না গুরুলাভ করিতেছেন, ততদিন দুনিয়ার চার কোণে মাথামুণ্ড খুঁড়িয়া আসুন, অথবা হিমালয়, আল্পস বা ককেসস পর্ব্বত অথবা গোব বা সাহারা মরুভূমিতেই বিচরণ করুন বা সাগরের অতল তলেই প্রবেশ করুন, কিছুতেই এই জ্ঞান আসিবে না। গুরুলাভ করিয়া সন্তান যেমন পিতার সেবা করে, তদ্রূপ তাঁহার সেবা করুন, তাঁহার নিকট হৃদয় খুলিয়া দিন—তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া দর্শন করুন। ভগবান্ বলিয়াছেন, "আচার্য্যকে আমি অর্থাৎ ভগবান্ বলিয়া জানিও।" গুরু

আমাদের পক্ষে ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি—এই বলিয়া প্রথম তাঁহার প্রতি চিত্ত সংলগ্ন হয়।

তারপর তাঁহার ধ্যান যতই প্রগাঢ় হইতে প্রগাঢ়তর হয়, ততই গুরুর ছবি মিলাইয়া যায়, তাঁহার আকারটা আর দেখা যায় না, তৎস্থলে কেবল যথার্থ ঈশ্বরই বর্ত্তমান থাকেন। যাহারা এইরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা ভালবাসার ভাব লইয়া সত্যানুসন্ধানে অগ্রসর হয়, তাহাদের নিকট সত্যের ভগবান্ অতি অদ্ভুত তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করেন। বাইবেলে এক স্থানে আছে "জুতা খুলিয়া ফেল, কারণ, যেখানে তুমি দাঁড়াইয়া আছ, তাহা পবিত্র ভূমি।" যেখানেই তাঁহার নাম উচ্চারিত হয়, সেই স্থানই পবিত্র। যিনি তাঁহার নাম উচ্চারণ করেন, তিনি কতদূর পবিত্র ভাবুন দেখি। আর যে ব্যক্তির নিকট হইতে আধ্যাত্মিক সত্যসমূহ লাভ হয়, কতদূর ভক্তির সহিত তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হওয়া উচিত! এই ভাব লইয়া আমাদিগকে গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে। এই জগতে এরূপ গুরু যে সংখ্যায় অতি বিরল, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু জগৎ কোনকালে সম্পূর্ণরূপে এরূপ গুরুশূন্য হয় না। যে মুহূর্ত্তে ইহা সম্পূর্ণরূপে এইরূপ গুরুবিরহিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই ইহা ঘোরতর নরককুণ্ডে পরিণত হইবে, ইহা নষ্ট হইয়া যাইবে। এই গুরুগণই মানবজীবনরূপ বৃক্ষের সুচারু পুষ্পস্বরূপ—তাঁহারা আছেন বলিয়াই জগতের কার্য্য চলিতেছে। এইরূপ জীবন হইতে যে শক্তি প্রসূত হয়, তাহাতেই সমাজবন্ধনকে অব্যাহত রাখিয়াছে।

ইঁহারা ব্যতীত আর এক প্রকার গুরু আছেন—সমগ্র জগতের খ্রীষ্টতুল্য ব্যক্তিগণ। তাঁহারা সকল গুরুর গুরু—স্বয়ং ঈশ্বরের মানবরূপে প্রকাশ।

অবতার।

তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত গুরুগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর। তাঁহারা স্পর্শ দ্বারা, এমন কি, শুধু ইচ্ছামাত্র দ্বারা অপরের ভিতর ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত করিতে পারেন। তাঁহাদের শক্তিতে অতি হীনতম, অধম চরিত্র ব্যক্তিগণ পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের মধ্যে সাধুরূপে পরিণত হয়। তাঁহারা কিরূপে ইহা করিতেন, তৎসম্বন্ধে কি আপনারা পড়েন নাই? আমি যে সকল গুরুর কথা বলিতেছিলাম, তাঁহারা সেরূপ গুরু নহেন—ইঁহারা কিন্তু সকল গুরুর গুরু—মানুষের নিকট ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। আমরা তাঁহাদের মধ্য দিয়া ব্যতীত ঈশ্বরকে কোনরূপে দেখিতে পাই না। আমরা তাঁহাদিগকে পূজা না করিয়া থাকিতে পারি না এবং কেবল তাঁহাদিগকেই আমরা পূজা করিতে বাধ্য।

অবতারের মধ্য দিয়া তিনি যেভাবে প্রকাশিত, তাহা ব্যতীত কোন মানব অন্যরূপে ঈশ্বরকে দেখেন নাই। আমরা ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না।

মানবভাবে ব্যতীত অন্য কোন ভাবে আমাদের ভগবান্‌কে দেখিবার সাধ্য নাই।

যদি আমরা তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করি, তবে আমরা কেবল তাঁহাকে এক ভয়ানক বিকৃতাকার করিয়াই গঠন করিয়া থাকি। আমাদের চলিত কথায় বলে, একটি মূর্খ লোক শিব গড়িতে গিয়া অনেক চেষ্টা করিয়া একটী বানর গড়িয়াছিল। এইরূপ যখনই আমরা ঈশ্বরের প্রতিমাগঠনে চেষ্টা করি, তখনই আমরা একটী বিকৃতাকার করিয়া তুলি, কারণ, আমরা যতক্ষণ মানব রহিয়াছি, ততক্ষণ আমরা তাঁহাকে মানবাপেক্ষা উচ্চতর আর কিছু ভাবিতে পারি না। অবশ্য এমন সময় আসিবে, যখন আমরা মানবপ্রকৃতি অতিক্রম করিব এবং তাঁহার যথার্থ স্বরূপ অবগত হইব। কিন্তু যতদিন আমরা মানুষ রহিয়াছি, ততদিন আমাদিগকে তাঁহাকে মনুষ্যরূপেই উপাসনা করিতে হইবে। যাহাই বলুন না কেন, যতই চেষ্টা করুন না কেন, ঈশ্বরকে মানবব্যতীত অন্যরূপে দেখিতে পাইবেন না। আপনারা খুব বড় বড় বুদ্ধিকৌশলপূর্ণ বক্তৃতা করিতে পারেন, খুব দিগ্‌গজ যুক্তিবাদী হইতে পারেন, প্রমাণ করিতে পারেন যে, ঈশ্বর-সম্বন্ধে এই যে সকল পৌরাণিক গল্প কথিত হইয়া থাকে, এ সমুদয়ই মিথ্যা, কিন্তু একবার সহজ ভাবে বিচার করুন দেখি। ঐ অদ্ভুত বুদ্ধি-বত্তা কি লইয়া? উহা শূন্য মাত্র—উহা ভুয়া বৈ আর কিছুই নহে—উহাতে সার কিছুই নাই। এখন হইতে যখন দেখিবেন, কোন ব্যক্তি এই-রূপে ঈশ্বরপূজার বিরুদ্ধে খুব প্রবল বুদ্ধিকৌশলপূর্ণ বক্তৃতা করিতেছে, তখন সেই বক্তাকে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহার ঈশ্বরসম্বন্ধে কি ধারণা। সে 'সর্ব্বশক্তিমত্তা' 'সর্ব্বব্যাপিতা', 'সর্ব্বব্যাপী প্রেম' ইত্যাদি শব্দে ঐ গুলির বানান ব্যতীত আর অধিক কি বুঝিয়া থাকে। সে কিছুই বুঝে না, সে ঐ শব্দগুলি দ্বারা নির্দ্দিষ্ট কোন ভাবই বুঝে না। রাস্তার যে লোকটী একখানিও বই পড়ে নাই, সে তাহা অপেক্ষা কোন অংশে শ্রেষ্ঠ নহে। তবে রাস্তার লোকটী নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতি—সে জগতের কোনরূপ শান্তিভঙ্গ করে না, কিন্তু অপর ব্যক্তির তর্কের জ্বালায় জগৎ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠে। তাহার প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ ধর্ম্মানুভূতি নাই, সুতরাং উভয়েই এক ভূমিতে অবস্থিত। প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম্ম আর বচন ও প্রত্যক্ষানুভূতির ভিতর বিশেষ

প্রভেদ করা উচিত। যাহা আপনি নিজ আত্মাতে অনুভব করেন, তাহাই প্রত্যক্ষানুভূতি। যে ঐরূপ বাক্যব্যয় করে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন, "তোমার সর্ব্বশক্তিমত্তার কি ধারণা? তুমি কি সর্ব্বশক্তিমত্তা বা সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে দেখিয়াছ? এই সর্ব্বব্যাপী পুরুষ বলিতে তুমি কি বুঝ? মনুষের ত আত্মার সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই—তাহার সম্মুখে যে সকল আকৃতিমান্ বস্তু সে দেখে, সেইগুলি দিয়াই তাহাকে আত্মাসম্বন্ধে চিন্তা করিতে হয়। তাহাকে নীল আকাশ বা প্রকাণ্ড বিস্তৃত ময়দান বা সমুদ্র বা অন্য কিছু বৃহৎ বস্তুর চিন্তা করিতে হয়। তাহা না হইলে আর কিরূপে তুমি ঈশ্বর চিন্তা করিবে? তবে তুমি করিতেছ কি? তুমি সর্ব্বব্যাপিতার কথা কহিতেছ অথচ সমুদ্রের বিষয় ভাবিতেছ। ঈশ্বর কি সমুদ্র?" অতএব সংসারের এই সব বৃথা তর্কযুক্তি দূরে ফেলিয়া দিন—আমরা সাদা সিদে জ্ঞান চাই। আর এই সাদাসিদে জ্ঞান যতদূর দুর্লভ বস্তু, জগতে আর কিছুই তত নহে। জগতে কেবল লম্বা লম্বা কথাই শুনিতে পাওয়া যায়। অতএব দেখা গেল, আমাদের বর্ত্তমান গঠন ও প্রকৃতি যদ্রূপ, তাহাতে আমরা সীমাবদ্ধ এবং আমরা ভগবান্‌কে মানবভাবে দেখিতে বাধ্য। মহিষেরা যদি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহারা ঈশ্বরকে এক বৃহৎকায় মহিষরূপে দেখিবে। মৎস্য যদি ভগবানের উপাসনা করিতে ইচ্ছা করে, তবে তাহাকে বৃহদাকার মৎস্যরূপে ভগবানের ধারণা করিতে হইবে, মানুষকেও এইরূপ ভগবান্‌কে মানুষরূপে ভাবিতে হইবে আর এগুলি কল্পনা নহে। আপনি আমি মহিষ মৎস্য—ইহাদের প্রত্যেকে যেন বিভিন্ন পাত্রস্বরূপ। এগুলি নিজ নিজ আকৃতির পরিমাণে জলে পূর্ণ হইবার জন্য সমুদ্রে গমন করিল। মানবরূপ পাত্রে ঐ জল মানবাকার, মহিষপাত্রে মহিষাকার ও মৎস্যপাত্রে মৎস্যাকার ধারণ করিল। এই প্রত্যেক পাত্রেই জল ছাড়া আর কিছু নাই। ঈশ্বর সম্বন্ধেও তদ্রূপ। মানব ঈশ্বরকে মানবরূপেই দর্শন করে, পশুগণ পশুরূপেই দর্শন করিয়া থাকে। প্রত্যেকে নিজ নিজ আদর্শানুযায়ী তাঁহাকে দেখিয়া থাকে। এইরূপেই কেবল তাঁহাকে দর্শন করা যাইতে পারে। আপনাকে তাঁহাকে এই মানবরূপেই উপাসনা করিতে হইবে, কারণ, ইহা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

দুই প্রকার ব্যক্তি ভগবান্‌কে মানবভাবে উপাসনা করে না—এক পশুপ্রকৃতি মানব—তাহার কোনরূপ ধর্ম্মই নাই আর দ্বিতীয় পরমহংস (শ্রেষ্ঠতম

যোগী) যিনি মানবভাবের বাহিরে যাইয়াছেন, যিনি নিজ দেহ মনকে দূরে ফেলিয়াছেন, যিনি প্রকৃতির সীমার বাহিরে গিয়াছেন। সমুদয় প্রকৃতিই তাঁহার আত্মস্বরূপ হইয়া গিয়াছে। তাঁহার মনও নাই, দেহও নাই—তিনিই ঈশ্বরকে তাঁহার যথার্থ স্বরূপে উপাসনা করিতে সমর্থ—যেমন যীশু ও বুদ্ধ। তাঁহারা ঈশ্বরকে মানবভাবে উপাসনা করিতেন না। ইহা হইল এক সীমা। আর এক সীমায় পশুভাবাপন্ন মানব আর আপনারা সকলেই জানেন, দুই বিরুদ্ধপ্রকৃতিক বস্তুর চরমাবস্থা কেমন একরূপ দেখায়। চূড়ান্ত অজ্ঞান ও চূড়ান্ত জ্ঞানের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। ইহারা উভয়েই কাহারও উপাসনা করে না। চূড়ান্ত অজ্ঞানীরা নিজেদের দেহটাকেই ব্রহ্ম ভাবিয়া থাকে, তাহারাই ব্রহ্ম—তবে আর তাহারা কাহার উপাসনা করিবে? আর চূড়ান্ত জ্ঞানীরা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়াছেন—আর ব্রহ্ম ব্রহ্মের উপাসনা করেন না। এই দুই চূড়ান্ত অবস্থার মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া যদি কেহ বলে, সে মনুষ্যরূপে ভগবানের উপাসনা করিবে না, তাহা হইতে সাবধান থাকিবেন। সে যে কি বলিতেছে, তাহার মর্ম্ম সে নিজেই জানে না, সে ভ্রান্ত, তাহার ধর্ম্ম ভাসা ভাসা লোকের জন্য, উহা বৃথা বুদ্ধিশক্তির অপব্যবহার মাত্র।

অতি জড় প্রকৃতি ও পরমহংসগণই অবতারের উপাসনা করে না।

অতএব ঈশ্বরকে মানবরূপে উপাসনা করা সম্পূর্ণ আবশ্যক আর যে সকল জাতির উপাস্য এইরূপ মানবরূপধারী ঈশ্বর আছেন, তাহারা ধন্য। খ্রীষ্টিয়ানগণের পক্ষে খ্রীষ্ট এইরূপ মানবদেহধারী ঈশ্বর। অতএব আপনারা খ্রীষ্টকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া থাকুন—তাঁহাকে কখনই ছাড়িবেন না। ভগবদ্দর্শনের ইহাই স্বাভাবিক উপায়—মানবে ঈশ্বর দর্শন। আমাদের ঈশ্বরসম্বন্ধীয় সমুদয় ধারণাই তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে। খ্রীষ্টিয়ানেরা কেবল এইটুকু গণ্ডী কাটিয়া থাকেন যে, তাঁহারা ভগবানের অন্যান্য অবতার মানেন না, কেবল খ্রীষ্টকেই মানেন। তিনি ভগবানের অবতার ছিলেন, বুদ্ধও তাহাই ছিলেন আরও শত শত অবতার হইবেন। ঈশ্বরের কোথাও ইতি করিবেন না। ঈশ্বরকে যতদুর ভক্তি করা উচিত বিবেচনা করেন, খ্রীষ্টকে ততদূর ভক্তিশ্রদ্ধা করুন। এইরূপ উপাসনাই একমাত্র সম্ভব। ঈশ্বরকে উপাসনা করা যাইতে পারে না, তিনি সর্ব্বব্যাপী হইয়া সমগ্র জগতে বিরাজিত

খ্রীষ্টিয়ানেরা খ্রীষ্টকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া থাকুন, কিন্তু উদার হউন।

আছেন। তিনি কি এক হাতে পুরস্কার ও অপর হাতে দণ্ড লইয়া আমাদের পূজা গ্রহণের জন্য বসিয়া থাকিতে পারেন? ভাল কায করিলে পুরস্কার পাইবেন, মন্দ কায করিলে দণ্ড পাইতে হইবে! মানবরূপে প্রকাশিত তাঁহার অবতারের নিকটই আমরা প্রার্থনা করিতে পারি। যদি খ্রীষ্টিয়ানেরা প্রার্থনা করিবার সময় "খ্রীষ্টের নামে" বলিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করেন, তবে খুব ভাল হয়। ঈশ্বরের নামে প্রার্থনা ছাড়িয়া কেবল খ্রীষ্টের নিকট প্রার্থনার প্রথা প্রচলিত হইলে খুব ভাল হয়। ঈশ্বর মানবের দুর্ব্বলতা বুঝেন এবং মানবের কল্যাণের জন্য মানবরূপ ধারণ করেন। 'যখনই ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি মানবের হিতার্থ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকি।' * 'মূঢ় ব্যক্তিগণ—জগতের সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর আমি যে মানবাকার ধারণ করিয়াছি, তাহা না জানিয়া আমাকে অবজ্ঞা করে ও মনে করে—ভগবান্ আবার কিরূপে মানবরূপ ধরিবেন।' † তাহাদের মন আসুরী অজ্ঞানরূপ মেঘে আবৃত বলিয়া তাহারা তাঁহাকে জগতের ঈশ্বর বলিয়া জানিতে পারে না। এই মহান্ ঈশ্বরাবতারগণকে উপাসনা করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, তাঁহারাই একমাত্র উপাসনার যোগ্য— আর তাঁহাদের আবির্ভাব বা তিরোভাবের দিনে আমাদের তাঁহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করা উচিত। খ্রীষ্টের উপাসনা করিতে হইলে তিনি যেরূপ ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে আমি সেই ভাবে উপাসনা করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার জন্মদিনে আমি না খাইয়া বরং উপবাস ও প্রার্থনা করিয়া কাটাইব। যখন আমরা এই মহাত্মাগণের চিন্তা করি, তখন তাঁহারা আমাদের আত্মার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেন এবং আমাদিগকে তাঁহাদের সদৃশ করিয়া লয়েন।

কিন্তু আপনারা যেন খ্রীষ্ট বা বুদ্ধকে শূন্যসঞ্চরণকারী ভূত-প্রেতাদির

---

* যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥ গীতা।

† অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরং॥ ঐ

সহিত এক করিয়া ফেলিবেন না। কি পাপ! খ্রীষ্ট ভূত নামানর দলে আসিয়া নাচিতেছেন! আমি এই দেশে এ সব বুজরুকি দেখিয়াছি। ভগবানের এই সব অবতারগণ এই ভাবে আসেন না —তাঁহাদের মধ্যে যে কেহ স্পর্শ করিলেই মানবের মধ্যে তাহার ফল প্রত্যক্ষ হইবে। খ্রীষ্টের স্পর্শে মানবের সমগ্র আত্মাই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। খ্রীষ্ট যেরূপ ছিলেন, সেই ব্যক্তিও তদ্রূপ হইয়া যাইবে। তাহার সমগ্র জীবন আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ হইয়া যাইবে—তাহার শরীরের প্রত্যেক লোমকূপ দিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি বাহির হইবে। খ্রীষ্টের চরিত্রের যতদূর শক্তি. তাঁহার রোগ আরোগ্য করণে বা অন্যান্য অলৌকিক কার্য্যে কি সে শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে? তিনি হীন নিম্নাধিকারী জনগণের মধ্যে ছিলেন বলিয়া ঐ হীন কার্য্যগুলি না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। এ সকল অদ্ভূত ঘটনা কোথায় হয়?—য়াহুদীদের ভিতর, আর তাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিল না। আর কোথায় উহা হয় নাই?—ইউরোপে। ঐ সব অদ্ভূত কার্য্য য়াহুদীদের ভিতর হইল—যাহারা খ্রীষ্টকে ত্যাগ করিল—আর ইউরোপ তাঁহার শৈলোপদেশ (Sermon on the Mount) গ্রহণ করিল। মানবাত্মা সত্য যাহা তাহা গ্রহণ করিল এবং মিথ্যা যাহা তাহা ত্যাগ করিল। রোগ আরোগ্য বা অন্যান্য অদ্ভুত কার্য্যে খ্রীষ্টের মহত্ব নহে—একটা মহা অজ্ঞানী লোকও তাহা করিতে পারিত। অজ্ঞান ব্যক্তিগণও অপরকে আরোগ্য করিতে পারে—পিশাচপ্রকৃতি ব্যক্তিগণও অপরকে আরোগ্য করিতে পারে। অতি ভয়ানক আসুরীপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ অদ্ভুত অদ্ভুত অলৌকিক কার্য্য করিয়াছে—আমি দেখিয়াছি। তাহারা মাটি হইতে ফলই করিয়া দিবে। আমি দেখিয়াছি, অনেক অজ্ঞান ও পিশাচপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ঠিক ঠিক বলিয়া দিতে পারে। আমি দেখিয়াছি, অনেক অজ্ঞান ব্যক্তি ইচ্ছামাত্রে একবার দৃষ্টি করিয়া ভয়ানক ভয়ানক রোগসকল আরাম করিয়াছে। অবশ্য এগুলি শক্তি বটে, কিন্তু অনেক সময়েই এগুলি পৈশাচিক শক্তি। খ্রীষ্টের শক্তি কিন্তু আধ্যাত্মিক শক্তি—উহা চিরকাল থাকিবে—চিরকাল রহিয়াছে—সর্ব্বশক্তিমান্ বিরাট্ প্রেম ও তৎপ্রচারিত সত্যসমূহ। লোকের দিকে চাহিয়াই তিনি যে তাহাদিগকে আরাম করিতেন, তাহা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু তিনি যে বলিয়াছিলেন—

কিন্তু খ্রীষ্টের প্রকৃত ভাব ছাড়িয়া তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়াদির দিকে ঝোঁক করিবেন না।

"পবিত্রাত্মারা ধন্য," তাহা এখনও লোকের মনে জীবন্তভাবে রহিয়াছে। যতদিন মানব বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন ঐ বাক্যগুলি অফুরন্ত মহীয়সী শক্তির ভাণ্ডার স্বরূপ হইয়া থাকিবে। যতদিন লোকে ঈশ্বরের নাম না ভুলিয়া যায়, ততদিন ঐ বাক্যাবলী বিরাজিত থাকিবে—উহাদের শক্তি-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়া চলিবে—কখনই থামিবে না। যীশু এই শক্তি-লাভেরই উপদেশ দিয়াছিলেন, তাঁহার এই শক্তিই ছিল—ইহা পবিত্রতার শক্তি—আর ইহা বাস্তবিকই একটী যথার্থ শক্তি। অতএব খ্রীষ্টকে উপাসনা করিবার সময়, তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবার সময় আমরা কি চাহিতেছি, এটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। অজ্ঞানজনোচিত অলৌকিক শক্তির বিকাশ নহে—আমাদের চাহিতে হইবে—আত্মার অদ্ভুত শক্তি—যাহাতে মানুষকে মুক্ত করিয়া দেয়, সমগ্র প্রকৃতির উপর তাহার শক্তি বিস্তার করে, তাহার দাসত্বতিলক মোচন করিয়া দেয় এবং তাহাকে ঈশ্বর দর্শন করায়।

ক্রমশঃ।

ভ্রমান্ধতা।

মনে ভাব আপনারে অতীব সক্ষম
অযোগ্য দেশেতে শুধু হ'য়েছে জনম॥
দুষ্ট সমাজের দোষে নাহি ঋদ্ধি সিদ্ধি
বুঝিবে মহত্ব তব, কার হেন বুদ্ধি?
এত যদি শক্তি ধর তবে কেন আর
অলস আবেশে কাল কাট অনিবার?
বিভুদত্ত ক্ষমতার যোগ্য ব্যবহার
করেছ কি? ওরে মূঢ়! ভাব একবার॥
জীবন সংগ্রামে জয় তার(ই) অধিকার
সাধ্য কর্ম্মে আছে সদা অনুরক্তি যার॥
যে সুযোগ, যে সম্পদ দিয়াছেন বিধি
যোগ্য ব্যবহার তার করে থাক যদি॥
দশে দেশে গাবে যশ আত্মার প্রসাদ
আপনি উদিবে চিতে, ঘুচিবে বিষাদ॥

শ্রীকালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী।

পুরুষোত্তম।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীনিকুঞ্জবিহারী মল্লিক।

পরদিন আমরা পাণ্ডার সহিত বাসা হইতে বাহির হইয়া জগন্নাথের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ রাস্তা দিয়া ক্রমে দক্ষিণদিকের সহরপ্রান্তে লোকনাথ মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। এই পথে আসিতে পথিমধ্যে কাশি মিশ্রের বাটী, যেখানে চৈতন্যদেব বাস করিতেন, তাহা দেখিতে পাইলাম। এখন এই বাটীতে একটী চালাঘর ভিন্ন আর কিছুই দেখিবার নাই। লোকনাথের মন্দিরটি খুব পুরাতন, আশে পাশে কয়েকটী ভাঙ্গা মন্দিরে অপরাপর দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। নিকটেই সরোবর। আমরা লোকনাথের মন্দিরে গিয়া, কয়েকটী সিঁড়ি দিয়া নামিয়া মাটীর নীচে অর্দ্ধপ্রোথিত লোকনাথ মহাদেবের গৃহে প্রবেশ করিলাম। গৃহমধ্যে লোকনাথ মহাদেবের প্রকাণ্ড লিঙ্গ বিরাজিত। গৃহটি খুব অন্ধকার। শ্রীক্ষেত্রে লোকনাথ মহাদেব খুব প্রসিদ্ধ। আমরা লোকনাথের পূজা করিয়া, এখান হইতে বাহির হইয়া, অদূরে সমুদ্রোপকূলে তোটা বা টোটা গোপীনাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম! এই মন্দির বা মঠের একটী ঘরে গোপীনাথজীর মূর্ত্তি বিরাজিত। এখানে চৈতন্যদেব ভাগবত পাঠ শুনিতে আসিতেন এবং সময় সময় থাকিতেন। প্রবাদ এইরূপ যে, এইখানে চৈতন্যদেবের অন্তর্দ্ধান হয়। কথিত আছে, এক দিন তিনি গোপীনাথজীর ঘরে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইলেন না। কোন কোন পাণ্ডা বলেন যে, চৈতন্যদেব ৺জগন্নাথের মন্দিরে অন্তর্দ্ধান হন এবং জগন্নাথদেবের সহিত মিলিত হইয়াছেন। এই স্থান অধুনা গৌড়িয় বৈষ্ণবদিগের একটী প্রধান মঠ। এই মঠের আশে পাশে অনেকগুলি বৈষ্ণব মহাপুরুষদের সমাধি বা সমাজ আছে। এই স্থান দেখিয়া সমুদ্রের উপকূলে পূর্ব্ব-উত্তরদিকে কিছুদূর গেলেই শঙ্করাচার্য্যের গোবর্দ্ধন মঠ দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময় এই মঠের খুব প্রাধান্য ছিল। এখন এই মঠে একটী ঘরে শঙ্করাচার্য্যের গদি ও প্রস্তরনির্ম্মিত তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মঠের মধ্যে একটী ঘরে গোপালজীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং মঠের বাহিরে কয়েকজন মঠাধিপের সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখান হইতে আর কিছুদূর সমুদ্রোপকূলে উত্তর পূর্ব্ব দিকে যাইয়া, স্বর্গদ্বারে বা স্বর্গদুয়ারে উপস্থিত হইলাম। কেহ কেহ বলেন, রাবণ এখান হইতে স্বর্গের সিঁড়ি করিতে ইচ্ছা

করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহার নাম স্বর্গদ্বার হইয়াছে। সমুদ্রজলের নিকটে বালুকারাশীর মধ্যে একখণ্ড প্রস্তর প্রোথিত রহিয়াছে, ইহাকেই স্বর্গদ্বার কহে। আমরা স্বর্গদ্বারে আসিয়া সমুদ্রের পূজা ও স্নান করিলাম। এখানকার সমুদ্রের ঢেউ বেশ উচ্চ। সমুদ্রে জেলেগণ কাষ্ঠের ভেলার ন্যায় নৌকার সাহায্যে প্রায় উপকূল হইতে ১ মাইল দূরে গিয়া সমুদ্রে জাল ফেলিতেছে ও পরে ঐ জাল উপকূল হইতে ৪।৫ জনে টানিয়া তুলিয়া মৎস্য ধরিতেছে। স্বর্গদ্বারের উত্তর দিকে কিছু দূরে সাহেবদের কয়েকটী বাঙ্গলা আছে। স্বর্গদ্বারের একটু দক্ষিণে ভক্ত হরিদাসের সমাধি মন্দির, ইহা সমুদ্রোপকূলে সংস্থাপিত। ইহারই নিকট চৈতন্যদেবের মঠ আছে। আমরা সমুদ্রে ঢেউ খাইয়া স্বর্গদ্বারের নিকট সমুদ্রসংলগ্ন একটী খালে উপস্থিত হইলাম। পাণ্ডা বলিলেন, ইহাই চক্রতীর্থ। এই স্থানেই ভগবানের অস্থিপঞ্জর নিমবৃক্ষের সহিত ভাসিয়া আসিয়া উপকূলে সংলগ্ন হইয়াছিল। পরে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা ঐ বৃক্ষে জগন্নাথের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। যাত্রীদিগকে এই স্থানে স্নানদানাদি করিতে হয়। আমরা এই খালে পুনরায় স্নান করিলাম। এই খাল সমুদ্রে সংলগ্ন হইলেও ইহার জল তত লোনা নহে। আমরা এখান হইতে পশ্চিম মুখে কিছুদূর আসিয়া হনুমান বা মহাবীরের আস্থানা দেখিতে পাইলাম। এখানে মহাবীরের একটী প্রকাণ্ড মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। মহাবীরের আস্থানা হইতে কিছু দূরে পশ্চিমে আসিয়া রেল ষ্টেশনের নিকট উপস্থিত হইলাম। এখানে রেল পার হইয়া আমরা সহরমধ্য দিয়া বাসার দিকে আসিবার কালে পথে শ্বেতগঙ্গা নামক চতুর্দ্দিকে পাথরে বাঁধান সরোবরে উপস্থিত হইলাম। এই সরোবরটী সর্ব্বাপেক্ষা ছোট এবং ইহার জল খুব নীচে অবস্থিত। সরোবরের পাড়ে ২।৩টী মন্দির আছে। এই সরোবরে আমরা স্নানাদি করিয়া পঞ্চতীর্থের স্নান শেষ করিলাম। শ্বেতগঙ্গা সরোবর জগন্নাথের মন্দিরের পূর্ব্বদিকে ১ মাইল দূরে লোকালয়পূর্ণ পল্লীমধ্যে অবস্থিত। পুরীতে নরেন্দ্র, মার্কণ্ড, শ্বেতগঙ্গা, ইন্দ্রদ্যুম্ন ও চক্রতীর্থ এই পঞ্চতীর্থে স্নানাদি করিতে হয়।

পুরী বা জগন্নাথ হইতে দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের তীরে তীরে ৬।৭ ক্রোশ পদব্রজে বা গরুর গাড়ি করিয়া যাইলে আলালনাথ নামক তীর্থে যাওয়া যায়। এখানে মন্দিরমধ্যে প্রস্তরনির্ম্মিত বিষ্ণুর গোপাল মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে; ইহারই নাম আলালনাথ। আলালনাথের প্রকট সম্বন্ধে এইরূপ

প্রবাদ আছে যে, পূর্ব্বে এই মন্দিরের পূজারি একদিন কোন দূরবর্ত্তী গ্রামে যাইবার প্রয়োজন হওয়ায় এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে তৃতীয় প্রহর গত হইবে জানিয়া আলালনাথের ভোগ সেবার জন্য চিন্তিত হইলেন। পরে উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজ বালক পুত্রকে ভোগ রসুই করিয়া ভগবানের ভোগ দিতে বলিয়া উক্ত দূরবর্ত্তী গ্রামে গমন করিলেন। পূজারির পুত্র বালকস্বভাবপ্রযুক্ত সঙ্গিদিগের সহিত খেলা করিতে করিতে ভগবানের ভোগ রসুই করিতে ভুলিয়া যায়। পরে দ্বিপ্রহর গতে পিতার আজ্ঞা স্মরণ হইবামাত্র তাড়াতাড়ি পায়স ভোগ রসুই করিয়া সেই উত্তপ্ত পায়স থালে ঢালিয়া ভগবান্‌কে খাইতে দেয়। শ্রীভগবান্ খাইতেছেন না দেখিয়া এবং ভগবানের আহার না হইলে পিতা আসিয়া তাহাকে বকিবে, এই ভয়ে বালক একান্তমনে ভগবান্‌কে আহার করিবার জন্য মিনতি, স্তুতি ও তাড়না করিতে লাগিল। শ্রীভগবান্‌ও বালকের প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া সেই প্রস্তর মূর্ত্তিতেই উক্ত গরম পায়স সমুদায় আহার করিলেন। তৃতীয় প্রহরে পূজারি ফিরিয়া আসিয়া আহারের জন্য পুত্রকে ভগবানের প্রসাদী অন্ন আনিতে আজ্ঞা করিলে, পুত্র পিতাকে বলিল যে, ভগবান্ সমুদয় অন্ন আহার করিয়াছেন ; কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। পূজারি ইহাতে বিস্মিত হইয়া নিজে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, যথার্থই ভগবান্ সমুদয় পায়স খাইয়া ফেলিয়াছেন, পাত্রে কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। গরম পায়স ভক্ষণ হেতু ভগবানের হাতে ও মুখে চিহ্নস্বরূপ ফোস্কা হইয়াছে। পূজারি ইহা দেখিয়া ভগবান্ তাহার বালক পুত্রের একদিন মাত্র সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে দর্শন দিলেন, কিন্তু তাহার এতকালের সেবাতেও সন্তুষ্ট হইয়া দর্শন দিলেন না, ইহা ভাবিয়া দুঃখিত ও বিস্মিত হইলেন। পূজারি কিছুক্ষণ পরে আত্মাস্বরূপ নিজপুত্র যে ভগবানের দর্শন পাইয়াছে, ইহা পরম সৌভাগ্যজ্ঞানে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন। এখনও এই মূর্ত্তির হাতে ও মুখে ফোস্কার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীক্ষেত্র হইতে ৮।৯ ক্রোশ দূরে সমুদ্রের উপকূলে কনারক্ বা কনার্ক নামক স্থানে একটী বিখ্যাত সূর্য্যমন্দির আছে। খৃঃ ১২৪১ সালে লঙ্গোর নৃসিংহ দেও এই মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই মন্দির প্রস্তরে নির্ম্মিত, খুব কারুকার্য্য খচিত এবং ১৫০ হাত উচ্চ অর্থাৎ জগন্নাথের মন্দির অপেক্ষা উচ্চে বড় ছিল। এখন এই মন্দিরটির ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে।

এখানে নবগ্রহের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত জ্যোতিষচক্রের গণনার জন্য মানমন্দির আছে। এই মন্দির দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কনারকের নিকট চন্দ্রভাগা নামক উৎকল দেশের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ আছে। ইহা একটী শুষ্ক নদীমাত্র ; তবে সমুদ্রের নিকটে ২।৩ বিঘা মাত্র স্থান জলে পূর্ণ, ইহাতে জল অতি সামান্য থাকে। মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর দুই দিন পরে অর্থাৎ সপ্তমীর দিন এই চন্দ্রভাগায় স্নান করিবার একটী মেলা হয়। সেই সময় অনেক যাত্রী শ্রীক্ষেত্র হইতে গোরুর গাড়ি ও পাল্‌কীর সাহায্যে অথবা পদব্রজে এই স্থানে স্নান করিতে আগমন করে। এই স্থান হইতে সূর্য্য উদয়কালীন, সূর্য্যের রথ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া প্রবাদ আছে। এই স্থানে পূর্ব্বমুখী হইয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া থাকিলে সমুদ্রমধ্য হইতে সূর্য্যের উদয়কালে বোধ হয় যেন সূর্য্যদেব একখানি রথের মধ্যে অবস্থিত রহিয়াছেন। কিন্তু জল হইতে সূর্য্য একটু উপরে উঠিলে আর এ দৃশ্য দেখা যায় না।

জগন্নাথে রথযাত্রা এবং দোলযাত্রার সময় দুইটী বড় মেলা হয়। রথ-যাত্রার সময় জগন্নাথদেব মন্দিরের সিংহদ্বার দিয়া বাহির হইয়া সম্মুখের বড় রাস্তায় অবস্থিত প্রকাণ্ড রথে আরোহণ করেন। বলরাম ও সুভদ্রাদেবী জগন্নাথের পশ্চাৎভাগে অপর দুইখানি রথে উঠেন। জগন্নাথের নন্দীঘোষ নামক ৩২ হাত উচ্চ রথ, বলরামের তালধ্বজ নামক ৩০ হাত উচ্চ রথ এবং সুভদ্রার পদ্মধ্বজ নামক ২৮ হাত উচ্চ রথ প্রতি বৎসর নূতন নির্ম্মিত হয়। সিংহদ্বার হইতে তিন খানি রথ টানিয়া বরাবর এই রাস্তার অপর প্রান্তস্থিত গুণ্ডিচা মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। গুণ্ডিচা মন্দিরে জগন্নাথ কয়েকদিন অবস্থান করিয়া, পুনরায় পুনর্যাত্রার দিন রথে চড়িয়া মন্দিরে ফিরিয়া আসেন। রথযাত্রার সময় প্রায় ২।৩ লক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়। শুনা যায়, পূর্ব্বে রথযাত্রাকালে কোন কোন ব্যক্তি ৺জগন্নাথের রথচক্রের নিম্নে স্বেচ্ছায় পড়িয়া দেহত্যাগ করিত ; কিন্তু ঐরূপ প্রকারের কোন বাস্তব কারণ নাই অনুসন্ধানে জানিলাম। দোলযাত্রার সময় ৺জগন্নাথদেব নিজ মন্দিরে রত্নবেদীর উপর বসিয়াই আবির খেলা করেন। তবে দোলগোবিন্দ নামক এক কৃষ্ণ মূর্ত্তি, মন্দির হইতে খুব ধুমধামের সহিত বাহির হইয়া, মন্দিরের পূর্ব্ব উত্তর দিকে অল্পদূরে অবস্থিত দোলমঞ্চে আসিয়া আবির খেলা করিয়া থাকেন। শুনিলাম, দোলের সময় প্রায় এক লক্ষ যাত্রী সমবেত হয়।

শ্রীক্ষেত্রে যাত্রীদের আট্‌কে বাঁধিবার প্রথা আছে। সচরাচর যাত্রিগণ পাণ্ডার হাতে আট্‌কে বাঁধিবার জন্য ২।৫৲ টাকা দিয়া থাকেন কিন্তু তাহাতে আট্‌কে বাঁধা কার্য্য কতদূর সিদ্ধ হয়, বলিতে পারি না। জগন্নাথের ভোগ রসুই মহলে, প্রত্যহ যে নূতন নূতন আট্‌কে (এক রকম গুড়ের কলসীর ন্যায় মাটির হাঁড়ি) করিয়া ভগবানের ভোগ প্রস্তুত হয়, সেইরূপ একটী ভোগের আট্‌কে, চিরদিনের মতন ভগবানের সেবার্থ বন্দোবস্ত করাকেই প্রকৃত আট্‌কে বাঁধা বা আট্‌কে বন্ধানি বলে। এইরূপ আট্‌কে বাঁধিতে হইলে যাত্রিগণকে পাণ্ডা বা জগন্নাথের মন্দিরের কর্ম্মচারির সহিত এখানকার রাজার কাছারীতে যাইয়া আট্‌কে বাধার রীতিমত লেখাপড়া করিয়া টাকা জমা দিতে হয়। যাত্রিগণ সামর্থ্য অনুসারে কেহ একজনের আহারোপযোগী, কেহ অধিক লোকের আহারোপযোগী অন্নের আট্‌কে বন্ধানি করিয়া থাকেন। একশত টাকা জমা দিলে একজন লোকের আহারোপযোগী অন্নের আট্‌কে বাধা হয়। যাত্রী প্রদত্ত এই সকল আট্‌কের অন্ন জগন্নাথের ভোগের পর সাধুসান্তদিগকে আহার করান হয়। আট্‌কে বাধা ভিন্ন এখানে যাত্রিগণ পাণ্ডার মুখে ৺জগন্নাথের প্রসাদী অন্ন সহস্তে দিয়া থাকেন। এ কারণ পাণ্ডারা যাত্রাদের নিকট হইতে অবস্থামত টাকা লইয়া থাকেন। আজকাল জগন্নাথের মন্দিরে অনেক ব্রাহ্মণই এই কার্য্যের জন্য হাতে প্রসাদ লইয়া ঘুরিয়া বেড়ায়—যাত্রীরা ইচ্ছা করিলে দুই চার পয়সা দিয়া ইহাদের মুখে প্রসাদ দিতে পারেন। এখানে ৺জগন্নাথদেবের ভোগের সম্বন্ধে এই আশ্চর্য্য গল্প প্রচলিত আছে যে, একখানি দর্পণে দৃষ্টিপাত করিলে ৺জগন্নাথদেব ভোগ আহার করিতেছেন, প্রত্যক্ষ করা যায় জগন্নাথের ভোগ রসুই হইলে পর, মন্দির ধৌত করিয়া উক্ত ভোগ জগন্নাথের ঘরে রাখিয়া, দ্বার বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। এই সময় মন্দিরের প্রধান সেবক উক্ত দর্পণমধ্যে ভগবান্ ভোগ গ্রহণ করিলেন কি না, দেখেন। যদি ভগবান্ ভোগ গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ঐ ভোগ কোনরূপে দূষিত হইয়াছে এবং অনুসন্ধান করিলে উক্ত দোষ ধরা পড়ে। তখন ঐ সমস্ত দূষিত ভোগ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা হয় এবং পুনরায় মন্দির ধুইয়া ও নূতন ভোগ রসুই করিয়া তবে ভোগ লাগান হয়। তবে এই প্রবাদ যে কতদূর সত্য, তাহা বলিতে পারি না।

বেদ ও বেদ্য।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।] [শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বর্ম্মন্।

প্রতীচ্য অভিব্যক্তিবাদ বিচার।

ইতিপূর্ব্বে আমরা যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে অভিব্যক্তিবাদের আলোচনা করিয়াছি। প্রতীচ্য আস্তিক ও নাস্তিক অভিব্যক্তিবাদিগণের মধ্যে পরস্পরের মতবিরোধ যে কোথায়, তাহাও আমরা যথাস্থানে সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিয়াছি। আস্তিক ক্রমবিকাশবাদিগণ স্বমতপ্রতিষ্ঠার্থ যতই তর্কজাল বিস্তার করুন না কেন, অস্মদ্দেশে কিন্তু ডারুইন (Darwin), বুকনার (Buchner), হ্যাকাল (Hackel), হক্সলি (Huxley), স্পেন্সার (Spencer) প্রভৃতি নাস্তিক ক্রমবিকাশবাদিগণই একরূপ আধিপত্য লাভ করিয়াছে, একথাও পূর্ব্বেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। ইহাদিগের মতবাদগুলিই আমাদের শিক্ষিতসমাজে একরূপ পরমসত্যস্বরূপে আদৃত হইয়া থাকে। কেবল ইহাই নহে—অস্মদ্দেশীয় শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা ভারতীয় দর্শনের কথঞ্চিৎ চর্চ্চা রাখেন, এমন কি তাঁহারাও ভারতীয় দর্শনের সত্যাসত্য নির্ণয়ে প্রোক্ত নাস্তিকগণ-ব্যাখ্যাত ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্বের মূল সূত্রগুলিকে সত্যাসত্যের মানদণ্ডস্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সাংখ্যপাতঞ্জলে ব্যাখ্যাত সৃষ্টিতত্ত্বের পরিচয় কিরূপে ডারুইন (Darwin) স্পেন্সারের (Spencer) অনুমোদনীয় হইবে; কোন উপায়ে বেদবেদান্তের ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ববিষয়ক ব্যাখ্যা, প্রতীচ্য অভিব্যক্তিবাদিগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত মতবাদের সহিত সমন্বয় হইবে, ইহারই চেষ্টা তাঁহাদের লিখনে, পঠনে পাঠনে ও বক্তৃতায় দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বর্ত্তমান প্রবন্ধে সৃষ্টিতত্ত্বালোচনক্রমে প্রশ্ন হইতে পারে, বাস্তবিকই কি প্রোক্ত প্রতীচ্য মহোদয়গণ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত মতবাদগুলি এরূপ ভ্রমপ্রমাদশূন্য যে, ইহাদের সিদ্ধান্তগুলি সাক্ষাৎ কৃতধর্ম্মা ঋষিগণ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ বেদাদি শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত সৃষ্টিরহস্যের সত্যাসত্যনির্ণয়ে মানদণ্ডস্বরূপ গৃহীত হইবে? বাস্তবিকই কি এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ড কেবলমাত্র এক, অথবা বহু অন্ধ জড়শক্তি কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতেছে? প্রকৃতই কি প্রাণশূন্য বা অপ্রাণ জড় হইতে প্রাণশক্তির আবির্ভাব হইতেছে? সত্যসত্যই কি যথোক্ত প্রাণহীন ভূত ও ভৌতিক পদার্থ হইতে তথাকথিত আত্মা ও মনাখ্য পদার্থের উৎপত্তি হইতেছে এবং তাহাতেই আবার

বিলীন হইতেছে? যথার্থই কি দুর্ব্বার জীবনসংগ্রামে নিপতিত হইয়া অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রতম কীটদেহ বংশপরম্পরানুক্রমে উচ্চ জীবদেহ ধারণ করিতেছে—বানরও ক্রমপরিণামন্যায়ে মানবদেহ প্রাপ্ত হইতেছে? তবে কি পরলোক নাই? মরণের পর আর জীবন নাই? মৃত্যুর পরে কৃত কর্ম্মের কি আর ফলভোগ নাই? ঈশ্বর কি নাই? অমৃতত্ব কি নাই? তবে কি হিন্দুর শ্রুতিস্মৃতি ধর্ম্ম ও ব্রহ্মমীমাংসা, সাংখ্য ও পাতঞ্জল, ন্যায় ও বৈশেষিক, ইতিহাস ও পুরাণ, যাগ ও যজ্ঞ, সবই কি কল্পনার বিজৃম্ভণ? সর্ব্বৈব কি মিথ্যা?

মিথ্যা নিশ্চয়ই, যদি পাশ্চাত্য সুধীবর্গ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত জড়বাদাত্মক বিশ্বোৎপত্তিতত্ত্ব সত্য হয়। চিন্তাশীল পণ্ডিত স্পেন্সারও তাহাই বলিয়াছেন। তাঁহার 'জীবন্তত্ত্ব' নামক গ্রন্থে Spencer লিখিয়াছেন, "তুমি যদি কোন বহুশ্রুত ব্যক্তিকে এই কথা জিজ্ঞাসা কর যে, ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব বিষয়ে তিনি ভারতবর্ষীয় গ্রীসীয় অথবা য়াহুদীয় মতবাদে কি বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে তিনি যে যৎপরোনাস্তি অবমানিত হইলেন, ইহাই মনে করিবেন।"—"Ask any well-informed man whether he accepts the Cosmogony of the Indians or the Greeks or the Jews, he will regard the question as next to insult." Principle of Biology Vol. I. Page 419.

ডারুইন-স্পেন্সারপ্রমুখ প্রতীচ্য দার্শনিকগণ কর্ত্তৃক হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে এবম্বিধ মতবাদ প্রকাশ কিছু নূতন ও বিচিত্র ব্যাপার নহে। একটু চিন্তা করিলেই বেশ প্রতীত হইবে যে, প্রকৃতই যদি জড়বাদ হেত্বাভাসাদি ভ্রম-প্রমাদশূন্য হয়, তাহা হইলে বেদাদি শাস্ত্রোক্ত মীমাংসাসমূহ অলীক হইবেই হইবে বা কেবল জীর্ণশীর্ণ বিকৃতমস্তিষ্কের কল্পনাবিজৃম্ভণ বলিয়া প্রমাণিত হইবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং অস্মদ্দেশীয় কৃতবিদ্যগণের মধ্যে যাঁহারা কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য—উভয়বিধ দর্শনশাস্ত্রের সমধিক চর্চ্চা রাখেন, তাঁহারা এতদুভয় শাস্ত্রের একান্ত বৈপরীত্য লক্ষ্যীভূত করিয়াও কিরূপে—কোন্ ন্যায়যুক্তি অনুসারে—ডারুইন-স্পেন্সার-প্রণীত তথাকথিত দর্শনশাস্ত্রের সহিত বেদাদি শাস্ত্রের সামঞ্জস্য স্থাপন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন, কোন্ হিসাবে যে, বেদাদি শাস্ত্রোক্ত সত্যাসত্যবিনির্ণয়ে, প্রতীচ্য দর্শনাদি শাস্ত্রকে প্রমাণস্বরূপে, বিনাবাদবিচারে, বিচারকের আসনে উপবেশন করাইয়া থাকেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়!

কোন কিছুর সত্যাসত্যবিনির্ণয়ে মানদণ্ডস্বরূপে, কোন শাস্ত্রকে গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহাকে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া লওয়া কি উচিত নহে? যাহাকে প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে, তাহা প্রকৃতপক্ষে প্রমা বা যথার্থ জ্ঞানের কারণ কি না, ইহা বিচার করা উচিত। কেননা নিখিল লোকব্যবহার প্রমাণাধীন। কি হিতাহিত বিবেকক্ষম মানবজাতি, কি অবিবেকী ইতর জীববৃন্দ সকলেই প্রমাণ-বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম কবিয়া থাকে। এই জন্যই আচার্য্যপ্রবর শঙ্কর বলিয়াছেন— "সমানঃ পশ্বাদিভিঃ পুরুষাণাং প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ।" সুতরাং নিরপেক্ষ-ভাবে বিচার করিলে, সত্যসত্যই যদি প্রতীচ্য জড়বাদ ভ্রমপ্রমাদবিহীন-হেতু অসন্দিগ্ধবাদরূপে প্রমাণীকৃত হয়, তাহা হইলে বেদাদি শাস্ত্রব্যাখ্যাত সৃষ্টিতত্ত্বের সত্যাসত্যবিনির্ণয়ে নিশ্চয়ই প্রতীচ্য জড়বাদকে প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। নতুবা তত্ত্বজ্ঞানাকাঙ্ক্ষার দারুণ পিপাসা মিটিবে না। মিথ্যার উপাসনা চিরদিন চলে না। অতএব পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক, প্রতীচ্য জড়-বাদ, যাহা অস্মদ্দেশে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে, তাহার প্রামাণ্য কোথায়?

অভিব্যক্তিবাদের সারকথা সংকলনকালে আমরা দেখিয়াছি যে, প্রলয়ান্তে সাম্যে অবস্থিত একরূপে পরিণত আকর্ষণবিপ্রকর্ষণধর্ম্মাত্মক শক্তি-পুঞ্জই স্পেন্সারের অনাদি অনন্ত ও অচেতন 'সৎ' পদবাচ্য বস্তুই একমাত্র পরম কারণ। স্বতন্ত্র প্রবর্ত্তকনিবর্ত্তকের অভাবহেতু অচেতন এই 'সৎ' পদার্থ স্বভাবতই বিকাশশীল এবং অতীন্দ্রিয় হইলেও তদ্বিকারজাত পদার্থ-নিচয় হইতে উহার অস্তিত্ব অনুমেয়। এই সৎ-পদার্থ নিত্য ও বিভু এবং মূলে মূলাভাবপ্রযুক্ত ইহা এক অদ্বিতীয়, অপরিচ্ছন্ন ও সর্ব্বপদার্থের উপাদান-স্বরূপ। সংসারে আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই, তৎসমুদায়ই এই সৎ পদার্থের বিকারসমুদ্ভূত—অর্থাৎ কি সচেতন, কি অচেতন, সকল পদার্থই আত্মস্বরহিত ঐ অচেতন 'সৎ'এর বিকৃতিমাত্র। আত্মস্বরহিত অচেতন উক্ত সৎ পদার্থ এক ও অদ্বিতীয় হইলেও বিষমগুণত্বহেতু আত্মগত 'আকর্ষণ বিপ্রকর্ষণ' নামধেয় পরিণামশক্তির দ্বারা অচেতন সচেতন দেহাদিবিমণ্ডিত, সুখদুঃখবিজড়িত এই বিচিত্র রচনাময় জগৎ উৎপাদন করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মূলে মূলাভাবপ্রযুক্ত অচেতন এই 'সৎ' পদার্থই যাবতীয় বিকৃতির একমাত্র পরম কারণ। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, এতদ্দ্বারা উক্ত 'সৎ' পদার্থের জগন্নিমিত্তোপাদানরূপত্বই সূচিত হইয়াছে।

স্পেন্সারাদির মতে, 'প্রত্যক্ষ' ও তন্মূলক 'অনুমান'—এই দুইটিই প্রমাণ বস্তুতত্ত্বজ্ঞানের কারণ। উপমানাদি অপরাপর প্রমাণ, উক্ত প্রমাণদ্বয়েরই অন্তর্গত। সুতরাং এতন্মতে অতিরিক্ত প্রমাণের আর স্বীকার নাই।

অতএব এখন বেশ বুঝা যাইতেছে যে, প্রতীচ্য অভিব্যক্তিবাদে, আদ্যন্ত-রহিত এক 'অচেতন' সত্তা বা 'সৎ' পদার্থকে জগদুৎপত্তির কারণ রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার নিরাস প্রয়োজন। কারণ, উক্ত মতের নিরাসেই স্পেন্সারাদিব্যাখ্যাত সৃষ্টিরহস্যবিষয়ক সকল মতবাদই নিরাসিত হইবে এবং তদ্ধেতু জিজ্ঞাস্য হইতেছে—স্পেন্সারাদির যথোক্ত 'সৎ' পদার্থ জগদুৎপত্তির কিরূপ কারণ—নিমিত্ত, না উপাদান, অথবা নিমিত্তোপাদান উভয়ই ?—

পূর্ব্বপক্ষ বলেন—প্রোক্ত 'সৎ' নামাভিধেয় সচেতন পদার্থ জগতের যেমন উপাদান কারণ, তেমনিই নিমিত্তকারণও বটে। উপাদান, কার্য্যের সজাতীয়ই হইয়া থাকে। যেমন অচেতন জড়ই, জড়পদার্থজাত বস্তুনিচয়ের উপাদান এবং বৃক্ষাদির ফলোৎপাদন দৃষ্টে অচেতন 'সৎ' পদার্থের নিমিত্ত-কারণত্বও অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

ক। পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের প্রতিবাদস্বরূপে কিন্তু একথা বলা যাইতে পারে যে, তোমাদের ঐরূপ সিদ্ধান্ত সৎ সিদ্ধান্ত নহে। কেননা তোমাদেরই মতে তোমাদের তথাকথিত 'সৎ' পদার্থ 'অচেতন। বস্তুতত্ত্বঃ নিরূপণে তোমরা যে প্রমাণদ্বয় স্বীকার কর, সেই প্রমাণদ্বয়ই তোমাদের সিদ্ধান্তের অনুকূল নহে। যেহেতু 'প্রত্যক্ষ' ও তন্মূলক অনুমান—এতদুভয় প্রমাণের সাহায্যে বিচার করিয়া দেখিলে তোমাদের ঐ সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়ে। জগদুৎপত্তিব্যাপারে তোমরা অচেতন 'সৎ'কে নিমিত্তকারণরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার কর্ত্তৃত্ব স্বয়ং ক্রিয়াকারিত্ব প্রতিষ্ঠা করিতেছ। তোমাদের ন্যায়ানুসারে তোমরাই বলিয়া থাক, 'দৃষ্টব্যাপার হইতে অদৃষ্টব্যাপারের অনুমান করিতে হয়।' তোমাদের 'সৎ'নামাভিধেয় পদার্থ ত অচেতন সুতরাং জ্ঞানশূন্য। আচ্ছা বল দেখি, এই পরিদৃশ্যমান সংসারে অচেতনের কর্ত্তৃত্ব—স্বয়ং ক্রিয়াকারিত্ব কোথায় দেখিয়াছ ? জ্ঞানশূন্য অচেতন জড়নির্ম্মিত বাষ্পীয়পোতাদি যন্ত্রসমূহের যে ক্রিয়াদি দেখিতে পাও, তাহা কি কখন সচেতনের অধিষ্ঠানব্যতিরেকে সম্পাদিত হইতে দেখিয়াছ ? বৃক্ষাদির ফলোৎপাদনাদি ব্যাপারেও চৈতন্যের অধিষ্ঠান অনু

মিত হয় : কেননা, চেতনাবিহীন বৃক্ষাদির পত্রপল্লবাদি বৃদ্ধি বা তাহার ফলোৎপাদন দৃষ্ট হয় না। সুতরাং তোমাদের তথাকথিত 'সৎ'পদার্থের অচেতনত্বহেতু জগৎ-সর্জ্জনব্যাপারে তাহার কর্তৃত্ব অসম্ভব।

খ। আর এক কথা। তোমাদের তথাকথিত 'সৎ' পদার্থের অচেতনত্ব হেতু জগদুৎপত্তিব্যাপারে তাহার উপাদান-কারণত্বও অসম্ভব। কেন-না মূলে মূলাভাবনিবন্ধন তোমাদের অচেতন 'সৎ' পদার্থই তোমাদের মতে 'পরম কারণ' এবং এতদ্ব্যতিরিক্ত অন্য পদার্থের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব অস্বীকার হেতু উক্ত তথাকথিত 'সৎ' পদবাচ্য 'অর্থ' বা বস্তু এক ও অদ্বিতীয়। তোমরা আরও বলিয়া থাক যে, সাম্যাবস্থায় বিদ্যমান পরম কারণ—অচেতন হইলেও আপনাপনিই জগদুপাদানত্বে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। কিন্তু 'প্রত্যক্ষ' ও 'অনু-মান' এতদ্ প্রমাণদ্বয় দ্বারা তোমাদের এ কথার যাথার্থ্য প্রমাণীকৃত হয় না। প্রত্যক্ষ ও অনুমান সাহায্যে বিচার করিয়া দেখিলে বরং ইহাই সিদ্ধ হয় যে, সচেতনের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে অচেতন জড় পদার্থ কর্ম্মঠ হয় না। অচে-তন জড়পদার্থকে স্বয়ং প্রেরিত হইয়া ঘটপটযন্ত্রাদি উদ্ভাবন করিতে কখন দেখা যায় নাই। পরন্তু চেতনাধিষ্ঠিত জীবই অচেতন জড়পদার্থসাহায্যে ঘটপটযন্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। সুতরাং দৃষ্টবস্তু হইতে অদৃষ্টব্যাপা-রের অনুমান করিতে হইলে, বিচিত্র রচনাময় জগদুৎপাদনব্যাপারে কোন বিশিষ্ট চৈতন্যবানের আবশ্যক। কিন্তু হে পূর্ব্বপক্ষিন্, তোমার মতে তাঁহার অস্তিত্বই নাই। অতএব জগদুৎপত্তিতে তোমাদের তথাকথিত সৎপদার্থের অচেতনত্বহেতু তাহার উপাদান-কারণত্বও অসম্ভব।

গ। সুখদুঃখের ভূমি হইতে বিচার করিয়া দেখিলেও তথাকথিত 'সৎ' নামাভিধেয় অচেতন শক্তির উপাদানত্ব প্রভৃতি সিদ্ধ হয় না। বিচিত্র রচনাময় এই বিশ্বসংসার সুখদুঃখজড়িত। 'কারণ গুণ, কার্য্যেই অনুগমন করে'। 'কারণে যাহা নাই, কার্য্যেও তাহা থাকিতে পারে না' ইত্যাদি প্রমাণানু-সারে অচেতন হইতে সচেতনের অভিব্যক্তি হয় না। সুখদুঃখ জ্ঞান আপেক্ষিক ও আন্তরিক। সচেতনের নিকটই ইহাদের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। সচেতন অন্তঃকরণাদিসাহায্যে সুখদুঃখের জ্ঞান অর্জ্জন করে। যাহা আপনার উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল, সচেতনের নিকট তাহা সুখোৎপাদক; উদ্দেশ্যসিদ্ধির যাহা প্রতিকূল, সচেতনের নিকট তাহা দুঃখপ্রদ। দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশ্যে সচেতন অনুক্ষণ কর্ম্ম করিয়া থাকে। কর্ম্ম-

মাত্রেই ত্যাগ ও গ্রহণাত্মক। যাহা স্বীয় উদ্দেশ্যসিদ্ধির অনুকূল, সচেতন—তাহারই নিকট আগমন করে—তাহাকেই গ্রহণ করে—অন্যথা বিবেচনা করিলে ত্যাগ করে। দেখনা কেন, পশ্বাদি ইতর জীববৃন্দও ইন্দ্রিয়-গৃহীত বিষয়কে আপনার প্রতিকূল বিবেচনা করিলে—দণ্ডোদ্যতকর পুরুষকে আপনার সম্মুখবর্ত্তী হইতে দেখিলে—তৎক্ষণাৎ তাহার সকাশ হইতে দূরে পলায়ন করে; কিন্তু হরিত-তৃণপূর্ণপাণি অনুকূল পুরুষকে দেখিলে তাহার নিকট আগমন করে। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্মমাত্রেই ত্যাগ-গ্রহণাত্মক এবং ত্যাগগ্রহণও আবার বিচারাত্মক। ঈষৎ চিন্তা করিলেই বেশ প্রতীয়মান হইবে যে, এবম্বিধ অনুকূলপ্রতিকূল বিচার সচেতনের পক্ষেই সম্ভব—উদ্দেশ্যবিহীন অচেতনের পক্ষে নহে। কিন্তু তথাকথিত 'সৎ' পদার্থ অচেতন এক ও অদ্বিতীয়; সুতরাং অচেতন হইতে উদ্ভূত অচেতন পদার্থজাতও অচেতন; যেহেতু কারণগুণ কার্য্যেই পর্য্যবসিত হয়। এই বিশ্বসংসারকে 'সৎ' নামাভিধেয় এক অচেতন জড়শক্তির বিকাররূপে গ্রহণ করিলেও অচেতনত্বহেতু ইহাকে সুখ-দুঃখের বিচারক্ষম বলিয়া স্বীকার করা যায় না। দৃষ্টব্যাপারাদি হইতে অদৃষ্টব্যাপারাদির অনুমান করিতে হইলে, প্রাচীর-প্রাসাদাদি উপাদানভূত অচেতন ইষ্টকাদির অনুকূলপ্রতিকূল সুখদুঃখাদি বিচার কেহই কখন প্রত্যক্ষ করে নাই। সুতরাং সুখাদির ভূমি হইতে দৃষ্টিপাত করিলেও জগন্নিমিত্তোপাদান-ভূত "মূলে মূলাভাবা" তথাকথিত এক ও অদ্বিতীয় 'সৎ' নামাভিধেয় পদার্থের অচেতনত্বনিবন্ধন, তাহাকে সুখদুঃখ প্রভৃতি আন্তরিক জ্ঞানাশ্রিত বিচিত্র রচনাময় বিশ্বাভি-ব্যক্তির এক ও অদ্বিতীয় পরমকারণরূপেও অনুমান করা যায় না।

ক্রমশঃ।

রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব।

বিগত ২০শে মার্চ্চ বেলুড় মঠপ্রাঙ্গণে এক সুমহৎ দৃশ্যের অভিনয় হইয়াছিল। যাঁহার অমানুষী লোকপাবনী চরিতগাথা আজ লোকের ঘরে ঘরে সাদরে গীত হইতেছে, সেই সমন্বয়াবতার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মমহোৎসব বাস্তবিকই এক অতি অপরূপ সামগ্রী। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ষের ন্যায় এবারও বহু-সংখ্যক ভক্তমণ্ডলী সমবেত হইয়া এই শুভ অবসরে ভাগিরথীতীরে পবিত্র

মঠক্ষেত্রে ভগবানের নামগুণকীর্ত্তনে আপনাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। তবে এবারের জনসংখ্যা কিছু অধিক। বেলা ১০ ঘটিকা হইতে অপরাহ্ন পর্য্যন্ত জনস্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহে আসা যাওয়া করিয়াছিল, এজন্য কত লোক সমবেত হইয়াছিল, তাহার নির্ণয় করা সুকঠিন। বহুদল সংকীর্ত্তন ও সঙ্গীত-সম্প্রদায় নিজ নিজ সম্প্রদায়ের অভিমত ভগবদ্বিষয়ক গানে লোকসকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল; ইহাদের প্রত্যেকের ধর্ম্মবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত ও ধারণা হইলেও ঠাকুরের দরবারে তাহারা 'সূত্রে মণিগণাইব' স্থান পাইয়াছিল; হিংসাদ্বেষাদি ভুলিয়া এই শুভ মুহূর্ত্তে তাহারা প্রাণ খুলিয়া ভজনানন্দ উপভোগ করিয়াছিল। এবারের এক বিশেষত্ব রামনাম সংকীর্ত্তন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ দাক্ষিণাত্য হইতে এই মনোহর গাথা আনয়ন করিয়া মঠের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসিগণকে শিখাইয়া গান করাইয়াছিলেন এবং স্বয়ংও ইহাতে যোগদান করিয়া সকলের আনন্দ বিধান করিয়াছিলেন। এই গাথায় শ্রীরামচন্দ্রের সমগ্র পূত চরিত সংক্ষেপে ও সরল ভাষায় সন্নিবেশিত আছে। শ্রোতৃমাত্রেরই উহা হৃদয়াভিরাম হইয়াছিল। আন্দুলের বিখ্যাত কালীকীর্ত্তন সম্প্রদায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় শ্রীশ্রীজগন্মাতার নামগানে বহুসংখ্যক ভক্তবৃন্দকে মোহিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও দুইটী তরজার দলে অতি কৌতুককর কবিতাযুদ্ধ চলিয়াছিল। প্রতিদ্বন্দ্বী গায়কগণের উপস্থিত রচনাশক্তি ও পৌরাণিক অভিজ্ঞতা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। সুবিস্তৃত চন্দ্রাতপতলে শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের বৃহৎ তৈলচিত্র কলিকাতার শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সুন্দরভাবে সজ্জিত হইয়া ভক্তবৃন্দের আনন্দবিধান করিয়াছিল। প্রায় তিন শত ভক্তযুবক দলবদ্ধ হইয়া জনসাধারণকে প্রসাদ বিতরণ করিবার ভার লইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব সমাগত ভক্তদের কাহাকেও মিষ্টমুখ না করাইয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিতে দিতেন না; তাঁহার ঐ ভাবটী রক্ষা করাই এই প্রসাদ বিতরণের উদ্দেশ্য। মঠের সন্ন্যাসিগণ উপস্থিত জনসংঘের যাহাতে আদর অভ্যর্থনা ও আনন্দের ব্যাঘাত না হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া চতুর্দ্দিকে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন এবং "জয় গুরু মহারাজজীকী জয়", "জয় স্বামিজী মহারাজজীকী জয়" ইত্যাদি জয়রব বহু কণ্ঠোচ্চারিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ গগণ প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল। সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বেই উৎসবের বিরাম হয়।

উৎসবের কয়েক দিন পূর্ব্বে ফাল্গুনী শুক্লাদ্বিতীয়ায় পরমহংসদেবের জন্মতিথি-পূজা মঠে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তিথি-পূজা এবৎসর রবিবারে পড়ায় সে দিনও বিস্তর ভক্ত যোগদান করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞ গায়কগণ এই দিনে ভগবদ্বিষয়ক গানে সকলকে মোহিত করিয়াছিলেন এবং এদিনও প্রসাদ বিতরণ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। শ্রীশ্রীমহামায়ার পূজান্তে রাত্রিশেষে হোমক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

তিথিপূজা ও মহোৎসব হইতে আমরা একটী বিশেষ শিক্ষা পাই। "বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়" যাঁহাদের জীবন উৎসৃষ্ট হয়, সেই লোকোত্তর পুরুষগণের এক অপূর্ব্ব আকর্ষণী শক্তি থাকে। মানুষ সেই শক্তিপ্রভাবে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে তাঁহাদের পূতচরিত্রের ধ্যানে আকৃষ্ট হইয়া উন্নত ও ধন্য হয়। ঐ শক্তির বিকাশ তাঁহাদের জীবদ্দশাতে যেরূপ, তাঁহাদের অদর্শনের পর তদপেক্ষা আরও অধিক উজ্জ্বল ভাব ধারণ করে। দেশবিশেষে ও জাতিবিশেষে ঐ শক্তির বিকাশ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হইলেও উহার সীমার মধ্যে যাহারা আসিয়া পড়ে, তাহারা সকলেই ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হয়। ঠাকুর যেমন বলিতেন—"অমৃতকুণ্ডে যেরূপেই পড় না কেন, একটু পেটে যাইলেই অমর হইয়া যাইবে।" অমৃতস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এই মাহেন্দ্রক্ষণে স্মরণ মনন করিয়া ও কামকাঞ্চন ত্যাগই অমৃতত্বলাভের একমাত্র উপায়, তাঁহার এই অমূল্য উপদেশের সার্থকতা কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা চরিতার্থ হইয়াছি এবং শ্রীভগবানের চরণে বারবার প্রণাম করিতেছি—

"স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপিণে
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।"

জনৈক দর্শক

ভারতের শিল্পাদর্শ।

[শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ।]

প্রকৃতিতে ভগবান্ অনুপ্রবিষ্ট থাকিলেও মানুষের মধ্যেই তাঁহার শ্রেষ্ঠ বিকাশ। ভগবানের সৃষ্টি প্রকৃতি, মানুষের সৃষ্টি শিল্প। ভগবান্ যেমন কল্পনায় বিশ্ব সৃজন করিয়াছেন, মানুষ তেমনি কল্পনায় শিল্প বিকাশ করে। কিন্তু ব্যক্তি এবং জাতি বিশেষে কল্পনা বিভিন্ন, সুতরাং বিভিন্ন জাতির শিল্পও বিভিন্ন। এই বিভিন্নতার কারণ না জানিলে প্রকৃত শিল্পতত্ত্ব জানা যায়

না। অতএব ব্যক্তি বা জাতিগত পার্থক্য কিসে উৎপন্ন হয়, পূর্ব্বে তাহাই দেখা যাক্।

মানবমন স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়গত বটে, কিন্তু কোথাও পূর্ণ, কোথাও আংশিক ভাবে, অথচ সকল মানুষই প্রকৃতিরূপিনী জগজ্জননীর ক্রোড়ে লালিত পালিত ব্যক্তির মানসিক গঠনে একথা যেমন খাটে, ব্যক্তির সমষ্টি জাতির মানসিক গঠনেও তদ্রূপ। কিন্তু যে জাতির মন যত কম পরিমাণে ইন্দ্রিয়াকৃষ্ট, তাহারই প্রকৃতির সঙ্গে তত ঘনিষ্ঠতা বেশী দেখা যায় এবং তাহারই শিল্পরাজ্যে তত মৌলিকতা থাকে। পক্ষান্তরে যে সমস্ত জাতির মন অধিক ইন্দ্রিয়াকৃষ্ট, তাহারা আত্মতৃপ্তির জন্যই ব্যস্ত, সুতরাং এই বিশ্বপ্রসবিনী বিরাট্ প্রকৃতির স্থুল ভিন্ন সূক্ষ্ম তত্ত্ব তাহারা রাখিতে চায় না, পারেও না। কারণ, প্রথম গুণবিশিষ্ট জাতির আনন্দোপলব্ধি মনে এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সূক্ষ্ম বিষয়সকলে এবং অপব গুণবিশিষ্ট জাতিসকলের আনন্দোপলব্ধি ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনায় ও অপরিমার্জ্জিত অশিক্ষিত ইন্দ্রিয়সকলের গ্রাহ্য রূপরসাদি বিষয়সকলের স্থুলভাবে এই বিভিন্ন আনন্দতৃষাই মনে বিভিন্ন লিপ্সার উৎপত্তি করিয়া মানুষকে বিভিন্ন কার্য্যের অনুষ্ঠান করায়। যেখানে অধিককাল স্থায়ী সূক্ষ্ম আনন্দের কামনা, সেইখানে মন চিন্তাশীল। সে মনের সম্মুখে বহির্জ্জগতে কোন একটা ঘটনা সংঘটিত হইলেই সে তদ্বিষয়ের কারণ বা সূক্ষ্মতত্ত্ব আবিষ্কারে সদাই লিপ্ত হয়; তখন তাহার আর আত্মতৃপ্তি বা শরীরেন্দ্রিয়ের ভোগের কোন লক্ষ্য থাকে না। মনের এইরূপ অবস্থায় উপস্থিত হইলে মানুষ জীবনযাত্রার জন্য চেষ্টা করিলেও প্রধানতঃ প্রকৃতির সকল বিষবেব কারণ বা তত্ত্ব আবিষ্কারেই মগ্ন হয়। ঐ চেষ্টার ফলেই মানবমনে ক্রমশঃ কল্পনাদেবী সম্যক্ জাগরিতা হইয়া উঠিয়া তাহাকে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের পূজা এবং পরে আত্মবিশ্লেষণে নিযুক্ত করেন। আমরা সাধারণতঃ যাহাকে শিল্প বলি, তাহা এই পূজা হইতেই উৎপন্ন। পক্ষান্তরে যেখানে মন ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনাপ্রসূত স্থুল ক্ষণিক আনন্দই চায়, সেখানে ভোগ্যবস্তুর হাত এড়াইয়া সে আর উচ্চতর স্তরে উঠিতে চায় না এবং উঠিতে সমর্থও হয় না। সেখানে কল্পনাদেবী নিদ্রিতা এবং দুষ্পুর ভোগকামনায় রাগদ্বেষাদি নীচ প্রবৃত্তিসমূহ জাগরিত হইয়া জীবন জটিলতাময় করে। এরূপ মনে শিল্প-প্রসূতি উচ্চ কল্পনা কখন জাগিয়া উঠে না।

পূর্ব্বোক্ত উভয়প্রকার প্রকৃতির সংমিশ্রন যেমন সমস্ত মানবজাতির

ভিতরেই দেখা যায়, তদ্রূপ এক বা অন্যের প্রাধান্যও প্রত্যেক জাতিতেই লক্ষিত হয়। প্রথম প্রকৃতির প্রাধান্য যেখানে, সে জাতিকে আমরা আত্ম-বাদী এবং দ্বিতীয় প্রকৃতির প্রাধান্য যেখানে, সে জাতিকে দেহ বা জড়বাদী বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।

পৃথিবীস্থ অন্যান্য জাতির সহিত তুলনায় জাতীয় জীবনের আলোচনায় দেখা যায় যে, বৈদিক যুগের পূর্ব্ব হইতেই আমাদের আদিপুরুষদের মনে একটা স্বভাবসিদ্ধ শ্রদ্ধা যাবতীয় প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তির উপর ছিল। সেই শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি করিতে যাইয়াই তাঁহাদের ভিতর কবিতা, সঙ্গীত ও নানা-বিধ পূজা এবং যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান আরব্ধ হয়। আর্য্যজাতির এই ভাগের ইতিহাস আলোচনায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা শিল্পকে ধর্ম্মের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন; মনে হয়, ধর্ম্ম ও শিল্পের সম্বন্ধ তাঁহাদের ভিতর ভাব ও ভাষার সম্বন্ধের ন্যায় গণ্য হইত।

আমাদের বিবেচনায় বাস্তবিকই শিল্প একপ্রকার ভাষা, যাহা দ্বারা মানুষ আপন উচ্চ মনোভাবসমূহ প্রকাশ করে বা জীবনের উচ্চ আদর্শ-সমূহে উঠিবার উদ্যম দেখায়। এইরূপে অতি সংক্ষেপে অতি উচ্চ তত্ত্বসকলের শিক্ষা দেওয়াই প্রকৃত শিল্প বলিয়া বোধ হয়। সেজন্যই শিল্প ভাব ও বাস্তব জগতের সেতুবিশেষ। স্বামী বিবেকানন্দ শিল্পের এই দিক্‌টি লক্ষ্য করিয়া কখন কখন প্রস্ফুটিত নলিনীর সঙ্গে শিল্পের তুলনা করিতেন। পদ্ম যেমন পঙ্কিল জলে জন্মায় এবং সেই জলের সংস্পর্শ ত্যাগ না করিয়া অথচ জল হইতে ঊর্দ্ধে উঠিয়া আত্মগরিমা বিস্তার করে, শিল্পও সেই প্রকার রূপরসাদি বাস্তব বস্তুর স্থূল বা ইন্দ্রিয়-উত্তেজক ভাবসমূহ অব-লম্বনে জন্মলাভ করিয়া ঐ সকল নীচ ভাব হইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া উত্তেজনা ও অবসাদশূন্য ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে উপস্থিত হয় এবং দেবভাবসমূহ প্রকাশ করিতে থাকে। অন্তঃ বা বহিঃ প্রকৃতির যথাযথ বর্ণনা বা নকল করা এইজন্য উচ্চদরের শিল্প বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না।

সর্ব্বকালেই শিল্প শিল্পীর স্বধর্ম্মের পরিচায়ক। শিল্পীর যেমন স্বভাব, যেমন মনোভাব, জীবনের যেমন উদ্দেশ্য, শিল্পে তাহার পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। এজন্য কোন জাতির শিল্পে কেবল ভোগবিলাস, স্থলযুদ্ধ, জলযুদ্ধ, জলদৃশ্য, স্থলদৃশ্য, দৈনিক জীবনে পরস্পরের প্রতিযোগিতা প্রভৃতি স্থূল মানব-প্রকৃতিরই পরিচয় পাওয়া যায়; আবার কোন জাতির শিল্পে ঐ সমস্ত স্থূল

ভাব কিছু কিছু থাকিলেও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবসমূহ বিকাশে মহা পারিপাট্য দেখা যায়। এইজন্য বিভিন্ন জাতির শিল্প বিভিন্ন রকমের, আর তাই এক জাতিকে অন্য জাতির শিল্পের কোন একটা বিশেষ ভাব গ্রহণ করিতে দেখিতে পাইলেও ঐ জাতির সম্পূর্ণ শিল্প গ্রহণে অক্ষম দেখা যায়। যেমন একটা জাতি নিজের ভাব ও ভাষা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোন জাতির ভাব ও ভাষা গ্রহণ করিতে যাইলে বিফলমনোরথ হয় এবং কখন কখন ঐরূপ অনুকরণচেষ্টার ফলে আপন অস্তিত্বের লোপ করিয়া বসে, শিল্প সম্বন্ধেও তদ্রূপ একজাতি অপর জাতিকে সম্পূর্ণ অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিলে বিফলমনোরথ বা বিনষ্ট হইয়া যায়।

ইতিহাসের তীক্ষ্ণদৃষ্টি অতীতের অন্ধতমঃ ভেদে যতই সমর্থ হইতেছে, ততই প্রমাণিত হইতেছে, পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে যে সমস্ত উচ্চ ধর্ম্মচিন্তার নিদর্শন পাওয়া যায়, সে সমস্ত ভাবই ভারতের আত্মবাদীর হৃদয় হইতে প্রথম উদ্ভূত এবং উন্নত মনের উন্নত ভাব প্রকাশক সঙ্গীতাদি শিল্পাঙ্গসকল ও ভারত হইতেই প্রথম অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। হইবারই কথা—কারণ, উন্নত মনের পরাকাষ্ঠার বিকাশ বৈদিক ঋষিদের মধ্যেই প্রথম হইয়াছিল। বেদান্তবাদী বলেন, মানবজীবনের চরম উন্নতিতেই ঈশ্বর উপলব্ধি বা মানুষের উন্নতির শেষসীমাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি; ঋষিরাই তাহার উদাহরণ। কথাটি সত্য হইলে কল্পনা প্রভৃতি মানব চরিত্র উন্নতকারী সকল ভাবই ঐ সীমার মধ্যে অবস্থিত স্বীকার করিতে হয়। সেজন্যই আমাদের দেশে সাধারণ সিদ্ধান্ত এই যে, সকল বিষয়েই মানবজাতির প্রকৃত উন্নতিসাধন আত্মবাদীর দ্বারাই হইয়াছে, এখনও হয়, আর ভবিষ্যতেও হইবে, এবং পৃথিবীতে ঐ শ্রেণীর লোকেরাই প্রথমে শিল্প প্রণয়ন করেন। অসুরাদি বর্ব্বর জাতিরা দেবতাদিগের নিকট সর্ব্বপ্রকার শিল্পশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া শিল্পচর্চ্চা করিতে থাকে; একথা বেদে গল্পচ্ছলে বিবৃত আছে। তাহাদের হাতে শিল্পের পবিত্রতা ও উচ্চ উদ্দেশ্য যে বারম্বার বিনষ্ট হইয়াছিল, একথাও বেশ অনুমিত হয়।

মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, যাঁহারা সামগাথার রচয়িতা, তাঁহারাই যে সেই সব বেদগাথার স্বরলিপি প্রস্তুত করিয়া বীণার সংযোগে ঐ সকল প্রথম গান করেন, ইহা নিঃসংশয়। তদ্ভিন্ন দেশে একটা কিম্বদন্তিও আছে যে, সপ্ত সুর ও তিন গ্রাম মহাদেবের কণ্ঠেই প্রথম উৎপন্ন হয়। তাই সঙ্গীতবিদ্যা মহাপবিত্র বলিয়া গণ্য। নাদই ব্রহ্ম এবং প্রণবরূপী নাদ হইতেই সুরের উৎপত্তি এ

কথাতেও সঙ্গীতের পবিত্রতা বিশিষ্টরূপে ব্যক্ত।* ভারতের ইতিহাসে এই-রূপে ধর্ম্ম অনুষ্ঠানেই যে শিল্পের জন্ম, একথা বেশ অনুমিত হয় এবং ভারতে শিল্পের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে করিতে এমন স্থলে উপনীত হইতে হয় যে, সেখান হইতে দৃষ্টি করিয়া মনে হয় যেন শিল্প ও ধর্ম্মে কোন পার্থক্য নাই—দুই এক বস্তুর বিভিন্ন বিকাশ অথবা উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। আমাদের দার্শ-নিকেরাও একথা চিরকাল বলিয়াছেন যে, এ বিশ্বসংসারের কি সূক্ষ্ম, কি স্থূল সকল বস্তুই পরস্পর চিরসম্বদ্ধ বা এক বিরাট্ অভিব্যক্তির সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে নিবদ্ধ। তাই সূক্ষ্ম জগতের তত্ত্ব বুঝিতে পারিলে, স্থূল জগতের তত্ত্বও আয়ত্ত হয়। এই কথাটি পূর্ব্ব হইতে বুঝিয়াছিল বলিয়াই এ মন্ত্রদ্রষ্টা জাতির কোন প্রকার শিক্ষার জন্য পুরাকালে কাহারও মুখাপেক্ষী হ'তে হয়নি। বেদোক্ত ধর্ম্মতত্ত্বসকলের ন্যায় বেদাঙ্গোক্ত সঙ্গীতশিল্পাদির উচ্চ তত্ত্ব সকলও এই জাতির ভিতর আপনাপনি স্ফুরিত হইয়াছিল। বেদে বৈদিক যুগের সভ্য-তার যে প্রকার নিদর্শন পাওয়া যায় আর আর্য্যদের যে প্রকার আত্ম-নির্ভরতা, জীবনের পবিত্র ও উচ্চ উদ্দেশ্যবোধ এবং তাৎকালিক সমাজ-বন্ধনের ভিতরে যে পরিমাণে সেই উদার উদ্দেশ্যের জীবনে পরিণত করি-বার ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে মনে হয়, পৃথিবীর অন্যত্র কোথাও হইবার পূর্ব্বে ভারতেই আর্য্যঋষিগণ সমস্ত উচ্চশিল্পের প্রণয়ন করেন। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে বেদে ও পুরাণে ঐ বিষয়ের বহু প্রমাণ বিদ্যমান দেখিতে পাই। বেদে প্রস্তরনির্ম্মিত নগর, লৌহনির্ম্মিত শত-প্রাচীরবিশিষ্ট রাজধানী, তেতলা চারিতলা বাটী, কারুকার্য্যখচিত প্রস্তর, ইষ্টকের অট্টালিকা প্রভৃতি বহুবিধ বৈভবের উক্তি দৃষ্ট হয়। বশিষ্ঠ ঋষি এক মন্ত্রে পর্য্যন্যের নিকট একটী ত্রিতল বসতবাটীর জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।† দেখিয়া মনে হয়, পূর্ব্বে ত্রিতল বাটী ছিল না, বশিষ্ঠদেবই তাহার প্রথম কল্পনা ও নির্ম্মাণ করেন। ডাক্তার মুর বলেন যে, বেদে রূপকভাবে শতভুজী দুর্গবিশিষ্ট জনপদ প্রভৃতির উক্তি আছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐ প্রকার জন-পদাদি তৎকালে বিদ্যমান না থাকিলে ঐ প্রকার রূপক ও উপমা সকল কেমন করিয়া ঋকরচয়িতা ঋষিদিগের মনে উদয় হইবে?‡ ঋক্‌বেদের ২য় মণ্ডলে

* The Indo-Aryans, Vol. I. P. 26.

† Wilson's Rigveda, IV. P. 200.

‡ Dr. Muir's Sanskrit texts, V. P. 421.

ধার্ম্মিক অনত্যাচারী রাজারা সহস্রস্তম্ভযুক্ত সুসজ্জিত প্রাসাদে বাস করেন এবং ঐ প্রাসাদের প্রকোষ্ঠসকল অতি বিশাল ও সহস্রদ্বারবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত আছে। মুর বলেন, এ সমস্ত বর্ণনা কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত। কিন্তু যে জাতি অজন্তা, ইলোরা, এলিফন্তা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে কি সহস্রদ্বার ও সহস্রস্তম্ভযুক্ত প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ এতই অসম্ভব যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, ওসব কবির কল্পনা ও মিথ্যা। মুরের মতে মত দিয়া এ সমস্তকে কবির মনের অতিরঞ্জিত কল্পনা মনে করিলেও আমাদের বুঝা উচিত যে, পরবর্ত্তী সময়ে ঐ সমস্ত কল্পনা কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভব এবং মানবসমাজের উন্নতি এই প্রকার উচ্চকল্পনা দ্বারাই চিরকাল সাধিত হইয়াছে। পাণিনির মহাভাষ্যে ভাস্কর কথার ব্যুৎপত্তি দেওয়া আছে। * রামচন্দ্র স্বর্ণসীতা নির্ম্মাণ করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, রামায়ণে এ কথার উল্লেখ দেখা যায়। ইহা হইতে অনুমিত হয়, ভাস্কর্য্য শিল্প গ্রীকদের বহুপূর্ব্বে ভারতে চর্চ্চিত হইত। বেদে পোষাকপরিচ্ছদের বিশেষ বর্ণনা না পাইলেও বিলক্ষণ আভাষ পাওয়া যায়, পূর্ব্বোক্ত বৈভবের উপযুক্ত পরিচ্ছদ ছিল। অবশ্য ধুতিচাদরই তাহার মধ্যে প্রধান পরিধেয় ছিল বলিয়া মনে হয় এবং এইজন্যই আমাদের বৈদিক সংস্কারসূচক ক্রিয়া-কলাপে এখনও ঐ পরিধেয়ের দরকার হয়। কর্ণেল টেলর বলেন, "আরামে বেড়াতে, বস্‌তে, শুতে এমন উপযোগী ও উত্তম পরিচ্ছদ আর হতে পারে না।" † ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন যে, বৈদিক বীর-পুরুষেরা যখন ধাতু-বর্ম্ম পরিতে জানিতেন, তখন কি জামা, পা-জামা পরিতে জানিতেন না? বোধ হয় কেন, নিশ্চয়ই কাপড় কাটিয়া ছুঁচে শেলাই করিয়া পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে জানিতেন, কেননা ছুঁচ ও শেলাইএর উক্তি বেদে আছে। ‡

ওল্‌ড্‌ টেষ্টামেণ্টে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরাকালে ভারতবাসীরা প্রচুর পরিমাণে কাপড় বুনিত এবং তাহার কিয়দংশ বিক্রয়ার্থ বিদেশেও পাঠাইত। § ভারত হইতে তায়র বাবিলন প্রভৃতি দেশে বহুবিধ রঙ্গীন

* Ibid, P. 19.

† Edinburgh Review, July 1867.

‡ Wilson's Rigveda, II. P. 288.

§ Ezakiel, XXVII. 24.

কাপড়ের আমদানি হইত। (১) ইহা ব্যতীত চিত্রকলা ভাস্কর্য্য প্রভৃতির কথা সকল পুরাণেই বর্ত্তমান এবং শিল্প সম্বন্ধে বহু প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সকল এখনও বর্ত্তমান আছে।

বেদে ক্ষুরের উক্তি আছে, (২) নাপিতের কথাও আছে (৩)। বৈদিক আর্য্যদের মধ্যে দাড়ি রাখার প্রথাও অতি প্রাচীনকাল হইতে উঠিয়া যায়। ক্ষুর ও ক্ষৌরকার্য্যের আবশ্যক প্রত্যহই হইত; আবার সপ্তাহের মধ্যে শনিবার এবং কোন কোন তিথি ক্ষৌরকার্য্যের পক্ষে অমঙ্গলসূচক বলিয়া ধারণা ছিল (৪)। কিন্তু গ্রীস ও রোমে এ প্রকার সভ্য প্রথা ছিল না। খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৯৯ সাল পর্য্যন্ত রোমকেরা দাড়ি রাখিত। এই সময়ে টিসিনস্ মিনা সিসিলি হইতে রোমে নাপিত আনয়ন করেন এবং সিপিও আফ্রিকনাস্ প্রথম কামাইতে আরম্ভ করেন। গ্রীক্‌রা সেকেন্দরের সময় পর্য্যন্ত দাড়ি কামাইবার আরাম ও পবিত্রতা জানিতে পারে নাই। মিসরিরা কিন্তু ভারতের ঐ সভ্য প্রথার অনুবর্ত্তী ছিল বলিয়া গ্রীকদের দাড়ি রাখা প্রথাকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। কোন মিসরি কোন গ্রীকের মুখচুম্বন, কি তাহার ছুরিকা ব্যবহার, কি কোন গ্রীক কর্ত্তৃক হনন করা মাংস স্পর্শ করিত না। আশ্বলায়ন, শাংবত্যের কথা উদ্ধৃত করিয়া এক স্থলে বলিয়াছেন, "শুলগব যজ্ঞে হনন করা পশুর চর্ম্মসকল পাদুকা প্রভৃতি দ্রব্যের জন্য ব্যবহারোপযোগী।" এ-রিয়ন বলেন, "ভারতবাসীরা সাদা চামড়ার জুতা ব্যবহার করেন; জুতাগুলি অতি সুন্দর নির্ম্মিত এবং তাহার তলাগুলি পুরু এবং অনেক রকমের"। (৫) বৈদিক সময়ে আর্য্যদের ত্রিকোণ রথে তিনটী বোম ছিল। ঐ ত্রিকোণ রথের অনেক স্থলেই দুটী চাকা থাকিত, কিন্তু তিন চাকার রথের প্রশংসা অধিক ছিল। (৬) স্বর্ণমণ্ডিত রথচক্রের কথাও বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। (৭) ঐ সকল রথে তিনটী বসিবার আসন থাকিত।

(১) Heeren's Historical Researches, Vol. III. P. 363.
(২) Wilson's Rigveda IV. P. 233.
(৩) Rigveda Mundal X. 42-44.
(৪) Muir's Sanskrit Texts Vol. V. P. 492.
(৫) Translation P. 220.
(৬) Wilson's Rigveda. I. P. 126.
(৭) Ibid. P. 226.

তাহাতে একের অধিক লোক বসিতে পারিত এবং মাল আসবাব রাখিবার স্থানও থাকিত। গ্রীক, পারস্য ও মিসরিদের রথগুলি হিন্দুদিগের অপেক্ষা ছোট ছিল এবং তাহাতে কোন প্রকার ছাদ থাকিত না। ভারতের রথের অধিকাংশই ছাদযুক্ত নির্ম্মিত হইত। রাজপুতানার কোন কোন স্থানে এখনও ঐ প্রকার যানের মত যান দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, সভ্য জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হইলে সমাজে যে সমস্ত ব্যবহারিক উন্নতির লক্ষণ আবশ্যক মনে হয়, তাহার কোন প্রকার অভাব বৈদিক ও পৌরাণিক সমাজে দেখা যায় না। তদ্ভিন্ন ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঐ সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি একটা মহা উচ্চ, মহা পবিত্র ভাবের প্রেরণায় সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। সকল কার্য্যের প্রারম্ভেই ভগবানের অর্চ্চনা। এত উজ্জ্বল ধর্ম্মভাবের কোটি রবিকিরণের পার্শ্বে একটা মহা ঘৃণার অন্ধকার কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়!—উহা অপর সমস্ত জাতির উপর বীতরাগ; তাহাদের অনার্য্য ও অপবিত্র বলিয়া বেদের সর্ব্বস্থানে উল্লেখ! এই ঘৃণার কারণ নিশ্চয়ই অনার্য্য জাতিরা আর্য্যদের মত সুসভ্য, উন্নত ও ধার্ম্মিক ছিল না। সুযোগ পাইলেই হিংস্র পশু বা দস্যুর মত আর্য্য সমাজের উপরে পড়িয়া তাহারা আর্য্যদের উপর অত্যাচার করিতে ত্রুটি করিত না। আমাদের মনে হয়, আর্য্যদিগের সহিত এই প্রকার সংঘর্ষে আসিয়াই ভারত ও ভারতেতর দেশের অনার্য্য জাতিরা ক্রমে সভ্য হয় ও শিল্পাদি শিক্ষা করে।

বৈদিক যুগ হইতে আজও পর্য্যন্ত ভারতীয় জীবনের সমস্তটাই ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত ও সমস্ত ক্রিয়াকলাপ ধর্ম্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং সেই সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ যখনি ধর্ম্ম হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে, তখনি তাহা নির্জ্জীব ও হীন হইয়া বিনষ্ট হয়। বৈদিক সময়ের পূর্ব্ব হইতেই এদেশে নানারূপ কলা-বিদ্যার উৎপত্তি। বৈদিক যাগযজ্ঞ হইতে বেদী নির্ম্মাণ, যজ্ঞের সময় নির্ণয় করিতে যাইয়া স্থাপত্য-বিদ্যা, জ্যোতিষ, অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতির উৎপত্তি হয় আর স্তোত্র-মন্ত্রাদির তান-লয়-মানে পাঠ হইতেই যে সঙ্গীতের উৎপত্তি, একথা আর বলিতে হইবে না। হিয়ংস্থন যখন ভারতে আসেন, তখন একটা প্রবাদ শুনেন যে, দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িতে বা আঁকিতে আঁকিতে মহা যোগসাধনার ফল উপস্থিত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ হয়। তাই আমাদের কলা-দেবী মা সরস্বতী মোক্ষ ও ব্যবহারিক জ্ঞান উভয়দায়িনী। ধ্যান, জপ,

পূজাদি যেমন চিত্তের পবিত্রতা ও একাগ্রতা আনয়ন করিয়া মানবকে অবশেষে সমাধিস্থ করে, শিল্প অনুষ্ঠানেও যে তদ্রূপ হয়, একথা চিরপ্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তাহাই বলিতেন। কোন দেবদেবীর মূর্ত্তি ঠিক ঠিক গড়িতে পারিলে শিল্পী যে সিদ্ধ হয়, তাহার আর কিছু সাধন করিতে হয় না, একথা তিনি বহুবার বলিয়াছেন। কারণ দেবতার ধ্যান ও দেবতার মূর্ত্তি গঠন বা অঙ্কনে পার্থক্য কোথায়? আমাদের দেশে পোটোদের মধ্যে কিম্বদন্তি আছে যে, দশমহাবিদ্যার ছবি আঁকিলে তাঁহারা দেখা দেন। আমরা শুনিয়াছি—রাণী রাসমণির দেবালয় প্রতিষ্ঠার সময় যে ভাস্কর তথায় বাস করিয়া কালী মূর্ত্তিটী গঠন করিয়াছিলেন, তিনি গঙ্গাজলে স্নান, গঙ্গাজল পান, হবিষ্যান্ন ভোজন, কালীনাম জপ, কালীর ধ্যান ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে থাকিয়া ঐ মূর্ত্তিটী আন্দাজ ছয় মাসে গড়েন। দেশে ধর্ম্মের বাঁধাবাঁধি বেশী থাকিলে শিল্পে ধর্ম্মভাব আসিয়া পড়েই পড়ে। Coleridge, Longfellow, Wordsworth, Tennyson প্রভৃতির কবিতাও ইহার একপ্রকার নিদর্শন বলা যাইতে পারে। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ ও টেনিসন্ কবিতা-রূপ শিল্পের সেবা করিতে করিতে ভাবসমাধিস্থ হইতেন। এইরূপে শিল্প অনুষ্ঠানে চিত্তশুদ্ধি ও মনের একাগ্রতা সম্পাদিত হইয়া কবি, ভাস্কর ও চিত্রকরাদির যখন মন্ত্রদ্রষ্টার পদে আরূঢ় হইবার বিবরণ পাওয়া যায়, তখন যথার্থ শিল্পে ও ধর্ম্মে প্রভেদ অল্প বলিয়াই বোধ হয়।

ধর্ম্ম ও শিল্পের অপূর্ব্ব মিলন আমাদের দেশের অবতারদের জীবনেও দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব অতি শৈশব অবস্থায় স্বহস্তে দেবদেবীর মূর্ত্তি গড়িতেন ও আঁকিতেন এবং এমন উত্তম গাহিতে পারিতেন যে, সঙ্গীতজ্ঞ লোকেরাও তাঁহার গানে মুগ্ধ হইতেন।

সকল দেশেই একটা কথা প্রচলিত আছে যে, শিল্প মানবমনকে উন্নত করে। কেমন করিয়া ও কি ভাবে উহা করিয়া থাকে, এক্ষণে তাহাই দেখা যাক্। যোগীরা মনের তিন প্রকারে অবস্থানের কথা বলিয়া থাকেন। একভাবে উহা অহংবুদ্ধির সীমার নিম্নে থাকিয়া শরীরমধ্যে কার্য্য করে—যথা শ্বাসপ্রশ্বাসাদি; দ্বিতীয় অবস্থায় উহা অহং-বোধের সহিত সংযুক্ত হইয়া কার্য্যকারী থাকে—যেমন জীবের জাগ্রতাবস্থায় বিচার অনুমানাদি; আর তৃতীয় অবস্থা বা ভাবে উহা অহংবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির অতীত রাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ইন্দ্রিয়জ সাধারণ জ্ঞানাপেক্ষা উচ্চদরের জ্ঞান ও অনুভূতি আনিয়া

দেয়। মানবসমাজে সর্ব্ববিষয়ে সকল প্রকার উচ্চাঙ্গের জ্ঞান মনের এই ইন্দ্রিয়াতীত অহংবোধশূন্য সমাধির অবস্থাতেই লাভ হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ঐরূপ হইবে। ধর্ম্মবিষয়ক যাবতীয় জ্ঞান যে এই প্রকারে সমাধিলব্ধ, এবিষয়ে এখন কেহ আর বড় একটা সন্দেহ করেন না। উচ্চাঙ্গের শিল্পসম্বন্ধীয় জ্ঞানও যে ঐভাবে বিকশিত হইয়াছে, এবিষয়েও এখন ভূরি নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে এবং আমাদের ধারণা, শীঘ্রই ঐ বিষয় সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইবে। একমনে শিল্পালোচনায় মানব এই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে উপনীত হইয়া 'রসো বৈ সঃ' পুরুষের উপলব্ধি করে বলিয়াই শিল্প-সম্বন্ধিনী পূর্ব্বোক্ত ধারণা মানবসমাজে প্রচলিত।

মডার্‌ন্ রিভিউর জনৈক লেখক আনন্দকুমার স্বামী বলেন যে, মৌলিক শিল্পকল্পনা ও শিল্পশক্তি ভারতে যত অধিক পরিমাণে আছে এবং ভারতে অদ্যাপি যত বিচিত্র রকমের শিল্প আছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে তত নাই। ইহার গুহ্য কারণ বেদোক্ত ধর্ম্মের অদৃষ্টপূর্ব্ব মৌলিকতা বলিয়াই আমাদের বোধ হয়। ধর্ম্মে এইরূপ মৌলিকতা আছে বলিয়াই হিন্দুর প্রত্যেক প্রাত্যহিক কার্য্যেই একটু ভাবুকতা ও মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ধর্ম্মানুষ্ঠানে গোঁড়ামির সঙ্কীর্ণতা আসিবার যেমন আশঙ্কা আছে, শিল্পানুষ্ঠানে তদ্রূপ এক আশঙ্কা আছে। কোনরূপ শিল্প নিত্য অনুষ্ঠান করিতে করিতে স্নায়ুগত হইয়া পড়ে। তখন আর তাহাতে মনের পূর্ব্ববৎ একাগ্রতা বা কল্পনা শক্তির নিত্য নূতন বিকাশ হয় না। কাজেই তদনুষ্ঠানে আনন্দ বা সেই কার্য্যে আত্মপ্রীতি ও গৌরব কিছুই থাকে না। তখন কারিকর একটা জড়যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়ে এবং অবশেষে শিল্প ও শিল্পীর মৃত্যু ঘটে। হিন্দুর শিল্পের অবস্থা বহিঃশক্তিসংঘর্ষে বহুবার নানারূপে ধ্বস্ত ও নষ্টগৌরব হইলেও কখনও অতদূর জীবনিশক্তি রহিত হয় নাই। পূর্ব্বেতিহাসে দেখা যায়, উহা কখন কখন ঐরূপে সুপ্ত হইলেও আবার ব্যক্ত হইয়াছে। উহার কারণ বোধ হয়, শিল্পকে ধর্ম্মের সহিত অভিন্ন দেখা। প্রত্যেক কারিকর, কি ভাস্কর, কি চিত্রকর, কি স্বর্ণকার, কি লৌহকর, কি স্থাপক সকলেই প্রতিদিন কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে আপনাপন যন্ত্রগুলি এবং বিশ্বশিল্পীকে প্রণাম করে। তাহারা জানে যে, এ বিশ্বসংসার নাম-রূপে বিভিন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে এক বস্তু—সর্ব্বগুণাধার এক নিত্য-মুক্ত-শুদ্ধ-বুদ্ধ স্বরূপ বস্তুর বিকাশমাত্র। তাই তাহার ধারণা সেই

বিশ্বশিল্পী স্বয়ং তাহাদের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া উদ্ভাবনি শক্তিরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। বলিতে হইবে না, এইরূপে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে শিল্পী অনন্ত ভাবের প্রস্রবণের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া আপনাকে তাঁহারই যন্ত্রস্বরূপ মাত্র বলিয়া জ্ঞান করাতে তাহার ভাবুকতার হ্রাস হয় না বা তাহার কল্পনা-শক্তি মরে না। কোন্ জাতির লোকেরাই না নিজের নিজের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে? হিন্দু কিন্তু সেই ক্ষুধা ও তৎপরিতৃপ্তিকে আর এক চক্ষে দেখে। সে দেখে, উহাও তাহার নিজের শক্তি নয়—জগৎ-পালিনী এক মহাশক্তির বিকাশমাত্র; তাই সে কল্পনা করে, সেই মহাশক্তির নিয়োগে তাঁহারই পরিতৃপ্তির জন্য আহার প্রস্তুত করিতেছে—তাঁহাকে ভোগ দিতেছে, তাহার পর সে সেই শক্তির পরিতৃপ্তির জন্যই প্রসাদ ধারণ করিতেছে। আবার দর্শনযুক্তির রাজ্যে অধিকদূর অগ্রসর কেহবা ভাবে, নিজ দেহের মধ্যে অগ্নিরূপে প্রকাশিত সেই মহাশক্তিকেই খাদ্যরূপ আহুতি প্রদান করিতেছে—নিজে খাইতেছে না। এইরূপ এক আহার সম্বন্ধেই কত প্রকার অভিনব কল্পনাই না হিন্দুর ভিতর আছে! এইরূপ কল্পনাসমূহ বর্ত্তমান বলিয়াই আমাদের রন্ধনশিল্পে এত পারিপাট্য দেখা যায়। এমন সুন্দর মসলার ব্যবহার আর কোথাও নাই; ব্যঞ্জনে এমন ষড়রসের সমাবেশও বোধ হয়, আর কোন দেশেই নাই। তিক্ত রস সর্ব্বজাতিই কেবল রোগের সময় ঔষধবৎ ব্যবহার করে; কিন্তু হিন্দু তাহারও অতি সুস্বাদু ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া থাকে। ইহা অপেক্ষা রন্ধনশিল্পে মৌলিকতা আর কি হইতে পারে?

ভারতের পূর্ব্বেতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, দেশে যখন শান্তি বিরাজ করিত, তখনই যে হিন্দু শিল্পকে পবিত্রভাবে পূজা করিত, তাহা নহে; রাষ্ট্রবিপ্লবের রাগদ্বেষোৎপন্ন দ্বন্দ্বকোলাহলের মধ্যেও তাহার কিছুমাত্র ত্রুটি হইত না। প্রাচীন ভারতে শিল্পোন্নতির উহা যে প্রধান কারণস্বরূপ ছিল, তাহা বেশ অনুমিত হয়। বাইশ শতাব্দী পূর্ব্বের মিগাস্থিনিস কৃত ভারতের পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাদের বিবরণে দেখা যায়, দুই বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া দুই রাজার ঘোর যুদ্ধের সময়েও পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ও জনপদে কারিকরেরা স্ব স্ব কার্য্যে এবং কৃষকেরা শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে নিঃশঙ্কচিত্তে নিযুক্ত। যুদ্ধসংবাদে তাহাদের মনে কোনরূপ আশঙ্কার উদয় হয় নাই। যুদ্ধে একদল অন্যদলের ধ্বংশসাধন করিল। পরে বিজয়ীদল ডঙ্কা মারিয়া

মহা উল্লাসে স্বস্থানে প্রস্থান করিল. কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র বা গ্রাম-সমূহে লুটপাট বা বিজিত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে অধিকারচ্যুত করিবার কোনরূপ চেষ্টা করিল না! মিগাস্থিনিস এই নূতন ব্যাপার দেখিয়া নিজ জাতীয় সংস্কারানুযায়িক ভাবিলেন, এটা একটা দুর্ভিক্ষ-নিবারণের মহৎ উপায় এই পর্য্যন্ত! কিন্তু উচ্চশিল্প যদি উন্নত সভ্যতার পরিচায়ক হয়, তবে উপরোক্ত ঘটনা যে পূর্ব্বভারতের উন্নত সমাজের মহা উন্নত যুদ্ধ-শিল্পের পরিচায়ক, তাহা নিঃসংশয়।

এইরূপে হিন্দুর প্রত্যেক প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপের পশ্চাতেই এক এক অভিনব কল্পনা বর্ত্তমান! বাজে কল্পনা নয়, অপ্রাকৃতিক কল্পনা নয়, অনিত্য বস্তুর কল্পনা নয়, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমষ্টিকল্পনা আর আমাদের দেশের দার্শনিক ঋষি বলেন, এই সমষ্টিকল্পনা, কল্পনা নামের যোগ্য নহে; উহাই সত্য; উহাই ভগবদ্স্বরূপ! ব্যষ্টি যতদিন আপনাকে এই সমষ্টির অংশ বলিয়া দেখিতে পায় ও অনুভূতি করে, ততদিন তাহাতে জীবনস্রোত অবরুদ্ধ বা সঙ্কুচিত হয় না, ততদিন সে ক্রমোন্নতির রাজপথে প্রতিনিয়ত বর্দ্ধনশীল থাকিয়া অদ্বয় একেমেবাদ্বিতীয়ং সত্যের দিকে অগ্রসর হয়। ভারতে শিল্পীকুলের মনে এই মহা পবিত্র কল্পনার উদয় হইয়াছিল বলিয়াই যেন সেই আদি শিল্পী বিমুগ্ধ হইয়া শিল্পের তন্ময় চর্চ্চায় যে তাঁহার 'সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী' মূর্ত্তির আশু দর্শন লাভ হয়, এ সত্য সর্ব্বাগ্রে হিন্দুজাতির নিকটেই প্রকাশ করেন! অতএব মানব-চরিত্র-উন্নতকারী যথার্থ শিল্প, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরাভাস ব্যতাত আর কি হইতে পারে? এই জন্যই বোধ হয়, শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীজি বলিতেন. 'হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ, শিল্পপ্রাণ', 'ধর্ম্মোন্নতিতে শিল্পোন্নতি এবং শিল্পোন্নতিতে ধর্ম্মোন্নতি হইবেই হইবে।' সেইজন্য বলি, সমষ্টিকল্পনারূপ মহা ভাবটী যে শিল্পে বর্ত্তমান নাই, তাহা হিন্দুশিল্প নহে।

হিন্দুর সঙ্গীত শাস্ত্রালোচনায় দেখিতে পাওয়া যায়, রাগরাগিণীর বিভিন্ন ভাবানুযায়ী স্ত্রীপুরুষ জাতি নির্ণয় আছে। এক সময়ের সুর আবার অন্য সময়ে গাওয়া চলে না। এক ভাবের গানে অন্য ভাবের সুর লাগান চলে না। রাগরাগিণীর রূপবর্ণনা, এবং সেই সমস্ত বর্ণিত রূপের ছবিও আছে! সঙ্গীতশিল্পে এরূপ মৌলিকতা আর কোন দেশে নাই।

[ক্রমশঃ।

———

মধুর রস ও বৈষ্ণব কবি।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীজিতেন্দ্রলাল বসু।

আমরা এ পর্য্যন্ত যাহা বলিয়াছি, তাহা হইতেই বুঝা যাইবে যে, সম্ভোগ-বর্ণন বৈষ্ণবকবির অবশ্য সম্পাদ্য কর্ত্তব্য ছিল। যাঁহারা বৈষ্ণব পদাবলীর চর্চ্চা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন যে, তাঁহারা পর্যায়ক্রমে পূর্ব্বরাগ, মিলন সম্ভোগ ও বিরহবর্ণন করিয়াছেন, পরে বিরহান্তে মিলনও গাহিয়াছেন। বৈষ্ণবকবি প্রেমের কবি, প্রণয়ের কবি নহেন; তিনি ভক্তিরসের কবি, ভক্ত কবি, তাই ভক্তভগবানের সম্ভোগবর্ণনায় তাঁহাদের অতুল আনন্দ। কারণ, এই সম্ভোগামৃত রাগানুগা ভক্তির একমাত্র লক্ষ্য, সখী-ভাবে অহরহঃ রসিক ভক্তগণ ইহার চিন্তায় নিমগ্ন।

"অতএব গোপী-ভাব করি অঙ্গীকার।
রাত্রিদিন চিন্তে রাধাকৃষ্ণের বিহার॥
সিদ্ধদেহে চিন্তি করে তাহাঙ্ি সেবন।
সখী-ভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ॥ (১)

বৈষ্ণব কবির সম্ভোগ স্বার্থ-ত্যাগজনিত, নিজ সুখান্বেষণ মাত্র তাহার লক্ষ্য নহে। এই সম্ভোগেই প্রেমের পরিপুষ্টি। যে প্রেমে আত্মত্যাগ আছে, সেই প্রেমই পরিপুষ্ট প্রেম; যাহা খালি সুখের অন্বেষণে পর্য্যবসিত, তাহা প্রেম নহে, তাহা বিষ, তাহা কেবল দুঃখের আকর। চণ্ডীদাস কহিয়াছেন—"সুখের লাগিয়া যে করে পিরীতি, দুঃখ যায় তারি ঠাঁই॥" কিন্তু বৈষ্ণবকবির সম্ভোগ-চিত্রেই ভাবি বিরহের সূচনা হইয়াছে। সম্ভোগ ও বিরহ পরস্পর সংবদ্ধ, দুইই বৈষ্ণব কবিতার আবশ্যকীয় অংশ। এই কথাই এখন বুঝাইবার চেষ্টা করিব। প্রেমে সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ বা সম্পূর্ণ স্বার্থ-ত্যাগ সহজে ঘটে না। গভীর ভক্তি হৃদয়ে আসিলেও একেবারেই যে ভক্তের হৃদয় হইতে সকল আততায়ী-ভাবের যে লোপ হইয়া যায়, তাহা নহে। অথবা সংসারাশক্তি একেবারে যে মুছিয়া যায়, তাহাও নহে। কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ-সাধনই প্রেমভক্তির চরম সাধ্য, শেষ পরিণতি। ভালবাসার গর্ব্ব বড় মধুর, বড় উপাদেয়, কিন্তু প্রেমের চরম পরিণতির অবস্থায় ইহার

(১) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য, ৮ম।

অস্তিত্বও অসঙ্গত ভাবোৎপাদক বলিয়া অসম্ভব। আমরা মিলনানন্দের মধ্যে দেখিয়াছি যে, শ্রীরাধার অন্তরে এই গর্ব্বের অস্তিত্ব বিলক্ষণ ছিল—

"আমার বরণ স্মরণ করিয়া
পীতবাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করেতে মুরলী
লইতে আমারি নাম॥

এ গর্ব্ব গভীর ভালবাসার নিদর্শন, প্রিয়ের ভালবাসার উপলব্ধিজাত সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহাতে যে অহমিকাটুকু স্পষ্টাক্ষরে বিদ্যমান রহিয়াছে, সৌভাগ্যগর্ব্ব যে ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা সেই সর্ব্ববিলোপ-সাধনকারী প্রেম-স্বরূপ শ্রীভগবানের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মদৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। গোপী-বল্লভ গোপীদিগকে জগতের আদর্শ ভক্ত করিতে কৃতসঙ্কল্প। কথায় বলে, "লজ্জা,ঘৃণা, ভয়, তিন থাকৃতে নয়"—গোপীদিগের এই তিনটী গিয়াছিল, কিন্তু গর্ব্ব যায় নাই—আমরা যে ভগবানের বড় প্রিয় এই গর্ব্ব তাঁহাদের মনে উপস্থিত হইয়াছিল! গোপিকা-শিরোমণি শ্রীরাধারও মনে হইয়াছিল যে, ভগবান্‌কে তিনি ভালবাসা দিয়া একেবারে বশীভূত করিয়াছেন! এই সৌভাগ্যাভিমান বর্ত্তমান থাকিতে প্রেমের পরাকাষ্ঠায় যে সকল ভাবের প্রকাশ, সে সকলের ব্যক্তি হওয়া সম্ভব নয় বুঝিয়াই শ্রীভগবান্ শ্রীরাধা ও গোপীগণকে প্রেমের চরম পরিণতিতে উপনীত করিবার নিমিত্ত

"তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তর ধীয়ত॥ (১)

ভাগবত কহিতেছেন—অনুগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। এ অনুগ্রহের ফল ভাগবত বর্ণনা করিয়াছেন—কিরূপে বিরহ দ্বারা প্রেমের পরিশুদ্ধি ও পরীক্ষা হইল এবং কিরূপে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গোপীগণ শ্রীভগবান্‌কে সম্পূর্ণরূপে পাইয়াছিলেন ইত্যাদি। বিরহ অগ্নিতে ভালবাসা ও ভক্তির "বিশুদ্ধি বা শ্যামিকা" পরীক্ষিত হয়। যাহার যত ভালবাসা, তাহার তত বিরহ; যাহার যত লালসা, তাহার তত বিরহ। বিরহে লালসার ও ভালবাসার শুদ্ধি। কথাটা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য এতদ্‌বিষয়ে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিলাম—

"বিরহে প্রেমের পরিশুদ্ধি—প্রীতির পবিত্রতা। প্রেমের মূলতত্ত্ব পরকীয়

(১) শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০ম স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ঃ।

প্রকৃতিনিহিত সৌন্দর্য্য অথবা সেই সৌন্দর্য্যের প্রত্যক্ষ প্রতিকৃতিস্বরূপ রূপের উপাসনা এবং পরার্থ আত্মোৎসর্গ—প্রেমের মুখ্য কণ্টক সুখলালসা আর স্বার্থপরতা। যে অনুরাগ শুধুই সুখ-লালসায় অঙ্কুরিত এবং স্বার্থ-পরতায় সংবর্দ্ধিত হয়, তাহা প্রেম নহে, প্রেমের বিড়ম্বনা মাত্র। তাদৃশ আকর্ষণীর সহিত উপাসনা কিংবা আত্মোৎসর্গের কোনপ্রকার সম্পর্ক থাকিতে পারে না। যাহারা দুর্ভাগ্যবশতঃ মনুষ্যত্ব হইতে পরিভ্রষ্ট অথবা মনুষ্যত্বের উচ্চতর আদর্শে বঞ্চিত, উহা তাহাদিগেরই ভোগে আসিতে পারে, উচ্চ প্রকৃতিশালী উদারচরিত্রদিগের উপভোগ্য হয় না। বিরহ, সুখ-লালসা ও স্বার্থপরতা সম্বন্ধে স্বভাবতঃই বহ্নির ন্যায় পরিশোষক, পরিশোধক এবং সুতরাংই প্রীতির প্রকর্ষ-বর্দ্ধক। যাহার হৃদয় স্বপ্নেও কখনও পবিত্রতার শান্ত-স্নিগ্ধ, শুদ্ধ সুন্দর স্বর্গীয় মূর্ত্তি দেখিতে পায় না, সেও বিরহের যজ্ঞীয় অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া সহসা তাহার হৃদয়নিহিত প্রীতিতেই পবিত্রতার সৌন্দর্য্যসমাবেশ দর্শনে আনন্দে শিহরিয়া উঠে এবং উহার সংস্পর্শে সমস্ত মনোবৃত্তিরই পুন-র্জ্জন্ম অথবা নবজীবনের ভাব অনুভব করিয়া জীবনে কৃতার্থ হয়। এইরূপে ইচ্ছা ধীরে ধীরে লালসার সম্পর্ক-শূন্য হইয়া পড়ে, লালসা একেবারে বিনষ্ট না হইলেও পয়োরাশিতে শর্করার ন্যায় প্রীতিতে মিশিয়া যায় এবং মনুষ্যের প্রাণ, অপ্রত্যক্ষ প্রিয়জনের উপাসনা দ্বারা স্মৃতির উপাসনা করিতে প্রথম শিক্ষা পাইয়া, সোপানপরম্পরায় ধীরে ধীরে আরোহণ করে। আমি বিরহের ঈদৃশ শিক্ষাকে কোন প্রকারেই সামান্য শিক্ষা বলিতে সাহস পাই না।" (১)

গোপীদিগের পক্ষে বিরহ কি প্রকার উপকারক হইয়াছিল, তাহা ভাগবত বর্ণনা করিয়াছেন—

"দুঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহ তীব্র তাপধুতা শুভাঃ।
ধ্যান প্রাপ্তাচ্যুতা শ্লেষ নির্বৃত্যা ক্ষীণ মঙ্গলাঃ॥
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ" ॥ (২)

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যে হৃদয়ে প্রেম বিরাজমান, সে প্রেম মনুষ্যসাধারণহৃদয়গত হউক বা ভক্তহৃদয়গত হউক, বিরহ উভয় ক্ষেত্রেই

(১) নিশীথ চিন্তা—বিরহ।

(২) শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০ম স্কন্ধে ২৯ অধ্যায়ঃ।

মহোপকারী, উভয় ক্ষেত্রেই প্রিয় হৃদয়ের সঙ্গে নিজ হৃদয় সম্মিলিত করিয়া একীকরণসম্বন্ধে প্রকৃষ্টতম উপায়। তাই ভাগবত বলিয়াছেন—"প্রসাদায় তবৈবান্তর ধীয়ত।"

এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম—বৈষ্ণবকবিতায় বিরহবর্ণনা কেন অবশ্যম্ভাবী। পরে আরও দেখিতে পাইব যে, বৈষ্ণবকবির প্রতিষ্ঠাই বিরহ-চিত্রে। যাহাতে প্রেমের প্রতিষ্ঠা, প্রেমিক কবির তাহাতেই চরম স্ফূর্ত্তি। ইহার জন্যই বৈষ্ণবকবির বিরহচিত্রের সমকক্ষ চিত্র বঙ্গ-কাব্য-রাজ্যে আর কোথাও নাই।

যে বিরহে পাগল হয় না, আত্মহারা হয় না, জড়-চেতনের পার্থক্য ভুলিয়া প্রিয়চিন্তায় নিমগ্ন হইতে পারে না, সে যথার্থ ভালবাসা জানে না। যাহার হৃদয়ে ভালবাসার সামগ্রীতেই সমগ্র বিশ্ব কেন্দ্রীভূত বলিয়া অনুভব হয় না এবং সেই একের প্রেমই বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না, সে যথার্থ ভালবাসিতে শিখে নাই। সেই প্রেমিক নামের যোগ্য, যে প্রিয়চিন্তার মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া বিশ্বময় সেই ভালবাসা, সেই মধুরতা বিকীর্ণ করিতে পারে, যাহার হৃদয়ে সেই এক বস্তুতে সমগ্র বিশ্ব বিলীন হইয়া যায়। গোপীর প্রেম এইরূপ উচ্চাঙ্গের অপূর্ব্ব বস্তু। গোপীর বিরহ, গোপীর প্রধানা শ্রীরাধার বিরহও আবার এক অলৌকিক ব্যাপার। ইহার সম্যক্ ধারণা করিতে হইলে আমাদিগের সংসারাসক্ত চিত্তকে ভগবদুন্মুখ করিয়া পবিত্র করিয়া লইতে হইবে। আমরা জগতের অনেক কাব্যে বিরহের চিত্র দেখিয়াছি—দেখিয়া মুগ্ধও হইয়াছি। কিন্তু সে সকল বিরহচিত্র যত মহৎ হউক, তাহাদের ভিতর শ্রীরাধার বিরহের অলৌকিকতা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমরা পরে তাহা দেখিতে পাইব।

বিরহ লালসাসম্ভূত। যাহার যত লালসা, তাহার সেই পরিমাণে বিরহ-ব্যথা এবং তাহারই তত প্রিয়চিন্তার একাগ্রতা। পক্ষান্তরে যাহার যত ভালবাসা, তাহারই তত লালসা—লালসা অর্থে ইন্দ্রিয়-লালসা, ইহা যেন কেহ মনে না করেন—হৃদয়েরও লালসা আছে, ভালবাসার লালসা আছে, প্রিয়ের ভিতর আপনাকে লুপ্ত করিবার তীব্র লালসা আছে; সেই লালসার কথাই বলিতেছি। যাহার হৃদয়ে কেবল ইন্দ্রিয়লালসা, তাহার বিরহ ক্ষণস্থায়ী—তাহার বিরহে চাঞ্চল্য আছে, কিন্তু গভীরতা আসে না। দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিরহের পার্থক্য ভাবিয়া দেখিলেই তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে।

দুষ্মন্তের ভালবাসা অনেক পরিমাণে ইন্দ্রিয়লালসায় পর্য্যবসিত ছিল, তাই তিনি শকুন্তলার মিলনে অত আগ্রহান্বিত হইয়াও মিলনান্তে অন্যাসঙ্গম সুখে অনায়াসে তাঁহাকে ভুলিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু শকুন্তলার হৃদয়ে যথার্থ প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল, তাই মিলনান্তে প্রিয়বিরহ সেই প্রেমের পরিপোষক হইয়াছিল এবং তাঁহার হৃদয় প্রিয়তমের চিন্তাই সার করিয়াছিল। সে চিন্তায় এত একাগ্রতা, এত বিশ্ববিলোপসাধকতা ও অন্তর্লীনত্ব আসিয়াছিল যে, সেই মধুময়ী চিন্তার বশীভূতা বালিকার কর্ণে বজ্রনির্ঘোষতুল্য দুর্ব্বাসার আতিথ্য-প্রার্থনা ও অভিসম্পাত কিছুই প্রবেশ করিতে পারে নাই। (১) বিরহ এমনি করিয়া হৃদয়কে প্রিয়োন্মুখ করিয়া তুলে। হৃদয় প্রিয়তমের বিচ্ছেদে এত অন্যচিন্তাপরাঙ্মুখ হইলে প্রিয়তমেরও সেই হৃদয়ের মাধুর্য্য ধারণা করিবার ক্ষমতা উপস্থিত হয় এবং তখন তাঁহারও হৃদয় সেই প্রেমের আকর্ষণে বশীভূত হইয়া পড়ে। শুধু ইন্দ্রিয়চপলতার বিরহে তাহা হওয়া সম্ভব নয়। এমনি বিরহেই আত্মহারা হইয়া মেঘদূতের যক্ষ চেতনাচেতনের পার্থক্য বিস্মৃত হইয়াছিল। এমনি বিরহের বশীভূত হইয়াই রাজরাণী ডাইডো (২) সকল সুখসমৃদ্ধি ও রাজ্যপাট বিসর্জ্জন দিয়া প্রিয়স্মৃতির মধুর আকর্ষণে সমুদ্রতটে লহরী গণনা করিয়া নিজ ক্লান্ত জীবন কাটাইয়াছিলেন ও শেষে প্রিয়তমের সমাগমে নিরাশ হইয়া নিজ নগণ্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। এইরূপ দুঃসহ প্রিয়াবিরহেই রাজাধিরাজ পুরুরবা উর্ব্বশীর অন্বেষণার্থ বনে বনে পাগল হইয়া বেড়াইয়াছিলেন। (৩) অতএব দেখা যাইতেছে যে, কি পাশ্চাত্য, কি প্রতীচ্য সকল কাব্যেই বিরহ কবিগণের আদরণীয় ও প্রতিভাপ্রকাশের এক বিশেষ পন্থাস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে।

এই ঐকান্তিক প্রিয়চিন্তার দ্বারা হৃদয় বিশুদ্ধ হয়, নিজের স্বতন্ত্রতা বিলুপ্ত হয় এবং আত্মাভিমান তিরোহিত হইয়া প্রিয়ের সহিত একীকরণ সাধিত হয়। শকুন্তলা-বিরহ-পরিশুদ্ধ-হৃদয় দুষ্মন্ত নিজাভিমান পরিত্যাগ করিয়া অকারণ পরিত্যক্তা শকুন্তলার চরণে আত্মবিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

(১) অভিজ্ঞান শকুন্তলম্।

(২) Virgil's Æneid.

(৩) বিক্রমোর্ব্বশী।

যেখানে হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন সাধিত হইয়াছে, সেখানে চক্ষুর অন্তরাল ও মনের অন্তরাল একই কথা—"Out of sight is out of mind" (১) হইতে পারে না। তেমন স্থলে বিরহই তপস্যা এবং সেই তপস্যার বলে আত্মশুদ্ধি, ও প্রিয়ের হৃদয়াকর্ষণ। উমার রূপে মহাদেবকে বাঁধিতে পারে নাই, কিন্তু উমার তপস্যায়, বিরহজনিত একান্ত সাধনায় যোগীশ্বরকেও বশীভূত করিয়া উমাগত-প্রাণ করিয়াছিল। (২) শ্রীরাধারও বিরহরূপ তপস্যার দ্বারা সেই ফল প্রসূত হইয়াছিল। এই বিরহাগ্নিতে পরীক্ষিত হইয়া তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব প্রেমের মলাটুকু সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল ও শ্রীভগবান্‌কে তাঁহার প্রেম-বশীভূত করিয়া দিয়াছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, মিলনানন্দে ও সৌভাগ্য-গর্ব্বে যে রাধিকা বলিয়াছেন—

"আমার বরণ স্মরণ করিয়া
পীত বাস পরে শ্যাম।
প্রাণের অধিক করেতে মুরলী
লইতে আমারি নাম॥

তিনিই বিরহান্তে মিলনের পর বলিতেছেন—

বঁধু তুহারি গরবে গরবিণী আমি,
রূপসী তুহারি রূপে।
হেন মনে লয় চরণ যুগল,
সদা ধরে রাখি বুকে॥ (৩)

এখন শ্রীরাধা বুঝিয়াছেন যে, গৌরব-গর্ব্ব ভগবৎ-প্রাপ্তির অন্তরায়।

"শুন শুন হে রসিক রায়
তোমায় ছাড়িয়া যে সুখে আছিনু
নিবেদি যে তুয়া পায়॥
না জানি কি ক্ষণে কুমতি হইল

---

(১) Gœthe's Faust.

(২) কুমারসম্ভব, ৫ম সর্গ।

(৩) জ্ঞানদাস।

গৌরবে ভরিয়া গেনু।
তোমা হেন বঁধু   হেলায় হারায়ে
ঝুরিয়া ঝুরিয়া মনু॥ (১)

মিলনানন্দের ভিতরও শ্রীরাধার সংসার ছিল, বিরহপরীক্ষোত্তীর্ণা শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই নাই।

বঁধু কি আর বলিব আমি।
মরণে জীবনে   জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈয় তুমি॥
তোমার চরণে   আমার পরাণে
বাধিল প্রেমের ফাঁসী।
সব সমর্পিয়া   এক মন হৈয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥
ভাবিয়াছিলাম   এ তিন ভুবনে
আর মোর কেহ আছে।
রাধা বলি কেহ   সুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে॥
একুলে ওকুলে   দুকুলে গোকুলে
আপনা বলিব কায়।
শীতল বলিয়া   শরণ লইনু
ও দুটী কোমল পায়॥
না ঠেলহ ছ'লে   অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু   প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥
আঁখির নিমিখে   যদি নাহি দেখি
তবে সে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে   পরশ রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি॥

(১) চণ্ডীদাস।

গর্ব্ব গিয়াছে, সংসার গিয়াছে এবং আত্মাভিমান পাপ-পুন্য বিচার সকলি শ্রীরাধার এখন লুপ্ত হইয়াছে।

বঁধু তুমি সে আমার প্রাণ।
দেহ মন আদি তো হেরে স'পেছি
কুল শীল জাতি মান॥
অখিলের নাথ তুমি হে কালিয়া
যোগীর আরাধ্য ধন।
গোপ গোয়ালিনী হাম অতি হীনা
না জানি ভজন পূজন॥
পিরীতির সোত ঢালি তনু মন
দিয়াছি তোমার পায়।
তুমি মোর পতি তুমি মোর গতি
মন নাহি আন তায়॥
কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোকে
তাহাতে নাহিক দুখ।
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ॥
সতী বা অসতী তোমাতে বিদিত
ভাল মন্দ নাহি জানি।
কহে চণ্ডীদাস পাপ পুণ্য মম
তোহারি চরণ দুখানি॥

ভক্তের প্রগাঢ় ভক্তির ইহাই স্বাভাবিক পরিণাম। যাঁহার সকল কর্ম্ম, সকল প্রবৃত্তি, সর্ব্বকর্ম্মের ফলাফল ভগবদর্পিত, তাঁহারি মুখে এমন কথা শোভা পায়, তিনিই—

জানামি ধর্ম্মং নচ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্য ধর্ম্মং নচ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন।
যথা নিযুক্তোস্মি তথা করোমি॥

এই মহাবাক্য উচ্চারণের অধিকারী। [ক্রমশঃ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ। *

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর] [স্বামী সারদানন্দ।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে।

যে চৈব সাত্ত্বিকাভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥

গীতা,—৭—১২, ১৩।

দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী অদৃষ্টপূর্ব্ব অলৌকিক তপস্যান্তে শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরকে বলেন 'ভাবমুখে থাক্', ঠাকুরও তাহাই করেন—একথা এখন অনেকেই জানিয়াছেন। কিন্তু ভাবমুখে থাকা যে কি ব্যাপার এবং উহার অর্থ যে কত গভীর তাহা বুঝা ও বুঝান বড় কঠিন। আটাশ বৎসর পূর্ব্বে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন জনৈক বন্ধুকে † বলিয়াছিলেন 'ঠাকুরের এক একটি কথা অবলম্বন করিয়া ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শনগ্রন্থ লেখা যাইতে পারে!' বন্ধুটি তৎশ্রবণে অবাক হইয়া বলেন, 'বটে? আমরা তো ঠাকুরের কথার অত গভীর ভাব বুঝিতে পারি না! তাঁহার কোন একটি কথা ঐ ভাবে আমাকে বুঝিয়ে বলবে?'

স্বামীজি—বোঝ্‌বার মাথা থাক্‌লে তবে ত বুঝ্‌বি। আচ্ছা, ঠাকুরের যে কোন একটি কথা ধর, আমি বুঝাচ্চি।

বন্ধু—বেশ; সর্ব্বভূতে নারায়ণ দেখা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ঠাকুর, 'হাতি নারায়ণ ও মাহুত নারায়ণের' যে গল্পটি বলেন সেইটি বুঝিয়ে বল।

স্বামীজিও তৎক্ষণাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়বিধ পণ্ডিতদিগের ভিতরে

---

* প্রবন্ধাবলিতে বর্ণিত ঘটনাবলির পূর্ব্বাপর সম্বন্ধাদির যে একটু আধটু ব্যতিক্রম হইতেছে তাহা লীলাপ্রসঙ্গ পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবার সময় সংশোধিত হইবে।

† শ্রীযুৎ হরমোহন মিত্র।

আবহমানকাল ধরিয়া, স্বাধীন ইচ্ছা ও অদৃষ্টবাদ অথবা পুরুষকার ও ভগবদিচ্ছা লইয়া যে বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে অথচ কোন একটা স্থির মীমাংসা হইতেছে না সেই সকল কথা উত্থাপন করেন এবং ঠাকুরের ঐ গল্পটি যে ঐ বিবাদের এক অপূর্ব্ব সমাধান, তাহা সরল ভাষায় তিন দিন ধরিয়া বন্ধুটিকে বুঝাইয়া বলেন!

তলাইয়া দেখিলে বাস্তবিকই ঠাকুরের অতি সামান্য সামান্য দৈনিক ব্যবহার ও উপদেশের ভিতর ঐরূপ গভীর অর্থ দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্য হইতে হয়। অবতার পুরুষদিগের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই কথাটি সত্য। তাঁহাদের জীবনালোচনায় ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি যে দুই এক জন মহাপুরুষ বিপক্ষদলের কুতর্কজাল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য জন্মগ্রহণ করেন তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিলে, অপর সকল মহাপুরুষদিগের জীবনেই দেখা যায়, তাঁহারা সাদা কথায়, মর্ম্মস্পর্শী ছোট ছোট গল্প, উপমা বা রূপকের সহায়ে যাহা বলিবার বলিয়া ও বুঝাইয়া গিয়াছেন। লম্বা চওড়া কথা, দীর্ঘ দীর্ঘ সমাস প্রভৃতির ধার দিয়াও যান নাই! কিন্তু সে সাদা কথার, সে ছোট উপমার ভিতর এত ভাব ও মানব-সাধারণকে উচ্চ আদর্শে পৌঁছাইয়া দিবার এত শক্তি রহিয়াছে যে, আমরা হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া চেষ্টা করিয়াও ঐ সকল 'মেঠো' কথার ভাবের অন্ত বা শক্তির সীমা এখনও করিতে পারিলাম না! যতই দেখি ততই উচ্চ উচ্চতর ভাব দেখিতে পাই, যতই নাড়াচাড়া তোলাপাড়া করি ততই মন 'অনিত্য অশুভ' সংসারের রাজত্ব ছাড়িয়া ঊর্দ্ধে ঊর্দ্ধতর দেশে উঠিতে থাকে! এবং 'পরমপদ প্রাপ্তি' 'ব্রাহ্মীস্থিতি' 'মোক্ষ' বা 'ভগবদ্দর্শনের'—কারণ এক বস্তুকেই নানা ভাবে দেখিয়া মহাপুরুষরা ঐ সকল নানা নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন—দিকে যতই কেহ অগ্রসর হইতে থাকে ততই ঐ সকল সাদা কথার গভীর ভাব প্রাণে প্রাণে বুঝিতে থাকে।

ইহাই নিয়ম। ঠাকুরের কথা ও ব্যবহারের সম্বন্ধেও ঐ নিয়মের ব্যতি-ক্রম দেখি না। তাঁহার যে কথাগুলি আগে যে ভাবে বুঝিতাম এখন সেই গুলিরই আরও কতই না গভীর ভাব দেখিতে পাই! দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে একটি কথা বলিলেই চলিবে। শ্রীযুৎ গিরিশ, ঠাকুরের নিকট কয়েকবার আসা যাওয়ার পর এক দিন তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে আত্মসমর্পণ করিয়া বলিলেন 'এখন থেকে আমি কি ক'রব'?

ঠাকুর—'যা ক'রচ তাই করে যাও। এখন এদিক (ভগবান্) ওদিক (সংসার) দুদিক রেখে চল, তার পর যখন একদিক ভাঙ্গবে তখন যা হয় হবে। তবে সকাল বিকালে তাঁর স্মরণ মননটা রেখো।' এই বলিয়া গিরিশের দিকে চাহিলেন, যেন তাঁহার উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন।

গিরিশ শুনিয়া বিষণ্নমনে ভাবিতে লাগিলেন 'আমার যে কাজ তাহাতে স্নান আহার নিদ্রা প্রভৃতি নিত্যকর্ম্মেরই একটা নিয়মিত সময় রাখিতে পারি না। সকাল বিকালে স্মরণ-মনন করিতে নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাইব। তাহা হইলে ত মুস্কিল, শ্রীগুরুর আজ্ঞালঙ্ঘনে মহাদোষ ও অনিষ্ট হবে। অতএব এ কথা কি করিয়া স্বীকার করি? সংসারে অন্য কাহারও কাছে কথা দিয়াই সে কথা না রাখিতে পারিলে দোষ হয়, তা যাঁহাকে পরকালের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি তাঁহার কাছে'! গিরিশ মনের কথাগুলি বলিতেও কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। আবার ভাবিলেন 'কিন্তু ঠাকুর আমাকে তো আর কোন একটা বিশেষ কঠিন কাজ করিতে বলেন নাই। অপরকে একথা বলিলে এখনি আনন্দের সহিত স্বীকার পাইত।' কিন্তু তিনি কি করিবেন, আপনার একান্ত বহির্ম্মুখ অবস্থা ঠিক ঠিক দেখিতে পাইয়াই বুঝিতেছিলেন যে ধর্ম্মকর্ম্মের অতটুকুও প্রতিদিন করা যেন তাঁহার সামর্থ্যের অতীত! আবার নিজের স্বভাবের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন কোনরূপ ব্রত বা নিয়মে 'চিরকালের নিমিত্ত আবদ্ধ হইলাম'—এ কথা মনে করিতে গেলেও যেন হাঁপাইয়া উঠেন এবং যতক্ষণ না ঐ নিয়ম ভঙ্গ হয় ততক্ষণ যেন প্রাণে অশান্তি। আজীবন এইরূপ ঘটিয়া আসিয়াছে। নিজের ইচ্ছায় ভাল মন্দ যাহা হয় করিতে কোন গোল নাই কিন্তু যাই মনে হইল 'বাধ্য হয়ে অমুক কাজটা করতে হচ্চে বা হবে অমনি মন বেঁকে দাঁড়াল', আর কি। কাজেই আপনার নিতান্ত অপারক ও অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিতে করিতে কাতর হইয়া চুপ্‌করিয়া রহিলেন,'করিব' বা 'করিতে পারিব না' কোন কথাই বলিতে পারিলেন না! আর অত সোজা কাজটা করিতে পারিবেন না, একথা লজ্জার মাথা খাইয়া বলেনই বা কিরূপে—বলিলেও ঠাকুর ও উপস্থিত সকলে মনে করিবেন্‌ই বা কি? তাঁহার একান্ত অসহায় অবস্থার কথা হয়ত বুঝিতেই পারিবেন না, আর মুখ ফুটিয়া না বলিলেও মনে নিশ্চয় করিবেন —তিনি একটা ঢং করিয়া কথাগুলি বলিতেছেন।

ঠাকুর, গিরিশকে ঐ রূপ নীরব দেখিয়া তাঁহার দিকে চাহিলেন

এবং তাঁহার মনোগতভাব বুঝিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তা যদি না পার ত খাবার শোবার আগে তাঁকে একবার স্মরণ করে নিও।"

গিরিশ নীরব। ভাবিলেন উহাই কি করিতে পারিবেন। দেখিলেন—কোন দিন খান্ বেলা ১০ টায় আর কোন দিন বৈকাল পাঁচটায়; রাত্রির খাওয়া সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। আবার মামলা মকদ্দমার ফ্যাঁসাতে পড়ে এমন দিন গিয়াছে যে খাইতে বসিয়াছেন বলিয়াই হুঁস নাই!—কেবলই উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতেছেন 'ব্যারিষ্টারকে যে ফি পাঠাইয়াছি তাহা ঠিক সময়ে তাঁর হাতে পৌঁছিল কি না খবরটা পাইলাম না, মকদ্দমার সময় যদি তিনি উপস্থিত না হন তাহলেই তো বিপদ, ইত্যাদি!' কার্য্যগতিকে ঐরূপ দিন যদি আবার আসে—আর আসাও কিছু অসম্ভব নয়—তাহা হইলে সে দিন ভগবানের স্মরণ মনন করিতে তো নিশ্চয়ই ভুলিবেন! হায় হায় ঠাকুর এত সোজা কথা করিতে বলিতেছেন আর তিনি 'করিব' বলিতে পারিতেছেন না! গিরিশ বিষম ফাঁপরে পড়িয়া স্থির নীরব রহিলেন আর তাঁহার প্রাণের ভিতরে যেন একটা চিন্তা ভয় ও নৈরাশ্যের ঝড় বহিতে লাগিল। ঠাকুর গিরিশের দিকে আবার চাহিয়া হাসিতে হাসিতে এইবার বলিলেন—"তুই ব'লবি,'তাও যদি না পারি'—আচ্ছা তবে আমায় বকল্‌মা * দে!" ঠাকুরের তখন অর্দ্ধবাহ্যদশা!

কথাটি মনের মত হইল। গিরিশের প্রাণ ঠাণ্ডা হইল। শুধু ঠাণ্ডা হইল না, ঠাকুরের অপার দয়ার কথা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভালবাসা বিশ্বাস একেবারে অনন্তধারে উছলিয়া উঠিল! গিরিশ ভাবিলেন 'যাক্, নিয়ম বন্ধনগুলোকে বাঘ মনে হয়, তাহার ভিতর আর পড়িতে হইল না। এখন যাহাই করি না কেন এইটি মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিলেই হইল যে ঠাকুর তাঁহার অসীম দিব্যশক্তিবলে কোন না কোন উপায়ে তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন।' শ্রীযুৎ গিরিশ তখন বকল্‌মা বা ঠাকুরের উপর সমস্ত ভার দেওয়ার এইটুকু মানেই বুঝিলেন। বুঝিলেন তাঁহাকে নিজে চেষ্টা করিয়া বা সাধন ভজন করিয়া

---

* অর্থাৎ ভার দাও। বিষয়কর্ম্মে একব্যক্তি তাঁহার হইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা বা অধিকার অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে সে ব্যক্তি তাহার হইয়া সমস্ত লেন্ দেন্ করে, রসিদ চিঠি পত্র লিখে এবং তাঁহার নামে ঐ সকলে সহি করিয়া নিয়ে, 'বঃ (অর্থাৎ বকলম) অমুক' বলিয়া নিজের নাম লিখিয়া দেয়।

কোনবিষয় ছাড়িতে হইবে না; ঠাকুরই তাঁহার মন হইতে সকল বিষয় নিজশক্তিবলে ছাড়াইয়া লইবেন, বাশ্! নিয়মের বন্ধন গলায় পরা অসহ্য বোধ করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে যে তদপেক্ষা শতগুণে অধিক ভালবাসার বন্ধন স্বেচ্ছায় গলায় তুলিয়া লইলেন তাহা তখন বুঝিতে পারিলেন না। ভাল মন্দ যে অবস্থায় পড়ুন না কেন, যশ অপযশ যাহাই আসুক না কেন, দুঃখ কষ্ট যতই উপস্থিত হউক না কেন নিঃশব্দে তাহা সহ্য করা ভিন্ন তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার যে আর বলিবার বা করিবার কিছুই রহিল না সে কথা তখন আর তলাইয়া দেখিলেন না, দেখিবার শক্তিও হইল না। অন্য সকল চিন্তা মন হইতে সরিয়া যাইয়া কেবল দেখিতে লাগিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণা! আর বাড়িয়া উঠিল শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরিয়া শতগুণে অহঙ্কার। মনে হইল, 'সংসার যা বলে বলুক, যতই ঘৃণা করুক, ইনি তো সকল সময়ে সকল অবস্থায় আমার—তবে আর কি? কাহাকে ডরাই?' ভক্তিশাস্ত্র এ অহঙ্কারকে যে সাধনের মধ্যে গণ্য করেন * এবং মানবের বহুভাগ্যে আসে বলেন তাহাই বা তখন কেমন করিয়া জানিবেন? যাহাই হউক শ্রীযুৎ গিরিশ এখন নিশ্চিন্ত এবং খাইতে শুইতে বসিতে ঐ এক চিন্তা 'শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছেন' সর্ব্বদা মনে উদিত থাকিয়া তাঁহাকে যে ঠাকুরের ধ্যান করাইয়া লইতেছে এবং তাঁহার সকল কর্ম্ম ও মনোভাবের উপর একটা ছাপ দিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমূল পরি-বর্ত্তন আনিয়া দিতেছে তাহা বুঝিতে না পারিলেও সুখী—কারণ তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) যে তাঁহাকে ভালবাসেন এবং আপনার হইতেও আপনার!

ঠাকুর চিরকাল শিক্ষা দিয়াছেন, 'কখন কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই' এবং প্রত্যেক ভক্তের সহিত ঐরূপ ব্যবহারও নিত্য করিতেন। শ্রীযুৎ গিরিশকে পূর্ব্বোক্ত ভাব দিয়া ধরিয়া পর পর শিক্ষা সকলও ঐভাবের উপ-যোগী দিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীযুৎ গিরিশ ঠাকুরের সম্মুখে কোন একটি সামান্য বিষয়ে 'আমি করিব' বলায় ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন—"ও কি গো?' অমন করে 'আমি করব' বল কেন? যদি না করতে পার? বলবে —ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় ত করবো।" গিরিশও বুঝিলেন, 'ঠিক কথা; আমি যখন ভগবানের উপর সকলবিষয়ে সম্পূর্ণ ভার দিয়াছি এবং তিনিও সেই

* নারদ ভক্তিসূত্র—

ভার লইয়াছেন তখন তিনি যদি ঐ কার্য্য আমার পক্ষে করা উচিত বা মঙ্গলকর বলিয়া করিতে দেন তবেই করিতে পারিব; নতুবা উহা কেমন করিয়া আপনার সামর্থ্যে করিতে পারিব?' বুঝিয়া, তদবধি আমি করিব, যাইব, ইত্যাদি বলা ও ভাবাগুলো ত্যাগকরিতে লাগিলেন।

পরে ঠাকুরের অদর্শন হইল, স্ত্রীপুত্রাদির বিয়োগরূপ নানা দুঃখ কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল আর মন প্রতি ব্যাপারে বলিয়া উঠিতে লাগিল 'তিনি ঐরূপ হওয়া তোর পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়াই হইতে দিয়াছেন। তুই তাঁর উপর ভার দিয়াছিস, তিনিও লইয়াছেন; কিন্তু কোন পথ দিয়া তিনি তোকে লইয়া যাইবেন তাহা ত আর তোকে লেখাপড়া করিয়া বলেন নাই? তিনি এই পথই তোর পক্ষে সহজ বুঝিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহাতে তোর না বলিবার বা বিরক্ত হইবার তো কথা নাই। তবে কি তাঁর উপর বকল্‌মা বা ভার দেওয়াটা একটা মুখের কথা মাত্র বলিয়াছিলি?' ইত্যাদি--

এইরূপে যত দিন যাইতে লাগিল ততই বকল্‌মা দেওয়ার গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। এখনই কি উহার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পারা গিয়াছে? শ্রীযুৎ গিরিশকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন 'এখনও ঢের বাকি আছে! বকল্‌মা দেওয়ার ভিতর যে এতটা আছে তখন কি তা বুঝেছি। এখন দেখি যে সাধন ভজন জপ তপ রূপ কাজের, একটা সময়ে অন্ত আছে, কিন্তু যে বকল্‌মা দিয়েছে তার কাজের আর অন্ত নাই—তাকে প্রতিপদে প্রতি নিশ্বাসে দেখতে হয় তাঁর (ভগবানের) উপর ভার রেখে,তাঁর জোরে পাটি নিশ্বাসটি ফেল্‌লে, না এই হতচ্ছাড়া 'আমি'টার জোরে সেটি করলে!'

বকল্‌মার প্রসঙ্গে নানা কথা মনে উদয় হইতেছে। জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাই ভগবান্ যীশু, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণই কখন কখন কাহাকেও ঐরূপে অভয় দিয়াছেন। সাধারণ গুরুর ঐরূপ করিবার অধিকার বা সামর্থ্য নাই। সাধারণ গুরু বা সাধুরা মন্ত্র তন্ত্র বা ক্রিয়াবিশেষ, যাহা দ্বারা তাঁহারা নিজেরা কিছু আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, সেই সকলই বড় জোর অপরকে বলিয়া দিতে পারেন। অথবা পবিত্রভাবে নিজ জীবন যাপন করিয়া লোককে পবিত্রতার দিকে আকৃষ্ট করিতে পারেন। কিন্তু নানা বন্ধনে জড়ীভূত হইয়া মানুষ যখন একেবারে অসহায় অবস্থায় উপস্থিত হয়, যখন 'এইরূপ কর' বলিলে সে হতাশ হইয়া বলিয়া উঠে—'করিব কিরূপে? করিবার শক্তি দাও তো করি'—তখন তাহাকে সাহায্য করা

সাধারণ গুরুর সাধ্যাতীত। 'তোমার দুষ্কৃতের সকল ভার লইলাম, আমিই তোমার হইয়া ঐ সকলের ফল ভোগ করিব' একথা মানবকে মানবের বলা ও তদ্রূপ করা সাধ্যাতীত। মানব-হৃদয়ে ধর্ম্মের ঐরূপ গ্লানি উপস্থিত হইলেই কৃপায় শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন। এবং তাহার হইয়া ফলভোগ করিয়া তাহাকে সেই বন্ধনের আবর্ত্ত হইতে উদ্ধার করেন। কিন্তু ঐরূপ করিলেও তাঁহারা তাহাকে একেবারে রেহাই দেন না। তাহার শিক্ষার নিমিত্ত কিছু না কিছু করাইয়া লন। ঠাকুর যেমন বলিতেন— 'তাঁহাদের কৃপায় তার দশজন্মের ভোগটা একজন্মে হয়ে যায়।' ব্যক্তির সম্বন্ধে যেরূপ জাতির সম্বন্ধেও উহা সেইরূপ সত্য। ইহাই গীতায় বিশ্বরূপদর্শনের জন্য অর্জ্জুনের দিব্যচক্ষু লাভ বলিয়া, পুরাণে শ্রীভগবানের কৃপালাভ বলিয়া, বৈষ্ণবশাস্ত্রে জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারসাধন বা পাষণ্ড দলন বলিয়া এবং ক্রিশ্চান ধর্ম্মে ঈশার অপরের ভোগটা নিজে ঘাড়ে লইয়া ভগবানের কোপ শমন করা (atonement) বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে যদি ইহার আভাষ না পাইতাম তাহা হইলে কথাটিতে যে সত্য আছে তাহা কখনই বুঝিতে পারিতাম না।

কলিকাতার শামপুকুরে চিকিৎসার জন্য আসিয়া ঠাকুর যখন থাকেন তখন একদিন দেখিয়াছিলেন তাঁহার নিজের সূক্ষ্মশরীরটা স্থুল-শরীর হইতে বাহিরে আসিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেছে! ঠাকুর বলিয়াছিলেন— 'দেখলুম্, তার পিটময় ঘা হয়েছে! ভাবচি কেন এমন হোল? আর মা দেখিয়ে দিচ্চে,—যা তা করে এসে যত লোকে ছোঁয়, আর তাদের সেই গুলো (দুষ্কর্ম্মের ফল) নিতে হয়। তাই নিয়ে নিয়ে ঐরূপ হয়েছে। আর তাইতেই (নিজের গলা দেখাইয়া) এই হয়েছে। নইলে এ শরীরে কখন কিছু অন্যায় করেনি—এত (রোগ) ভোগ কেন?' আমরা শুনিয়া অবাক! ভাবিতে লাগিলাম বাস্তবিকই তবে একজন অপরের কৃত কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া তাহাকে ধর্ম্মপথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে? অনেকে আবার ঠাকুরের প্রতি ভালবাসায় তখন ভাবিয়াছিলেন 'হায় হায়, কেন আমরা ঠাকুরকে যা তা করিয়া আসিয়া ছুঁইয়াছি। আমাদের জন্য তাঁর এত ভোগ, এত কষ্ট। আর কখনও ঠাকুরের দেবশরীর স্পর্শ করিব না।'

এ সম্বন্ধে ঠাকুরের আর একটি কথা এখানে মনে পড়িতেছে। কোন সময়ে একটি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত (ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ) ব্যক্তি আসিয়া ঠাকুরকে

কাতর হইয়া ধরে ও বলে যে তিনি একবার হাত বুলাইয়া দিলেই তাহার ঐ রোগ হইতে নিষ্কৃতি হয়। ঠাকুর তাহার প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া বলেন "আমি তো কিছু জানি না বাবু, তবে তুমি বলছ, আচ্ছা, হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। মার ইচ্ছা হয় তো সেরে যাবে।" এই বলিয়া হাত বুলাইয়া দেন। সে দিন সমস্ত দিন ধরিয়া ঠাকুরের এমন হাতে যন্ত্রণা হয় যে, তিনি অস্থির হইয়া জগদম্বাকে বলেন, 'মা, আর কখন এমন কাজ করব না।' ঠাকুর বলিতেন, "তাহার রোগ সারিয়া গেল—কিন্তু তার ভোগটা (নিজের দেহ দেখাইয়া) এই-টের উপর দিয়া হয়ে গেল।" তাই বলি—বেদ বাইবেল পুরাণ কোরাণ তন্ত্র মন্ত্র প্রভৃতি, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোক সহায়ে না বুঝিলে এখন কখনই বুঝিতে পারা যাইবে না। ঠাকুর যে বলিতেন নবাবি আমলের টাকা বাদশাই আমলে চলে না'—তাহার কারণই এই।

আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় বকলমা দেওয়াটা বড় সোজা কথা, দিলেই হইল আর কি। মানুষ প্রবৃত্তির দাস, ধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে আসিয়াও কেবল সুবিধাই খোঁজে। কিরূপে এদিক ওদিক, সংসারসুখ ও ভগবদানন্দ, দুটোই পেতে পারে তাই কেবল দেখিতে থাকে। সংসারের ভোগসুখগুলোকে এত মধুর এত অমৃতোপম বলিয়া বোধ করে যে, সেগুলোকে ছাড়িতে হইবে মনে হইলেও দশ দিক শূন্য দেখে। মনে হয় 'বাবা—তবে কি নিয়ে থাকব'? কাজেই ধর্ম্ম কর্ম্মে বকলমা দেওয়া চলে শুনিয়াই লাফাইয়া উঠে। মনে করে, তবে আর কি—আমি চুরি জুয়াচুরি বাটপাড়ি যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া যতটা পারি সংসারে সুখ ভোগ করি, আর শ্রীচৈতন্য যীশু বা শ্রীরামকৃষ্ণ, আমি পর-কালটায়—কারণ মরিতে ত একদিন হইবেই—যাহাতে সুখী হতে পারি তা দেখুন। কিন্তু বোঝে না যে, এটা আর কিছুই নয় কেবল পাজি মন আপ-নাকে আপনি ঠকাইতেছে। বোঝে না, যে ইহা আর কিছুই নয় কেবল পাছে আপনার দুষ্কৃত সকলের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিতে হয় বলিয়া সাধ করিয়া চক্ষে ঠুলি পরিয়া সর্ব্বনাশের দিকে অগ্রসর হওয়া। বোঝে না, যে ঐ ঠুলি একদিন জোর করিয়া একজন খুলিয়া দিবে এবং সে অকূলপাথার দেখিবে—দেখিবে জুয়াচোরের বকলমা কেহ লয় নাই। হায়রে মানব, কত রক-মেই না তুমি আপনাকে আপনি ঠকাইতেছ, এবং মনে করিতেছ বড় 'জিতি-য়াছি!' বা! ভাই, বেশ জিতিতেছ বটে! আর ধন্য মহামায়া! কি ভেল্কিই মানব মনে লাগাইয়াছ! শ্রীরামপ্রসাদ গানে যাহা বলিয়াছেন

তাহা কি হুবহু সত্য—"সাবাস্ মা দক্ষিণাকালি, ভুবন ভেল্কি লাগিয়ে দিলি"! *

বকল্‌মা, অমনি দিলেই, দেওয়া যায় না। বকল্‌মা দেবার অবস্থা হইলে তবেই উহা ঠিক ঠিক দেওয়া যায়, আর তখনই শ্রীভগবান উহা লন। সুখী হইবার আশায় সংসারের নানা কাজে ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া মানব যখন বাস্তবিকই দেখে 'প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়', সাধন ভজন জপ তপ করিয়া মানব যখন প্রাণে প্রাণে বুঝে,অনন্ত ভগবান্‌কে পাইবার উহা কখনই উপযুক্ত মূল্য হইতে পারে না—অদম্য উদ্যমে পাহাড় কাটিয়া পথ করিয়া লইব, ভাবিয়া সকল বিষয়ে লাগিয়া, যখন মানব হাতে নাতে দেখিতে পায় তাহার হাতে কিছুই নাই—তখনই সে 'কে কোথায় আছ গো, রক্ষা কর' বলিয়া কাতরকণ্ঠে ডাকিতে থাকে, আর তখনই শ্রীভগবান্ তাহার বকল্‌মা লন! নতুবা সাধন ভজন করিতে, শ্রীভগবান্‌কে ডাকিতে আমার ভাল লাগে না, বদমায়েসি যথেচ্ছাচার করিতে ভাল লাগে ও তাহাই করিব, আর কেহ ঐ বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে বলিব—'কেন? আমি তো ভগবান্‌কে বকল্‌মা দিয়াছি? তিনি আমায় ঐরূপ করাইতেছেন তা কি করিব; মনটি কেন তিনি ফিরিয়ে দেন না'—এ বকল্‌মা কেবল পরকে ফাঁকি দিবার ও নিজে ফাঁকি পড়িবার বকল্‌মা। উহাতে ইতো নষ্টঃ ততো ভ্রষ্টঃ হইতে হয়।

আর একদিক দিয়া কথাটির আলোচনা করিলে আরও পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে। আচ্ছা বুঝিলাম—তুমি বকল্‌মা দিয়াছ, তোমার শ্রীভগবান্‌কে ডাকিবার বা সাধন ভজন করিবার আর আবশ্যকতা নাই। কিন্তু এটিতো তোমার প্রাণে প্রাণে অনুভব করা চাই যে এই সংসারসমুদ্রে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিলাম, তিনি আমায় কৃপা করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন? ঐরূপ অনুভব করিলে, যিনি তোমার বকল্‌মা লইয়া তোমার জন্য এতটা করিলেন তাঁহার উপর তোমার কতটা ভক্তি ভালবাসার উদয় হইবে, ভাব দেখি।

---

* সাবাস মা দক্ষিণাকালি, ভুবন ভেল্কি লাগিয়ে দিলি
(তোর) ভেল্কির গুটি চরণ দুটি ভবের ভাগ্যে ফেলে দিলি।
এমন বাজিকরের মেয়ে, রাখ্‌লি বাবারে পাগল সাজায়ে,
নিজে গুণময়ী হয়ে পুরুষ প্রকৃতি হলি।
মনেতে তাই সন্ধ করি, যে চরণ পায়নি ত্রিপুরারি,
প্রসাদরে সেই চরণ পাবি? তুইও বুঝি পাগল হলি।

তোমার হৃদয় তাঁহার উপর কৃতজ্ঞতা ভালবাসায় পূর্ণ হইয়া সর্ব্বদাই যে তাঁহার কথা ভাবিতে ও তাঁহার নাম লইতে থাকিবে— উহা করিতে তোমাকে কি আর বলিয়া দিতে হইবে? সাপ যে এমন খল জানোয়ার, সেও যে আশ্রয়-দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া বাস্তু সাপ হয় ও বাটীর কাহাকেও দংশন করে না? তোমার হৃদয় কি উহাপেক্ষাও নীচ যে যিনি তোমার ইহকাল পরকালের ভার লইলেন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভালবাসায় পূর্ণ হইল না? অতএব বকল্‌মা দিয়া যদি দেখ তোমার ভগবান্‌কে ডাকিতে ভাল লাগে না তাহা হইলে বুঝিও তোমার বকল্‌মা দেওয়া হয় নাই এবং তিনিও তোমার ভার গ্রহণ করেন নাই। বকল্‌মা দিয়াছি বলিয়া আর আপনাকে ঠকাইও না এবং অপাপ-বিদ্ধ নিষ্কলঙ্ক ভগবানে নিজ কৃত দুষ্কৃতের কালিমা অর্পণ করিও না। উহাতে আপনারই সমূহ ক্ষতি ও অমঙ্গল। ঠাকুরের 'ব্রাহ্মণের গোহত্যা' গল্পটি মনে রাখিও।—

এক ব্রাহ্মণ অনেক যত্ন ও পরিশ্রমে একখানি সুন্দর বাগান করিয়াছিল। নানা জাতীয় ফল ফুলের গাছ পুতিয়াছিল ও সেগুলি দিন দিন নধর হইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণের আনন্দের আর সীমা ছিল না। এখন একদিন দরজা খোলা পাইয়া একটা গোরু ঢুকিয়া সেই গাছগুলি মুড়াইয়া খাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কার্য্যান্তরে গিয়াছিল। আসিয়া দেখে তখনও গোরুটা গাছ খাইতেছে! বিষম কোপে তাড়া করিয়া সেটাকে যেমন এক ঘা লাঠি মারিয়াছে আর অমনি মর্ম্মস্থানে আঘাত লাগায় গোরুটা মরিয়া গেল! ব্রাহ্মণের তখন প্রাণে ভয়— তাই তো হিন্দু হইয়া গোহত্যা করিলাম;— গোহত্যার তুল্য যে পাপ নাই। ব্রাহ্মণ একটু আধটু বেদান্ত পড়িয়াছিল ও তাহাতে দেখিয়াছিল লেখা আছে যে বিশেষ বিশেষ দেবতার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া মানবের ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব কার্য্য করে। যথা— সূর্য্যের শক্তিতে চক্ষু দেখে, পবনের শক্তিতে কর্ণ শুনে, ইন্দ্রের শক্তিতে হস্ত কার্য্য করে ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের সেই কথাগুলি এখন মনে পড়ায় ভাবিল— 'তবে তো আমি গো হত্যা করি নাই। ইন্দ্রের শক্তিতে হস্ত চালিত হইয়াছে—ইন্দ্রই তবে গো হত্যা করিয়াছে।' কথাটি মনে মনে পাকা করিয়া ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হইল। এদিকে গোহত্যা-পাপ ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবেশ করিতে আসিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের মন তাহাকে তাড়াইয়া দিল! বলিল, 'যাও, এখানে তোমার স্থান নাই; গোহত্যা ইন্দ্র করিয়াছে, তাহার কাছে যাও।' কাজেই পাপ

ইন্দ্রকে ধরিতে গেল। ইন্দ্র, পাপকে বলিলেন, 'একটু অপেক্ষা কর, আমি ব্রাহ্মণের সহিত দুটো কথা কহিয়া আসি, তার পর আমায় ধরিও'। বলিয়া মানবরূপ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের উদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিলেন ও দেখিলেন ব্রাহ্মণ অদূরে দাঁড়াইয়া গাছ পালার তদারক করিতেছে। ইন্দ্র উদ্যানের শোভা দেখিয়া ব্রাহ্মণের যাহাতে কাণে যায় এমন ভাবে প্রশংসা করিতে করিতে ধীরপদে ব্রাহ্মণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বলিলেন—"আহা কি সুন্দর বাগান, কি রুচির সহিত গাছপালা গুলি লাগান হইয়াছে, যেখানে যেটি দরকার সেখানে সেটি পোঁতা হইয়াছে," ইত্যাদি—এই প্রকার বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয় বলিতে পারেন বাগানখানি কার? এমন সুন্দর ভাবে গাছপালাগুলি কে লাগাইয়াছে?" ব্রাহ্মণ উদ্যানের প্রশংসা শুনিয়া আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিল—"আজ্ঞা, এখানি আমার, আমিই এগুলি সব পুঁতিয়াছি। আসুন না, ভাল করিয়া বেড়াইয়া দেখুন না।" এই বলিয়া উদ্যানসম্বন্ধে নানা কথা বলিতে বলিতে ইন্দ্রকে উদ্যান মধ্যস্থ সব দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল এবং ক্রমে ভুলিয়া মৃত গোরুটা যথায় পড়িয়াছিল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ইন্দ্র যেন একেবারে চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'রাম, রাম, এখানে গো-হত্যা করিল কে?' ব্রাহ্মণ এতক্ষণ উদ্যানের সকল পদার্থই 'আমি করিয়াছি, আমি করিয়াছি' বলিয়া আসিয়াছে; কাজেই গোহত্যা কে করিল, জিজ্ঞাসায় বিষম ফাঁপরে পড়িয়া একেবারে নির্ব্বাক, চুপ্। তখন ইন্দ্র নিজরূপ পরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'তবে র‍্যা ভণ্ড, উদ্যানের যাহা কিছু ভাল সব তুমি করিয়াছ, আর গোহত্যাটাই কেবল আমি করিয়াছি, বটে? নে তোর গোহত্যাকৃত পাপ।' এই বলিয়া ইন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন এবং পাপও আসিয়া ব্রাহ্মণের শরীর মনে প্রবেশ করিল!

যাক্ এখন বকলমার কথা, আমরা পূর্ব্ব প্রসঙ্গের অনুসরণ করি।

ঠাকুরের প্রত্যেক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন ঠাকুরের কথাগুলির পূর্ব্বে তাঁহারা যে অর্থ গ্রহণে সমর্থ হইতেন, এখন যত দিন যাইতেছে তত সেইগুলিরই ভিতর আরও কত গভীর অর্থ তাঁহার কৃপায় বুঝিতে পারিতেছেন। আবার ঠাকুরের অনেক কথা বা ব্যবহার যাহার অর্থ তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই, কেবল হাঁ করিয়া শুনিয়া গিয়াছি মাত্র, তাহাদের ভিতর এখন অপূর্ব্ব অর্থ ও ভাব উপলব্ধি করিয়া

অবাক হইয়া থাকিতে হয়! ঠাকুরের কথাই ছিল—'ওরে কালে হবে, কালে বুঝবি। বিচিটা পুঁত্‌লেই কি অমনি ফল পাওয়া যায়? আগে অঙ্কুর হবে, তার পর চারা গাছ হবে, তার পর সেই গাছ বড় হয়ে তাতে ফুল ধরবে, তার পর ফল—সেই রকম। তবে লেগে থাকতে হবে, ছাড়লে হবে না, এই গানটা শোন, কি ব'ল্‌ছে।' এই বলিয়া ঠাকুর মধুর-কণ্ঠে গান ধরিতেন—

হরিষে লাগি রহোরে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই—তেরা বিগড় বাত বনি যাই॥
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে, তারে সুজন কসাই
(আওর্) শুগা পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মীরা বাই।
দৌলত দুনিয়া মাল খাজানা, বেনিয়া বয়েল চালাই
(আওর্) এক বাতকো টাণ্টা পড়ে তো খোঁজ খবর না পাই॥
এয়্‌সি ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাই
সেবা বন্দি আওর্ অধীন্‌তা সহজ মিলি রঘুরাই॥

গান গাহিয়া আবার বলিতেন—"তাঁর সেবা বন্দনা ও অধীনতা, কি না দীনভাব, এই নিয়ে বিশ্বাস করে পড়ে থাক্‌তে থাক্‌তে সব হবে, তাঁর দর্শন পাওয়া যাবেই যাবে। তা না করে ছেড়ে দিলে কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই হল। একজন চাকরি করে কষ্টে সৃষ্টে কিছু কিছু করে টাকা জমাত। একদিন গুণে দেখে যে হাজার টাকা জমেছে। অমনি আহ্লাদে আটখানা হয়ে মনে কর্‌লে তবে আর কেন চাকরি করা? হাজার টাকা ত জমেছে, আর কি? এই বলে, চাকরি ছেড়ে দিলে! এতটুকু আধার, এতটুকু আশা! ঐ পেয়েই সে ফুলে উঠলো, ধরাকে সরাখানা দেখতে লাগল। তারপর হাজার টাকা খরচ হতে আর কদিন লাগে? অল্প দিনেই ফুরিয়ে গেল। তখন দুঃখে কষ্টে আবার চাকরির জন্য ফ্যা ফ্যা করে বেড়াতে লাগল! ও রকম করলে চলবে না, তাঁর (ভগবানের) দ্বারে পড়ে থাকতে হবে, তবেত হবে।"

আবার কখন কখন গানটির দ্বিতীয় চরণ—'তেরা বনত বনত বনি যাই' (অর্থাৎ ভক্তি করিতে করিতে ফল পাওয়া যাইবে)—গাহিতে গাহিতে বলিয়া উঠিতেন "দূর শালা! 'বনত বনত' কি? অমন ম্যাদাটে ভক্তি করতে নাই। মনে জোর করতে হয়—এখনি হবে, এখনি তাঁকে পাব। ম্যাদাটে ভক্তির কি কর্ম্ম তাঁকে পাওয়া?"

ঠাকুরকে দেখিলে বাস্তবিকই মনে হইত যেন একটি জ্বলন্ত ভাবঘন মূর্ত্তি!—যেন পুঞ্জীকৃত ধর্ম্মভাবরাশি একত্র সম্বদ্ধ হইয়া জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে বলিয়াই আমরা তাহার একটা আকার ও রূপ দেখিতে পাইতেছি! মনের ভাব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটার পরিবর্ত্তন হওয়ার কথা আমরা বলিয়াই থাকি ও কালে ভদ্রে কখন একটু আধটু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি, কিন্তু মনের ভাবতরঙ্গ যে শরীরে এতটা পরিবর্ত্তন আনিয়া দিতে পারে, তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই! নির্ব্বিকল্প সমাধিতে 'আমি' জ্ঞানের একেবারে লোপ হইল আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের হাতের নাড়ি, হৃদয়ের স্পন্দন সব বন্ধ হইয়া গেল—ডাক্তারেরা (শ্রীযুৎ মহেন্দ্র লাল সরকার ইত্যাদি) যন্ত্রসহায়ে পরীক্ষা করিয়াও হৃৎপিণ্ডের কার্য্য কিছুই পাইলেন না* এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া জনৈক ডাক্তার বন্ধু ঠাকুরের চক্ষুর তারা বা মণি অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিলেও উহা মৃত ব্যক্তির ন্যায় কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না! 'সখিভাব' সাধনকালে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী ভাবিতে ভাবিতে মন তন্ময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরেও স্ত্রীসুলভ ভাব, উঠা বসা দাঁড়ান কথা কহা প্রভৃতি—প্রত্যেক কার্য্যে এমন প্রকাশ হইতে লাগিল যে চব্বিশ ঘণ্টা যাহারা ঠাকুরের সঙ্গে উঠা বসা করিত (শ্রীযুৎ মথুরানাথ মাড় ইত্যাদি) তাহারাও তাঁহাকে দেখিয়া অনেকবার কোন আগন্তুক স্ত্রীলোক বলিয়া ভ্রমে পড়িল! এইরূপ কত ঘটনাই না আমরা দেখিয়াছি ও ঠাকুরের নিজ মুখ হইতে শুনিয়াছি যাহাতে বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞান ও শরীরবিজ্ঞানের বাঁধাধরা নিয়মগুলিকে পাল্টাইয়া বাঁধিতে হয়। সে সব কথা বলিলেও কি লোকে বিশ্বাস করিবে?

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় দেখিয়াছি ঠাকুরের ভাবরাজ্যের সর্ব্বত্র বিচরণ করিবার ক্ষমতা।—ছোট বড় সব রকম ভাব বুঝিতে পারা! বালক যুবা বৃদ্ধ সকলের মনোভাব—বিষয়ী সাধু, জ্ঞানী ভক্ত, স্ত্রী পুরুষ, সকলের হৃদ্‌গত ভাব ধরিয়া কে কোন পথে কতদূর ধর্ম্মরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছে, পূর্ব্বসংস্কারানুযায়ী ঐ পথ দিয়া অগ্রসর হইতে তাহার কিরূপ সাধনেরই বা বর্ত্তমানে প্রয়োজন, সকল কথা বুঝিতে পারা ও তাহাদের প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করা! দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়

* গলরোগের চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরের বাসায় যখন ঠাকুর থাকেন তখন আমাদের সম্মুখে এই পরীক্ষা হয়।

ঠাকুর যেন মানব মনে যত প্রকার ভাব উঠিয়াছে, উঠিতে পারে, বা পরে উঠিবে সে সকল ভাবই নিজ জীবনে অনুভব করিয়া বসিয়া আছেন এবং ঐ সকল ভাবের প্রত্যেকটির, মনের ভিতর আবির্ভাব হইতে তিরোভাবকাল পর্য্যন্ত, তাঁহার নিজের পর পর যে যে অবস্থা হইয়াছিল তাহাও পুঙ্খানুপুঙ্খ স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন! আর যে যখন আসিয়া যে ভাবের কথা বলিতেছে, নিজের ঐ সকল পূর্ব্বানুভূত ভাবের সহিত মিলাইয়া তখনি তাহা ধরিতেছেন বুঝিতেছেন ও তদুপযোগী বিধান করিতেছেন। সকল বিষয়েই যেন এই রূপ! মায়ামোহ, সংসারতাড়না, ত্যাগ বৈরাগ্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি সকল বিষয়েই কেহ কোন অবস্থায় পড়িয়া উহা হইতে উদ্ধার হইবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া কাতর জিজ্ঞাসু হইয়া আসিলে ঠাকুর পথের সন্ধান তো দিয়া দিতেনই, আবার অনেক সময়েই সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঐ অবস্থায় পড়িয়া যে রূপ অনুভূতি হইয়াছিল তাহাও বলিতেন। বলিতেন "ওগো তখন এইরূপ হইয়াছিল ও এইরূপ করিয়াছিলাম," ইত্যাদি। বলিতে হইবে না—ঐ রূপ করায়, জিজ্ঞাসুর মনে কত ভরসার উদয় হইত এবং ঠাকুর তাহার জন্য যে পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন কতদূর বিশ্বাস ও উৎসাহে সে সেই পথে অগ্রসর হইত। শুধু তাহাই নহে, এইরূপে নিজ জীবনের ঘটনা বলায় জিজ্ঞাসুর মনে হইত, ঠাকুর তাহাকে কত ভালবাসেন! আপনার মনের কথাগুলি পর্য্যন্ত বলেন! দুই একটি দৃষ্টান্তেই বিষয়টি সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে।

সিঁদুরিয়া পটির শ্রীযুৎ মণিমোহন মল্লিকের একটি উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইল। মণিমোহন পুত্রের সৎকার করিয়াই ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরকে অভিবাদন করিয়া বিমর্ষ ভাবে ঘরের এক পাশে বসিলেন। দেখিলেন, ঘরে স্ত্রী পুরুষ অনেকগুলি জিজ্ঞাসু ভক্ত বসিয়া রহিয়াছেন এবং ঠাকুর তাঁহাদের সহিত নানা সৎ প্রসঙ্গ করিতেছেন। বসিবার অল্পক্ষণ পরেই ঠাকুরের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল এবং ঘাড় নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি গো? আজ এমন শুক্‌নো দেখ্‌ছি কেন?'

মণিমোহন (পুত্রের নাম করিয়া) অমুক বাবু আজ মারা পড়িয়াছেন।

ঠাকুর—'বটে?'—বলিয়াই ঠাকুরের চেহারা এমন হইয়া গেল যেন তাঁহারই কোন নিকট আত্মীয় মারা পড়িবার সংবাদ এই প্রথম পাইলেন! ঠাকুরের ঐ রূপ ভাবান্তরে মণিমোহন এবং উপস্থিত সকলের কাহারও বুঝিতে

বাকি রহিল না, ঠাকুর ঐ দুর্ঘটনায় কতদূর ব্যাথিত হইয়াছেন। শোকের কথা শুনিলেই লোকের নিজ নিজ আত্মীয় বন্ধু বান্ধব যাহারা মারা পড়িয়াছে, তাহাদের কথাই স্বভাবতঃ অগ্রে মনে পড়ে—ঠাকুরের কথাগুলিও তদনুরূপ হইল। শুধু তাহাই নহে, এমন বিমর্ষ-গম্ভীর ভাবে ঠাকুর কথাগুলি বলিতে লাগিলেন যে স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল তিনি যেন আপনার আত্মীয়ের মৃত্যু পুনরায় চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছেন! পাঠক হয়ত বলিবে 'এ আর কি বড় কথা? সংসারে এরূপ তো অনেকেই করিয়া থাকে। একথা আবার ঠাকুর ঠুকুর আনিয়া ভণিতা করিয়া বলিবার প্রয়োজন কি?' আমরা বলি, ছোট কথা বলিয়াই বলিতেছি। যিনি যথার্থ মহৎ তাঁহার ছোট ছোট কাজগুলিও অপর সাধারণের মত হয় না, সে সকলেই মহত্ত্বের বিশেষ ছাপ অঙ্কিত থাকে। ভাবিয়া দেখ দেখি, এই মাত্র কিছুক্ষণ পূর্ব্বে হয় ত নির্ব্বিকল্প সমাধি বা শ্রীভগবানের নৈকট্য উপলব্ধিতে যাঁহার হৃদয়ের স্পন্দন পর্য্যন্ত রহিত হইয়া গিয়াছিল সেই ঠাকুরই এখন আবার পুত্রশোকে কাতর মণিমোহনের অবস্থার সহিত সহানুভূতিতে একেবারে সাধারণ মানবের ন্যায়, সত্য সত্যই হইয়াছেন! কেন?—"মায়া হ্যায়, ছোট কথা," বলিয়া উড়াইয়া দিতে তো পারিতেন?—সে ক্ষমতা যে ঠাকুরের ছিল না, তাহাত নহে? কিন্তু ঐরূপে মহত্ত্ব খ্যাপন করিলে বুঝিতাম, তিনি বড় হন বা আর যাহা কিছু হন, লোকগুরু জগদ্‌গুরু ঠাকুর নহেন—ইহা নিশ্চিত। বুঝিতাম, মানব সাধারণের ভাব বুঝিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। এবং বলিতাম,—ও পাঠ নাই বলিয়াই 'মায়া হ্যায়' টায়া হ্যায় সব চলছে; একবার দুর্ব্বল মানব, আমাদের মত অসহায় অবস্থায় পড়িলে ও সব কথা কেমন বাহির হইত তাহা দেখিতাম। যাক্, তাহা না করিয়া ঠাকুর বলিলেন—'আহা!'—আবার কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া, 'পুত্র শোকের মত কি আর জ্বালা আছে? খোলটা (দেহ) থেকে বেরোয় কি না? খোলটার সঙ্গে সম্বন্ধ—যত দিন খোলটা থাকে তত দিন থাকে! অক্ষয় মোলো—তখন কিছু হ'ল না। কেমন করে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লুম। দেখ্‌লুম, যেন খাপের ভিতর তলোয়ার খানা ছিল, সেটাকে খাপ্ থেকে বার করে নিলে; তলোয়ারের কিছু হল না—যেমন তেমনিই থাক্‌ল, খাপ্‌টা পড়ে রইল! দেখে খুব আনন্দ হল—খুব হাস্‌লুম, গান করলুম, নাচলুম! তার শরীরটাকে তো পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে এল!

তার পর দিন (ঘরের পূর্ব্বে, কালিবাড়ির উঠানের সাম্‌নের বারাণ্ডার দিকে দেখাইয়া) ঐখানে দাঁড়িয়ে আছি, আর দেখছি কি, যেন প্রাণের ভিতরটায় গামছা যেমন নিংড়ায় তেমনি নেংড়াচ্চে, অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি কচ্চে! ভাবলুম, ওমা এখানে (আমার) পোঁদের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নেই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল—এখানেই (আমার) যখন এরকম হচ্চে তখন গৃহীদের শোকে কি না হয়!—তাই দেখাচ্চিস্, বটে?"

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—'তবে কি জান?—যারা তাঁকে (ভগবান্‌কে) ধরে থাকে তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না। একটু নাড়াচাড়া খেয়েই সামলে যায়। চুনো পুঁটির মত আধারগুলো একেবারে অস্থির হয়ে উঠে বা তলিয়ে যায়। দেখনি? গঙ্গায় ষ্টিমারগুলো গেলে জেলেডিঙ্গিগুলো কি করে? মনে হয় যেন একেবারে গেল, আর সামলাতে পারলে না। কোনখানা বা উল্টেই গেল। আর বড় বড় হাজার মণে কিস্তিগুলো দু চারবার টাল্ মাটাল্ হয়েই যেমন তেমনি, স্থির হল। দু চারবার নাড়াচাড়া, কিন্তু খেতেই হবে।'

আবার কিছুক্ষণ বিমর্ষ-গম্ভীর ভাবে থাকিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন— 'কয় দিনের জন্যেই বা সংসারের এ সকলের (পুত্রাদির) সঙ্গে সম্বন্ধ। মানুষ সুখের আশায় সংসার কর্‌তে যায়;—বিয়ে কর্‌লে, ছেলে হ'ল, সেই ছেলে আবার বড় হ'ল, তার বিয়ে দিলে—দিন কতক বেশ চল্‌লো। তার পর এটার অসুখ, ওটা ম'ল, এটা ব'য়ে গেল—ভাবনায় চিন্তায় একেবারে ব্যতিব্যস্ত,যত রস মরে তত একেবারে 'দশ ডাক' ছাড়তে থাকে। দেখনি?— ভিয়েনের উনুনে কাঁচা সুঁদরীর চেলাগুলো, প্রথমটা বেশ জ্বলে। তার পর কাটখানা যত পুড়ে আসে কাটের সব রসটা পোঁদের দিক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে গ্যাজলার মত হয়ে ফুটতে থাকে আর চুঁ, চাঁ, ফুস্ ফাস্ নানা রকম আওয়াজ হতে থাকে—সেই রকম।' এই প্রকারে সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা এবং শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়াতেই একমাত্র সুখ, এই বিষয়ে নানা কথা কহিতে কহিতে ঠাকুর যেন অর্দ্ধবাহ্য দশা প্রাপ্ত হইলেন এবং শ্রীযুৎ মণিমোহনকে লক্ষ্য করিয়া তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব তেজের সহিত গান ধরিলেন—

জীব সাজ সমরে।

ঐ দেখ্ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।

আরোহণ করি মহাপুণ্য রথে,　　ভজন সাধন দুটো অশ্ব জুড়ে তাতে
দিয়ে জ্ঞানধনুকে টান ভক্তিব্রহ্মবাণ সংযোগ কররে।
আর এক যুক্তি আছে শুন সুসঙ্গতি,
সব শত্রু নাশের চাইনে রথরথী
রণভূমি যদি করেন দাশরথি ভাগিরথীর তীরে॥

গানের বীরত্বব্যঞ্জক সুর ও তদনুরূপ অঙ্গভঙ্গী, ঠাকুরের নয়ন হইতে নিঃসৃত বৈরাগ্য ও তেজের সহিত মিলিত হইয়া সকলের প্রাণে এক অপূর্ব্ব আশা ও উদ্যমের স্রোত প্রবাহিত করিল। মণিমোহনও সামলাইয়া বলিলেন—"এই জন্যই তো আপনার কাছে ছুটে এলুম। বুঝলুম এ জ্বালা আর কেউ শান্ত করতে পারবে না।"

*　　*　　*　　*　　*

পরক্ষণেই আবার হয়ত কোন যুবক আসিয়া বিষণ্ণচিত্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল—'মশায়, কাম কি করে যায়? এত চেষ্টা করি, তবুও মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য ও কুভাব মনে উপস্থিত হয়ে বড় অশান্তি আসে।'

ঠাকুর—"ওরে ভগবদ্দর্শন না হলে কাম একেবারে যায় না। তা (ভগবানের দর্শন) হলেও শরীর যতদিন থাকে ততদিন একটু আধটু থাকে, তবে মাথা তুলতে পারে না। তুই কি মনে করিস আমারই একেবারে গেছে? এক সময়ে মনে হয়েছিল যে কামটাকে জয় করেছি। তারপর পঞ্চবটীতে বসে আছি আর এমনি কামের তোড় এল যে, আর যেন সামলাতে পারি নি! তারপর ধূলোয় মুখ ঘসড়ে কাঁদি আর মাকে বলি, 'মা, বড় অন্যায় করেছি, আর কখনও ভাব্‌ব না যে কাম জয় করেছি'—তবে যায়! কি জানিস্ (তোদের) এখন যৌবনের বন্যা এসেছে। তাই বাঁধ দিতে পাচ্চিস্ না। বান যখন আসে তখন কি আর বাঁধ টাধ মানে? বাধ উছলে ভেঙ্গে লোকের ধান ক্ষেতের উপর জল ছুটতে থাকে। তবে বলে, কলিতে মনের পাপ, পাপ নয়। আর মনে একবার আধ বার কখন কুভাব এসে পড়ে তো 'কেন এল,' বলে বসে বসে তাই ভাবতে থাক্‌বি কেন? ওগুলো কখন কখন শরীরের ধর্ম্মে আসে যায়, শৌচ পেচ্ছাপের চেষ্টার মত মনে করবি। শৌচ পেচ্ছাপের চেষ্টা হয়েছিল বলে লোকে কি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসে? সেই রকম ঐ ভাবগুলোকে অতি সামান্য, তুচ্ছ, হেয় জ্ঞান করে মনে আর আনবি না। আর তাঁর নিকটে খুব প্রার্থনা করবি, হরিনাম করবি ও তাঁর কথাই ভাববি। ও ভাবগুলো এল কি গেল, সেদিকে নজর দিবি না। এর পর ওগুলো ক্রমে ক্রমে বাধ মানবে।" যুবকের কাছে ঠাকুর যেন এখন যুবকই হইয়া গিয়াছেন!

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুৎ যোগেনের কথা মনে পড়িতেছে। স্বামী যোগানন্দ যাঁহার মত ইন্দ্রিয়জিৎ পুরুষ বিরল দেখিয়াছি, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে একদিন ঐ প্রশ্ন করেন। তাঁহার বয়স তখন অল্প, বোধ হয় ১৪।১৫ হইবে এবং অল্প দিনই ঠাকুরের নিকট গতায়াত করিতেছেন। সে সময় নারায়ণ নামে এক

হটযোগীও দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটী তলে কুটীরে থাকিয়া নেতি ধৌতি* ইত্যাদি ক্রিয়া দেখাইয়া কাহাকেও কাহাকেও কৌতূহলাকৃষ্ট করিতেছে। যোগেন স্বামীজি বলিতেন তিনিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং ঐ সকল ক্রিয়া দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, ঐ সকল না করিলে বোধ হয় কাম যায় না এবং ভগবদ্দর্শন হয় না! তাই প্রশ্ন করিয়া বড় আশায় ভাবিয়াছিলেন ঠাকুর কোন একটা আসন টাসন বলিয়া দিবেন বা হরীতকি কি অন্য কিছু খাইতে বলিবেন বা প্রাণায়ামের কোন ক্রিয়া শিখাইয়া দিবেন। যোগেন স্বামীজি বলিতেন—"ঠাকুর আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন 'খুব হরিনাম করবি, তা হলেই যাবে।' কথাটা আমার একটুও মনের মত হল না। মনে মনে ভাবলুম—উনি কোন ক্রিয়া টিয়া জানেন না কি না তাই একটা যা তা বলে দিলেন। হরিনাম করলে আবার কাম যায়—তা হলে এত লোকত কচ্চে, যাচ্চেনা কেন? তারপর একদিন কালিবাটীর বাগানে এসে ঠাকুরের কাছে আগে না গিয়ে পঞ্চবটীতে হটযোগীর কাছে দাঁড়িয়ে তার কথা বার্ত্তা শুনছি এমন সময় দেখি ঠাকুর স্বয়ং সেখানে এসে উপস্থিত! আমাকে দেখেই ডেকে আমার হাত ধরে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলতে লাগলেন 'তুই ওখানে গিয়েছিলি কেন? ওখানে যাস্‌নি। ওসব (হটযোগের ক্রিয়া) শিখলে ও করলে শরীরের উপরেই মন পড়ে থাকবে। ভগবানের দিকে যাবে না।' আমি কিন্তু ঠাকুরের কথাগুলি শুনে ভাবলুম—পাছে আমি ওঁর (ঠাকুরের) কাছে আর না আসি তাই এই সব বলছেন! আমার বরাবরই আপনাকে বড় বুদ্ধিমান বলে ধারণা, কাজেই বুদ্ধির দৌড়ে ঐরূপ ভাবলুম, আর কি! আমি তাঁর কাছে আসি বা নাই আসি তাতে তাঁর (ঠাকুরের) যে কিছুই লাভ লোকসান নাই একথা তখন মনেও এল না! এমন পাজি সন্দিগ্ধ মন ছিল। ঠাকুরের কৃপার শেষ নাই তাই এত সব অথায় ভাব মনে এনেও স্থান পেয়েছিলাম। তারপর ভাবলুম—উনি (ঠাকুর) যা বলেছেন তা করেই দেখি না কেন, কি হয়? এই বলে এক মনে খুব হরিনাম করতে লাগলুম। আর বাস্তবিকই অল্প দিনেই ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, প্রত্যক্ষ ফল পেতে লাগলুম।"

এইরূপে সকলের সকল অবস্থা ও ভাব ধরিবার কথার কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সিঁদুরিয়াপটির মল্লিক মহাশয়ের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহার ভক্তিমতী জনৈক আত্মীয়াও ঠাকুরের নিকট যাওয়া আসা করিতেন। এক দিন আসিয়া তিনি বিশেষ কাতরভাবে জানাইলেন যে ভগবানের ধ্যান

---

* দুই অঙ্গুলি চওড়া ও প্রায় দশ, পনর হাত লম্বা একটা ন্যাকড়ার ফালি ভিজাইয়া আস্তে আস্তে গিলিয়া ফেলা ও পরে তাহা আবার টানিয়া বাহির করার নাম নেতি। আর ২।১ সের জল খাইয়া পুনরায় বমন করিয়া ফেলার নাম ধৌতি। গুহ্য দ্বার দিয়া জল টানিয়া বাহির করাকেও ধৌতি বলে। হটযোগীরা এইরূপে শরীরমধ্যস্থ সমস্ত শ্লেষ্মাদি বহির্গত করিয়া ফেলেন। তাঁহারা বলেন ইহাতে শরীরে রোগ আসিতে পারে না এবং দৃঢ় হয়।

করিতে বসিলে সংসারের চিন্তা, এর কথা, তার মুখ, ইত্যাদি মনে পড়িয়া বড়ই অশান্তি আসে। ঠাকুর অমনি তাঁর ভাব ধরিলেন; বুঝিলেন, ইনি কাহাকেও ভালবাসেন যাহার কথা ও মুখ মনে পড়ে। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার মুখ মনে পড়ে গো? সংসারে কাকে ভাল বাস বল দেখি?" তিনি উত্তর করিলেন, একটি ছোট ভ্রাতুষ্পুত্রকে, যাহাকে তিনি মানুষ করিতেছিলেন। ঠাকুর বলিলেন—'বেশ তো, তাহার জন্য যা কিছু করবে, তাকে খাওয়ান পরান ইত্যাদি সব গোপাল ভেবে কোরো। যেন গোপালরূপী ভগবান তার ভিতরে রয়েচেন, তুমি তাঁকেই খাওয়াচ্চ পরাচ্চ, সেবা করচ, এই রকম ভাব নিয়ে কোরো। মানুষের করচি ভাববি কেন গো? যেমন ভাব তেমন লাভ।' শুনিতে পাই ঐরূপ করার ফলে অল্প দিনেই তাঁহার বিশেষ মানসিক উন্নতি, এমন কি ভাবসমাধি পর্য্যন্ত হইয়াছিল।

ঠাকুরের নিজের পুরুষ শরীর ছিল, সে জন্য তাঁর পুরুষের ভাব বুঝা ও ধরাটা কতক বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু স্ত্রীজাতি,—কোমলতা সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি মনোভাবের জন্য ভগবান যাহাদের পুরুষ অপেক্ষা একটা অংশ অধিক দিয়াছেন, তাহাদের সকল ভাব ঠাকুর কি করিয়া ঠিক ঠিক ধরিতেন তাহা ভাবিলে আর আশ্চর্য্যের সীমা থাকে না! ঠাকুরের স্ত্রী ভক্তেরা বলেন, "ঠাকুরকে তাঁহাদের পুরুষ বলিয়াই মনে হইত না। যেন মনে হত আমাদেরই একজন! সে জন্য পুরুষের নিকটে আমাদের যেমন সঙ্কোচ লজ্জা আসে ঠাকুরের নিকটে তাহার কিছুই আসিত না। যদি বা কখন আসিত তো তৎক্ষণাৎ আবার ভুলিয়া যাইতাম ও আবার নিঃসঙ্কোচে মনের কথা খুলিয়া বলিতাম!" 'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সখী বা দাসী আমি' এই ভাবনা দীর্ঘকাল ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া তন্ময় হইয়া 'পুরুষ আমি' এ ভাবটি ঠাকুর একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই কি ঐরূপ হইত? পতঞ্জল তাঁহার যোগসূত্রে বলিয়াছেন তোমার মন হইতে হিংসা যদি একবারে ত্যাগ হয় তো মানুষের তো কথাই নাই—জগতে কেহই, বাঘ সাপ প্রভৃতিও তোমাকে আর হিংসা করিবে না! তোমাকে দেখিয়া তাহাদের মনে হিংসাপ্রবৃত্তিরই উদয় হইবে না। হিংসার ন্যায় কামক্রোধাদি অন্য সকলবিষয়েও তদ্রূপ। পুরাণে এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি বলিলেই চলিবে। মায়াহীন নিষ্কলঙ্ক যুবক শুক, ভগবদ্ভাবে অহরহঃ নিমগ্ন থাকিয়া সংসার ছাড়িয়া যাইতেছেন, আর বৃদ্ধ পিতা ব্যাস, পুত্রমায়ায় অন্ধ হইয়া 'কোথা যাও' বলিতে বলিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন! পথিমধ্যে সরোবরতীরে বস্ত্র রাখিয়া অপ্সরীরা স্নান করিতেছিলেন। শুককে দেখিয়া তাঁহাদের মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা লজ্জা হইল না—যেমন স্নান করিতেছিলেন তেমনই করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ব্যাস তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সকলে সসম্ভ্রমে শরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত করিলেন। ব্যাস ভাবিলেন, এতো বেশ, আমার যুবক পুত্র অগ্রে যাইল তাহাতে কেহ একটু নড়িলও না, আর আমি বৃদ্ধ, আমাকে দেখিয়া এত লজ্জা! কারণ জিজ্ঞাসায় রমণীরা বলিলেন—"শুক এত পবিত্র যে, 'সে

আত্মা' এই চিন্তাই তাহার সর্ব্বক্ষণ রহিয়াছে! তাহার নিজের স্ত্রীশরীর কি পুরুষশরীর সে বিষয়ে আদৌ হুঁসই নাই! কাজেই তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জা আসিল না। আর তুমি বৃদ্ধ, রমণীর হাবভাবকটাক্ষের অনেক পরিচয় পাইয়াছ ও রূপলাবণ্যের অনেক বর্ণনাও করিয়াছ; তোমার শুকের মত, স্ত্রীপুরুষে আত্মদৃষ্টি নাই এবং হইবেও না কাজেই তোমাকে দেখিয়া আমাদের পুরুষ বুদ্ধির উদয় হইয়া সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা আসিল!”

ঠাকুরের সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথাই মনে হয়। তাঁহার জ্বলন্ত আত্মজ্ঞান ও স্ত্রীপুরুষ সকলের ভিতর, সর্ব্বভূতে আত্মদৃষ্টি, তাঁহার নিকটে যতক্ষণ থাকা যাইত ততক্ষণ সকলের মন এত উচ্চে উঠাইয়া রাখিত যে 'আমি পুরুষ' 'উনি স্ত্রী' এ সকল ভাব অনেক সময়ে মনেই উঠিত না। কাজেই পুরুষের ন্যায় স্ত্রীজাতিরও তাঁহার নিকট সঙ্কোচাদি না হইবারই কথা। শুধু তাহাই নহে, ঠাকুরের সংসর্গে ঐ আত্মদৃষ্টি তাঁহাদের ভিতর তৎকালে এত বদ্ধমূল হইয়া যাইত যে, যে সকল কাজকে মেয়েরা অসীম সাহসের কাজ বলেন ও কখনও কাহারও দ্বারা আদিষ্ট হইয়া করিতে পারেন না, ঠাকুরের কথায় সেই সকল কাজ অবাধে অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া আসিতেন! পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছি—কেমন করিয়া সম্ভ্রান্তবংশীয়া একটি স্ত্রীলোক যিনি গাড়ী পাল্কি ভিন্ন পাড়ায় একবাটী হইতে ও বাটীতে কখন যান নাই, ঠাকুরের আজ্ঞায় তাঁহার সহিত পদব্রজে দিনের বেলায় সদর রাস্তা দিয়া অনায়াসে হাঁটিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত আসিলেন ও নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালিবাটীতে যাইলেন; শুধু তাহাই নহে আবার সেখানে ঠাকুরের আজ্ঞায় বাজার করিয়া আনিলেন ও সন্ধ্যার সময় হাঁটিয়া পুনরায় নিজ বাড়ীতে আসিলেন! আর দুই একটি দৃষ্টান্ত ঐ বিষয়ে এখানে দিলেই কথাটি বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

১৮৮৪ খৃঃর ভাদ্র বা আশ্বিন মাস। শ্রীশ্রীমা তখন পিত্রালয় জয়রামবাটীতে গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বলরাম বসু তাঁহার পিতার সহিত বৃন্দাবনে গিয়াছেন। সঙ্গে শ্রীযুৎ রাখাল (ব্রহ্মানন্দ স্বামীজি) শ্রীযুৎ গোপাল (অদ্বৈতানন্দ স্বামী) প্রভৃতি স্ত্রীপুরুষ অনেকগুলি গিয়াছেন। বাগবাজারের একটি সম্ভ্রান্তবংশীয় স্ত্রীলোকের,—যিনি ঠাকুরকে কখন দেখেন নাই, কথা মাত্রই শুনিয়াছেন,—ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবার বিশেষ ইচ্ছা হইল; পরিচিতা আর একটি স্ত্রীলোককে ঐ কথা বলিলেন। পরিচিতা স্ত্রী ভক্তটি দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঠাকুরের নিকট যাওয়া আসা করিতেছেন, সে জন্যই তাঁহাকে বলা। পরামর্শ স্থির হইল। পরদিন অপরাহ্নে নৌকায় করিয়া উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। দেখিলেন ঠাকুরের ঘরের দ্বার রুদ্ধ। ঘরের উত্তরের দেয়ালে দুটি ফোকোর আছে, তাহার ভিতর দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন। কাজেই নহবতে, যেখানে শ্রীশ্রীমা থাকিতেন, গিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একটু পরেই ঠাকুর উঠিলেন এবং উত্তরের দরজা খুলিয়া নহবতের দ্বিতলের বারাণ্ডায়

তাঁহারা বসিয়া আছেন দেখিতে পাইয়া 'ওগো তোরা এখানে আয়' বলিয়া ডাকিলেন। স্ত্রী ভক্তেরা আসিয়া আসন গ্রহণ করিলে, ঠাকুর তক্তা হইতে নামিয়া পরিচিতা স্ত্রী ভক্তটির নিকটে যাইয়া বসিলেন। তিনি তাহাতে সঙ্কুচিত হইয়া সরিয়া বসিবার উপক্রম করিলে, ঠাকুর বলিলেন—"লজ্জা কি গো। লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাক্‌তে নয়। (হাত নাড়িয়া) তোরাও যা, আমিও তাই। তবে (দাড়ির চুলগুলি দেখাইয়া) এইগুলো আছে বলে লজ্জা হচ্চে, না ?"

এই বলিয়াই ভগবদ্‌প্রসঙ্গ পাড়িয়া নানা কথার উপদেশ করিতে লাগিলেন। স্ত্রী ভক্তেরাও স্ত্রী-পুরুষ ভেদ ভুলিয়া যাইয়া নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করিতে ও শুনিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথা বার্ত্তার পর বিদায়কালে ঠাকুর বলিলেন—'সপ্তাহে একবার করে আসবে। নূতন নূতন এখানে আসা যাওয়াটা বেশী রাখতে হয়।' আবার সম্ভ্রান্তবংশীয়া হইলেও গরিব দেখিয়া নৌকা, গাড়ীর ভাড়া নিত্য নিত্য কোথা পাইবেন ভাবিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন,—আসবার সময় তিন চার জনে মিলে নৌকায় করে আসবে। আর যাবার সময় এখান থেকে হেঁটে বরানগরে গিয়ে সেয়ারে গাড়ী করবে।' বলা বাহুল্য স্ত্রী ভক্তেরা তদবধি তাহাই করিতে লাগিলেন!

আর একজন আমাদের একদিন বলিয়াছিলেন—"ভোলা ময়রার দোকানে বেশ সর করেছিল! ঠাকুর সর খেতে ভাল বাসতেন জানতুম, তাই বড় একখানি সর কিনে আমরা পাঁচ জনে মিলে নৌকো করে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। ও মা, এসেই শুনলুম ঠাকুর কলিকাতায় গিয়াছেন! সকলে তো একেবারে বসে পড়লুম। কি হবে? রামলাল দাদা ছিল—তাঁকে ঠাকুর কোথায় গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করায়, বলে দিলে—'কম্বুলেটোলার মাষ্টার মহাশয়ের বাড়িতে।' অ—র মা, শুনে বল্‌লে—'সে বাড়ী আমি জানি, আমার বাপের বাড়ীর কাছে—যাবি?—চল যাই। এখানে বসে আর কি করব?' সকলে তাই মত করলে। রামলাল দাদার হাতে সরখানি দিয়ে বলে গেলুম 'ঠাকুর এলে দিও'। নৌকো তো ছেড়ে দিয়েছিলুম—হেঁটে হেঁটেই সকলে চল্‌লুম। কিন্তু এমনি ঠাকুরের ইচ্ছে, আলমবাজারটুকু গিয়েই একখান ফেরতা গাড়ী পাওয়া গেল! ভাড়া করেত শামপুকুরে সব এলুম। এসে আবার বিপদ! অ—র মা, বাড়ী চিন্‌তে পারলে না। শেষ ঘুরে ঘুরে তার বাপের বাড়ীর সামনে গাড়ী দাঁড় করিয়ে একটা চাকরকে ডেকে আনলে। সে সঙ্গে এসে দেখিয়ে দেয়, তবে হয়! অ—র মা'রই বা দোষ দেব কি, আমাদের চেয়ে ৩।৪ বছরের ছোট তো? তখন ছাব্বিশ সাতাশ বছরের হবে। বৌ মানুষ রাস্তা ঘাটে কখনও বেরোয় নি, আর গলির ভিতরে বাড়ী*—সে চিনবেই বা কেমন করে গা?

* ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুৎ মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রকাশ

"যা হোক্ করে তো পৌঁছুলুম। তখন মাষ্টারদের (পরিবারের) সঙ্গেও চেনা শুনা হয় নি। বাড়ী ঢুকে দেখি একখানি ছোট ঘরে তক্তাপোষের উপর ঠাকুর বসে, কাছে কেউ নাই! আমাদের দেখেই হেসে বলে উঠলেন—'তোরা এখানে কেমন করে এলি গো?' আমরা তাঁকে প্রণাম করে সব কথা বল্‌লুম। তিনি খুব খুসী, ঘরের ভিতর বসতে বল্‌লেন, আর অনেক কথা বার্ত্তা কইতে লাগলেন। এখন সকলে বলে, মেয়েদের তিনি ছুঁতে দিতেন না! কাছে যেতে দিতেন না। আমরা শুনে হাসি ও মনে করি—তবু আমরা এখনও মরি নি! তাঁর যে কি দয়া ছিল, তা কে জানবে! স্ত্রী-পুরুষে সমান ভাব! তবে লোকের হাওয়া অনেক ক্ষণ সহ্য করতে পারতেন না। অনেক ক্ষণ থাকলে বলতেন—'যা গো, এইবার একবার মন্দিরে দর্শন করে আয়।' পুরুষদেরও ঐরূপ বলতে আমরা শুনেছি।

"যাক্! আমরা তো বসে কথা কইছি। আমাদের ভিতর যে দু জনের বেশী বয়েস ছিল তারা দরজার সামনেই বসেছে, আর আমরা তিন জন ঘরের ভিতর এককোণে। এমন সময় ঠাকুর যাকে 'মোটা বামুন' বল্‌তেন (শ্রীযুৎ প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) এসে উপস্থিত। বেরিয়ে যাব, তারও যো নাই! কোথায়—যাই। বুড়ীরা দরজার সামনেই একটি জানালা ছিল তাইতে বসে রইল। আর আমরা তিনটেয় ঠাকুর যে তক্তাপোষে বসেছিলেন তার নিচে ঢুকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে রইলুম! মশার কামড়ে সর্ব্বাঙ্গ ফুলে উঠলো, কি করি, নড়বার যো নাই, স্থির হয়ে পড়ে রইলুম। কথা বার্ত্তা কয়ে বামুন প্রায় এক ঘণ্টা বাদে চলে গেল, তখন বেরুই!—আর হাসি।

"তারপর বাড়ীর ভিতর জল খাবার জন্য ঠাকুরকে নিয়ে গেল। তখন তাঁর সঙ্গে বাড়ীর ভিতর গেলুম। তার পর খেয়েদেয়ে কতক্ষণ বাদে ঠাকুর গাড়ীতে উঠলেন (দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন বলিয়া); তখন সকলে হেঁটে বাড়ী ফিরি! রাত তখন ৯টা হবে।

"তার পরদিন আবার দক্ষিণেশ্বরে গেলুম। যাবামাত্র ঠাকুর কাছে এসে বল্লেন—'ওগো তোমার সর প্রায় সবটা খেয়েছিলুম, একটু বাকি ছিল; কোন অসুখ করে নি, পেটটা একটু সামান্য গরম হয়েছে।' আমি তো শুনে অবাক্—তাঁর পেটে কিছু সয় না আর একখানা সর তিনি একেবারে খেয়েছেন! তার পর শুনলুম—ভাবাবস্থায় খেয়েছেন! শুনলুম, মাষ্টার মহাশয়ের বাড়ীথেকে ঠাকুর খেয়েদেয়ে সে রাত্রি সাড়ে দশটায় এসে পৌঁছুলেন; এসে খানিক বাদে তাঁর ভাব হয় ও অর্দ্ধবাহ্য দশায় রামলাল দাদাকে বলেন 'বড় ক্ষুধা পেয়েছে, ঘরে কি আছে দেত রে।' রামলাল দাদা শুনে আমার সেই সরখানি এনে সামনে দেন ও ঠাকুর তা

করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইনি তখন কলিকাতা কম্বুলিয়াটোলায় একটি ভাড়াটিয়া বাটীতে থাকিতেন।

প্রায় সব খেয়ে ফেলেন! ভাবের ঘোরে তাঁর কখন কখন অমন অসম্ভব খাওয়া ও খেয়ে হজম করার কথা মার কাছে ও লক্ষ্মী দিদির কাছে শুনেছিলাম. সেই সব কথা মনে পড়িল। এত কৃপা আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি! সে যে কি দয়া তা বোলে বোঝাবার নয়! আর সে কি টানে. কেমন করে যে আমরা সব যেতুম করতুম তা আমরাই জানি না, বুঝি না। কৈ, এখন তো আর সে রকম করে কোথাও হেঁটে হেঁটে, বলা নেই কওয়া নেই অচেনা লোকের বাড়ীতে সাধু দেখতে বা ধর্ম্ম কথা শুনতে যেতে পারি নি। সে যাঁর শক্তিতে করতুম তাঁর সঙ্গে গিয়েছে! তাঁকে হারিয়ে এখনও কেন যে বেঁচে আছি তা জানি না!"

এইরূপ আরও কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে! যাঁহারা কখনও বাটীর বাহির হন নাই তাঁহাদের দিয়া বাজার করাইয়া আনিয়াছেন, অভিমান অহঙ্কার দূরে যাইবে বলিয়া সাধারণ ভিখারীর ন্যায় লোকের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করাইযাছেন, সঙ্গে লইয়া পেনেটির মহোৎসব ইত্যাদি দেখাইয়া আনিয়াছেন—আর তাঁহারাও মনে কোন দ্বিধা না করিয়া মহানন্দে যাহা ঠাকুর বলিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন! ভাবিয়া দেখিলে ইহা একটি কম ব্যাপার বলিযা মনে হয় না। সে প্রবল জ্ঞানতরঙ্গের সম্মুখে সকলেরই ভেদজ্ঞানপ্রসূত দ্বিধাভাব তখনকার মত ভাসিয়া গিয়াছে। সে উজ্জ্বল ভাবঘনতনু ঠাকুরের ভিতর সকলেই নিজ নিজ ভাবের পূর্ণাদর্শ দেখিতে পাইয়া আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে! পুরুষ, পুরুষত্বের পূর্ণবিকাশ দেখিয়া নতশির হইয়াছে; স্ত্রী, স্ত্রীজনসুলভ সকল ভাবের বিকাশ তাঁহাতে দেখিতে পাইয়া নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে আপনার হইতেও আপনার জ্ঞান করিয়াছে!

স্ত্রীজাতিসুলভ হাবভাবাদি ঠাকুর কখন কখন আমাদের সাক্ষাতে নকল করিতেন। উহা এত ঠিক ঠিক হইত যে আমরা অবাক হইতাম। জনৈক স্ত্রীভক্ত ঐ সম্বন্ধে একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন, ঠাকুর একদিন তাহাদের সামনে, স্ত্রীলোকেরা পুরুষ দেখিলে যে রূপ হাবভাব করে তাহা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন। "সে মাথায় কাপড় টানা, কাণের পাশে চুল সরিয়ে দেওয়া, বুকের কাপড় টানা, ঢং করে নানা রূপ কথা কওয়া—একেবারে হুবহু ঠিক্। দেখে আমরা হাসতে লাগলুম, কিন্তু মনে লজ্জা আর কষ্টও হল যে ঠাকুর মাগীদের এই রকম করে হেয় জ্ঞান করচেন। ভাবলুম কেন, সকল স্ত্রীলোকেরাই কি ওই রকম? হাজার হোক আমরা মাগী কিনা, মাগীদের ও রকম করে কেউ ব্যাখ্যানা করলে মনে কষ্ট হতেই পাবে। ওমা—ঠাকুর অমনি আমাদের মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন! আর বলছেন 'ওগো তোদের বলচি না। তোরা তো অবিদ্যা শক্তি নস্—ও সব অবিদ্যা শক্তিগুলো করে।'"

ঠাকুরের স্ত্রী পুরুষ উভয় ভাবের এইরূপ একত্র সমাবেশ তাঁহার প্রত্যেক ভক্তই কিছু না কিছু উপলব্ধি করিয়াছে। শ্রীযুৎ গিরিশ ঐরূপ উপলব্ধি

করিয়া একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসাই করিয়া ফেলেন—'মশাই আপনি পুরুষ না প্রকৃতি?' ঠাকুর হাসিয়া তদুত্তরে বলিলেন—'জানি না!' ঠাকুর ঐ কথাটি আত্মজ্ঞ পুরুষেরা যেমন বলেন, আমি পুরুষও নহি, স্ত্রীও নহি, সেই ভাবে বলিলেন—অথবা নিজের ভিতর উভয় ভাবের সমান সমাবেশ দেখিয়া বলিলেন, সে কথা এখন কে মীমাংসা করিবে?

এইরূপে ভাবরূপী ঠাকুর ভাবমুখে থাকিয়া স্ত্রীর কাছে স্ত্রী ও পুরুষের কাছে পুরুষ হইয়া তাহাদের প্রত্যেকের সকল ভাব ঠিক ঠিক ধরিতেন। আমাদের কাহারও কাহারও কাছে একথা তিনি স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন। পরম ভক্তিমতী জনৈক স্ত্রীভক্ত * আমাদিগকে বলিয়াছেন, ঠাকুর তাঁহাকে একদিন বলিতেছেন—'লোকের দিকে চেয়েই কে কেমন বুঝতে পারি; কে ভাল কে মন্দ, কে সুজন্মা কে বেজন্মা, কে জ্ঞানী কে ভক্ত, কার হবে কার হবে না (ধর্ম্মলাভ), সব জানতে পারি—কিন্তু বলি না—তাদের মনে কষ্ট হবে, তাই!' ভাবমুখে থাকায় সমগ্র জগৎটাই তাঁহার নিকট সদা সর্ব্বক্ষণ ভাবময় বলিয়াই প্রতীত হইত। বোধ হইত, স্ত্রী পুরুষ, গোরু ঘোড়া, কাঠ মাটি সকলই যেন বিরাট মনে এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমষ্টিরূপে উঠিতেছে ভাসিতেছে—আর ঐ ভাবাবরণের ভিতর দিয়া অনন্ত অখণ্ড সচ্চিদাকাশ কোথাও অল্প, কোথাও অধিক পরিমাণে প্রকাশিত রহিয়াছে; আবার কোথাও বা আবরণের নিবিড়তায় একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যেন নাই বলিয়া বোধ হইতেছে! আনন্দময়ীর নিষ্কলঙ্ক মানস পুত্র তিনি, যিনি জগদম্বার পাদপদ্মে স্বেচ্ছায় শরীর মন চিত্তবৃত্তি সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়া অশরীরি আনন্দস্বরূপে সমাধিতে তাঁহার সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন—তিনি মা'র হুকুম শিরোধার্য্য করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জ্জিত অনির্ব্বচনীয় অবস্থায় লীন আপনার মনকে জোর করিয়া আবার বিদ্যার আবরণে আবরিত করিয়া নিয়ত মার আদেশ পালন করিতে থাকেন!—এবং অনন্ত ভাবময়ী জগজ্জননীও প্রসন্না হইয়া শরীরে রাখিয়াও একত্বের এত উচ্চপদে তাঁহার মনটি সর্ব্বক্ষণ রাখিয়াছেন যে সেখান হইতে অনন্ত বিরাট মনে যত কিছু ভাব উদয় হইতেছে তৎসকলই তাঁহার নিজস্ব হইয়া এতদূর আয়ত্তীভূত হইয়া থাকিত যে দেখিলেই মনে হইত। যিনিই মাতা তিনিই সন্তান এবং যিনিই সন্তান তিনিই মাতা!—'চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় শ্যাম!'

আমরা যতটুকু বলিতে পারিলাম বলিলাম, পাঠক এইবার তুমি ভাবিয়া দেখ অনন্ত ভাবরূপী এ ঠাকুর কে?

ক্রমশঃ

---

* স্বামী প্রেমানন্দজীর মাতাঠাকুরাণী।

স্বামি-শিষ্য সংবাদ।

[শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ।]

দীক্ষা।

স্বামীজি দার্জিলিঙ্গ হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। আলম্‌বাজার মঠেই অবস্থান করিতেছেন এবং গঙ্গাতীরে কোন স্থানে মঠ উঠাইয়া লইবার জল্পনা হইতেছে। শিষ্য আজকাল প্রায়ই মঠে যাতায়াত করে ও মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে অবস্থানও করিয়া থাকে। শিষ্যের জীবনের প্রথম পথ-প্রদর্শক নাগ মহাশয়—যিনি শিষ্যকে প্রথম মঠের সহিত পরিচিত করিয়া দেন এবং যাঁহার কৃপাব্যতীত শিষ্যের ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশাধিকারলাভের কোনই সম্ভাবনা ছিল না। ইনি কিন্তু শিষ্যকে কোনরূপ মন্ত্র দীক্ষা দেন নাই। মন্ত্রাদির কথা হইলে নাগ মহাশয় বলিতেন— মঠের মহারাজগণই জগতের একমাত্র মন্ত্রদাতা গুরু। শিষ্য স্বামীজিকে দীক্ষার কথা দার্জিলিঙ্গে পত্র লিখিয়া জানাইয়াছিল। তদুত্তরে স্বামীজি লিখেন—"নাগ মহাশয়ের আপত্ত না হইলে তোমাকে অতি আনন্দের সহিত দীক্ষিত করিব।" চিঠিখানি শিষ্যের নিকটে এখন আছে।

আজ ১৩০৩ সালের ১৯শে বৈশাখ। স্বামীজি আজ শিষ্যকে দীক্ষা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। আজ শিষ্যের জীবনের সেই বিশেষ দিন—১৯শে বৈশাখ! শিষ্য প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানান্তে কতকগুলি লিচু ও অন্য দ্রব্যাদি কিনিয়া বেলা ৮টা আন্দাজ আলম্‌বাজার মঠে উপস্থিত হইয়াছে। শিষ্যকে দেখিয়া স্বামীজি বলিলেন, "আজ তোদের 'বলি' দিতে হবে—না?" 'তোদের' বলিবার কারণ, সুধীর মহারাজ বা শুদ্ধানন্দ স্বামীও স্বামীজির কাছে আজ দীক্ষিত হইবেন।

স্বামীজি শিষ্যকে ঐকথা বলিয়া আবার হাস্যমুখে সকলের সঙ্গে আমেরিকার নানা প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মজীবন গঠন করিতে হইলে কিরূপ একান্ত হইতে হয়, গুরুতে কিরূপ অচল বিশ্বাস ও দৃঢ় ভক্তিভাব রাখিতে হয়, গুরুবাক্যে কিরূপ আস্থা স্থাপন করিতে হয় এবং গুরুর জন্য কিরূপ প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইতে হয়, এ সকল প্রসঙ্গও সঙ্গে সঙ্গে হইতে লাগিল। এইবার শিষ্যকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়া তাহার হৃদয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন—"আমি যদি তোকে অমুক কায করিতে বলি বা অমুক কর্‌তে বলি, তা হলে পার্‌বি?" এইরূপ কথা বলিয়া শিষ্যের মনের বিশ্বাসের দৌড়টা বুঝিতে লাগিলেন। শিষ্যও নতশিরে "পার্‌ব" বলিয়া প্রতি প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল। স্বামী শুদ্ধানন্দও কাছে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতে লাগিলেন।

স্বামীজি বলিতে লাগিলেন—'যিনি এই সংসার মায়ার পারে নিয়ে যান, যিনি কৃপা ক'রে সমস্ত আধিব্যাধি বিনষ্ট করেন, তিনিই যথার্থ গুরু। আগে শিষ্যেরা সমিৎপাণি হয়ে গুরুর আশ্রমে গমন করিত। গুরু—

অধিকারী বুঝিলে তাকে দীক্ষিত ক'রে বেদপাঠ করাতেন এবং কায়-মন-বাক্যদণ্ড-রূপ ব্রতের চিহ্নস্বরূপ ত্রিরাবৃত্ত মৌঞ্জিমেখলা কোমরে বাঁধিয়া দিতেন। ঐটে দিয়ে শিষ্যেরা কৌপীন আঁটিয়া রাখিত। সেই মৌঞ্জি-মেখলার স্থানে পরে যজ্ঞসূত্র বা পৈতে পরার পদ্ধতি হয়।'

শিষ্য—তবে কি, মশায়, পৈতে পরাটা বৈদিক নয়?

স্বামীজি—বেদে কোথায়ও ত পৈতের কথা নাই। তোর স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যও লিখেছেন—"অস্মিন্নেব সময়ে যজ্ঞসূত্রং পরিধাপয়েৎ"। এই পৈতের কথা গোভিল গৃহ্যসূত্রেও নাই। গুরুসমীপে এই প্রথম বৈদিক সংস্কারই শাস্ত্রে "উপনয়ন" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আজ তোদেরও উপনয়ন হবে। বুঝ্লি?

শিষ্য কথাগুলি শুনিয়া বুঝিল, আজই সে যথার্থ "উপনীত" হইবে এবং প্রাগুপনয়নসংস্কার কোন কাযেরই হয় নাই, এই কথা ভাবিতে লাগিল।

স্বামীজি আবার বলিতে লাগিলেন—তোদের দেশের কি দুরবস্থাই না হয়েছে। শাস্ত্রপথ পরিত্যাগ ক'রে কেবল কতগুলি দেশাচার, লোকাচার ও স্ত্রী-আচারে দেশ ছেয়ে ফেলেছে তোরা দেশে প্রাচীন আচার সংস্থাপনে উঠে প'ড়ে লেগে যা। নিজেরা শ্রদ্ধাবান্ হয়ে দেশে শ্রদ্ধা আনয়ন কর। নচিকেতার শ্রদ্ধা হৃদয়ে আন্। যা—নচিকেতার মত যমলোকে চ'লে—আত্মতত্ত্ব জান্‌বার জন্য—আত্মার উদ্ধারের জন্য। এই জন্মমরণ প্রহেলিকার যথার্থ মীমাংসার জন্য—যা চ'লে আজ থেকে যমের মুখে। আমি আজ তোদের যমের মুখে পাঠাবার জন্য দীক্ষা দেবো।

শিষ্য—মশায়, যমের মুখে ত সবাইকে যেতে হচ্ছে ও হবে। সেটা তো আর নূতন কথা নয়?

স্বামীজি—নূতন কথা এই ভাবে যে যমের মুখে নির্ভীক হৃদয়ে যেতে হবে। ভয়ই ত মৃত্যু। ভয়ের পরপারে যেতে হবে। আজ থেকে ভয়শূন্য হ। যা চ'লে—আপনার মোক্ষ ও পরার্থে দেহ দিতে। কি হবে—কতকগুলো হাড়মাসের বোঝা ব'য়ে? দধীচি মুনির মত পরার্থে হাড়মাস্ দান কর্।'—বলিতে বলিতে স্বামীজি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।

শিষ্য—মশায়, কখন দীক্ষা হবে?

স্বামীজি—এই হবে, এইবার।

শিষ্য—মশায়, এই দীক্ষা সংস্কারটা এখন কি এক কিম্ভূত আকার ধারণ করেছে! গুরুগিরিটে ব্যবসায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্বামীজি—শাস্ত্রে বলে, যাঁরা অধীত বেদবেদান্ত, যাঁরা ব্রহ্মজ্ঞ, যাঁরা অপরকে অভয়ের পারে নিতে সমর্থ, তাঁরাই যথার্থ গুরু। তাঁদের পেলেই দীক্ষিত হবে—"নাত্র কার্য্যবিচারণা"। এখন সেটা কেমন দাঁড়িয়েছে জানিস্?—"অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ"।

বেলা প্রায় ৯টা হইয়াছে। স্বামীজি আজ গঙ্গায় না যাইয়া বাড়ীতেই স্নান করিবেন। উপরে সেজন্য জল রাখা হইয়াছে শুনিয়া এইবার শিষ্য সমভি-

.ব্যাহারে স্বামীজি স্নানের জন্য চলিলেন। স্নানের পর পরিবার জন্য একখানা নূতন গৈরিক বস্ত্র বাহির করা হইয়াছে। শিষ্য তাই হাতে করিয়া চলিল। স্নানের স্থানে যাইয়া স্বামীজি একেবারে দিগম্বর হইয়া দাঁড়াইলেন। কৌপীন পর্য্যন্ত খুলিয়া ফেলিলেন। সে মূর্ত্তি দেখিয়া শিষ্যের মনে হইতে লাগিল যেন সাক্ষাৎ শঙ্করই তাহার জীবন সার্থক করিবার জন্য তাহার সম্মুখে আবির্ভূত!

স্নানান্তে স্বামীজি সেই গৈরিক বস্ত্রখানি পরিধান করিলেন এবং তাঁহার প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল এখন যেন শতগুণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। স্বামীজি তখন গম্ভীর, নীরব—মুখে কোন কথাই নাই—মৃদুপদে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিতেছেন। এইবার বিস্তৃত আসনে মহাযোগিরাজ উপবেশন করিলেন। শিষ্য এখনো ঠাকুরঘরে প্রবেশ করে নাই, স্বামীজি ডাকিলে তবে যাইবে। এইবার স্বামীজি ধ্যানস্থ হইলেন—মুক্তপদ্মাসন—ঈষন্মুদ্রিত-নয়ন—সে স্থির-ভাবের তুলনা হয় না। যেন দেহমনপ্রাণ সকলি স্পন্দহীন হইয়া গিয়াছে। শিষ্য ও শুদ্ধানন্দ বাহিরে উৎসুক মনে অবস্থান করিতে লাগিল। ধ্যানান্তে স্বামীজি প্রথমেই শিষ্যকে "বাবা আয়" বলিয়া ডাকিলেন। শিষ্য একেবারে আত্মবিস্মৃত; স্বামীজির সস্নেহ আহ্বানে জড়ের মত যন্ত্রবৎ (automatic) ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিল। দ্বারের অনতিদূরে শুদ্ধানন্দ দাড়াইয়া রহিলেন। ঠাকুরঘরে প্রবেশমাত্র স্বামীজি শিষ্যকে বলিলেন—"দোরে খিল দিয়ে দে।" সেইরূপ করা হইলে বলিলেন—'স্থির হয়ে আমার বাম পাশে বোস্।' স্বামীজির আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শিষ্য আসনে উপবেশন করিল। তাহার হৃৎপিণ্ড তখন কি এক অনির্ব্বচনীয় অপূর্ব্বভাবে দুর্ দুর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। এইবার স্বামীজি তাহার পদ্মহস্ত শিষ্যের মস্তকে স্থাপন করিয়া শিষ্যকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্যও ঐ বিষয়ের যথাসাধ্য উত্তর দিতে লাগিল। এই ভাবে প্রায় দশ মিনিট প্রশ্নোত্তর হইবার পর স্বামীজি সেই মহাবীজ মন্ত্র—যাহার স্মরণে মন স্বতঃই স্থির হইয়া আসে—শিষ্যের কর্ণমূলে তিনবার উচ্চারণ করিলেন এবং পরে শিষ্যকে তিনবার তাহা উচ্চারণ করিতে বলিলেন। তার পর সাধনার সামান্য উপদেশ প্রদান করিয়া, স্থির হইয়া অনিমেষনয়নে শিষ্যের নয়নপানে চাহিয়া রহিলেন। শিষ্যের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এখন যেন স্তব্ধ হইয়া গেল এবং কত-ক্ষণ এভাবে কাটিল, তাহা কিছুমাত্র বুঝিতে পারিল না। খানিক বাদে স্বামীজি বলিলেন—'গুরুদক্ষিণা দে।' শিষ্য বলিল—'কি দিব?' শুনিয়া স্বামীজি অনুমতি করিলেন—'যা ভাণ্ডার থেকে কোন ফল নিয়ে আয়।' শিষ্য দৌড়িয়া ভাণ্ডারে গেল এবং ১০।১৫টা লিচু লইয়া পুনরায় ঠাকুরঘরে আসিল। স্বামীজির হস্তে সেগুলি দিবামাত্র স্বামীজি একটী একটী করিয়া সেই লিচুগুলি সমস্ত খাইয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন—'যা তোর গুরুদক্ষিণা দেওয়া হয়ে গেল।' ইহার পর স্বামীজি শুদ্ধানন্দকে ডাকিতে বলিলেন। শিষ্যও ঠাকুরঘর হইতে বাহির হইয়া শুদ্ধানন্দকে যাইতে বলিল। শুদ্ধানন্দ-

গৃহে প্রবেশ করিয়া দীক্ষিত হইতে লাগিলেন আর শিষ্য এদিকে আনন্দে অধীর হইয়া মঠে উল্লম্ফন করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শ্রীমান্ শুদ্ধানন্দ দীক্ষিত হইয়া কিছুক্ষণ পরে বাহিরে আসিলেন। স্বামীজিও বাহিরে আসিয়া তুলসী মহারাজকে বলিতে লাগিলেন "আজ দুটো বলিদান্ দেওয়া হয়েছে।"

স্বামীজির আজ্ঞামত তুলসী মহারাজ বলিয়াদিয়াছেন—আজ স্বামীজির প্রসাদ একমাত্র শিষ্যই পাইবে। আর কেহ যেন তাহার ভাগ না লয়। স্বামীজির পশ্চাৎ পশ্চাৎ বেড়াইতে বেড়াইতে শিষ্যের অবিতথ অনুভব হইতে লাগিল, সে যেন আজ স্বামিকৃপায় ত্রিকালমুক্ত—যেন ভবান্ধকারের গণ্ডী হইতে সে আজ কোটীসূর্য্যদীপ্ত মহল্লোকে অবস্থিত আর তার সকল বিষয়ের ভয় ভাবনা যেন জন্মের মত অন্তর্হিত হইয়াছে!

স্বামীজির আহারান্তে তুলসী মহারাজ শিষ্যকে আহ্বান করিলেন। শিষ্যও আনন্দে স্বামীজির প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিল। মঠের অন্যান্য মহারাজগণ শিষ্যের কাছে দাঁড়াইয়া তাহার উপর স্বামীজির কৃপার কথা আলোচনা করিয়া শিষ্যকে ধন্য ধন্য করিয়া বলিতেছেন—"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।"

আচমনান্তে শিষ্য স্বামিপদে উপবেশন করিয়া স্বীয় অঙ্কে স্বামীজির রাতুল পদযুগল ধারণ করিয়া সেবা করিতে বসিল। স্বামীজি ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না; কেবল শিষ্যের পানে তাকাইয়া যেন তার মনোগত ভাব নিরীক্ষণ করিয়া মৃদুমন্দ হাস্য করিতে লাগিলেন শিষ্য যে আজ আনন্দে আত্মহারা —স্বামীজি তাহা যে বুঝিয়াছেন, ইহা ভাবিয়া শিষ্যের আনন্দ যেন শতগুণে বাড়িয়া উঠিল!

খানিক বিশ্রামান্তে স্বামীজি উঠিয়া বসিলেন; শিষ্য এখনো পদতলে বসিয়া আছে। মুখ প্রক্ষালন করিয়া স্বামীজি উপরের বৈঠকখানা ঘরে আসিলেন। শিষ্য এইবার জিজ্ঞাসা করিল—"মশায় এই সব পাপপুণ্যের ভাব (idea) কোথা থেকে এল?"

স্বামীজি—বহুত্বের ভাব থেকেই এই সব বেরিয়েছে। একত্বের দিকে যত এগিয়ে যায়, তত 'আমি তুমি' ভাব (relative ideas), যা থেকে এই সব ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বন্দ্বভাবসকল (duality) এসেছে, কমে যায়। আমা থেকে অমুক ভিন্ন যখনি এই ভাব্‌বি, তখনি এই সব দ্বন্দ্বভাবের বিকাশ হতে থাক্‌বে। একত্বের সম্পূর্ণ অনুভব যখন মানুষের তখন আর শোক মোহ থাকে না— "তত্র কো মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যত" পড়েছিস্ না?

শিষ্য—আজ্ঞে হাঁ, পড়া হয়েছে মাত্র। বোধ হয় নি।

স্বামীজি—যত প্রকার দুর্ব্বলতার অনুভবকেই পাপ বলা যায় (weakness is sin)। এই দুর্ব্বলতা থেকে হিংসাদ্বেষাদির (jealousy, hatred) উন্মেষ হয়। তাই দুর্ব্বলতা বা weaknessএরই নাম পাপ। ভিতরে আত্মা সর্ব্বদা জ্বল্ জ্বল্ কর্‌ছে। সে দিকে না চেয়ে এই হাড়মাসের কিম্ভূত-কিমাকার একটা খাঁচা এই জড় শরীরের দিকেই সবাই নজর দিয়ে 'আমি'

'আমি' কর্‌ছে! ঐ হচ্ছে দুর্ব্বলতার (weaknessএর) গোড়া। এই অধ্যাস থেকে জগতে ব্যবহারিক ভাব বেরিয়েছে। পরমার্থভাব এই সব দ্বন্দ্বের (duality) পারে।

শিষ্য—তা হলে এই সব ব্যবহারিক সত্তা সত্যি নয়?

স্বামীজি—যতক্ষণ 'আমি', ততক্ষণ সত্যি। আর যখনই আমি 'আত্মা' এই অনুভব, তখনই এই ব্যবহারিক সত্তা মিথ্যা। এই যে লোকে পাপ পাপ বলে, এগুলি weaknessএর ফল—'আমি দেহ' এই অহং-ভাবেরই রূপান্তর। যখন তুই আত্মা এই ভাবে মন নিশ্চল হবে, তখন তুই পাপপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত। ঠাকুর বল্‌তেন, 'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।'

শিষ্য—'আমি' টা যে মরেও মরে না।

স্বামীজি—'আমি' জিনিসটা কোথায় আছে, বুঝিয়ে দিতে পারিস্? যে জিনিস্‌টে নাই, তার আবার মরামরি কি? আমিত্ব রূপ একটা মিথ্যা ভাবে মানুষ hypnotised হয়ে আছে মাত্র। ঐ ভূতটা ছাড়লেই সব স্বপ্ন ভেঙ্গে যায়। আর দেখা যায়, এক আত্মা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলে রয়েছেন। এইটি জান্‌তে হবে। এর জন্যই—যা কিছু সাধনভজন—ঐ আবরণটা কাটাবার জন্য। ওটা গেলেই চিৎ-সূর্য্য আপনার প্রভায় আপনি জ্বল্‌চে দেখতে পাবে। এই আত্মা স্বয়ং জ্যোতি—স্বসংবেদ্য।

শিষ্য—যে জিনিস্‌টে স্বসংবেদ্য,তাকে কি ক'রে জান্‌তে পারা যায়? শ্রুতি বল্‌ছেন, "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।"

স্বামীজি—তুই যা কিছু জান্‌ছিস্, তা মন রূপ করণসহায়ে। মন ত জড় তার পেছনে শুদ্ধ আত্মা থাকাতেই মনের দ্বারা কার্য্য হয়। সুতরাং মন দ্বারা সে আত্মাকে কিরূপে জান্‌বি? তবে এইটে মাত্র জানা যায় যে, মন শুদ্ধাত্মার নিকট পৌঁছুতে পারে না, বুদ্ধিটাও পৌঁছুতে পারে না। জানা-জানিটা এই পর্য্যন্ত। তারপর মন যখন বিকল্প বা বৃত্তিহীন হয়, তখনই মনের লোপ হয় তখনই আত্মা প্রত্যক্ষ হন। ঐ অবস্থাকেই ভাষ্যকার শঙ্কর 'অপরোক্ষানুভূতি' বলে বর্ণনা করেছেন।

শিষ্য—মনটাইত আমি। সেই মনটার যদি লোপ হয়, তবে 'আমি'টাও তো আর থাকে না!

স্বামীজি—তখন যে অবস্থা, সেটাই যথার্থ 'আমিত্বের' স্বরূপ। সে আমি সর্ব্বভূতে—সর্ব্বগ—সর্ব্বান্তরাত্মা। যেন ঘটাকাশ ভেঙ্গে মহাকাশ। তার কি বিনাশ হয় রে বাপ্? যে ক্ষুদ্র আমিটাকে তুই দেহবদ্ধ মনে কর্‌ছিলি, সেটাই ছড়িয়ে এইরূপে সর্ব্বগত আমিত্বে বা আত্মায় পরিণতি হয়। অতএব এই 'আমি'টা এল বা গেল, তাতে আত্মার কি?

শিষ্য—মশায়, মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। ধারণা হচ্ছে না।

স্বামীজি—কালে হবে। 'কালেনাত্মনি বিন্দতি।' শ্রবণ মনন কত্তে কত্তে এইটে কালে ধারণা হয়ে যাবে—আর মনের পারে চলে যাবি। তখন আর এ প্রশ্ন করবার অবসর থাক্‌বে না।

শিষ্য শুনিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। কতক্ষণ পরে স্বামীজি বলিতেছেন—'তামাক নিয়ে আয়।' শিষ্য তামাক সাজিয়া দিল। স্বামীজি আস্তে আস্তে ধূম পান করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"এই সহজ বিষয়টা বুঝাতে কত শাস্ত্রই না লেখা হয়েছে, তবু লোক তা বুঝ্‌তে পার্‌ছে না—কেমন আপাতমধুর কয়েকটা রূপার চাকৃতি আর মেয়েমানুষের ক্ষণভঙ্গুর রূপ নিয়ে এই দুর্লভ মানুষ জন্মটা কাটিয়ে দিচ্ছে! মহামায়ার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! মা! মা!!

ভারতের শিল্পাদর্শ।

[পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।] [শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ।

শিল্পের মৌলিক মহান্‌ ভাবগুলির আলোচনা করিতে যাইয়া হিন্দুশিল্পের যেমন উচ্চ উদ্দেশ্য ও জাতীয়তা দৃষ্ট হয়, প্রত্যেক ব্যষ্টি শিল্প লইয়া শিল্পের সামান্য সামান্য ভাবগুলির আলোচনা করিলেও তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা এখন অপর জাতির ব্যষ্টি শিল্পের সহিত হিন্দুজাতির ব্যষ্টি শিল্পের তুলনায় কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

পানপাত্রের অভাবে ভারতের শিল্পী ঘটী প্রস্তুত করিল আর পাশ্চাত্যের শিল্পী গেলাস প্রস্তুত করিল। দুইজনে একই উদ্দেশ্যে দুইটা বস্তুর কল্পনা করিল। একজনের কল্পনা বহিঃপ্রকৃতির শিক্ষায় পূর্ব্ব স্মৃতির সহায় গ্রহণ করিল; প্রকৃতি যেন তাহাকে বলিয়া দিল, "দেখ্‌, পানপাত্রের অভাবে অঞ্জলি কোরে জলপান কোরেছিলি, সেই অঞ্জলির মত একটা কিছু তৈয়ার কর্‌ না।" সুতরাং ভারতীয় শিল্পী অঞ্জলিটীকে চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া একটা ঘটী প্রস্তুত করিল। আর পাশ্চাত্য শিল্পী সকল বিষয়ে বহিঃ-প্রকৃতির শক্তি সকলের সঙ্গে চিরকাল দ্বন্দ্ব করিয়াই আসিয়াছে, সে নিজের জল পানের সুবিধা কিরূপে হইতে পারে, এইটী লক্ষ্য করিয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া গেলাস প্রস্তুত করিল। দুইটীই শিল্পপ্রসূত পদার্থ বটে; কিন্তু একটীতে ভাবুকতার পরিচয়—মানবমনের সহিত তরঙ্গায়িত প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ও অপরটী কেবল মানবের সুবিধাসূচক হইল। একটীতে বিরাট্‌ প্রকৃতির সঙ্গে মানব মনের মিশামিশির লক্ষণ ও অপরটীতে কেবলমাত্র মানবের দেহ-পরিচর্য্যার দিকে ঝোঁকের লক্ষণ বর্ত্তমান। আবার একটা ঘটীতে আল-গোচে সকলেই জলপান করিতে পারে কিন্তু গেলাস প্রতিজনের এক একটা পৃথক্‌ না হইলে তাহাতে পানে উচ্ছিষ্ট দোষ জন্মায়। ঘটির আকৃতিতে ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাব অতি অল্প আর অপরটীতে ব্যক্তিগত স্বার্থ সম্পূর্ণ অভিব্যক্ত। এই ব্যক্তিগত স্বার্থের ভাব শিল্পোন্নতি লাভের পথে বিশেষ অন্তরায়স্বরূপ। এই ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই পাশ্চাত্য শিল্পসমূহ জড়বিজ্ঞান-সহায়ে কেন্দ্রীভূত ও যন্ত্রস্থ হইয়া পাশ্চাত্য মানবের শিল্পশক্তির ধ্বংস সাধিত হইতে বসিয়াছে।

আমাদের নিম্নশ্রেণীর লোকদের দৈনিক জীবনে শিল্পের ভাব শতধারে প্রবাহিত আছে। তাহারা সকলেই একটু আধটু গান গাইতে পারে, কারণ, সকলেই ধর্ম্মপ্রাণ ; বারমাসে তের পার্ব্বণের উদ্যোগ কিছু না কিছু সকলেই করে ; প্রায় সকলের ঘরে অথবা পল্লীতেই কোন না কোন দেবদেবীর পূজার বন্দোবস্ত আছে ; পূজার স্থানটী প্রায় বার মাসই কেমন নানাবিধ রঙ্গ, রাংতা, জগ্‌জগা, কড়ি, সিন্দুর প্রভৃতি দ্বারা সাজান। গরীবদের ছেঁড়া কাঁথায় যে শিল্পকার্য্য (ছুঁচের কায) দেখা যায়, তাহার নিদর্শন আর অন্যত্র পাওয়া দুর্লভ। সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকমাত্রেই আলপনা ও বড়ি দিতে জানে, খয়ের প্রভৃতির সহায়ে বাড়ী ঘর বাগান ও দেবদেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে জানে। বিবেকানন্দ স্বামীজি বলিতেন, প্রায় সমস্ত য়ুরোপ পরিভ্রমণ করিয়াও তথাকার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে কোথাও এরূপ শিল্পের প্রতি অনুরাগ তিনি দেখিতে পান নাই। দক্ষিণ য়ুরোপে এই ভাবের অতি সামান্য যাহা দেখেছিলেন তাহাও, তিনি বলতেন, আসিয়াতিকদের সংস্পর্শে আসিয়া অবধি হইয়াছে ; পূর্ব্বে ছিল না।

একটা জাতির মধ্যগত প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে নানা পার্থক্য সত্ত্বেও যে একটা সাধারণ ভাব প্রবাহিত থাকে, তাহাকেই জাতীয় ভাব বা জাতীয় প্রকৃতি বলে। সেই জাতীয় ভাবই প্রত্যেক মানুষের জীবনের পরিচালক হইয়া তাহার প্রত্যেক ক্রিয়া-কলাপের অন্য জাতি হইতে বিভিন্ন ছাঁচের একটা আকৃতি দেয়। শিল্প কল্পনাজাত বস্তু হইলেও সেই কল্পনা মানবের অন্তর্নিহিত স্বভাব হইতেই উঠে, এইজন্য সকল জাতির শিল্পেই তত্তৎ জাতীয় ভাব বা লক্ষণগুলি আপনাপনি প্রস্ফুটিত হয়। এই কারণে শিল্প এক প্রকার জাতীয় ভাষা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে, একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভানির্ম্মাণের পূর্ব্বে মহাশিল্পী ময় ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথনে এই সিদ্ধান্তের পূর্ণ পরিচয় আছে। একটা জাতির চরিত্র ঠিক ঠিক জানিতে হইলে সেই জাতির সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও শাস্ত্রাদি পাঠে অনেক সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। কারণ, সাহিত্য ও ইতিহাসে ঘটনার বিবৃতি এবং তৎসম্বন্ধে গবেষণাই পাওয়া যায়। ঘটনা অলীক হইতে পারে, গবেষণা ভ্রান্ত হইতে পারে, বিজ্ঞান জাতীয়বিজ্ঞান না হইয়া অপর জাতির বিজ্ঞানের অনুকরণ হইতে পারে ; কিন্তু শিল্প অধ্যয়নে সে ভ্রম জন্মিতেই পারে না। এইজন্য ইতিহাসবিজ্ঞানাদি অধ্যয়নের সঙ্গে সেই জাতীর শিল্প অধ্যয়ন না করিলে প্রকৃত জাতীয় চরিত্র জানার চেষ্টা বৃথা হয় ও অনেক সময়ে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। যথা, অর্দ্ধ-শতাব্দি পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পাশ্চাত্যদের ধারণা ছিল যে, গ্রীক মনোবিজ্ঞানই জগতে শ্রেষ্ঠ। ভারতীয় মনোবিজ্ঞানের সম্বন্ধে আসিয়া এখন ঐ বিষয়ে অন্যরূপ ধারণা হইয়াছে। ভারতের শিল্প অধ্যয়নের পর গ্রীক শিল্প অধ্যয়ন করিলে গ্রীকদের মনোবিজ্ঞান ভারত হইতেই লব্ধ বলিয়া আজকাল যে নূতন সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে প্রমাণিত হয়। এমফিডকলস্, থেলিস্, এনেক্‌সেসেরাস্, ডিমক্রটাস্

প্রভৃতি পুরাতন গ্রীক পণ্ডিতেরা বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য বহুকাল ধরিয়া ভারতে বাস করেন। ইঁহাদের মধ্যে এমফিডকল্‌স্ যোগাভ্যাস করিয়া বিভূতি-যুক্ত হইয়াছিলেন শুনা যায় *। ব্রহ্মবিৎ হিন্দুরাও সময়ে সময়ে গ্রীকদেশে যাতায়াত করিতেন। থেরাপুত্ত, মাণিক্য প্রভৃতি বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারকগণও যে পাশ্চাত্যে গমন করিয়াছিলেন, ইহারও প্রমাণ আছে। ভারতে শিক্ষিত এই সকল পণ্ডিতেরা গ্রীসদেশে যে বিজ্ঞানের প্রণয়ন করেন, তাহা যে গ্রীকদিগের জাতীয় জীবনে ঠিক ঠিক প্রবেশ করে নাই, ইহা আমরা তাহাদের শিল্পেই দেখিতে পাই।

গ্রীকদের শ্রেষ্ঠ শিল্প ভাস্কর্য্য, আমাদের বিবেচনায় কেমন একঘেয়ে রকমের। তাহাতে কেবল পাশব বলেরই বিকাশ দেখিতে পাই, এমন কি আদর্শ স্ত্রী-মূর্ত্তিতেও তাহাই দেখি! অবশ্য ঐ সকল মূর্ত্তির সংস্থানে যেখানে যে মাংসপেশী বা শিরাটীর যে ভাবে থাকা উচিত, সে সমস্ত নিখুঁত এবং বাড়িয়ে দেখান আছে। কিন্তু হিন্দু বলে, মানুষ পশুবিশেষ হইলেও তাহার মানসিক সৌন্দর্য্য পশু অপেক্ষা বেশী, তাই সে জীবকুলের রাজা এবং আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যে দেবতা। গ্রীকদের ভাস্কর্য্যে মানবমনের ষড়রিপুর বিকাশব্যতীত প্রায় অন্য কোন ভাবের প্রকাশ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! আবার এই ষড়রিপুর বিকাশ দেখাইবার জন্য অনেক অপ্রাকৃতিক উপায় অবলম্বন করাও হইয়াছে, দেখা যায়। মানবদেহের যে একটা কমনীয় কান্তি আছে এবং মানবমন যে সেই কান্তির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায়, এ গূঢ়তত্ত্বের আভাস তাহাদের ভাস্কর্য্যে নাই। অনেকের মতে সক্রেটিসই পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের জনক; আর যদি এল্‌সিবিয়েডিসের কথা মানিতে হয় তবে তিনি একজন সমাধিপরায়ণ জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। ম্যাক্‌স লুই ডেভিড্ কৃত সক্রেটিসের মৃত্যুকালের যে চিত্র আছে, তাহার সহিত তাঁহার এইভাবের কোন সাদৃশ্যই দেখা যায় না। মানবজীবনের পবিত্রতা ও উচ্চ উদ্দেশ্যের প্রচার করাই সক্রেটিসের জীবনের ব্রত ছিল, শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার জীবনে তাঁহাকে কেহ রাগান্বিত বা রিপুপরবশ বা সুরা-পানে আত্মহারা হইতে কখন দেখে নাই। স্বজাতির মধ্যে সৎশিক্ষার বিস্তার করিতেন, এই অপরাধে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। সক্রেটিস, সহাস্যবদনে তাহা শিরোধার্য্য করিয়া, ভ্রান্ত বিচারকদিগকে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ দেন এবং আপনার পক্ষসমর্থনের সময় একটীও অসন্তোষের কথা বলেন নাই। এমন সুমিষ্ট লোকের চেহারা কি ঐ প্রকার চোয়াড়ের মত হইতে পারে? সক্রেটিস্ নির্ভীকচিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, এইটী দেখানই ডেভিডের উদ্দেশ্য বোধ হয়। এই নির্ভীকতা কিন্তু তিনি তাঁহার জাতীয় প্রচলিত ভাবেই দেখাইয়াছেন, সক্রেটিসের ভাবে নহে। ঐ চিত্র দেখিলেই মনে হয়, সক্রেটিস যেন স্বীয় সুদৃঢ় শরীরের অভিমানমদে মত্ত হইয়া 'চল, যুদ্ধে যাই' এই কথাই সকলকে বলিতেছেন। যোদ্ধার মৃত্যু-ভয়কে অগ্রাহ্য করা আর আত্মজ্ঞানে মৃত্যুটা কিছুই নয় উপলব্ধি করা, এই দুটী ভাবের পার্থক্য আকাশ পাতাল। একটিতে যুদ্ধের উৎসাহে মৃত্যুর

* See page 38, Philosophy of Ancient India by Richard Garbe.

কথা উপেক্ষা করা বা মনে না আনা আর অপরটিতে জ্ঞানের চরমসীমায় উপনীত হইয়া মৃত্যু নাই ইহা প্রত্যক্ষ দেখা, এই দুই বিপরীত ভাবব্যঞ্জক। সক্রেটিস মৃত্যুর জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়া যখন বিষপূর্ণ পাত্র গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার মুখমণ্ডলে অমৃতত্বের জ্যোতিঃ নির্গত হইয়াছিল! সে ভাব এ ছবিতে নাই। যোদ্ধা সক্রেটিস যেন সঙ্গিদের যুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছেন, এই ভাবই দেখা যায়। সক্রেটিসের যে পুরাতন ভাস্কর্য্য আছে, তাহাতেও তাঁহার অতীন্দ্রিয় মানসিক ভাবের কোন লক্ষণ নাই, তবে সরল ভাবুক লোকের লক্ষণ আছে।

হিন্দুদের সংস্পর্শে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে সক্রেটিস নিজ জীবনে দেবত্বের আভাস পাইয়াছিলেন। ধ্যানে মগ্ন হইয়া তাঁহার কখন কখন চব্বিশ ঘণ্টা একভাবে কাটিয়া যাইত। কিন্তু তাঁহার ঐ ভাবটী যে জাতীয় মনোবিজ্ঞান বা ধর্ম্মবিজ্ঞানপ্রসূত ভাব নয়, তাহা তাঁহার পূর্ব্বকথিত প্রকারে স্বদেশীয়দিগের দ্বারা প্রাণদণ্ডের আদেশ হওয়াতেই প্রমাণিত। উহার দ্বিতীয় প্রমাণ, আমাদের মতে ডেভিডের চিত্র; এবং ঐ বিষয়ের তৃতীয় প্রমাণ, গ্রীকদিগের জাতীয় দেবদেবীর মূর্ত্তিতেই বর্ত্তমান! দেখা যায়, তাহাদের দেবদেবীর মূর্ত্তিসকল ডানাযুক্ত। কারণ, বোধ হয়, তাঁহারা মেঘের উপরিস্থ স্বর্গে থাকেন এবং আবশ্যকমত যথা তথা গমন করেন। শিল্পীরা ঐ আকাশমার্গে গমনাগমনের ক্ষমতাটা দেখাবার জন্যই ভাবিয়া চিন্তিয়া দেবতাদের ডানা পরাইয়া দেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাতে শিল্পীর কল্পনার প্রাখর্য্য বা দেবতাদিগের দিব্যশক্তির বোধ, কোনটারই বিশেষ প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া আমাদের বোধ হয় না। দেবতারা মানুষের অপেক্ষাও যখন সর্ব্ববিষয়ে উন্নত তখন, আকাশে গতায়াতের সময়, মনুষ্যা-পেক্ষা নিম্নশ্রেণীর জীব, পক্ষ্যাদির ন্যায় তাঁহারা যাইতে বাধ্য মনে করিলে দেবশক্তির অবমাননাই করা হয়। কথায় বলে, 'শিব গড়িতে বানর গড়া'—গ্রীকশিল্পীর দিব্যশক্তিপ্রকাশের ঐরূপ চেষ্টাকে আমরা হীনাঙ্গের কল্পনা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। পক্ষান্তরে ভারতের শিল্পীকুলের দিব্য-শক্তির কল্পনা দেখ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যত শক্তি আছে, সে সমস্তই আমাদের দেবতায় বর্ত্তমান। আবার মানুষ তপস্যাদিদ্বারা উন্নত হইয়া যে দেবতা হয়, ইহাও হিন্দুর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাই জানে; কিন্তু দেবত্বে আরূঢ় হইলে যে ডানা ভিন্ন গমনাগমনের সুবিধা হইবে না, এ কল্পনা হিন্দুর কোনকালেই

আসে নাই। পশুপক্ষ্যাদি দেবকুলের বাহন বলিয়াই কল্পিত হইয়াছে মাত্র। বীণা সহায়ে ভগবানের নাম গান করিতে করিতে দেবর্ষি নারদ সর্ব্বত্র গতায়াত করিতেছেন অথচ ডানার প্রয়োজন নাই। ডানা থাকিলে বরং মনে হইতে পারিত—তাঁহার দিব্যশক্তির অন্ততঃ কিয়দংশও ঐ ডানাতে বর্ত্তমান অর্থাৎ আত্মায় নাই, জড়ে বর্ত্তমান। দেবদেবীর ঐরূপ ডানা কল্পনায় গ্রীকশিল্পীর জড়বাদী স্বভাবই প্রকাশ পাইয়াছে। আর আমরা জড়বাদী নই বলিয়াই আমাদের ইন্দ্রনারদাদি দেবতার ডানা কল্পিত হয় নাই। পাশ্চাত্যের প্রাচীন ও নবীন সকল যুগের শিল্পের বিচার করিলেই এইরূপ জড়বাদের গন্ধ উপলব্ধি হয়।

আধুনিক য়ুরোপের কতকগুলি ছবিতে দেখা যায়, ঐ প্রকার পক্ষবিশিষ্ট দেবতারা জলমগ্ন নরনারীর উদ্ধার করিতেছেন। উহার ভাব দেবতারা মানুষকে পাপমুক্ত করিতেছেন কিম্বা নরক হইতে উদ্ধার করিতেছেন। শিল্পের এই সকল নিদর্শন হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ভগবান যে মানবের হৃদয়েই সর্ব্বদা বর্ত্তমান এবং তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অধিষ্ঠিত থাকিয়া তাহাকে দেবত্ব দেন, এ সমস্ত উচ্চ ধর্ম্মভাবের প্রভাব পাশ্চাত্যে এখনও অল্প। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব অবধি খৃষ্টান পাদ্রিরা যে মানবের পুরুষ দেহে ভিন্ন আর অন্য কোন জীবে, এমন কি নারী দেহেও আত্মা নাই বলিত—ইহাই ঐ বিষয়ের বিশিষ্ট প্রমাণ। ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ভাবের অনেকটা পরিবর্ত্তন হইলেও উহা একেবারে যায় নাই বলিয়াই আমাদের বোধ হয় এবং সেজন্যই অদ্যাপিও ঐ জড়বাদী ভাব তাহাদের শিল্পে বর্ত্তমান। পাশ্চাত্য শিল্পের উপরোক্ত দোষগুলি দেখাইয়া দেওয়া হইল বলিয়া কেহ যেন না মনে করেন, আমাদের মতে পাশ্চাত্যে উচ্চাঙ্গের শিল্পভাব আদৌ নাই।

ধর্ম্ম যে প্রকৃত উচ্চ শিল্পের জন্মদাতা, পাশ্চাত্য দেশের ইতিহাসে তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যীশুর ধর্ম্ম য়ুরোপী জীবনে প্রবিষ্ট হইবামাত্র প্রকৃত উচ্চাঙ্গের শিল্প জন্মাইতে লাগিল। তবে আসিয়াতিক যীশুর ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াতিক শিল্পও যে য়ুরোপে প্রবিষ্ট হয়, তাহারও বিলক্ষণ নিদর্শন পাওয়া যায়। কয়েক শতাব্দীর পর সেই ধর্ম্মভাবের হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পেরও যে অবনতি হইয়াছিল, য়ুরোপীয় ইতিহাস এ বিষয়েও সাক্ষ্য প্রদান করে।

পাশ্চাত্যের বর্ত্তমান শিল্প জড়বিজ্ঞানসহায়ে বিশেষ উন্নতিশীল বলিয়া সাধারণের ধারণা থাকিলেও আমরা ঐ মতের পোষকতা করিতে পারিলাম না। আমাদের ধারণায় জড়বাদের অপার মহিমায় পাশ্চাত্য শিল্পীর উদ্ভাবনী-শক্তিও জড়ত্বের দিকে উপনীত হইতেছে। বলিতে পার, ভাব-প্রবণতাই যদি শিল্পোন্নতির কারণ হয়, তবে জড়বিজ্ঞানের দ্রুতোন্নতিতে জগতে যে নূতন নূতন ভাবরাশি উপস্থিত হইতেছে, তাহাই পাশ্চাত্যে শিল্পোন্নতির কারণ হইবে। উত্তরে আমরা বলি, উহার সম্ভাবনা অল্প। কারণ, জড়বিজ্ঞান মানবমনে শ্রদ্ধাবিস্ময়াদি দিব্য ভাবের হ্রাস করিয়াছে, জীবনের উদ্দেশ্য ভোগমাত্রে পর্য্যবসিত বলিয়া মানবের দৈনন্দিন জীবন রাগদ্বেষসঙ্কুল ও জটিলতাময় করিয়া তুলিয়াছে এবং 'এক' হইতে 'বহু'র বিকাশ স্বীকার করিলেও সেই 'এক'কে জড়েরই একপ্রকার অনির্ব্বচনীয় রূপ বলিয়া প্রচার করিয়া জীবনসমস্যার সমাধানেও বিশেষ গোল উপস্থিত করিয়াছে। য়ুরোপী মনের সর্ব্বত্রই এখন জড়বাদবিরাজিত। সামান্য সামান্য বিষয়ের আলোচনাতেই উহা সম্যক্ উপলব্ধি হয়।

মনে কর, কয়েকজন পাশ্চাত্য লোক ও জন কয়েক হিন্দু একটী নির্জ্জন ও সুন্দর পার্ব্বত্য দৃশ্য দেখিল। পাশ্চাত্য লোক কয়টীর কেহবা মনে করিবে, এখানে মধ্যে মধ্যে আসিয়া পিক্‌নিক্ করিলে বড় আমোদ হয়, কেহবা মনে করিবে, দিনকতক এখানে বাস করিলে পরমায়ু বৃদ্ধি হইতে পারে, আবার কেহবা মনে করিবে, ঐ ঝরণাটী এই স্থান দিয়া প্রবাহিত থাকিলে আরও ভাল হইত। হিন্দু কয়টী ঐ পার্ব্বত্য দৃশ্য দেখিয়া যাহা মনে করিবে, তাহা উহার কতই বিপরীত। তাহাদের কেহ ভাবিবে, এমন সুন্দর জায়গায় কৌপীনধারী হইয়া ঈশ্বর-চিন্তা করাই উপযুক্ত, কেহ হয়ত ভাবিবে, আহা, এ হরপার্ব্বতীর বিহারস্থান, কি পবিত্র, সাক্ষাৎ কৈলাস। হিন্দুর মনে এইরূপ ভাবেরই স্ফূরণ হইবে।

কোন একটি বস্তু বা দৃশ্য দেখিয়া হিন্দুর মনে যে সমস্ত ভাবের উদয় হয়, সেই ভাবগুলি বজায় রাখিয়া ঐ বস্তু বা দৃশ্যটীর চিত্র আঁকিলে তবে উহা আমাদের জাতীয় শিল্পের মধ্যে গণ্য হইতে পারে। কারণ, শিল্পে জড় ও চৈতন্যের সর্ব্বদা সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। আমাদের জাতীয় সমস্ত ভাব বা সমস্ত চিন্তার অভিজ্ঞতা কিন্তু সাধারণ লোকের নাই। অতএব শিল্পী যদি ঐ সমস্ত ভাব বজায় রাখিয়া শিল্প প্রণয়ন করেন এবং সেই শিল্প

লোকের মনে ঐ সমস্ত উচ্চ উচ্চ ভাব জাগাইয়া তুলে, তবেই উহা যথার্থ উচ্চাঙ্গের শিল্প হয় এবং শিল্পী একজন মহা উপদেষ্টার কার্য্য করেন। অতএব ভারতীয় শিল্পীর আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও জাতীয় ভাবগুলির বিশেষ আয়ত্ব রাখা আবশ্যক। যে চিন্তাশীল নয়, তাহার মনে উচ্চ ভাব ঐরূপে জাগাইয়া না দিলে উচ্চ ভাবের স্ফুরণ হয় না। যদি হইত, তাহা হইলে শিল্পীর এ জগতে কোন কার্য্যই থাকিত না। সকল সময়েই প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য সকল লোকের সম্মুখে বিরাজিত; কিন্তু সে সমস্ত কে দেখে? সাধারণ মানুষের উহা দেখিবার অবকাশই বা কোথায়? আবার বহিঃ বা অন্তঃ প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিতে হইলে মানবকে তাহার নিজ মনোভাব তত্তৎ বস্তুর উপর আরোপ করিতে হইবে, তবেই উহাতে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইবে, নতুবা বাহ্য সৌন্দর্য্যের কোনও মানে নাই এবং তাই অনেকে বলেন, সৌন্দর্য্য বাহ্য জগতে নাই। এজন্যই শিল্পীর নিকট জড়-জগৎ অপেক্ষা ভাব-জগৎ অধিক অপরিহার্য্য। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সর্ব্বোচ্চ শিল্পনিদর্শনগুলি ভগবান্ বুদ্ধ ও যীশুকে অবলম্বন করিয়াই রচিত দেখা যায়। বুদ্ধদেবের সমাধিমূর্ত্তি আর পাশ্চাত্যদের যীশুমূর্ত্তির তুলনায় বিচার করিলে প্রথমটীতে ভাবজগতের অধিক বিকাশ আর দ্বিতীয়টীতে বাস্তব জগতের অধিক বিকাশই দেখিতে পাওয়া যায়। দুই পক্ষেরই কল্পনা অপার। একদিকে বাস্তব জগতের প্রতি লক্ষ্য কম, যেমন বুদ্ধদেবের সমাধিমূর্ত্তিতে। বুদ্ধদেবের মুখখানিতে শিল্পী মহা ধৈর্য্যের সহিত পরিশ্রম করিয়াছেন। মূর্ত্তির চক্ষুদ্বয়ের দৃষ্টি নাসাগ্রে; নাসারন্ধ্র, অধরোষ্ঠ, ও গ্রীবায় প্রাণায়ামের লক্ষণ বিরাজিত এবং সমস্ত মুখমণ্ডলের ভাব অন্তর্মুখী মনোবৃত্তির পরিচায়ক এবং আত্মানন্দের জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত! কিন্তু অন্যান্য অবয়ব যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া তাহাতে কোমলতা ও গভীর স্থৈর্য্যের লক্ষণমাত্র দেখাইয়াই শিল্পী যেন শ্রান্তিবোধে অব্যাহতি গ্রহণ করিয়াছেন। মুখব্যতীত অন্যান্য অবয়বের তেমন পারিপাট্য লক্ষিত হয় না। আত্মবাদী শিল্পী আত্মানন্দের লক্ষণ বুদ্ধমূর্ত্তির মুখে প্রস্ফুটিত করিয়াই শিল্প সম্পূর্ণ হইল জ্ঞান করিয়াছেন, আর অধিক অগ্রসর হইতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে যীশুর প্রতিকৃতির বিচার করিয়া দেখিলে আবার পাশ্চাত্য শিল্পীর ঐ প্রকার জড়বাদী বা দেহাত্মবাদীর ভাব সুস্পষ্ট দেখা যায়। ঐ প্রতিকৃতির দেহমাধুর্য্যবিকাশে শিল্পীর

যত শিল্পচাতুর্য্য দেখা যায়, ভাবগাম্ভীর্য্যপ্রকাশে সে চাতুর্য্য লক্ষিত হয় না। আবার যতটুকু ভাব দেখান হইয়াছে, তাহাও আবার অস্বাভাবিক অঙ্গ-পরিচালনা দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়া মূর্ত্তির গাম্ভীর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

বুদ্ধদেব যে সত্য জগতে প্রচার করেন, তাহার প্রতিষ্ঠায় দেশের জন-সাধারণের সহায়তা ছিল এবং ভারতের ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে সেই ভাবসাধনার উপায় ও সিদ্ধির লক্ষণও বহুকাল হইতে বর্ণিত ছিল। তাহার উপর অর্দ্ধ-শতাব্দী ধরিয়া তিনি চারিবার প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত পর্য্যটন করিয়া নিজ ভাবের প্রতিষ্ঠা করেন। সেজন্য তাঁহার অতীন্দ্রিয় অবস্থার বিবৃতি শিল্পে পরিস্ফুট করা সম্ভব হইয়াছে। যীশু তাঁহার ঐশী ভাব প্রতিষ্ঠার ঐরূপ কোনও সুবিধা পান নাই এবং তাঁহার শরীরত্যাগের বহু পরে তাঁহার মূর্ত্তি যখন অঙ্কিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন তাঁহার শারীরিক প্রতিকৃতির স্মৃতি মানবহৃদয় হইতে প্রায় লোপই পাইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার চিত্রাঙ্কন পাশ্চাত্যদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছে। বিশেষতঃ, আবার পাশ্চাত্যে ঐরূপ ঐশী ভাবসাধনার প্রণালীবদ্ধ শাস্ত্র নাই এবং ধ্যান-পরায়ণ বা সমাধিযুক্ত লোকও বিরল। তবে যীশুর ছবিতে যতটুকু দিব্যভাবের বিকাশ দেখা যায়, তাহা শিষ্যপরম্পরাগত কিঞ্চিৎ সাধনভজনের প্রথা ক্যাথলিক সম্প্র-দায়ের মধ্যে বর্ত্তমান থাকার দরুণ।

[ক্রমশঃ।

বেদ ও বেদ্য।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।] [শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বর্ম্মন্।

প্রতীচ্য অভিব্যক্তিবাদে বিচার।

কার্য্যমাত্রেরই একটী বা ততোধিক কারণ আছে। যদ্ব্যতিরেকে যাহা সিদ্ধ হয় না এবং যদ্বস্তু যাহার নিয়ত ও অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী, তদ্বস্তুই তাহার কারণ। মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘট-কার্য্য হয় না এবং কুম্ভকার ও দণ্ডচক্রাদি না থাকিলেও ঘটোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই; সুতরাং বুঝিতে হইবে, ঘটকার্য্যোৎ-

পণ্ডিতে মৃত্তিকাদি সকল পদার্থগুলিই কারণ। কিন্তু কারণের লক্ষণ ও প্রকার সম্বন্ধে মতভেদ আছে। নানা মুনির নানামত থাকিলেও উপাদান ও নিমিত্তভেদে, সকলেই সাধারণতঃ কারণের দ্বৈবিধ্য স্বীকার করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব সংখ্যায় আমরা দেখিয়াছি যে, জগৎসর্জ্জনব্যাপারে স্পেন্সা-রাদি কর্ত্তৃক মূলকারণরূপে গৃহীত আদ্যন্তরহিত, এক অদ্বিতীয়, অপ-রিচ্ছিন্ন, 'সৎ' নামাভিধেয় অচেতন পদার্থের নিমিত্ত ও উপাদান কারণত্ব সিদ্ধ হয় না এবং তদ্ধেতু হইতে বিশ্বের ক্রমবিকাশও অসম্ভব।

আমাদের এতদ্সিদ্ধান্তের প্রতিবাদস্বরূপে কিন্তু প্রতীচ্য জড়বাদের বর-পুত্রগণ বলেন, যেটি যাহার নিয়ত ও অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী এবং যদ্ব্যতিরেকে যাহার সিদ্ধি হয না, সেইটিই যে তাহার কারণ, একথা আমরাও স্বীকার করি। কিন্তু তোমরা যে নিমিত্ত ও উপাদানভেদে কারণের দ্বৈবিধ্য অঙ্গীকার করিতেছ; আমাদের মতে উক্ত দ্বৈবিধ্যের কোনই হেতু নাই। আমাদের মতে উপাদানাখ্য কারণের স্বতন্ত্র কারণত্বই নাই। সত্য বটে, কার্য্যের কারণবিনির্ণয়ে প্রবৃত্ত হইয়া কেহ কেহ 'কার্য্যকারক' ও 'কার্য্যাধার'—'নিমিত্ত' (Agent) ও উপাদান (Patient) এই বস্তুদ্বয়ের মধ্যে একটু পার্থক্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। উক্ত বস্তুদ্বয়ের উভয়ই যে কোন নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসমুৎপাদনের সহায়ক, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। কিন্তু কারণ পদটী, যদর্থে দর্শনাদিশাস্ত্রে প্রযুক্ত হয়, উপাদান নামধেয় শেষোক্ত বস্তুটিকে তদর্থে 'কারণ'-নামে অভিহিত করা নিতান্ত ন্যায়বিরুদ্ধ. কেননা, পূর্ব্বোক্তটিই প্রকৃতপক্ষে 'কারণ' নামে অভিহিত হইবার যোগ্য বস্তু। সে যাহা হউক, পরীক্ষা করিলেই 'কার্য্যকারক' ও কার্য্যাধার মধ্যস্থ পার্থক্যটি তিরোহিত হইবে। অথবা উক্ত পার্থক্যটি যে কেবলমাত্র বচনভঙ্গী হইতে সমদ্ভূত হইয়াছে, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। দেখনা কেন— 'কর্ম্ম' (Object) এবং যাহার প্রতি কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হয় বা যাহাকে তৎ-কার্য্যের আধার-রূপে বুঝিয়া থাকি, তদুভয়কেই আবার সাধারণতঃ 'কর্ম্ম' পদের অন্তর্ভুক্ত রূপে গ্রহণ করা হয় এবং কার্য্য (বা Effect) বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে। অতএব কর্ম্মের কিয়দংশকে যদি কারণাংশরূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে উহা যে আপনিই আপনার 'কারক'—এইরূপ বিরোধ উপস্থিত হইয়া কর্ম্মকর্ত্তৃত্বদোষ ঘটে। দৃষ্টান্তক্রমে দ্রব্যের অধঃপতন ব্যাপারটিকে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যথা ;—

'প্রস্তরখণ্ডের অধঃপতনের কারণ কি?'—এই প্রশ্নের উত্তরে যদি বল, "প্রস্তরখণ্ড স্বয়ংই তাহার পতনের কারণ," তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, এস্থলে 'কারণ' পদ বিবক্ষিত অর্থের বিরোধ ঘটিতেছে। সেই জন্যই পতনব্যাপারে প্রস্তরখণ্ড উপাদান কারণ (Patient) এবং পৃথিবীকে, অথবা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিবিহীন জনসাধারণের চিরন্তন বিশ্বাসানুমোদিত পৃথিবীর কোন অদৃষ্ট ধর্ম্মকে, নিমিত্তকারণরূপে (Agent) গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু প্রযুক্ত বচনভঙ্গীকে—বৈকল্পিক অসামঞ্জস্য হইতে রক্ষা করিয়া আমরা যদি দেখাইতে পারি যে, প্রস্তরখণ্ডকে তাহার নিজ পতনের কারণরূপে গ্রহণ করিবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে, তাহা হইলে বুঝিবে যে, তোমাদের যথোক্ত পার্থক্যের মূলে বিশেষ কিছুই নাই। আমরা বলিতে পারি, প্রস্তরখণ্ড আপনার আত্মভূত জড়ধর্ম্মপ্রভাবে পৃথিবীর অভিমুখে গমন করে। পতনব্যাপারটিকে এইভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, প্রস্তরখণ্ডটিকে তাহার পতনকার্য্যের নিমিত্তকারণরূপে (Agent) গ্রহণ করিবার তোমাদের কোনও আপত্তি থাকিতে পারে না। 'জড়বস্তু মাত্রই স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয়' এই প্রাচীন মত সংরক্ষণার্থ যদি তোমরা বল, পতনব্যাপারে প্রস্তরখণ্ডটি ঈপ্সিত কারণ নহে, পরন্তু তাহার গুরুত্বমাধ্যাকর্ষণাদি ধর্ম্মই তোমাদের অভিলষিত কারণ, তাহা হইলে তোমাদের একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, পতনব্যাপারে পৃথিবী যেমন প্রস্তরখণ্ডকে আকর্ষণ করিতেছে, তেমনই পৃথিবীও আবার প্রস্তরখণ্ড কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতেছে। কেননা বস্তুনিচয়ের মধ্যে পরস্পরের আকর্ষণ বিজ্ঞানসিদ্ধ। সুতরাং উপাদান কারণের (Patient) স্বাতন্ত্র্যের জোর থাকিতেছে না।

এইরূপে বিবিধ দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করিতে পারা যায় যে,—নিমিত্তোপাদান কারণদ্বয় মধ্যে বস্তুতঃ কোন পার্থক্য নাই। 'উপাদান' কারণের স্বতন্ত্র কোন ক্রিয়াকারিত্ব নাই। তবে ঐ দুইয়ের যে ভেদব্যবহার চলিয়া আসিতেছে তাহা বাচনিক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ চিরদিনই একই বস্তু। নিমিত্তোপাদান চিরদিনই এক ও অভিন্ন সামগ্রী।—"In most cases of causation a distinction is commonly drawn between something which acts and some other thing which is acted upon; between an *agent* and *patient*. Both of these, it would be universally allowed, are conditions of the

phenomenon but it would be absurd to call the latter the *cause*—that title being reserved for the former. The distinction, however vanishes on examination, or rather is found to be only verbal, arising from an incident of mere expression, namely, that the object said to be acted upon, and which is considered as the scene in which effect takes place, is commonly included in the phrase by which the effect is spoken of, so that if it were also reckoned as part of the Cause, the seeming incongruity would arise of its being supposed to cause itself. In the instance which we already had, of falling bodies, the question was thus put : What is the cause which makes a stone fall ? and if the answer had been "The stone itself," the expression would have been in apparent contradiction to the meaning of the word cause. The stone therefore is concieved as patient and the earth (or according to the Common and most unphilsophical practice, an occult quality of the earth) is represented as the agent or the cause. But that there is nothing fundamental in the distinction may be seen from this, that it is quite possible to concieve the stone as causing its own fall provided the language employed be such as to save the mere verbal incongruity. We might say that the stone moves towards the earth by the properties of matter composing it, and according to this mode of presenting the phenomenon, the stone itself might without impropriety be called the agent ; though to save the established doctrine of the inactivity of matter, men usually prefer here also to ascribe the effect to an occult quality and say that the cause is not the stone itself but the *weight* or *gravitation* of the stone. * * * * * * Thus in the example of stone

falling to the earth, according to the theory of gravitation the stone is as much an agent as the earth which not only attracts but is itself attracted by, the stone. * * * * * * The distinction between the *agent* and the *patient* is merely verbal: *patients* are always *agents* (Mill's Logic pp. 218-19).

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল তাহার অভিপ্রায় এই যে, নিমিত্ত ও উপাদান ভেদে কারণের দ্বৈবিধ্য স্বীকার্য্য নহে। কেননা উপাদানের কর্ত্তৃত্ব (agency) বা ক্রিয়ানিষ্পাদকত্ব স্বীকার করিলে, তাহাকে কারণাংশরূপে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু উপাদানকে কারণাংশরূপ গ্রহণ করিলে, কারণতত্বালোচনায়—'কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব' দোষ আসিয়া পড়ে। যেরূপ কোন কার্য্য হউক না কেন, পদার্থ মাত্রেরই যখন কারকত্ব বিজ্ঞানসিদ্ধ, তখন নিমিত্তোপাদানের ভেদ স্বীকার না করিয়া পরং উহাদের অভেদ অঙ্গীকারই যুক্তিসিদ্ধ।

কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলেই প্রতীতি হইবে যে, পূর্ব্বপক্ষীয় এবম্বিধ উক্তি সমীচীন নহে। কারণ পদার্থনিচয়ের স্বস্বব্যাপারে কারকত্ব (agency) থাকিলেও, নিমিত্ত হইতে উপাদানের ভেদ স্বীকার করিতেই হইবে এবং যুক্তিযুক্তভাবে ভেদ স্বীকার করিলে কর্ম্মকর্ত্তৃত্ব বিরোধ ঘটিবারও আশঙ্কা নাই। কেননা কারকের কর্ত্তৃত্ব (agency) বা ক্রিয়ানিবর্ত্তকত্ব নাই, এরূপ অযৌক্তিক কথা বলা আমাদের অভিপ্রায় নহে। কারক কর্ত্তৃকরণাদি ভেদে যেমনই হউক না কেন, তাহা যদি প্রকৃতই 'কারক' এই পদবাচ্য হয়, তাহা হইলে তাহার কর্ত্তৃত্ব (agency) আছে একথা আমরাও স্বীকার করি। কর্ত্তৃত্ব (agency) যদি না থাকিত তাহা হইলে ক্রিয়ানিবর্ত্তকত্বের অভাব হেতু কর্ত্তৃকরণাদি 'কারক' পদবাচ্য হইতে পারিত না। সুতরাং প্রশ্ন হইতেছে—'কারক' কাহাকে বলে? উত্তরে আমরা বলিব, যাহা ক্রিয়া নিষ্পাদন করে, তাহাকেই 'কারক' বলে। কিন্তু যাহা ক্রিয়া নিষ্পাদন করে তাহাকে ত 'কর্ত্তৃকারক' বলে। সুতরাং কর্ত্তৃকরণাদি কারকের সার্থকত্ব কোথায়? আমাদের মতে এবম্বিধ আশঙ্কার কোনই হেতু নাই। কারণ, 'কর্ত্তা' ও 'কারক'—এতদ্পদদ্বয়ের ধাতুগত অর্থের পার্থক্য না থাকিলেও ব্যবহারে বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে। 'কর্ত্তা' পদের পরিবর্ত্তে 'কারক' পদের ব্যবহার আমরা দেখিতে পাই না। ভাষায় কেহই 'করণকর্ত্তা'

এবম্বিধ পদ প্রয়োগ করে না। তুমি হয়ত বলিবে, যখন 'করণাদি' কারকেরও কর্তৃত্ব আছে তখন করণাদিকেও কর্ত্তা নামে অভিহিত করিবার আপত্তি কি? আপত্তি এই যে 'কারক' পদটি ক্রিয়া নিষ্পাদকত্বের পরিচায়ক সামান্য সংজ্ঞা মাত্র (merely a generic term to denote agency)। কারকের কর্তৃত্ব থাকিলেই যে তাহাকে 'কর্ত্তা' নামে অভিহিত করিতে হইবে এরূপ কোন বিশেষ নিয়ম নাই। পরং ক্রিয়াভেদে কারকের বিভিন্নতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এবং এই জন্যই কর্তৃকরণাদিভেদে কারকের বিভিন্নতা স্বীকৃত হইয়া থাকে। এই ভেদ কিন্তু বৈকল্পিক নহে—অথবা শুদ্ধবচন ভঙ্গী হইতেই যে, এই পার্থক্যটি সমুদ্ভূত হইয়াছে, এরূপও নহে। কেননা ইহা সত্য মূলক। ক্রিয়ামাত্রই যে একরূপ তাহা নহে। ক্রিয়াতে যেমন রূপভেদ আছে, সেইরূপ আবার তাহার নিষ্পাদনেও বিভিন্নতা আছে। ক্রিয়ার এই রূপ ও নিষ্পাদনভেদ নিবন্ধন কারকেও ভেদ অবশ্যম্ভাবি। কর্তৃকরণাদি কারকবর্গ এই ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার নিষ্পাদক ও পরিচায়ক এবং প্রত্যেক কারকের ক্রিয়ানিবর্ত্তকত্ব (agency থাকিলেও ইহাদিগের সকলকেই 'কর্ত্তৃ' সংজ্ঞা না দিবার হেতু এই যে, সকল কারকের কর্তৃত্ব সমান নহে। কর্তৃকারক, করণাদি অপর কারকবর্গের নিয়ামক ও স্বতন্ত্র। 'কর্ত্তৃ' ভিন্ন অপর কারকবর্গ কিন্তু সেরূপ নহে। করণাদি কারকবর্গ কর্ত্তার প্রবর্ত্তনা ব্যতিরেকে কর্ম্মক্ষম হয় না। কর্ত্তা কর্তৃক প্রেরিত হইলেই তাহারা স্বস্বব্যাপার সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই জন্যই ইহাদিগকে পরতন্ত্র ও কর্ত্তার নিয়ম্য (patient) বলে। কর্ত্তাকারকের দ্বারা নিয়মিত হইয়া ইহারা স্বস্বব্যাপার করিয়া থাকে বলিয়া 'কর্ত্তা' কারক-শ্রেষ্ঠ। অপরাপর কারক সকল কর্ত্তার দ্বারা চালিত হয় বলিয়া তাহাদের প্রধানত্বের স্বীকার নাই। সুতরাং এতদ্বারা কারকবর্গের মধ্যে পরস্পরের ভেদ সূচিত হইল। বক্ষ্যমাণ লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা কর্তৃকরণাদি কারকের ভেদ বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যথা :—

জড়বর্গকে বিগলিত করিবার শক্তি—অগ্নির আছে। কিন্তু ইহা স্বয়ম্প্রেরিত হইয়া দ্রব্যনিচয়কে বিগলিত করিতে পারে না। কারণ ইহা চৈতন্যবিহীন অন্ধজড় শক্তি। জ্ঞানশক্তিবিবর্জ্জিত জড়শক্তির কাল ও দিক্ জ্ঞান অসম্ভব। সুতরাং চৈতন্যবান পুরুষ কর্তৃক নিয়মিত হইয়া, অগ্নি আপন ধর্ম্মপ্রভাবে অন্নের পাককার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে এবং পাচক তথায় যদি উপস্থিত না থাকে তাহা হইলে পাক ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া

যাইলেও অগ্নি চৈতন্যবানের সাহায্য ব্যতিরেকে পাকক্রিয়া স্থগিত রাখিতে পারিবে না। পরং উত্তরোত্তর অন্নকে আরও দগ্ধ করিতে থাকিবে। কারণ পাক কার্য্য স্থগিত রাখা সম্বন্ধে অগ্নির কর্তৃত্ব নাই। দাহন কার্য্যে ইহার কারকত্ব থাকিলেও ইহা যে কর্তৃকারকের নিয়াম্য, এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং এই দৃষ্টান্ত হইতে বেশ হৃদয়ঙ্গম হইতেছে যে, ক্রিয়ার রূপ ও নিষ্পাদন ভেদে কর্তৃকরণাদি কারকের মধ্যে পরস্পরের ভেদ আছে। তবে তোমরা যে, প্রস্তরখণ্ডের অধঃপতন ব্যাপাররূপ দৃষ্টান্তে, তাহার প্রধান কর্তৃত্বের নিদর্শন দেখাও, তদ্বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই যে, 'স্থালী পাক করিতেছে,' 'অসি ছেদন করিতেছে,' 'প্রস্তরখণ্ড অধঃপতিত হইতেছে' ইত্যাদি বাক্যে, 'স্থালী' 'অসি' ও 'প্রস্তরখণ্ড' ইহারা, কারক বিচারে কর্তৃ সংজ্ঞা পাইয়াছে সত্য ; কিন্তু ইহাদের এবম্বিধভাবে সংজ্ঞিত হইবার বিশেষ কারণ আছে। যে স্থলে প্রধান কর্ত্তা, পরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় ; অথবা যেখানে প্রধান কর্তৃত্ব বিবক্ষিত নহে, সেই সকল স্থলে করণাদি কারকেরও স্বস্ব ব্যাপারে কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে বলিয়া কর্তৃ সংজ্ঞায় পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে। নতুবা কারণচক্রে প্রবিষ্ট হইয়া বিচার করিলেই প্রতীয়মান হইবে যে, প্রকৃতপক্ষে স্থালী, অসি বা প্রস্তরখণ্ড, কাহারও প্রধান কর্তৃত্ব নাই। আমরা বলিতে পারি যে স্বাতন্ত্র্য শক্তিপ্রভাবে গ্রহ উপগ্রহ আপন আপন অক্ষরেখায় পরিভ্রমণ করিতেছে ; যাঁহার ইঙ্গিতে সততোত্থিতপতিত উত্তাল তরঙ্গমালা অপার জলধিবক্ষে ক্রীড়া করিতেছে ; যাঁহার প্রেমপ্রস্রবণে জড়রেণু নিচয়-মধ্যে পরস্পরের অনুক্ষণ মিলন ও বিরহ ঘটিতেছে, সেই স্বাতন্ত্র্য-শক্তি কর্তৃক নিয়মিত হইয়া স্থালী পাক ক্রিয়া করিতেছে, অসি ছেদন করিতেছে অথবা প্রস্তরখণ্ড ভূমিতলে নিঃপতিত হইতেছে।

পাকাদিপতন ব্যাপারে প্রধান কর্ত্তার পরোক্ষত্ব বা অবিবক্ষিতত্ব নিবন্ধন অন্তর্দৃষ্টিবিহীন স্থূলদর্শী তোমরা, স্থালী অসি ও প্রস্তরখণ্ডের আপাতঃ দৃষ্টিতে নিমিত্তোপাদানরূপের প্রতীয়মানত্ব হেতু, তাহাদের উপর প্রধান কর্তৃত্বের আরোপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মকর্তৃত্ববিরোধ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে ইচ্ছা কর। কিন্তু বল দেখি ঐরূপে নিষ্কৃতি লাভের অবকাশ আছে কি ?

ক্রমশঃ।

ভক্তি-রহস্য।

[স্বামী বিবেকানন্দ।]

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈধী ভক্তির প্রয়োজনীয়তা।

ভক্তি দুই প্রকার। প্রথম, বৈধী ভক্তি বা অনুষ্ঠান, অপরটীকে মুখ্যা বা পরা ভক্তি বলে। ভক্তি শব্দে অতি নিম্নতম উপাসনা হইতে উচ্চতম অবস্থা পর্য্যন্ত বুঝায়। জগতের মধ্যে যে কোন দেশে বা যে কোন ধর্ম্মে যত প্রকার উপাসনা দেখিতে পান, প্রেমই সকলের মূলে। অবশ্য ধর্ম্মের ভিতর অনেকটা কেবল অনুষ্ঠান মাত্র—আবার অনেকটা অনুষ্ঠান না হইলেও প্রেম নহে, তদপেক্ষা নিম্নতর অবস্থা। তা হউক, কিন্তু এই অনুষ্ঠানগুলিরও আবশ্যকতা আছে। আত্মার উন্নতিপথে আরোহণের জন্য এই বৈধী বা বাহ্য ভক্তির সহায়তা গ্রহণ একান্ত আবশ্যক। মানুষে এই একটা মস্ত ভুল করিয়া থাকে—তারা মনে করে, তারা একেবারে লাফাইয়া সেই চরমাবস্থায় পঁহুছিতে সমর্থ। শিশু যদি মনে করে, সে একদিনেই বৃদ্ধ হইবে, তবে সে ভ্রান্ত। আর আমি আশা করি, আপনারা সর্ব্বদাই এইটী মনে রাখিবেন যে, বই পড়িলেই ধর্ম্ম হয় না, তর্ক বিচার করিতে পারিলেই ধর্ম্ম হয় না, অথবা কতকগুলি মতবাদে সম্মতি প্রকাশ করিলেই ধর্ম্ম হয় না। তর্কযুক্তি, মতামত, শাস্ত্রাদি বা অনুষ্ঠান এগুলি সবই ধর্ম্মলাভের সহায়কমাত্র, কিন্তু ধর্ম্ম স্বয়ং অপরোক্ষানুভূতিস্বরূপ। আমরা সকলেই বলি, একজন ঈশ্বর আছেন। জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কি ঈশ্বরকে দেখিয়াছেন? সকলেই বলিয়া থাকে শুনা যায়—স্বর্গে ঈশ্বর আছেন। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করুন, তাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছে কি না—আর যদি কেহ বলে, আমি দেখিয়াছি আপনারা তাহার কথায় হাসিয়া উঠিয়া তাহাকে পাগল বলিবেন। অনেকের পক্ষে ধর্ম্ম কেবল একটা শাস্ত্রে বিশ্বাস মাত্র—কতকগুলি মত মানিয়া লওয়া মাত্র। ইহার বেশী আর তাহারা উঠিতে পারে না। আমি আমার জীবনে এমন ধর্ম্ম কখন প্রচার করি নাই আর ওরূপ ধর্ম্মকে আমি ধর্ম্ম নাম দিতেই

বৈধী ভক্তি বা অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা।

প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্ম্ম।

পারি না। ঐ প্রকার ধর্ম্ম করার চেয়ে নাস্তিক হওয়াও শ্রেয়ঃ। কোনরূপ মতামতে বিশ্বাস করা না করার উপর ধর্ম্ম নির্ভর করে না। আপনারা বলিয়া থাকেন, আত্মা আছেন। আপনারা কি আত্মাকে কখন দেখিয়াছেন? আমাদের সকলেরই আত্মা রহিয়াছে, অথচ আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছি না, ইহার কারণ কি? আপনাদিগকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে ও আত্মদর্শনের কোনরূপ উপায় করিতেই হইবে। নতুবা ধর্ম্মসম্বন্ধে কথা কহা বৃথা। যদি কোন ধর্ম্ম সত্য হয়, তবে উহা অবশ্যই আমাদিগকে নিজ হৃদয়ে আত্মা ঈশ্বর ও সত্যের দর্শনে সমর্থ করিবে। এই সব মতামত বা শাস্ত্রাদির কোন একটা লইয়া যদি আপনাতে আমাতে অনন্তকালের জন্য তর্ক করি; তথাপি আমরা কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব না। লোকে ত যুগযুগান্তর ধরিয়া তর্ক বিচার করিতেছে—কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছে? মনবুদ্ধি ত সেখানে একেবারেই পঁহুছিতে পারে না। আমাদিগকে মন বুদ্ধির পারে যাইতে হইবে। অপরোক্ষানুভূতিই ধর্ম্মের প্রমাণ। এই দেয়ালটা যে আছে, তাহার প্রমাণ এই যে, আমরা উহা দেখিতেছি। যদি আপনারা চুপচাপ বসিয়া শত শত যুগ ধরিয়া ঐ দেয়ালের অস্তিত্ব নাস্তিত্ব লইয়া বিচার করিতে থাকেন, তবে আপনারা কোন কালে উহার মীমাংসা করিতে পারিবেন না, কিন্তু যখনই দেয়ালটী দেখিবেন, অমনি সব বিবাদ মিটিয়া যাইবে। তখন যদি জগতের সকল লোক মিলিয়া আপনাকে বলে, ঐ দেয়াল নাই, আপনি তাহাদিগের বাক্যে কখনই বিশ্বাস করিবেন না; কারণ, আপনি জানেন যে, আপনার নিজ চক্ষুর্দ্বয়ের সাক্ষ্য জগতের সমুদয় মতামত ও গ্রন্থরাশির প্রমাণ অপেক্ষা বলবান্। আপনারা সকলেই সম্ভবতঃ বিজ্ঞানবাদ (Idealism) সম্বন্ধে—যাহাতে বলে এই জগতের অস্তিত্ব নাই, আপনাদেরও অস্তিত্ব নাই—অনেক গ্রন্থ পড়িয়াছেন—আপনারা তাহাদের কথায় বিশ্বাস করেন না, কারণ, তাহারা নিজেরা নিজেদের কথায় বিশ্বাস করে না। তাহারা জানে যে, নিজ ইন্দ্রিয়গণের সাক্ষ্য এইরূপ সহস্র সহস্র বৃথা বাগাড়ম্বর হইতে বলবান্। আপনাদিগকে প্রথমেই সব গ্রন্থাদি ফেলিয়া দিতে হইবে—উহাদিগকে এক পাশে ঠেলিয়া ফেলিতে হইবে। বই যত কম পড়েন, ততই ভাল।

এক সময়ের মধ্যে একটা কায করুন। বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য দেশসমূহে একটা ঝোঁক দেখা যায় যে,—তাঁহারা মাথার ভিতর নানাপ্রকার

ভাব লইয়া এক দালখিচুড়ি পাকাইতেছেন—সর্ব্বপ্রকার ভাবের বদ্‌হজম মাথার ভিতর তাল পাকাইয়া একটা এলোমেলো অসম্বদ্ধ রকমের হইয়া দাঁড়াইয়াছে—সেগুলি যে বেশ মিলিয়া মিশিয়া একটা সুনির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করিবে, তাহারও অবকাশ পায় নাই। অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ নানাপ্রকার ভাব গ্রহণ এক প্রকার রোগবিশেষ হইয়া দাঁড়ায়—কিন্তু তাহাকে আদৌ ধর্ম্ম বলিতে পারা যায় না।

[এক সময়ে নানা ভাব লইয়া চিত্ত চঞ্চল করা উচিত নহে।]

তাহারা চায় খানিকটা স্নায়বীয় উত্তেজনা। তাঁহাদিগকে ভূতের কথা বলুন – কিম্বা উত্তরমেরু বা অন্য কোন দূরদেশনিবাসী পক্ষদ্বয়যুক্ত বা অন্য কোন আকারধারী লোকের কথা বলুন—যাহারা অদৃশ্যভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি পর্য্যাবেক্ষণ করিতেছে আর যাহাদের কথা মনে হইলেই তাহাদের গা ছমছমিয়া উঠে। এই সব বলিলেই তাহারা খুব খুসী হইয়া বাড়ী যাইবে, কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা পার হইতে না হইতেই তাহারা আবার নূতন হুজুক খুঁজিবে। কেহ কেহ ইহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহাতে ধর্ম্ম লাভ না হইয়া বাতুলালয়েই গতি হইয়া থাকে। এক শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ ভাবের স্রোত চলিলে এই দেশটা একটা বৃহৎ বাতুলালয়ে পরিণত হইবে। দুর্ব্বল ব্যক্তি কখন ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারে না আর এই সব ভূতুড়ে কাণ্ডে দুর্ব্বলতাই আসিয়া থাকে। অতএব ও সব দিকে পা মাড়াইবেন না—ওসব দিকেই যাইবেন না। উহাতে কেবল লোককে দুর্ব্বল করিয়া দেয়, মস্তিষ্কে বিশৃঙ্খলা আনয়ন করে, মনকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়, আত্মাকে অবনত করে আর তাহার ফলে ঘোরতর বিশৃঙ্খলাই আসিয়া থাকে।

[ভূতপ্রেতাদি অলৌকিক বিষয়ে অনুসন্ধান ধর্ম্ম নহে।]

আপনাদের যেন স্মরণ থাকে—ধর্ম্ম বচনে নাই, মতামতে নাই বা শাস্ত্র পাঠে নাই—ধর্ম্ম অপরোক্ষানুভূতি স্বরূপ। ধর্ম্ম কোনরূপ শেখা নহে—ধর্ম্ম হচ্চে—হওয়ার। 'চুরী করিও না,' এই উপদেশ সকলেই জানেন, কিন্তু তাহাতে কি হইল? যে ব্যক্তি চৌর্য্য ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই অচৌর্য্যের যথার্থ তত্ত্ব জানিয়াছেন। 'অপরের হিংসা করিও না,' এই উপদেশও সকলেই জানেন, কিন্তু তাহাতে ফল কি? যাঁহারা হিংসাকে

[কোন উপদেশ যথার্থ ভাবে প্রতিপালনেই সেই উপদেশের যথার্থ তাৎপর্য্য জ্ঞান।]

পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাই অহিংসাতত্ত্ব জানিয়াছেন, উহার উপর নিজেদের চরিত্র গঠিত করিয়াছেন।

অতএব আমাদিগকে ধর্ম্ম সাক্ষাৎকার করিতে হইবে, আর এই ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার করিতে অনেক দিন ধরিয়া অনেক চেষ্টা করিতে হয়। জগতের সকল ব্যক্তিই মনে করে, তাহার মত সুন্দর, তাহার মত বিদ্বান্, তাহার মত শক্তিমান্, তাহার মত অদ্ভুত লোক আর কেহ নাই। প্রত্যেক রমণীও তদ্রূপ জগতের মধ্যে আপনাকে পরমা সুন্দরী ও পরমবুদ্ধিমতী জ্ঞান করে। আমি ত অসাধারণ নয়, এমন একটী শিশুও দেখি নাই। সকল জননীই আমাকে একথা বলিয়া থাকেন—আমার ছেলেটী কি অদ্ভুত প্রকৃতি! মানুষের প্রকৃতিই এই। সুতরাং যখন লোকে কোন অতি উচ্চ অদ্ভুত বিষয়ের কথা শুনে, তখন সকলেই মনে করে, তাহারা উহা অনায়াসে লাভ করিবে—এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থির হইয়া একথা ভাবে না যে, তাঁহাদিগকে কঠোর চেষ্টা করিয়া উহা লাভ করিতে হইবে। তাহারা তথায় লাফাইয়া যাইতে চায়। উহা সকলের চেয়ে বড় ত—তবে আর কি—আমরা উহা এখনই চাই। আমরা কখন স্থিরভাবে ভাবিয়া দেখি না যে, আমাদের উহা লাভ করিবার শক্তি আছে কি না আর তাহার ফল এই হয়, যে, আমরা কিছুই করিতে পারি না। আপনারা কোন ব্যক্তিকে বাঁশ দিয়া ঠেলিয়া ছাদের উপর উঠাইতে পারেন না—সিঁড়ি দিয়া আস্তে আস্তে সকলকেই উঠিতে হয়। অতএব এই বৈধী ভক্তি বা নিম্নাঙ্গের উপাসনাই ধর্ম্মের প্রথম সোপান।

সকলেই ফস্ করিয়া বড় হইতে চায়, কিন্তু তাহা অসম্ভব।

নিম্নাঙ্গের উপাসনা কিরূপ? এইরূপ উপাসনা নানাবিধ। এই বিষয় বুঝাইবার জন্য আমি আপনাদিগকে একটী প্রশ্ন করিতে চাই। আপনারা সকলেই বলিয়া থাকেন, একজন ঈশ্বর আছেন আর তিনি সর্ব্বব্যাপী। এখন একবার চোক বুজিয়া তিনি কি ভাবুন দেখি। তাঁহাকে ভাবিতে গিয়া আপনাদের মনে কিসের ছবি উদয় হইতেছে? হয় আপনাদের মনে সমুদ্রের কথা, না হয় আকাশের কথা উদয় হইবে অথবা একটা বিস্তৃত প্রান্তরের কথা বা আপনাদের নিজ জীবনে অন্য যে সব জিনিষ দেখিয়াছেন, তাহাদেরই মধ্যে কোন একটীর কথা আপনাদের মনে উদয় হইবে। তাহাই

বৈধী ভক্তির প্রয়োজনীয়তা স্থূলের সহায়ে সূক্ষ্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার।

যদি হয়, তবে ইহা নিশ্চিত যে, 'সর্ব্বব্যাপী ভগবান্' এই বাক্য বলিলে আপনাদের মনে কোন ধারণাই হয় না। আপনাদের নিকট ঐ বাক্যের কোন অর্থই নাই। ভগবানের অন্যান্য গুণাবলি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমাদের সর্ব্বশক্তিমত্তা, সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতির কি ধারণা আছে? কিছুই নাই। ধর্ম্ম অর্থে সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষানুভূতি আর যখনই আপনারা ভগবদ্ভাব উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন, তখনই আপনাদিগকে ঈশ্বরোপাসক বলিয়া স্বীকার করিব। তাহার পূর্ব্বে আপনাদের ঐ শব্দগুলির বানান ব্যতীত অন্য কোন জ্ঞান নাই বলিতে হইবে। অতএব, যেমন ছেলেদের অনেক সময় স্থূল অবলম্বনে শিখাইতে হয়, পরে তাহাদের সূক্ষ্মের ধারণা হয় উক্ত অপরোক্ষানুভূতির অবস্থা লাভ করিতে হইলেও তদ্রূপ আমাদিগকে প্রথমে স্থূল অবলম্বনে অগ্রসর হইতে হইবে। পাঁচ দুগুণে দশ বলিলে একটা ছোট ছেলে কিছুই বুঝিবে না, কিন্তু যদি পাঁচটী জিনিষ দুইবার লইয়া দেখান যায় যে, তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ দশটী জিনিষ হইয়াছে, তাহা হইলে সে উহা বুঝিবে। এই সূক্ষ্মের ধারণা অতি ধীরে ধীরে দীর্ঘকালে লাভ হইয়া থাকে। আমরা সকলেই শিশুতুল্য; আমরা বয়সে বড় হইয়া থাকিতে পারি এবং দুনিয়ার সব বই পড়িয়া থাকিতে পারি, কিন্তু ধর্ম্মরাজ্যে আমরা শিশুমাত্র। এই প্রত্যক্ষানুভূতির শক্তিই ধর্ম্ম। বিভিন্ন মতামত, দর্শন বা ধর্ম্মনীতিগ্রন্থের ভাব লইয়া যতই মস্তিষ্ক পূর্ণ করিয়া থাকুন না কেন, তাহাতে ধর্ম্মজীবনের বড় কিছু আসিয়া যাইবে না; ধর্ম্মজীবন লাভ করিতে হইলে আপনাদের নিজেদের কি হইল, আপনাদের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি কতটা হইল, এইটী বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। এই অপরোক্ষানুভূতি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই বুঝিতে হইবে যে, আমরা ধর্ম্মরাজ্যে শিশুতুল্য। আমাদের বুঝিতে হইবে, আমরা মতামত শাস্ত্রাদি শিখিয়াছি বটে, কিন্তু জীবনে আমাদের কিছুই উপলব্ধি হয় নাই। আমাদিগকে এক্ষণে নূতন করিয়া আবার স্থূলের মধ্য দিয়া সাধন আরম্ভ করিতে হইবে—আমাদিগকে মন্ত্র, স্তব, স্তুতি, অনুষ্ঠানাদির সহায়তা লইতে হইবে আর এইরূপ বাহ্য ক্রিয়াকলাপ সহস্র সহস্র প্রকারের হইতে পারে।

সকলের পক্ষে এক প্রকার প্রণালীর কোন প্রয়োজন নাই। কতক মূর্ত্তিপূজায় ধর্ম্মপথে সাহায্য হইতে পারে, কতক লোকের নাও হইতে পারে। কতক লোকের পক্ষে মূর্ত্তির বাহ্য পূজার প্রয়োজন হইতে

পারে আবার অপর কাহারও কাহারও বা মনের মধ্যে ঐরূপ মূর্ত্তির চিন্তার প্রয়োজন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজ মনের ভিতর মূর্ত্তির উপাসনা করে, সে অনেক সময় বলিয়া থাকে—আমি মূর্ত্তিপূজক হইতে শ্রেষ্ঠ। আমি যখন অন্তরে মূর্ত্তিপূজা করিতেছি, তখন আমারই ঠিক ঠিক উপাসনা হইতেছে, যে বাহিরে মূর্ত্তিপূজা করিতেছে, সে পৌত্তলিক। তাহার সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অনেক লোকে মন্দির বা চার্চ্চরূপ একটা সাকার বস্তু খাড়া করিয়া উহাকে পবিত্র জ্ঞান করিয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্যাকৃতি মূর্ত্তি গঠন করিয়া যদি তাহার পূজা করা হয়, তবে তাহার মতে উহা অতি ভয়াবহ। অতএব স্থূলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া সূক্ষ্মে গমন করিবার নানাবিধ অনুষ্ঠান ও সাধনপ্রণালী আছে। ইহাদের মধ্য দিয়া সোপানক্রমে অগ্রসর হইয়া আমরা শেষে সূক্ষ্মানুভূতির যোগ্য হইব। আবার এক প্রকার সাধনপ্রণালী সকলের জন্য নহে। একপ্রকার সাধনপ্রণালী হয়ত আপনার উপযোগী আবার অপর কাহারও পক্ষে হয়ত অন্য প্রকার সাধনপ্রণালীর প্রয়োজন। সুতরাং সর্ব্বপ্রকার অনুষ্ঠান প্রণালী যদিও এক চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়, তথাপি সকলগুলি সকলের উপযোগী নহে। আমরা সাধারণতঃ এই আর একটী ভুল করিয়া থাকি। আমার আদর্শ আপনার উপযোগী নহে, আমি কেন, জোর করিয়া উহা আপনার ভিতর দিবার চেষ্টা করিব? জগতের ভিতর ঘুরিয়া আসিবেন,—দেখিবেন,—সকল নির্ব্বোধ ব্যক্তিই আপনাকে বলিবে যে, তাহার সাধনপ্রণালীই একমাত্র সত্য আর অন্যান্য প্রণালী সব পৈশাচিকতাপূর্ণ, আর জগতের মধ্যে ভগবানের মনোনীত পুরুষ একমাত্র তিনিই জন্মিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই সমুদয় অনুষ্ঠান-প্রণালীর কোনটীই মন্দ নহে, সকলগুলিই আমাদিগকে ধর্ম্ম-সাক্ষাৎকারে সাহায্য করে, আর যখন মনুষ্য প্রকৃতি নানাবিধ, তখন ধর্ম্ম-সাধনের বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানপ্রণালীর প্রয়োজন আর এইরূপ বিভিন্ন সাধনপ্রণালী জগতে যত প্রচলিত থাকে, ততই জগতের পক্ষে মঙ্গল। যদি জগতে কুড়িটী ধর্ম্মপ্রণালী থাকে, তবে তাহা খুব ভাল, যদি চার শত ধর্ম্ম-প্রণালী থাকে, আরো ভাল—কারণ, তাহা হইলে অনেকগুলির ভিতর যেটী ইচ্ছা বাছিয়া লইতে পারা যাইবে। অতএব ধর্ম্ম ও ধর্ম্মতত্ত্ব সমূহের সংখ্যার বৃদ্ধিতে আমাদের বরং আনন্দ প্রকাশই করা উচিত, কারণ উহাতে সকল

সাধনপ্রণালী অসংখ্য এবং প্রত্যেক ব্যক্তির সাধনপ্রণালী বিভিন্ন।

মানুষকে ধর্ম্মপথের পথিক করিবার উপায় হইতেছে, ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক মানবকে ধর্ম্মপথে সাহায্য করিবার উপায় হইতেছে, আর আমি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, ধর্ম্মের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাউক—যতদিন না প্রত্যেক লোকের অপর সকল ব্যক্তি হইতে পৃথক্ নিজের, নিজের এক একটী ধর্ম্ম হয়। ভক্তিযোগীর ইহাই ধারণা।

ইষ্ট।

এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত এই যে, আমার ধর্ম্ম আপনার বা আপনার ধর্ম্ম আমার হইতে পারে না। যদিও সকলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এক, তথাপি প্রত্যেক ব্যক্তির মনের রুচি অনুসারে প্রত্যেককেই ভিন্ন পথ দিয়া যাইতে হয়, আর যদিও পথ বিভিন্ন, তথাপি সমুদয়ই সত্য; কারণ, তাহারা একই চরম লক্ষ্যে লইয়া যায়। একটী সত্য, অবশিষ্ট-গুলি মিথ্যা—তাহা হইতে পারে না। এই নিজ নিজ নির্ব্বাচিত পথকে ভক্তিযোগীর ভাষায় ইষ্ট বলে।

তার পর আবার শব্দ বা মন্ত্রশক্তির কথা উল্লেখ করা উচিত।

শব্দ বা মন্ত্রশক্তি।

আপনারা সকলেই শব্দশক্তির কথা শুনিয়াছেন। এই শব্দশক্তি কি অদ্ভুত! প্রত্যেক শাস্ত্রগ্রন্থে—বেদ, বাইবেল, কোরাণ, এই সকলগুলিতেই শব্দশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কতকগুলি শব্দ আছে—মানবজাতির উপর তাহাদের আশ্চর্য্য প্রভাব! তার পর আবার ভক্তিলাভের বাহ্য সহায় স্বরূপ বিভিন্ন ভাবোদ্দীপক বস্তু আছে। আর এইগুলিরও মানব মনের উপর প্রবল প্রভাব। কিন্তু বুঝিতে হইবে—ধর্ম্মের প্রধান প্রধান ভাবোদ্দীপক বস্তুগুলি ইচ্ছামত বা খেয়াল মত কল্পিত হয় নাই। সেগুলি ভাবের বাহ্য প্রকাশ মাত্র। আমরা সর্ব্বদাই রূপক সহায়তায় চিন্তা করিয়া থাকি। আমাদের সকল শব্দগুলিই উহাদের

ভক্তির অন্যান্য বাহ্য সহায়।

অন্তরস্থিত চিন্তার রূপকমাত্র, আর বিভিন্ন লোক ও বিভিন্ন জাতি হেতু না জানিয়াও বিভিন্ন ভাবোদ্দীপক বস্তু সাধনার্থ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। উহারা তাহাদের অন্তরালস্থ ভাবের প্রকাশ মাত্র সুতরাং ঐ বস্তুগুলি সেই সেই ভাবের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে সম্বদ্ধ আর যেমন ভাব হইতে বহির্দ্দেশস্থ ভাবোদ্দীপক বস্তু সহজেই আসিয়া থাকে, তদ্রূপ ঐ বস্তুও আবার ভাবোদ্রেকে সমর্থ। এই হেতু ভক্তযোগের এই অংশে এই সব ভাবোদ্দীপক বস্তু, শব্দ বা মন্ত্রশক্তি ও প্রার্থনা বা স্তবস্তুতির কথা আছে।

সকল ধর্ম্মেই প্রার্থনা আছে—তবে এইটুকু আপনাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ধনসম্পদ বা আরোগ্যের জন্য প্রার্থনাকে ভক্তি বলা হয় না—ওগুলি কর্ম্ম। স্বর্গাদি গমনের জন্য প্রার্থনারূপ কোন লাভের জন্য প্রার্থনা কর্ম্মমাত্র। যিনি ভগবান্‌কে ভাল বাসিতে চাহেন যিনি ভক্ত হইতে চাহেন, তাঁহাকে ঐ সমুদয় কামনাগুলিকে একটী পুঁটুলি বাঁধিয়া ভক্তিগৃহের দ্বারের বাহিরে ফেলিয়া আসিতে হইবে, তবে তিনি উহাতে প্রবেশাধিকার পাইবেন। আমি এ কথা বলিতেছি না যে, যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহা পাওয়া যায় না; যা চাওয়া যায় সবই পাওয়া যায়। তবে উহা অতি হীনবুদ্ধির, নিম্নাধিকারীর, ভিখারীর ধর্ম্ম।

ভগবান ব্যতীত অন্য কোন জিনিষ প্রার্থনা ভক্তি নহে।

উষিত্বা জাহ্নবীতীরে কূপং খনতি দুর্ম্মতিঃ।

"মূর্খ সে, যে গঙ্গাতীরে বাস করিয়া জলের জন্য কূপ খনন করে।"

"মূর্খ সে, যে হীরকখনিতে আসিয়া কাচখণ্ডের অন্বেষণ করে।"

ভগবান্ হীরকখনিস্বরূপ আর এই সব ধনমান ঐশ্বর্য্য এগুলি কাচখণ্ড-স্বরূপ। এই দেহ একদিন নষ্ট হইবেই; তবে আর বারম্বার ইহার স্বাস্থ্যের জন্য প্রার্থনা করা কেন? স্বাস্থ্যে ও ঐশ্বর্য্যে আছে কি? শ্রেষ্ঠতম ধনী ব্যক্তি নিজ ধনের অত্যল্প অংশমাত্র স্বয়ং ব্যবহার করিতে পারেন। তিনি আর ৪।৫ বার করিয়া ভোজ খাইতে পারেন না, অধিক বস্ত্রও ব্যবহার করিতে পারেন না, একজন লোক যতটা বায়ু নিঃশ্বাসযোগে গ্রহণ করিতে পারে তাহার অধিক লইতে পারেন না। তাঁহার নিজের দেহে যতটা জায়গা যায়, তাহা অপেক্ষা অধিক স্থানে তিনি শুইতে পারেন না। আমরা এই জগতের সকলবস্তু কখনই পাইতে পারি না, আর যদি না পাই, তাহাই বা কে গ্রাহ্য করে? এই দেহ একদিন যাইবে—এ সব জিনিষের জন্য কে ব্যস্ত হইবে? যদি ভাল ভাল জিনিষ আসে, আসুক—যদি সেগুলি চলিয়া যায়—যাক্, তাহাও ভাল। আসিলেও ভাল, না আসিলেও ভাল। কিন্তু ভগবানের নিকট গিয়া এ জিনিষ ও জিনিষ চাওয়া ভক্তি নহে। এগুলি ধর্ম্মের নিম্নতম সোপানমাত্র। উহারা অতি নিম্নাঙ্গের কর্ম্মমাত্র। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করা—সেই রাজরাজেশ্বরের সামীপ্যলাভের চেষ্টা উহাপেক্ষা উচ্চতর। আমরা তথায় ভিক্ষুকের বেশে, ভিক্ষুকের ন্যায় চীরপরিহিত হইয়া, সর্ব্বাঙ্গে মলালিপ্ত হইয়া উপস্থিত হইতে পারি না। যদি আমরা

কোন সম্রাটের সাক্ষাতে উপস্থিত হইতে চাই, আমাদিগকে কি তথায় যাইতে দেওয়া হইবে ? কখনই নহে। দ্বারবানেরা আমাদিগকে গেট হইতেই তাড়াইয়া দিবে। ভগবান্ রাজার রাজা, সম্রাটের সম্রাট ; তথায় ভিক্ষুকের চীর পরিধান করিয়া প্রবেশের অধিকার নাই। তথায় দোকানদারের প্রবেশাধিকার নাই। সেখানে কেনাবেচা একেবারেই চলিবে না। আপনারা বাইবেলেও পড়িয়াছেন যে, যীশু ভগবানের মন্দির হইতে ক্রেতা বিক্রেতাদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সকামীদের ভাব এই,—"ঈশ্বর, আমি তোমাকে আমার এই ক্ষুদ্র প্রার্থনা উপহার দিতেছি, তুমি আমাকে একটি নূতন পোষাক দাও। ভগবান্, আজ আমার মাথাধরাটা সারাইয়া দাও, আমি কাল আরো দুঘণ্টা অধিকক্ষণ ধরিয়া প্রার্থনা করিব।" এইরূপ নিম্নাঙ্গের সকাম-প্রার্থনাকারী অপেক্ষা আপনারা একটু উচ্চাবস্থাপন্ন—ভাবুন দেখি। এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিষের জন্য প্রার্থনা করা অপেক্ষা আপনাদের জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্য আছে। মানুষে আর পশুতে ইহাই প্রভেদ। পশুর ভিতরকার অস্ফুট মনঃশক্তি সমুদয়ই তাহার দেহেই সীমাবদ্ধ। মানুষ যদি নিজের সমুদয় মনঃশক্তি ঐরূপ পশুবৎ কার্য্যেই ব্যয় করেন, তবে মানুষ ও পশুর ভিতর কি প্রভেদ—দেখান।

অতএব ইহা বলাই বাহুল্য যে, ভক্ত হইতে গেলে প্রথমেই এই সব স্বর্গাদিগমনের বাসনা পরিহার করিতে হইবে। এইরূপ স্বর্গ এই সব স্থানেরই মত, তবে এখানকার অপেক্ষা কিছু ভাল হইতে পারে। এখানে আমাদের কতকগুলি দুঃখ, কতকগুলি সুখভোগ করিতে হয়। তথায় না হয় দুঃখ কিছু কম হইবে, সুখ কিছু বেশী হইবে। আমাদের জ্ঞান কোন-অংশে বাড়িবে না,—উহা আমাদের পুণ্যকর্ম্মের ফল-ভোগস্বরূপ মাত্র হইবে—হয়ত আমরা যথেষ্ট খাইতে পাইব, হয়ত খুব কম খাইতে পাইব। হয়ত আমরা আকাশের মধ্য দিয়া বাদুড়ের ন্যায় উড়িয়া যাইবার শক্তি লাভ করিব, দেয়ালের ভিতর দিয়া লাফাইয়া যাইতে পারিব, সর্ব্বপ্রকার চালাকি খেলিতে পারিব, কিম্বা কোন ভুতুড়ের দলে গিয়া সং দেখাইতে পারিব। আমার মনে হয়, এইরূপ ভুতুড়ে দলে গিয়া ভূতের নৃত্য করা অপেক্ষা নরকে যাওয়াও শ্রেয়ঃ। ভুতুড়ে দলে ভূতের নৃত্য করিতে বাধ্য হওয়া অপেক্ষা বরং আমি বাধ্য হইয়া পৃথিবীর ঘোর তমোময় প্রান্তে যাইতে প্রস্তুত আছি।

স্বর্গ ইহলোকেরই উৎকৃষ্ট সংস্করণ মাত্র।

খ্রীষ্টিয়ানের স্বর্গের ধারণা এই যে, উহা এমন এক স্থান, যেখানে ভোগসুখ শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে। এইরূপ স্বর্গ কিরূপে আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে? সম্ভবতঃ আপনারা এরূপ স্থানে শত শতবার গিয়াছেন, আবার তথা হইতে শত শত বার পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন।

সমস্যা এই, কিরূপে এই সকল প্রাকৃতিক নিয়ম অতিক্রম করা যাইবে। কিসে মানুষকে অসুখী করিয়া থাকে? মানুষ এই সকল প্রাকৃতিক নিয়মে বদ্ধ দাসতুল্য মাত্র। প্রকৃতির হাতের পুতুলস্বরূপ—তিনি ক্রীড়নকের ন্যায় তাহাদিগকে কখন এদিকে, কখন সেদিকে ফিরাইতেছেন। খুব বড়লোক —যথা একজন সম্রাটের কথা ভাবুন। সম্রাট্ হইলে কি হয়, ধরুন তাঁহার ক্ষুধা লাগিল। তখন যদি খাদ্য না পান, তবে তিনি একেবারে লাফাইতে থাকিবেন—পাগল হইয়া যাইবেন। অতি সামান্য কিছুতে যাহার চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবার আশঙ্কা আছে, সেই এই দেহের আমরা সর্ব্বদা যত্ন করিতেছি, আর সেই হেতুই সর্ব্বদা ভয়-ব্যাকুলিত-চিত্তে বাস করিতেছি। আমি সেদিন পড়িতে-ছিলাম—জনৈক ব্যক্তি গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, হরিণকে ভয়ের দরুণ, প্রত্যহ গড়ে ৬০।৭০ মাইল দৌড়াইতে হয়। অনেক মাইল দৌড়িয়া গেল, তার পর কিছু খাইল। যিনি এইরূপ গণনা করিয়া-ছেন, তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, আমরা হরিণ অপেক্ষা অধিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত। হরিণ তবু খানিকক্ষণ বিশ্রাম করিতে পায়, আমরা তাহাও পাই না। হরিণ যথেষ্টপরিমাণে ঘাস পাইলেই তৃপ্ত হয়, আমরা কিন্তু ক্রমাগত আমাদের অভাব বাড়াইতেছি। ক্রমাগত আমাদের অভাব বাড়ান আমাদের রোগ-বিশেষ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা এমন অপ্রকৃতিস্থ ও বিকারগ্রস্ত হইয়াছি যে, কোন স্বাভাবিক বস্তুই আর আমাদের তৃপ্তিসাধনে সমর্থ নহে। আমা-দের প্রত্যেক স্নায়ু বিষ ও রোগবীজে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছে—সেইজন্য আমরা সর্ব্বদাই অস্বাভাবিক বস্তু খুঁজিতেছি—অস্বাভাবিক উত্তেজনা, অস্বাভাবিক খাদ্যপানীয়, অস্বাভাবিক সঙ্গ ও জীবন খুঁজিতেছি। বায়ু প্রথমে বিষাক্ত হওয়া চাই, তবেই—আমরা শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণে সমর্থ হইতে পারি। ভয় সম্বন্ধে বক্তব্য এই,—আমাদের সমগ্র জীবনটা কতকগুলা ভয়ের সমষ্টি ছাড়া আর কি? হরিণের ভয় করিবার এক প্রকার জিনিষ অর্থাৎ ব্যাঘ্রাদি আছে, মানবের সমগ্র জগৎ।

মানুষ প্রকৃতির দাস—তাহাকে এই দাসত্ব অতিক্রম করিতে হইবে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই, আমরা কিরূপে এই বন্ধনশৃঙ্খল ভগ্ন করিব? এ কথা বলিতে বেশ—আমরা ক্ষুদ্র মানুষ—ভগবানের কথায় আমাদের কায কি? আমি দেখিতে পাই, হিতবাদীগণ আসিয়া বলেন, "ঈশ্বর ও এতদ্বিধ অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না। আমরা ও সবের কোন ধার ধারি না। এই জগতে সুখে বাস করিতে চাই।" যদি তাহা সম্ভব হইত, তবে আমিই প্রথমে ইহা করিতাম, কিন্তু জগৎ আমাদিগকে ত তাহা করিতে দিবে না।

স্বর্গে যাইবার বাসনা ছাড়িয়া ভগবানের আশ্রয়গ্রহণ না করিলে প্রকৃতির দাসত্ব অতিক্রম করিবার শক্তি কাহারও নাই।

আপনারা যতদিন প্রকৃতির দাসস্বরূপ রহিয়াছেন, ততদিন সুখভোগ করিবেন কিরূপে? যতই চেষ্টা করিবেন ততই আরো ঘোরতর অজ্ঞান আপনাদিগকে আবৃত করিবে। জানি না, কত বর্ষ ধরিয়া আপনারা উন্নতির জন্য কত মতলব আঁটিতেছেন, কিন্তু যেমন এক এক বর্ষ যাইতে থাকে, ক্রমশঃ অবস্থা মন্দ হইতে মন্দতর হইতে থাকে। দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে তদানীন্তন পরিচিত জগতে লোকের অতি অল্পই অভাব ছিল, কিন্তু যেমন তাহাদের জ্ঞান একগুণ বাড়িতে লাগিল অভাবও শতগুণ বাড়িয়া চলিল। আমরা ভাবি, অন্তত যখন আমরা উদ্ধার হইব, তখন আমাদের বাসনা সব পূর্ণ হইবে—তাই আমরা স্বর্গে যাইতে চাই। সেই অনন্ত, অদম্য পিপাসা! সর্ব্বদাই একটা কিছু চাওয়া! নিঃস্ব ভিক্ষুক চায় কেবল টাকা, টাকা, টাকা। টাকা হইলে আবার অন্যান্য জিনিষ চায়, সমাজের সঙ্গে মিশিতে চায়, তার পর আবার অন্য কিছু চায়। কিরূপে আমাদের এই তৃষ্ণা মিটিবে? যদি আমরা স্বর্গে যাই, তাহাতে বাসনা আরো বাড়িয়া যাইবে। যদি দরিদ্র ব্যক্তি ধনী হয়, তাহাতে তাহার বাসনার নিবৃত্তি হয় না, বরং যেমন অগ্নিতে ঘৃত প্রক্ষেপ করিলে অগ্নির তেজ আরও বাড়িতে থাকে, তদ্রূপ তাহারও বাসনার বৃদ্ধি হইতে থাকে। স্বর্গে যাওয়ার অর্থ—খুব বড়মানুষ হওয়া—আর তাহা হইলেই বাসনা আরো বাড়িতে থাকিবে। জগতের বিভিন্ন শাস্ত্রে পড়া যায়, স্বর্গেও অনেক দুষ্টুমি, অন্যায় হইয়া থাকে। স্বর্গে যাহারা যায়, তাহারাই যে খুব ভাল লোক, তাহা নহে আর তার পর এই স্বর্গে যাইবার ইচ্ছা কেবল ভোগবাসনা মাত্র। এইটী ছাড়িয়া দিতে হইবে। স্বর্গে যাওয়া ত অতি ছোট কথা, অতি হীনবুদ্ধি ব্যক্তির কথা। আমি লক্ষপতি হইব এবং লোকের উপর প্রভুত্ব করিব, এভাব যেরূপ, স্বর্গে যাইবার ইচ্ছাও তদ্রূপ। এইরূপ স্বর্গ অনেক আছে

কিন্তু ওগুলি না ছাড়িলে ধর্ম্ম ও ভক্তির দ্বারদেশে প্রবেশেরও অধিকার পাইবেন না।

সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

ধর্ম্মপ্রচারক গ্রন্থাবলীর ১ম সংখ্যা - শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত, 'দিনচর্য্যা'। প্রতিদিন প্রত্যেক হিন্দুর যে সকল বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং জীবনে পরিণত করিতে চেষ্টা করা আবশ্যক, প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে গ্রন্থকার সেই সকল বিষয়ের কতকগুলি সংগ্রহ করিয়া ইহাতে পাঠককে উপহার দিয়াছেন। মধ্যে মধ্যে কোন কোন জটিল বিষয় সরল ভাষায় স্বাধীন যুক্তি দ্বারা বুঝাইবারও প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। পুস্তক খানির মূল্য চারি আনা মাত্র নির্দ্ধারিত করায় এবং উত্তম কাগজে যথাসাধ্য নির্ভুল করিয়া মুদ্রনের চেষ্টা পাওয়ায়, এ ধরণের পুস্তক বঙ্গ ভাষায় অনেক প্রকাশিত থাকিলেও সাধারণে আদরণীয় হইবে বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থখানির একটি অভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গুরুভক্তি সম্বন্ধে কোন কথা বুঝাইবার প্রয়াসই গ্রন্থখানিতে দেখিলাম না। এ শ্রদ্ধাহীনতার দিনে ঐ বিষয়ের কিছু বলিলে মন্দ হইত না। আর এক কথা, পুস্তক খানিতে অষ্টাঙ্গ যোগের কথাই অনেক বলা হইয়াছে। এ ঘোর জীবনসংগ্রাম ও জাতীয় প্রতিযোগিতার দিনে তৎসাধনার অবসর বড়ই অল্প। এখন চাই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ, যতদুর পারা যায় ফলকামনা রহিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান এবং 'জুতো সেলাই হইতে চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত' যাবতীয় কর্ম্মের যথাসম্ভব নিঃস্বার্থ অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ভগবদ্ভক্তি ও জ্ঞানলাভে অগ্রসর হওয়া। এখন চাই ছাত্র ও গৃহস্থদের চক্ষুসম্মুখে সর্ব্বদা উদিত রাখা মহাভারতীয় সতী উপাখ্যান, ধর্ম্মব্যাধ চরিত, এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আজীবন কর্ম্মানুষ্ঠান। তবেই এ নির্জ্জীব জাতীয় জীবনে আবার প্রাণস্পন্দন হইবে। পুস্তকে ঐ বিষয়টির খুব বিশদ্ প্রচার থাকিলে ভাল হইত। আশা করি গ্রন্থকার ভবিষ্যতে গ্রন্থখানির উক্ত ত্রুটিগুলি যথাসম্ভব পূরণ করিবেন।

মধুর রস ও বৈষ্ণব কবি।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর] [শ্রীজিতেন্দ্র লাল বসু।

যে বিরহ হৃদয়ের পূর্ব্বোক্ত প্রকার উচ্চ অবস্থা সাধিতে পারে,সে বিরহের চিত্র ভক্তি-কাব্যে কত প্রয়োজনীয় তাহা বোধ হয় আর ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝাইতে হইবে না। এখন আমাদের সেই বিরহের চিত্র উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইবার সময় হইয়াছে।

বিরহ অভাবের অনুভূতি; অতীত সুখের ও আনন্দের আলোচনা, স্মৃতির পূজা। এ স্মৃতি ভালবাসার স্মৃতি—ভালবাসার সকল আনন্দের স্মৃতি,—মিলনানন্দ বিচ্ছেদ-দুঃখ প্রভৃতি প্রিয়তম সম্বন্ধীয় সমস্ত ব্যাপারই এই স্মৃতির বিষয়ীভূত। বিরহের প্রথমাবস্থায় কেবল হাহাকার। হৃদয়ের বিরাটশূন্যতা, সংসারের অন্য বস্তুর অসারতা বোধ। এ অবস্থায় কেবল হৃদয়ভেদী কাতর ক্রন্দন।

সজল নয়ান করি পিয়া পথ হেরি হেরি
তিলেএক হয় যুগচারি।
বিধি বড় দারুণ তাহে পুন ঐ ছন
দূরহি করল মুরারি॥
সজনি কিযে করব পরকার।
কি মোর করম ফলে পিয়া গেল দেশান্তরে
নিতি নিতি মদন ঝঙ্কার॥
নারীর দীঘ নিশাস পড়ুক তাহার পাশ
মোর পিয়া মোর পাশে বৈসে।
পাখী জাতি যদি হউঁ পিয়া পাশে উড়ি যাউঁ
সব দুঃখ কহুঁ তছু পাশে।
আনিদেই মোর পিউ রাখহ আমার জীউ
কোই হ করুণা বান।
বিদ্যাপতি কহ ধৈরজ ধর চিতে
তুরিতহিঁ মিলব কান॥

আর শ্রীরাধার এখন বসন ভূষণ, এসকল কিছুই ভাল লাগে না।
"স্ত্রীণাং প্রিয়লোক ফলোহি বেশঃ।"

"দূরে রহুঁ বসন ভূষণ রূপ যৌবন
জীবন জ্বলত জনু লাগি ॥

মহাকবি বিদ্যাপতি শ্রীরাধার নিজ বসনভূষণ, সাজসজ্জার প্রতি বিরাগ সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

"শঙ্খকর চূর বসন কর দূর
তোড়ত গজমতি হার রে।
পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিঙ্গারে
যামুন সলিলে সব ডার রে ॥
সাঁথার সিন্দুর মুছিয়া কর দূর
পিয়া বিনু সকলি নৈরাশ রে।
ভণয়ে বিদ্যাপতি শুনহ যুবতি
দুখ ভেল অবশেষ রে ॥

তার পর প্রিয়ের ভালবাসার স্মৃতি ঃ—

সে মোর অঙ্গের পবন পরাশ
অমিয়া সায়রে ভাসে
এক আধ তিলে মোরে না দেখিলে
যুগশত হেন বাসে ॥
সই সে কেনে এমন হৈল।
কঠিন গান্ধিনী তনয় কি গুণে
তারে উদাসীন কৈল ॥
পরাণে পরাণে বান্ধা যেই জনে
তাহারে করিয়া ভিন।
মথুরা নগরে থুইল কার ঘরে
সোঙরি জীবন ক্ষীণ ॥
কেমনে গোঙাব এ দিন রজনী
তাহার দরশ বিনে
বিরহ দহনে যে দেহ মলিন
আকুল হইনু দীনে ॥
অন্তর বাহির মলিন শরীর
জীবনে নাহিক আশ।

শুনি বেয়াকুল হইয়া ধাইয়া
চলিল শঙ্কর দাস ॥

মিলনানন্দের সময় প্রিয়ের প্রতি অনুযোগ ছিল, এখন খালি ভালবাসার স্মৃতি ও গুণের স্মৃতি—যাহা কিছু আদরের সুখের ছিল, সকলের প্রতি অনাস্থা—

পুন না হেরিব সো চান্দ বয়ান।
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু না রহে পরাণ ॥
আর কত পিয়া গুণ কহিব কান্দিয়া।
জীবন সংশয় হৈল পিয়া না দেখিয়া ॥
উঠিতে বসিতে আর নাহিক শকতি।
জাগিয়া জাগিয়া কত পোহাইব রাতি ॥
সো সুখ সম্পদ মোর কোথাকারে গেল।
পরাণ পুতলী মোর কে হরিয়া নিল ॥
আর না যাইব সেই যমুনার জলে
আর না হেরব শ্যাম কদম্বের তলে ॥
নিলাজ পরাণ মোর রহে কি লাগিয়া।
জ্ঞানদাস কহে মোর ফাটি যায় হিয়া ॥

শ্রীরাধার হৃদয় এখন কেবল পুরাতন সুখ স্মৃতিময় হইয়া উঠিয়াছে :—

এই তো মাধবী তলে আমার লাগিয়া পিয়া
যোগী যেন সদাই ধেয়ায়।
পিয়া বিনে হিয়া কেন ফাটিয়া না পড়ে গো
নিলাজ পরাণ নাহি যায় ॥
সখি হে বড় দুঃখ রহল মরমে
আমারে ছাড়িয়া পিয়া মথুরা রহল গিয়া
এই বিধি লিখিল করমে ॥
আমারে লইয়া সঙ্গে কেলি কৌতুক রঙ্গে
ফুল তুলি বিহরই বনে।
নব কিশলয় তুলি শেজ বিছায়ই বন্ধু
রস পরিপাটির কারণে ॥
আমারে লইয়া কোলে শয়নে স্বপনে দেখে
যামিনী জাগিয়া পোহায়।

সে হেন গুণের পিয়া   কোন খানে কার সনে
কৈছনে দিবস গোঙায়॥
এতেক দিবস হইল   প্রাণনাথ না আইল
কার মুখে না পাই সম্বাদ।
গোবিন্দদাস চলু   শ্যাম সমুঝাইতে
বাঢ়াল বিরহ-বিষাদ॥

শ্রীরাধার এক মাত্র সুখ তিরোহিত হইয়াছে, রাত্রিদিবস, শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্ত কোনও কালেই, কোনও সময়েই, কোনও অবস্থাতেই তাঁহার হৃদয়ে সুখের লেশ মাত্র নাই। বৈষ্ণবকবির নিপুণ তুলিকায় এই সার্ব্বকালিক বিরহব্যথা সুচিত্রিত হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সময়োপযোগী চিত্র সুন্দর রূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। বর্ষার বিরহচিত্র দেখুন--

সখিরে হামার দুখের নাহিক ওর।
এ ভরা বাদর   মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।
ঝঞ্ঝা ঘন   গরজন্তি সন্তুতি
ভুবন ভরি বরখণ্ডিয়া।
কান্ত পাহুন   কাম দারুণ
সঘনে খরশর হণ্ডিযা॥
কুলিশ শত শত   পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাহরি   ডাকে ডাহুকা
ফাটি যাওত ছাতিয়া।
তিমির দিগ ভরি   ঘোর যামিনী
অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে   কৈসে গোঁয়ায়ব
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥

কি গম্ভীর, কি মধুর কি সহজ ও স্বাভাবিক চিত্র, সম সৌন্দর্য্যময় ছন্দে প্রকাশিত হইয়াছে। শুনিয়াই কালিদাসের মেঘদূতের মেঘমন্দ্রবৎ গম্ভীর ছন্দ যেন কাণে বাজিয়া উঠে, আর মনে পড়ে সেই অমর বিরহকাব্যের অমর বাক্য—

মেঘালোকে ভবতি নিতরামন্যথাবৃত্তিচেতঃ।

কণ্ঠাশ্লেষি প্রণয়িনীজনে কিং পুনঃ দূরসংবহ ॥

প্রণয়ীর বাহুপাশে আলিঙ্গিত থাকিয়াও যখন প্রণয়িনীর মনে মেঘ দেখিয়া নানা অশুভ চিন্তার উদয় হয় তখন সেই প্রণয়ী দূরে থাকিলে প্রণয়িনীর মন মেঘ দেখিয়া যে অধিক উৎকণ্ঠিত হইবে তাহা আর বলিতে হইবে না।

বৈষ্ণব কবিতার বাহ্য প্রকৃতির পরিচয় এতাবৎ আমরা লই নাই। এই স্থলে তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। আমরা দেখিব যে ভাববৈচিত্র্যের সঙ্গে বৈষ্ণব কবি ছন্দেরও বহুবিধ বৈচিত্র্যের অবতারণা করিয়াছেন এবং ভাষার লালিত্যও প্রচুর পরিমাণে তাঁহাদের পদাবলীর ভিতর পাওয়া যায়। উপরে যে পদটী উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার ছন্দ ও ভাষা পরীক্ষা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। ছন্দ ভাবের বাহন। যখন যে ভাব প্রকাশের আবশ্যক হয় তখন সেই ভাবোপযোগী ছন্দের সৃষ্টি করিতে পারিলে কবিতা সর্ব্বতোভাবে হৃদয়গ্রাহিনী হয়। কালিদাসের কুমারসম্ভবের ছন্দগুলি মেঘদূতের মেঘগর্জ্জনবৎ ছন্দের সহিত পর্য্যালোচনা করিলেই এ কথা বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। বর্ষার গাম্ভীর্য্যময় চিত্র যে ভাষায় ও ছন্দে প্রকটিত হইয়াছে তাহা তৎকালোপযোগী। বসন্তের বিরহ আবার অন্য ছন্দে ও ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে। বসন্তে প্রকৃতির যে পরিবর্ত্তন, প্রকৃতির মধ্যে যে আনন্দ হিল্লোল তাহা সেই ছন্দোবন্দের মধ্যে যেন সমস্তটুকু ধরা পড়িয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া শ্রীরাধার মর্ম্মের ক্রন্দনটুকু কোথাও ঢাকা পড়ে নাই! তাঁহার হৃদয়ের এখন একমাত্রাবলম্বন স্মৃতির পূজা স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে।

ফুটল কুসুম নব কুঞ্জকুটীর রস

কোকিল পঞ্চম গাওইরে।

মলয়ানিল হিম শিখরে সিধারিল

পিয়া নিজ দেশে না আওইরে ॥

চাঁদ চন্দনতনু অধিক উতাপই

উপবনে অলি উতরোল।

সময় বসন্ত কান্ত রহুঁ দূরদেশ

জানলু বিহি প্রতিকূল ॥

অনিমিখ-নয়নে নাহ মুখ নিরখিতে
তিরপিত নাহয়ে নয়ান।
এ সুখ সময়ে সহরে এত সঙ্কট
অবলা কঠিন পরাণ॥
দিনে দিনে ক্ষীণ তনু হিমে কমলিনী জনু
না জানি কি ইহ পরিয়ন্ত।
বিদ্যাপতি কহ ধিক ধিক জীবনে
মাধব নিকরুণ অন্ত॥
গগনে গরজে ঘন কুকরে ময়ূর।
একাল মন্দিরে হাম পিয়া মধুপুর॥

এইরূপ গুরুগম্ভীর সুরে বর্ষার আগমনী যেমন গীত হইয়াছে, তেমনি আবার শরতের বিরহ অন্য ছন্দে প্রকটিত হইয়াছে:—

আওল শরদ নিশাকর নিরমল
পরিমল কমল বিকাশ।
হেরি হেরি বরজ রমণীগণ মূরছরে
সোঙরিয়া রাসবিলাস॥
মাধব তুয়া অতি চপল চরিত
কিয়ে অভিলাষে রহলি মথুরাপুরে
বিসরিয়া পূরব পিরীত॥
এ সুখ যামিনী বিরহিণী কামিনী
কৈছনে ধরব পরাণ।
রোই রোই ভরম সরম সব তেজল
জীবইতে নাহি নিদান॥
অমল কমল দল যো মুখমণ্ডল
অবভেল ঝামর তুল।
লম্পটি পতি তোহে কিয়ে সমুঝায়ব
পেখহ বল্লরী কুল॥

বসন্ত কালোচিত বিরহ বর্ণনায় কবি বসন্তকালের কোনও শোভার অপলাপ করেন নাই—সকল সৌন্দর্য্যই বিরহিণী রাধিকার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন। সে ছন্দেও যে সুষমা ব্যক্ত হইয়াছে তাহাও লক্ষ্য করিবার উপযুক্ত—

হুতাশ সদৃশ চাঁদ চন্দন
মন্দ পবন সন্তাপই।
মাধবী মধু মত্ত মধুকর
মধুর মঙ্গল গাবই॥
নবমঞ্জু অঞ্জন পুঞ্জ রঞ্জিত
চূত কানন শোহই।
রসলোল কোকিল কোকিলাকুল
কাকলি মন মোহই॥
মোহই মাধবী মাস
চৌদিশে কুসুম বিকাশ
বিকাশহাস বিলাস সুললিত
কমলিনী রস জ্ম্ভিতা।
মধুপান চঞ্চল চঞ্চরীক কুল
পদ্মিনী মুখ চুম্বিতা॥
মুকুল পুলকিত বল্লী অরু তরু
চারু চৌদিশে সজ্জিতা।
হামসে পাপিনী বিরহে তাপিনী
সকল সুখ পরিবঞ্চিতা॥

এই সকল পদাবলী হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে বৈষ্ণব কবিগণ শুধু যে প্রেমিক, শুধু যে কবি, তাহা নহেন, সুশিল্পীও বটেন। তাঁহাদের ভাবপ্রবণ লেখনীর মুখে শুধু হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশের গূঢ় ও বহু বৈচিত্র্যময় বার্ত্তাগুলিই প্রকাশিত হয় না, কাব্যশিল্পের সৌন্দর্য্যময়ী কলাও বিকশিত হইয়া উঠে; মনুষ্য হৃদয়ের সহিত সুর লয়ে গাঁথা প্রকৃতি সুন্দরীর সুষমাময়ী প্রতিকৃতিও প্রতিবিম্বিত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণবকবিতা ছন্দোবৈভবে অতুল সম্পত্তিশালিনী, ভাষার লালিত্যেও নিতান্ত হীনগৌরব নহে। ফলকথা বৈষ্ণব কবিতার বাহ্য-প্রকৃতি ও তাহার অন্তঃপ্রকৃতির ন্যায় অসামান্য ঐশ্বর্য্যময়ী। আমরা এই প্রবন্ধমধ্যে এতাবৎ যে সকল পদ উদ্ধৃত করিয়াছি, এ কথার সেই সকলই যথেষ্ট প্রমাণ। এ বিষয়ে অধিক কালক্ষেপের প্রয়োজন নাই।

আমরা শ্রীরাধার বিরহ বর্ণনার পরিচয় লইতেছিলাম! যতদূর দেখা-

ইয়াছি, তাহা সেই বিরহের বাহ্যস্বরূপ বলা যাইতে পারে। বাহ্যস্বরূপ অর্থাৎ অভাব বোধ আকাঙ্ক্ষার অপরিসমাপ্তি—লালসার অচরিতার্থতা—বিরহের উৎপত্তি। এই অবস্থায় প্রিয়তমের বাহ্য ও আন্তর শরীর ও মন উভয় বস্তু অবলম্বনে বিরহস্রোত ছুটিয়াছে; অথবা প্রিয়তমের রূপ ও প্রিয়তমের ভালবাসা এই দুয়েরই স্মৃতি এ অবস্থায় শ্রীরাধার মনে জাগরুক আছে।

ক্রমশঃ এই অবস্থার পরিবর্ত্তন দর্শিত হইয়াছে। এখন বিলাপের পরিবর্ত্তে চিন্তা আসিয়া শ্রীরাধার হৃদয় অধিকার করিয়াছে এবং নিজের অস্তিত্বের অসারতা হৃদয়ে সম্যক জাগরুক হইয়া উঠিয়াছে।

ওহে পরাণ গিরিধর।
কেমনে দেখিব তোমার মুখ সুধাকর।
ওহে রস-শেখর রায়।
কেমনে পাইব তোমা কহ সে উপায়॥
ওহে নব জলধর শ্যাম।
আর কি দেখিব তোমার ত্রিভঙ্গিম ঠাম॥
আর কি আমারে তুমি দিবে দরশন।
আর কি দেখিব তোমার ও রাঙ্গাচরণ॥
আর কি মালতীমালা গাঁথি দিব গলে।
আর কি অধরে দিব কর্পূর তাম্বুলে॥
মরিব মরিব বধু নিশ্চয় মরিব।
তোমার বিচ্ছেদ আর সহিতে নারিব॥
ছটফট করিয়া বাহির হয় প্রাণ।
এ রাধাবল্লভ দাস ভেল সমাধান॥

ইহাও ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা মনের আকাঙ্ক্ষা; কিন্তু এই ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষা নীচ ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষা নহে—ইহা প্রিয় বিরহ বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়াকাঙ্ক্ষা—ইহা ভক্তের ভগবৎ প্রাপ্তি বা ভগবদ্দর্শনের জন্য আকুল ক্রন্দন। যখন ইন্দ্রিয়গণ ভগবদুদ্দেশে প্রেরিত হয় তখন ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষার মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা আসে। "মনুষ্যের মনের এবং ইন্দ্রিয়ের ভিতর এই অপূর্ব্ব যোগ আছে বলিয়া মনুষ্যের মন যখন ভগবানে ভোর হয় তাহার ইন্দ্রিয়ও তখন ভগবানকে লইয়া থাকে, তাহার ইন্দ্রিয় তখন ভগবান ছাড়া আর কিছুতেই সারবত্তা দেখে না এবং আর কিছুই লইয়া আনন্দিত বা পরিতৃপ্ত হয় না।

তখন মনও ভগবান্‌ময় হয়, ইন্দ্রিয়ও ভগবানময় হয়। তখন জড় ও চৈতন্যের প্রভেদ থাকে না। তখন কি জড়, কি চৈতন্য, কি ইন্দ্রিয়, কি মন সকলই প্রেমভক্তিতে গলিয়া একাকার হইয়া শ্রীভগবানের পাদপদ্মে লুটাইতে থাকে। তখন জড়ও থাকে না চৈতন্যও থাকে না, ইন্দ্রিয়ও থাকে না, মনও থাকে না। তখন শুদ্ধ ভক্তি; ভক্তি ভক্তিই থাকে।" (১)

কবি দেখাইতেছেন শ্রীরাধার হৃদয়ে এখন ক্রমশঃ সেই অপূর্ব্ব ভাবের সৃষ্টি হইতেছে। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিভিন্ন আর কোনও কামনা হৃদয়ে স্থান পাইতেছে না; শ্রীকৃষ্ণ দর্শন ভিন্ন আর কোনও আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে জাগিতেছে না; কেবল প্রিয়তমের সঙ্গমের জন্য দারুণ পিপাসা কখনও নৈরাশ্য, কখনও আশায় জড়িত হইয়া হৃদয় উন্মথিত করিতেছে!

সখি কহবি কানুর পায়—
সে সুখসাগর দৈবে শুকায়ল
তিয়াসে পরাণ যায়॥
সখি ধরবি কানুর কর
আপনা বলিযা বোল না তেজবি
মাগিয়া লইবি বর॥
সখি যতেক মনের সাধ।
শয়নে স্বপনে করিনু ভাবনে
বিহি সে করাল বাদ॥
সখি হাম সে অবলা তায়।
বিরহ আগুণ হৃদয়ে দ্বিগুণ
সহন নাহিক যায়॥
সখি বুঝিয়া কানুর মন।
যেমন করিলে আইসে করিবে
দ্বিজ চণ্ডীদাস ভণ।

ক্রমশঃ।

(১) ত্রিধারা-ইন্দ্রিয়ের আকাঙ্ক্ষা।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ।

শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব।

ঠাকুরকে যাঁহারা দুচারবার মাত্র দেখিয়াছেন অথবা যাঁহারা তাঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন নাই, উপর উপর দেখিয়াছেন মাত্র, তাঁহারা ঠাকুরের গুরুভাবে ভক্তদিগের সহিত লীলার কথা কাহারও মুখে শুনিতে পাইলে একেবারে অবাক হইয়া থাকেন। ভাবেন লোকটা 'ডাহা মিথ্যা কথা গুলো বল্‌ছে'। আবার যখন দেখেন অনেকে ঐ ভাবের কথা বলিতেছে তখনও মনে করেন, 'এরা সব একটা মতলব করে দল পাকিয়েচে, আর শ্রীরামকৃষ্ণকে ঠাকুর করে তুল্‌চে; তিন শ তেত্রিশ কোটির উপর আবার একটা বাড়াতে চলেছে! কেনরে বাপু, অতগুলো ঠাকুরেও কি তোদের শানে না? যাকে ইচ্ছা, যত গুলো ইচ্ছা ওরি ভিতর থেকে নেনা—আবার একটা বাড়ান কেন? কি আশ্চর্য্য, এরা একবার ভাবেও না গা যে মিথ্যা কথাগুলো ধরা পড়লে অমন পবিত্র লোকটার উপরে লোকের ভক্তি একেবারে চটে যাবে? আমরাও তো তাঁকে দেখেছি?—সকলের কাছে নিচু, নম্রভাব—একেবারে যেন মাটি, যেন সকলের চাইতে ছোট—এতটুকু অহঙ্কার নাই! তার পর একথা তো তোরাও বলিস্, আর আমরাও দেখেছি যে, 'গুরু' কি 'বাবা' কি 'কর্ত্তা' বলে তাঁকে কেউ ডাক্‌লে তিনি একেবারে সহিতেই পারতেন না, বলে উঠতেন—'ঈশ্বরই একমাত্র গুরু, পিতা ও কর্ত্তা—আমি হীনের হীন, দাসের দাস, তোমার গায়ের একগাছি ছোট রোমের সমান—একগাছি বড়র সমানও নই!' - বলেই হয়ত আবার তার পায়ের ধূলো তুলে নিজের মাথায় দিতেন! এমন দীন ভাব কোথাও কেউ কি দেখেছে? আর সেই লোককে কিনা এরা গুরু, ঠাকুর, যা নয় তাই বল্‌চে, যা নয় তাই কর্‌চে!'

এইরূপ অনেক বাদানুবাদ চলা অসম্ভব নয় বলিয়াই আমরা ঠাকুরের গুরুভাব সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি শুনিয়াছি তাহার কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ বাস্তবিকই ঠাকুর যখন সাধারণ ভাবে থাকিতেন তখন আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে ঠিক-ঠিক নারায়ণ বুদ্ধি স্থির রাখিয়া মানুষের তো কথাই নাই, সকল প্রাণীরই 'দাস আমি' এই ভাব লইয়া থাকিতেন

বাস্তবিকই তখন তিনি আপনাকে হীনের হীন দীনের দীন জ্ঞানে সকলের পদধূলী গ্রহণ করিতেন এবং বাস্তবিকই সে সময় তিনি 'গুরু, কর্ত্তা বা পিতা' বলিয়া সম্বোধিত হইলে সহিতে পারিতেন না। কিন্তু সাধারণ ভাবে অবস্থানের সময় ঐরূপ করিলেও ঠাকুরের গুরুভাবে অপূর্ব্ব লীলার কথা কেমন করিয়া অস্বীকার করি? সে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব-দিব্য-ভাবাবেশে যখন তিনি যন্ত্রস্বরূপ হইয়া কাহাকেও স্পর্শ মাত্রেই সমাধি, গভীর ধ্যান বা ভগবদানন্দের অভূতপূর্ব্ব নেশার ঝোঁকে * নিমগ্ন করিতেন, অথবা কি এক আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাহার মনের তমোগুণ বা মলিনতা এতটা টানিয়া লইতেন যে, সে তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বে যেরূপ কখনও অনুভব করে নাই, এপ্রকার একটা মনের একাগ্রতা, পবিত্রতা ও আনন্দ লাভ করিত এবং আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া ঠাকুরের চরণতলে চিরকালের নিমিত্ত আত্মবিক্রয় করিত—তখন তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত এ ঠাকুর পূর্ব্বের সেই দীনের দীন ঠাকুর নহেন; ইঁহাতে কি একটা ঐশ্বরিক শক্তি বা ভাব প্রবিষ্ট হইয়া আত্মহারা করিয়া ইঁহাকে ঐরূপ করাইতেছে; ইনি বাস্তবিকই অজ্ঞান তিমিরান্ধ, ত্রিতাপে তাপিত, ভবরোগগ্রস্ত অসহায় মানবের গুরু, ত্রাতা এবং শ্রীভগবানের পরম পদের দর্শয়িতা! ভক্তেরা ঠাকুরের ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই গুরু, কৃপাময়, ভগবান্ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আপাততঃ বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও যথার্থ দীনভাব এবং এই দিব্য ঐশ্বরিক গুরুভাব যে একত্রে একজনে অবস্থান করিতে পারে তাহা আমরা বর্ত্তমান যুগে শ্রীভগবান্ রামকৃষ্ণে যথার্থই দেখিয়াছি; এবং দেখিয়াছি বলিয়াই উহারা কেমনে একত্রে একই মনে থাকে সে বিষয়ে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই এখন পাঠককে উপহার দিতে চেষ্টা করিতেছি। ঐরূপ চেষ্টা করিলেও যতটুকু বুঝিয়াছি ততটুকুও ঠিক ঠিক বুঝাইতে পারিব কি না জানি না;—আর সম্যক্ বুঝা বা বুঝান, লেখক ও পাঠকের উভয়েরই সাধ্যাতীত! কারণ ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুরের ভাবের ইয়ত্তা নাই! ঠাকুর বলিতেন,

---

* বাস্তবিকই তখন অধিক পরিমাণে সিদ্ধি খাইলে যেমন নেশা হয় তেমনি একটা নেশার ঘোর উপস্থিত হইত। কাহারও কাহারও পাও টলিতে দেখিয়াছি। ঠাকুরের নিজের তো কথাই ছিল না। ঐরূপ নেশার ঝোঁকে এমন পা টলিত যে আমাদের কাহাকেও ধরিয়া তখন চলিতে হইত। লোকে মনে করিত বিপরীত নেশা করিয়াছেন।

শ্রীভগবানের ইতি নাই, আমাদের প্রত্যক্ষ, এ লোকোত্তর পুরুষেরও তদ্রূপ ভাবের ইতি নাই!

সচরাচর লোকে ঠাকুর ভাবমুখে থাকিতেন শুনিলেই ভাবে যে, তিনি জ্ঞানী ছিলেন না। ভগবদনুরাগ ও বিরহে মনে যে সুখ দুঃখাদি ভাব আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাই লইয়া সদা সর্ব্বক্ষণ থাকিতেন। কিন্তু ভাবমুখে থাকাটি যে কি ব্যাপার বা কিরূপ অবস্থায় উহা সম্ভব তাহা যদি আমরা বুঝিতে পারি তবেই বর্ত্তমান বিষয়টি বুঝিতে পারিব—সেজন্য ভাবমুখে থাকা অবস্থাটির সংক্ষেপ আলোচনা এখানে একবার আর এক প্রকারে করিয়া লওয়া যাক্। পাঠক মনে মনে ভাবিয়া লউন—তিন দিনের সাধনে ঠাকুরের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইল।

প্র—নির্ব্বিকল্প সমাধিটি কি?

উ—মনকে একেবারে সংকল্পবিকল্পরহিত অবস্থায় আনয়ন করা।

প্র—সঙ্কল্প বিকল্প কাহাকে বলে?

উ—বাহ্য জগতের রূপরসাদি বিষয় সকলের জ্ঞান বা অনুভব, সুখ দুঃখাদি ভাব, কল্পনা বিচার অনুমান প্রভৃতি মানসিক চেষ্টা এবং ইচ্ছা বা 'এটা করিব' 'ওটা বুঝিব' 'এটা ভোগ করিব' 'ওটা ত্যাগ করিব' ইত্যাদি মনের সমস্ত বৃত্তিকে।

প্র—বৃত্তিসকল কোন্ জিনীসটা থাকিলে তবে উঠিতে পারে?

উ—'আমি' 'আমি' এই জ্ঞান বা বোধ। 'আমি' বোধ যদি চলিয়া যায় বা কিছুক্ষণের জন্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায় তবে সে সময়ের মত কোন বৃত্তিই আর মনে খেলা বা রাজত্ব করিতে পারে না।

প্র—মূর্চ্ছা বা গভীর নিদ্রাকালেও তো 'আমি' বোধ থাকে না—তবে কি নির্ব্বিকল্প সমাধিটা ঐরূপ একটা কিছু?

উ—না; মূর্চ্ছা বা সুষুপ্তিতে 'আমি' বোধ ভিতরে ভিতরে থাকে, তবে মস্তিষ্করূপ (brain) যে যন্ত্রটার সহায়ে মন 'আমি' 'আমি' করে সেটা কিছুক্ষণের জন্য জড়ভাবাপন্ন হয় বা চুপ করিয়া থাকে, এইমাত্র; ভিতরে বৃত্তিসমূহ গজ্ গজ্ করিতে থাকে—ঠাকুর যেমন দৃষ্টান্ত দিতেন, 'পায়রাগুলো মটর খেয়ে গলা ফুলিয়ে বসে আছে বা বক্ বকম্ করে আওয়াজ কর্‌চে—তুমি মনে কর্‌চ তাদের গলার ভিতরে কিছুই নাই—কিন্তু যদি গলায় হাত দিয়ে দেখ তো দেখ্‌বে মটর গজ্ গজ্ কর্‌চে!'

প্র—মূর্চ্ছা বা সুষুপ্তিতে যে 'আমি' বোধটা ঐরূপে থাকে তা বুঝ্‌ব কি করে?

উ—ফল দেখে; যথা ঐ সকল সময়েও হৃদয়ের স্পন্দন, হাতের নাড়ি, রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি বন্ধ হয় না—ঐ সকল শারীরিক ক্রিয়াও 'আমি' বোধ-টাকে আশ্রয় করে হয়; দ্বিতীয় কথা মূর্চ্ছা ও সুষুপ্তির বাহ্যিক লক্ষণ কতকটা সমাধির মত হইলেও ঐ সকল অবস্থা হতে মানুষ যখন আবার সাধারণ বা জাগ্রৎ অবস্থায় আসে তখন তাহার মনে জ্ঞান ও আনন্দের মাত্রা পূর্ব্বের ন্যায়ই থাকে, কিছুমাত্র বাড়ে বা কমে না;—কামুকের যেমন কাম তেমনি থাকে, ক্রোধীর যেমন ক্রোধ তেমনি থাকে, লোভীর লোভ সমান থাকে ইত্যাদি—নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থা লাভ হইলে কিন্তু ঐ সকল বৃত্তি আর মাথা তুলিতে পারে না; অপূর্ব্ব জ্ঞান ও অসীম আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং জগৎকারণ ভগবানের সাক্ষাৎদর্শনে মনে আর পরকাল আছে কি না, ভগবান্ আছেন কি না এসকল সংশয় সন্দেহ উঠে না।

প্র—আচ্ছা বুঝিলাম—ঠাকুরের নির্ব্বিকল্প সমাধিতে কিছুক্ষণের জন্য আমি বোধের একেবারে লয় হইল—তার পর?

উ—তার পর, ঐরূপে 'আমি' বোধটার লোপ হইয়া কারণরূপিণী শ্রীশ্রীজগন্মাতার কিছুক্ষণের জন্য সাক্ষাৎ দর্শনে ঠাকুর তৃপ্ত না হইয়া সদা সর্ব্বক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

প্র—সে চেষ্টার ফলে ঠাকুরের মনের কিরূপ অবস্থা হইল এবং কিরূপ লক্ষণই বা শরীরে প্রকাশিত হইল?

উ—কখন 'আমি' বোধের লোপ হইয়া শরীরে মৃতব্যক্তির লক্ষণ সকল প্রকাশিত হইয়া, ভিতরে জগদম্বার পূর্ণ বাধামাত্রশূন্য সাক্ষাৎ দর্শন—আবার কখন অত্যল্প মাত্র 'আমি' বোধ উদিত হইয়া শরীরে জীবিতের লক্ষণ একটু আধটু প্রকাশ পাওয়া ও সত্ত্বগুণের অতিশয় আধিক্যে শুদ্ধ স্বচ্ছ পবিত্র মন-রূপ ব্যবধান বা পর্দ্দার ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার কিঞ্চিৎ বাধাযুক্ত দর্শন!—এইরূপে কখন 'আমি' বোধের লোপ, মনের বৃত্তিসকলের একেবারে লয় ও শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূর্ণদর্শন—ও কখন 'আমি' বোধের একটু উদয়, মনের বৃত্তি সকলের ঈষৎ প্রকাশ ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণ দর্শন ঈষৎ আবরিত হওয়া। এইরূপ বারবার হইতে লাগিল।

প্র—কতদিন ধরিয়া ঠাকুর ঐরূপ চেষ্টা করেন?

উ—নিরন্তর ছয়মাস কাল ধরিয়া।

প্র—বল কি? তবে তাঁহার শরীর রহিল কিরূপে, কারণ ছয়মাস না খাইলে তো আর মানবদেহ থাকিতে পারে না এবং তোমরা তো বল শরীরের যতটা হুঁস আসিলে আহারাদি কাজ করা চলে, ঠাকুরের ঐকালে মাঝে মাঝে 'আমি' বোধের উদয় হইলেও ততটা হুঁস কখনই আসে নাই?

উ—সত্যই ঠাকুরের শরীর থাকিত না এবং 'শরীরটা কিছুকাল থাকুক' এরূপ ইচ্ছার লেশমাত্রও তখন ঠাকুরের মনে ছিল না, তবে ছিল যে সে কেবল জগদম্বা ঠাকুরের শরীরটার সহায়ে তাঁহার অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ দেখাইয়া বহুজনকল্যাণ সাধিত করিবেন বলিয়া।

প্র—তা তো বটে—কিন্তু ঐ ছয়মাসকাল জগদম্বা নিজে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া আসিয়া কি ঠাকুরকে জোর করিয়া আহার করাইয়া দিতেন?

উ—কতকটা সেইরূপই বটে; কারণ, ঐ সময়ে একজন সাধু কোথা হইতে আপনা আপনি আসিয়া জোটেন, ঠাকুরের ঐরূপ মৃতকল্প অবস্থা যে যোগ সাধনার বা শ্রীভগবানের সহিত একত্বানুভবের ফলে তাহা সম্যক্ বুঝেন এবং ঐ ছয়মাস কাল দক্ষিণেশ্বর কালীবাটিতে থাকিয়া ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে আঘাত পর্য্যন্ত করিয়া একটু আধটু হুঁস আনিতে নিত্য চেষ্টা করিতেন; আর একটু হুঁস দেখিলেই দুই এক গ্রাস যাহা পারিতেন তাহাই খাওয়াইয়া দিতেন! একেবারে অপরিচিত জড়প্রায় মৃতকল্প একটি লোককে ঐরূপে বাঁচাইয়া রাখিতে সাধুটির এত আগ্রহ এতটা মাথাব্যথা কেন হইয়াছিল জানি না—তবে ঐরূপ ঘটনাবলীকে আমরা ভগবদিচ্ছায় সাধিত বলিয়া থাকি। অতএব শ্রীশ্রীজগদম্বার সাক্ষাৎ ইচ্ছা ও শক্তিতেই যে ঐ অসম্ভব সম্ভব হইয়া ঠাকুরের শরীরটা রক্ষা পাইয়াছিল ইহা ছাড়া আর কি বলিব?

প্র আচ্ছা বুঝিলাম, তার পর?

উ—তার পর, শ্রীশ্রীজগদম্বা বা শ্রীভগবান্ বা যে বিরাট চৈতন্য ও বিরাট শক্তি জগৎরূপে প্রকাশিত আছেন এবং জড় চেতন সকলের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আপাতঃ বিভিন্ন নামরূপে অবস্থান করিতেছেন তিনি ঠাকুরকে আদেশ করিলেন—'ভাবমুখে থাক'!

প্র—সেটা আবার কি?

উ—বলিতেছি, কিন্তু ঠাকুরের ঐ সময়কার কথা বুঝিতে হইলে কল্পনা-সহায়ে যতদূর সম্ভব ঠাকুরের ঐ সময়ের অবস্থাটা একবার ভাবিয়া লওয়া আবশ্যক। পূর্ব্বে বলিয়াছি ঠাকুরের তখন কখন আমিজ্ঞানের লোপ এবং কখন উহার ঈষৎ প্রকাশ হইতেছিল। যখন 'আমি' বোধটার ঐরূপ ঈষৎ প্রকাশ হইতেছিল তখনও ঠাকুরের নিকট জগৎটা আমরা যেমন দেখি তেমন দেখাইতেছিল না। দেখাইতেছিল, যেন একটা বিরাট মনে নানা ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে, ভাসিতেছে, ক্রীড়া করিতেছে, আবার লয় হইতেছে! অপর সকলের তো কথাই নাই, ঠাকুরের নিজের শরীরটা মনটা ও আমিত্ব বোধটাও ঐ বিরাট মনের ভিতরের একটা তরঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছিল! পাশ্চাত্য জড়বাদী পণ্ডিত মূর্খের দল যে জগচ্চৈতন্য ও শক্তিকে নিজের বুদ্ধি ও বুদ্ধিপ্রসূত যন্ত্রাদি সহায়ে মাপিতে যাইয়া বলিয়া বসে 'ওটা এক হলেও জড়', ঠাকুর এই অবস্থায় পৌঁছাইয়া তাহারই সাক্ষাৎ স্বরূপ দর্শন বা অনুভব করিলেন—জীবন্ত, জাগ্রত, একমেবাদ্বিতীয়ং, ইচ্ছা ও ক্রিয়া মাত্রেরই প্রসূতি, অনন্ত কৃপাময়ী জগজ্জননী! আর দেখিলেন সেই একমেবাদ্বিতীয়ং নির্গুণ ও সগুণ ভাবে আপনাতে আপনি বিভক্ত থাকায়—ইহাকেই শাস্ত্রে স্বগতভেদ বলিয়াছে—তাঁহাতে একটা আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত-ব্যাপী বিরাট আমিত্ব বিকশিত রহিয়াছে! শুধু তাহাই নহে, সেই বিরাট 'আমিটা থাকাতেই বিরাট মনে অনন্ত ভাব-তরঙ্গ উঠিতেছে; আর সেই ভাবতরঙ্গই স্বল্পাধিক পরিমাণে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখিতে পাইয়া মানবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'আমি' গুলো উহাকেই বাহিরের জগৎ ও বহির্জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া ধরিতেছে ও বলা কহা ইত্যাদি করিতেছে! ঠাকুর দেখিলেন বড় 'আমিটা'র শক্তিতেই মানবের ছোট 'আমি' গুলো রহিয়াছে ও স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে এবং বড় 'আমিটা'কে দেখিতে ধরিতে পাইতেছে না বলিয়াই ছোট 'আমি' গুলো ভ্রমে পড়িয়া আপনাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিমান মনে করিতেছে। এই দৃষ্টিহীনতাকেই শাস্ত্র অবিদ্যা ও অজ্ঞান বলেন।

নির্গুণ ও সগুণের মধ্যস্থলে এইরূপে যে বিরাট 'আমিত্ব'টা বর্ত্তমান, উহাই 'ভাবমুখ'—কারণ উহা থাকাতেই বিরাট মনে অনন্ত ভাবের স্ফুরণ হইতেছে! এই বিরাট আমিই জগজ্জননীর আমিত্ব বা ঈশ্বরের আমিত্ব! আবার এই বিরাট আমিত্বের স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবা-

চার্য্যগণ বলিয়াছেন অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বরূপ জ্যোতিঘনমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। ঠাকুরের আমিত্ব জ্ঞানের যখন একেবারে লোপ হইতেছিল তখন এই বিরাট আমিত্বের গণ্ডির পারে অবস্থিত, জগদম্বার নির্গুণভাবে অবস্থান করিতে-ছিলেন—তখন ঐ 'বিরাট আমি'ও তাহার অনন্তভাবতরঙ্গ যাহাকে আমরা জগৎ বলিতেছি তাহার কিছুরই অস্তিত্ব অনুভব হইতেছিল না—আর যখন ঠাকুরের 'আমি' জ্ঞানের ঈষৎ উন্মেষ হইতেছিল তখন তিনি দেখিতেছিলেন শ্রীশ্রীজগ-দম্বার নির্গুণভাবের সহিত সংযুক্ত এই সগুণ বিরাট 'আমি' ও তদন্তর্গত ভাব-তরঙ্গ সমূহ। অথবা নির্গুণভাবে উঠিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের অনুভবে ঐ একমেবাদ্বিতীয়মের ভিতর স্বগত ভেদের অস্তিত্বও লোপ হইতেছিল, আর ঐ সগুণ বিরাট আমিত্বের যখন বোধ করিতেছিলেন তখন দেখিতেছিলেন যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, যে নির্গুণ সেই সগুণ, যে পুরুষ সেই প্রকৃতি, যে সাপ স্থির ছিল সেই এখন চলিতেছে—অথবা যিনিই স্বরূপে নির্গুণ তিনিই আবার লীলায় সগুণ! শ্রীশ্রীজগদম্বার এই নির্গুণ-সগুণ উভয়ভাবে জড়িত স্বরূপের পূর্ণ দর্শন পাইবার পর ঠাকুর আদেশ পাইলেন 'ভাবমুখে থাক'—অর্থাৎ আমিত্বের একেবারে লোপ করিয়া নির্গুণভাবে অবস্থান করিও না; কিন্তু যাহা হইতে যতপ্রকার বিশ্বভাবের উৎপত্তি হইতেছে সেই বিরাট 'আমি'ই তুমি, তাঁহার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা, তাহার কার্য্যই তোমার কার্য্য এই ভাবটি ঠিক ঠিক সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া জীবন যাপন কর ও লোক-কল্যাণ সাধন কর! অতএব 'ভাবমুখে' থাকার অর্থই হইতেছে—মনে সর্ব্বতোভাবে, সকল সময়ে সকল অবস্থায়, দেখা ধারণা বা বোধ করা যে, আমি সেই 'বড় আমি' বা 'পাকা আমি'। 'ভাবমুখ' অবস্থায় পৌঁছিলে আমি অমুকের সন্তান, অমুকের পিতা, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র ইত্যাদি সমস্ত কথা একেবারে মন হইতে ধুইয়া পুঁছিয়া যায় এবং 'আমি সেই বিশ্বব্যাপী আমি,' এই কথাটি সর্ব্বদা মনে অনুভব হয়। ঠাকুর তাই আমাদের বার বার শিক্ষা দিতেন—'ও গো অমুকের ছেলে আমি, অমুকের বাপ্ আমি, ব্রাহ্মণ আমি, শূদ্র আমি, পণ্ডিত আমি, ধনী আমি—এ সব হচ্চে কাঁচা আমি; ওতে বন্ধন নিয়ে আসে। ও সব ছেড়ে মনে কর্‌বে তাঁর (ভগবানের) দাস আমি, তাঁর ভক্ত আমি, তাঁর সন্তান আমি, তাঁর অংশ আমি। এই ভাবটি মনে পাকা করে রাখ্‌বে।' অথবা বলিতেন—'ওরে অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তা কর!'

পাঠক হয়ত বলিবে, ঠাকুর কি তবে ঠিক ঠিক অদ্বৈতবাদী ছিলেন না?

শ্রীশ্রীজগদম্বার মধ্যে স্বগত ভেদ স্বীকার করিয়া ঠাকুর যখন জগন্মাতার নির্গুণ সগুণ দুই ভাবে অবস্থান দেখিতেন তখন ত বলিতে হইবে তিনি আচার্য্য শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদ, যাহাতে জগতের অস্তিত্বই স্বীকৃত হয় নাই, তাহা ত মানিতেন না? তাহা নহে। ঠাকুর অদ্বৈত বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত সকলভাব বা মতই মানিতেন। তবে বলিতেন ঐ তিন প্রকার মতই মানবমনের উন্নতির অবস্থানুযায়ী পর পর আসিয়া উপস্থিত হয়। এক অবস্থায় দ্বৈতভাব আসে, তখন অপর দুই ভাবই মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। ধর্ম্মোন্নতির উচ্চতর সোপানে উঠিয়া অপর অবস্থায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আসে—তখন নিত্য নির্গুণ বস্তুই আবার লীলায় সগুণ হইয়াছেন, এইরূপ বোধ হয়। তখন দ্বৈতবাদ তো মিথ্যা বোধ হয়ই আবার অদ্বৈতবাদে যে সত্য নিহিত আছে তাহারও মনে উপলব্ধি হয় না। আর মানব যখন ধর্ম্মোন্নতির শেষ সীমায় সাধন-সহায়ে উপস্থিত হয় তখন শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণরূপেরই কেবল মাত্র উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে অদ্বৈতভাবে অবস্থান করে। তখন আমি তুমি, জীব জগৎ, ভক্তি মুক্তি, পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম—সব একাকার! এই প্রসঙ্গে ঠাকুর দাস্যভাবের উজ্জ্বল নিদর্শন মহাজ্ঞানী হনুমানের ঐ বিষয়ের উপলব্ধিটি দৃষ্ঠান্ত স্বরূপে বলিতেন। বলিতেন শ্রীরামচন্দ্র কোন সময়ে নিজ দাস হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেন 'তুমি আমায় কি ভাবে দেখ, বা পূজা কর?' হনুমান তদুত্তরে বলেন—হে রাম, যখন আমি দেহ বুদ্ধিতে থাকি অথবা আমি এই দেহটা এইরূপ অনুভব করি, তখন দেখি তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি সেব্য আমি সেবক—তুমি পূজ্য আমি পূজক; যখন আমি মন বুদ্ধি ও আত্মা বিশিষ্ট জীবাত্মা বলিয়া আপনাকে বোধ করিতে থাকি তখন দেখি তুমি পূর্ণ আমি অংশ; আর যখন আমি উপাধি মাত্র রহিত শুদ্ধ আত্মা, সমাধিতে এই ভাব লইয়া থাকি তখন দেখি তুমিও যাহা আমিও তাহা—তুমি আমি এক, কোনই ভেদ নাই!

ঠাকুর বলিতেন "যে ঠিক ঠিক অদ্বৈতবাদী সে চুপ হইয়া যায়। অদ্বৈতবাদ বলিবার বিষয় নয়। বলিতে কহিতে গেলেই দুটো এসে পড়ে, ভাবনা কল্পনা যতক্ষণ ততক্ষণও ভিতরে দুটো, ততক্ষণও ঠিক অদ্বৈত জ্ঞান হয় নাই! জগতে একমাত্র ব্রহ্মবস্তু বা শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণভাবই কখনই উচ্ছিষ্ট হয় নাই"—অর্থাৎ মানবের মুখ দিয়া বাহির হয় নাই, অথবা মানব, ভাষা দ্বারা উহা প্রকাশ করিতে পারে নাই। কারণ ঐ ভাব মানবের মন বুদ্ধির অতীত; বাক্যে তাহা কেমন করিয়া বলা বা বুঝান যাইবে? অদ্বৈতভাব

সম্বন্ধে ঠাকুর সেজন্য বার বার বলিতেন 'ওরে ওটা শেষ কালের কথা।' অতএব দেখা যাইতেছে ঠাকুর বলিতেন যতক্ষণ 'আমি তুমি' 'বলা কহা' রহিয়াছে ততক্ষণ নিগুর্ণ সগুণ, নিত্য ও লীলা দুই ভাবই কার্য্যে মানিতে হইবে। ততক্ষণ অদ্বৈতবাদ মুখে বলিলেও কার্য্যে ব্যবহারে তোমাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী থাকিতে হইবে। ঐ সম্বন্ধে ঠাকুর আরও কতই না দৃষ্টান্ত দিতেন! বলিতেন—

"যেমন গানের অনুলোম বিলোম সা ঋ গা মা পা ধা নি সা—করিয়া সুর তুলিয়া আবার সা নি ধা পা মা গা ঋ সা—করিয়া সুর নামান। সমাধিতে অদ্বৈত বোধটা অনুভব করিয়া আবার নীচে নামিয়া 'আমি' বোধটা লইয়া থাকা।"

"যেমন বেলটা হাতে লইয়া বিচার করা যে খোলা, বিচি, শাঁস—এর কোনটা বেল। প্রথম খোলাটাকে অসার বলিয়া ফেলিয়া দিলাম, বিচি গুলোকে ঐরূপ করিলাম; আর শাঁসটুকু আলাদা করিয়া বলিলাম এইটিই বেলের সার, এইটিই আসত বেল। তার পর আবার বিচার এল যে যারই শাঁস তারই খোলা ও বিচি—খোলা বিচি ও শাঁস সব একত্র করেই বেলটা; সেই রকম নিত্য ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে তারপর বিচার—যে নিত্য সেই লীলায় জগৎ!"

"যেমন থোড়খানার খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে মাঝটায় পৌঁছুলুম আর সেইটাকেই সার ভাবলুম। তারপর বিচার এল খোলেরই মাঝ, মাঝের খোল—দুই জড়িয়েই থোড়টা।"

"যেমন প্যাঁজটা, খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে আর কিছুই থাকে না সেই রকম 'কোনটা আমি' বিচার করে দেখতে গিয়ে শরীরটা নয়, মনটা নয়, বুদ্ধিটা নয়, করে ছাড়াতে ছাড়াতে গিয়ে দেখা যায় আমি বলে একটা আলাদা কিছুই নাই, সবই 'তিনি' 'তিনি' 'তিনি' (ঈশ্বর)"—"যেমন গঙ্গার খানিকটা জল বেড়া দিয়ে ঘিরে বলা এটা আমার গঙ্গা।"

যাক্, ও কথা ছাড়িয়া আমরা পূর্ব্ব কথার অনুসরণ করি।

ভাবমুখে থাকিয়া যখন বিশ্বব্যাপী আমিত্বের ঠিক ঠিক অনুভব হইত তখন এক হইতে বহুর বিকাশ দেখিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার নিগুর্ণভাব হইতে কয়েক পদ নীচে বিদ্যা মায়ার রাজ্যে বিচরণ করিতেন, এ কথা আর বলিতে হইবে না। কিন্তু সে রাজ্যেও একের বিকাশ ও অনুভব এত

অধিক যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে যে যাহা করিতেছে, ভাবিতেছে, বলিতেছে, সে সকলই আমি করিতেছি, ভাবিতেছি, বলিতেছি, বলিয়া ঠাকুরের ঠিক ঠিক মনে হইত! এই অবস্থার অল্প বা আভাস মাত্র অনুভবও অতি অদ্ভুত! ঠাকুর বলিয়াছিলেন, একদিন ঘাসের উপর দিয়া একজন চলিয়া যাইতেছে, আর তাঁহার বুকে বিষম আঘাত লাগিতেছে!—যেন তাঁহার বুকের উপর দিয়াই সে যাইতেছে! বাস্তবিকই তখন তাঁহার বুকে রক্ত জমিয়া কাল দাগ হইয়া তিনি বেদনায় ছটফট করিয়াছিলেন!

ঐ অবস্থা হইতে মায়ার রাজ্যের আরও নিম্নস্তরে নামিয়া যখন থাকিতেন তখন ঠাকুরের মনে শ্রীশ্রীজগদম্বার দাস আমি, ভক্ত আমি, সন্তান আমি বা অংশ আমি এই ভাবটি সর্ব্বদা জাগরুক থাকিত। উহা হইতেও নিম্নে অবিদ্যা মায়ার বা কাম ক্রোধ লোভ মোহাদির রাজত্ব। সে রাজ্য ঠাকুর যত্নপূর্ব্বক নিরন্তর অভ্যাস সহকারে ত্যাগ করায় তাঁহার মন তথায় আর কখনও নামিত না বা শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে নামিতে দিতেন না। ঠাকুর যেমন বলিতেন—'যে মার উপর একান্ত নির্ভর করেছে মা তার পা বেতালে পড়তে দেন না।

অতএব বুঝা যাইতেছে নির্বিকল্প সমাধি লাভের পর ঠাকুরের ভিতরের ছোট আমি বা কাঁচা আমিটার একেবারে লোপ হইয়াছিল! আর যে আমিত্বটুকু ছিল সেটি আপনাকে সর্ব্বদা 'বড় আমি' বা 'পাকা আমি'টার সঙ্গে চিরসংযুক্ত দেখিত—কখন আপনাকে দেখিত সেই বিশ্বব্যাপী আমিটার অঙ্গ বা অংশ, আবার কখন তাহার নিকট নিকটতর নিকটতম দেশে উঠিয়া সেই বিশ্বব্যাপী আমিতে লীন হইয়া যাইত। এই পথেই ঠাকুরের সকল মনের সকল ভাব আয়ত্তীভূত হইত। কারণ ঐ 'বড় আমি'কে আশ্রয় করিয়াই জগতে সকল মনে যত কিছু ভাব উঠিতেছে এবং সেজন্যই ঠাকুর সেই বিশ্বব্যাপী 'আমি'কে আশ্রয় করিয়া বিশ্ব মনে যত ভাব তরঙ্গ উঠিতেছে সকলি ধরিতে ও বুঝিতে সক্ষম হইতেন। তখন 'তাঁর অংশ আমি,' ঠাকুরের এ ভাবটিও ক্রমশঃ লীন হইয়া যাইত এবং 'বিশ্বব্যাপী আমি' বা শ্রীশ্রীজগন্মাতার আমিত্বই ঠাকুরের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ গুরুরূপে প্রতিভাত হইত! কাজেই ঠাকুরকে দেখিলে তখন আর দীনের দীন বলিয়া বোধ হইত না। তখন ঠাকুরের চাল চলন অপরের সহিত ব্যবহার প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াকলাপই অন্য আকার ধারণ করিত। তখন কল্পতরুর মত হইয়া তিনি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিতেন 'তুই কি চাস্'?—যেন ভক্ত যাহা চাহেন

তাহা তৎক্ষণাৎ অমানুষী শক্তি বলে পূরণ করিতে বসিয়াছেন! দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ বিশেষ ভক্তদিগকে কৃপা করিবার জন্য ঐরূপ ভাবাপন্ন হইতে ঠাকুরকে আমরা নিত্য দেখিয়াছি; আর দেখিযাছি, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে। সেদিন ঠাকুর ঐরূপ ভাবাপন্ন হইয়া তৎকালে উপস্থিত সকল ভক্তদিগকে স্পর্শ করিয়া তাহাদের ভিতর ধর্ম্মশক্তি সঞ্চারিত বা সুপ্ত ধর্ম্মভাবকে জাগ্রত করিয়া দেন! সে এক অপূর্ব্ব কথা - এখানে বলিলে মন্দ হইবে না!

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের পৌষ, ১লা জানুয়ারী। কিঞ্চিদধিক দুই সপ্তাহ হইল ভক্তেরা শ্রীযুত মহেন্দ্রলাল সরকার ডাক্তার মহাশয়ের পরামর্শানুসারে ঠাকুরকে কলিকাতার উত্তরে কাশীপুরে রাণী কাত্যায়নীর জামাতা, গোপাল বাবুর বাগান বাটীতে আনিয়া রাখিয়াছেন। ডাক্তার বলিযাছেন কলিকাতার বায়ু অপেক্ষা বাগান অঞ্চলের বায়ু নির্ম্মল, ও যতদূর সম্ভব নির্ম্মল বায়ুতে থাকিলে ঠাকুরের গলরোগের উপশম হইতে পারে—সেজন্য। বাগানে আসিবার কয়েক দিন পরেই ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত ঠাকুরকে দেখিতে আসেন এবং লাইকোপোডিয়ম (২০০) ঔষধ প্রয়োগ করেন। উহাতে গলরোগটার কিছু উপকারও বোধ হয়। ঠাকুর কিন্তু এখানে আসাবধি বাটীর দ্বিতল হইতে একদিন একবারও নীচের তলে নামেন নাই বা বাগানে বেড়াইয়া বেড়ান নাই। আজ শরীর অনেকটা ভাল থাকায় অপরাহ্নে বাগানে বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই ভক্তদিগের আজ বিশেষ আনন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের তখন তীব্র বৈরাগ্য—সাংসারিক সঙ্কল্প সমূহ ত্যাগ করিয়া ঠাকুরের নিকটে বাস করিতেছেন ও তাঁহার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য নানা প্রকার সাধন করিতেছেন। সমস্ত রাত্রি বৃক্ষতলে ধুনি বা অগ্নি জ্বালাইয়া ধ্যান, জপ, ভজন, পাঠ ইত্যাদিতেই থাকেন। অপর কয়েক জন ভক্তও যথা ছোট গোপাল, কালী (অভেদানন্দ) ইত্যাদি আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনয়ন প্রভৃতি করিয়া তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করেন এবং আপনারাও যথাসাধ্য ধ্যান ভজন করেন। গৃহী ভক্তেরা, বিষয় কর্ম্মাদি থাকায় সর্ব্বদা থাকিতে পারেন না; সুবিধা পাইলেই আসা যাওয়া করেন; যাঁহারা ঠাকুরের সেবায় নিরন্তর ব্যাপৃত, তাঁহাদের আহারাদি সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেন; ও কখন কখন এক আধ দিন

থাকিয়াও যান। আজ ইংরাজী বর্ষের প্রথম দিন বলিয়া ছুটি থাকায় অনেকেই উপস্থিত হইয়াছেন।

অপরাহ্ণ, বেলা ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর লালপেড়ে ধুতি, একটি পিরান, লালপাড় বসান একখানি মোটা চাদর, কাণঢাকা টুপি ও চটি জুতাটি পরিয়া উপর হইতে ধীরে ধীরে নীচে নামিলেন এবং নীচেকার হল ঘরটি দেখিয়া পশ্চিমের দরজা দিয়া বাগানের পথে বেড়াইতে চলিলেন। গৃহী ভক্তেরা প্রায় সকলেই তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। শ্রীযুৎ নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রমুখ বালক বা যুবক ভক্তেরা তখন সমস্ত রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত থাকায় হল ঘরের পাশে যে ছোট ঘরটি ছিল, তাহার ভিতর নিদ্রা যাইতেছেন। আর শ্রীযুৎ লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) ও অপর একজন, ঠাকুর উপরে যে ঘরটিতে থাকেন সেটি ঝাঁট পাট দিয়া পরিস্কার করিবার ও ঠাকুরের বিছানা প্রভৃতি রৌদ্রে দিবার ইহাই সুন্দর অবসর বুঝিয়া তৎকার্য্যে ব্যাপৃত।

ঠাকুর ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া উদ্যান মধ্যস্থ প্রশস্ত পথটি দিয়া বাগানের গেটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভক্তদিগের মধ্যে একজন অনেক দিন পরে ঠাকুরকে ঐরূপ সুস্থাবস্থায় বেড়াইতে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া কয়েকটি পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া ঠাকুরের পাদ পদ্মে দিয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের অমনি ভাবান্তর উপস্থিত হইল। মুখমণ্ডল জ্যোতিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অর্দ্ধবাহ্য দশায় হাস্যমুখে উপস্থিত সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তোমাদের আর কি বলিব, তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক্!"—বলিয়াই ঠাকুর ভাবাবস্থায় স্থির নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন! ভক্তেরা আনন্দে জয় রব করিয়া প্রণাম ও একে একে আসিয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিতে লাগিলেন। প্রথম ব্যক্তি পদস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান হইবামাত্র ঠাকুর ঐরূপ ভাবাবস্থায় তাহার বক্ষঃ স্পর্শ করিয়া নীচের দিক হইতে উপরদিকে হস্ত সঞ্চালিত করিয়া বলিলেন—"চৈতন্য হোক্"! দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র তাহাকেও ঐরূপ করিলেন! তৃতীয় ব্যক্তিকেও ঐরূপ! চতুর্থকেও ঐরূপ—এইরূপে সমাগত ভক্তদিগের সকলকে একে একে ঐরূপে স্পর্শ করিতে লাগিলেন! আর সে অদ্ভুত স্পর্শে প্রত্যেকের ভিতর অপূর্ব্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া কেহ হাসিতে, কেহ কাঁদিতে, কেহ ধ্যান করিতে, আবার কেহ বা নিজে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অহেতুক-দয়ানিধি

ঠাকুরের কৃপা লাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্য অপর সকলকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন! সে চীৎকার, ও জয় রবে ত্যাগী ভক্তেরা কেহ বা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কেহ বা হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, উদ্যান পথমধ্যে সকলে ঠাকুরকে ঘিরিয়া ঐরূপ পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিতে-ছেন! এবংদেখিয়াই বুঝিলেন, দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি কৃপায় ঠাকুরের দিব্য-ভাবাবেশে যে অদৃষ্ট পূর্ব্ব লীলার অভিনয় হইত তাহারই অদ্য এখানে সকলের প্রতি কৃপায়, সকলকে লইয়া প্রকাশ! ত্যাগী ভক্তেরা আসিতে আসিতেই ঠাকুরের সে অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া আবার সাধারণ সহজ ভাব উপস্থিত হইল। পরে গৃহী ভক্তদিগের অনেককে ঐ সময়ে কিরূপ অনুভব হইয়াছিল তদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, কাহারও সিদ্ধির নেশার মত একটা নেশা ও আনন্দ, কাহারও চক্ষু মুদ্রিত করিবামাত্র যে মূর্ত্তির নিত্য ধ্যান করিতেন অথচ দর্শন পাইতেন না, ভিতরে সেই মূর্ত্তির জাজ্বল্য দর্শন, কাহারও ভিতরে পূর্ব্বে অননুভূত একটা পদার্থ বা শক্তি যেন সড় সড় করিয়া উপরে উঠিতেছে এইরূপ বোধ ও আনন্দ, এবং কাহারও বা পূর্ব্বে যাহা কখনও দেখেন নাই এরূপ একটা জ্যোতির চক্ষুমুদ্রিত করি-লেই দর্শন ও আনন্দানুভব হইয়াছিল! দর্শনাদি প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন হইলেও একটা অসাধারণ দিব্য আনন্দে ভরপূর হইয়া যাইবার অনুভবটি সকলের সাধারণ প্রত্যক্ষ—এ কথাটি বেশ বুঝা গিয়াছিল! শুধু তাহাই নহে, ঠাকুরের ভিতরের অমানুষী শক্তি বিশেষই যে বাহ্যস্পর্শ দ্বারা সঞ্চারিত হইয়া প্রত্যেক ভক্তের ভিতর ঐরূপ অপূর্ব্ব মানসিক অনুভব ও পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল, একথাটিও সকলের সাধারণ প্রত্যক্ষ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়! উপস্থিত ভক্ত সকলের মধ্যে দুই জনকে কেবল ঠাকুর 'আজ নয় বা থাক' বলিয়া ঐরূপে স্পর্শ করেন নাই! এবং তাঁহারাই কেবল এ আনন্দের দিনে আপনা-দিগকে হতভাগ্য জ্ঞান করিয়া বিষণ্ণ হইয়াছিলেন।* ইহা দ্বারা এবিষয়টিও বুঝা গিয়াছিল যে কখন কাহার প্রতি কৃপায় ঠাকুরের ভিতর দিয়া ঐ দিব্য শক্তির প্রকাশ হইবে তাহারও কিছুই স্থিরতা নাই! সাধারণ অবস্থায় ঠাকুর নিজেও তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিতেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ!

* পরে একদিন ঠাকুর ইঁহাদেরও ঐরূপে স্পর্শ করিয়াছিলেন।

অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে কাঁচা বা ছোট আমিত্বটাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুর, 'বিশ্বব্যাপী আমি' বা শ্রীশ্রীজগদম্বার শক্তি প্রকাশের মহান্ যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন! এবং ঐ কাঁচা আমিটাকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যথার্থ 'দীনের দীন' অবস্থায় উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুরের ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার লোক-গুরু, জগৎ-গুরু ভাবটির এইরূপ অপূর্ব্ব বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল! এইরূপে আমিত্বের লোপেই গুরু-ভাব বা গুরু-শক্তির বিকাশ যে, সকল ধর্ম্মগত সকল অবতার পুরুষগণের জীবনে উপস্থিত হইযাছিল, জগতের ধর্ম্মইতিহাস এ বিষয়ে চিরকাল সাক্ষ্য দিতেছে।

গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি করিলে ধর্ম্মলাভ বা ঈশ্বর লাভ হয় না, এ কথা আমরা আবহমান কাল ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি।

'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ'

—ইত্যাদি স্তুতিকথা আমরা চিরকালই বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের সহিত মন্ত্রদীক্ষাদাতা গুরুর উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করিয়া আসিতেছি; অনেকে আবার বিদেশী শিক্ষার কুহকে পড়িয়া আপনাদের জাতীয় শিক্ষা ও ভাব বিসর্জ্জন দিয়া, মানববিশেষকে ঐরূপ বলা মহাপাপের ভিতর গণ্য করিয়া অনেক বাদানুবাদ করিতেও পশ্চাৎপদ হই নাই! কারণ কেই বা তখন বুঝে যে কোন কোন মানব শরীরকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইলেও গুরুভাবটি মানবীয় ভাব রাজ্যেরই অন্তর্গত নহে। কেই বা তখন জানে যে শরীর রক্ষার উপযোগী জল বায়ু আহার প্রভৃতি নিত্যাবশ্যকীয় বস্তু সমস্তের ন্যায় মায়াপাশে বদ্ধ ত্রিতাপে তাপিত মানবমনের সমস্ত জ্বালা নিবারণ ও শান্তি লাভের উপায় স্বরূপ হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতা স্বয়ংই ঐ ভাব ও শক্তিরূপে শুদ্ধ বুদ্ধ অহমিকাশূন্য মানবমনের ভিতর দিয়া পূর্ণরূপে প্রকাশিত আছেন? এবং কেই বা তখন ধারণা করে যে যাহার মন যতটা পরিমাণে অহঙ্কার ত্যাগ বা কাঁচা আমিটাকে ছাড়িতে পারে ততটা পরিমাণেই সে ঐ ভাব ও শক্তি প্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ হয়! সাধারণ মানবমনে ঐ দিব্য ভাবের যৎসামান্য 'ছিটে ফোঁটা' মাত্র প্রকাশ, তাই আমরা ততটা ধরিতে ছুঁইতে পারি না। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধ চৈতন্য শঙ্কর যীশু প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগাবতার সকলে এবং বর্ত্তমান যুগে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণে ঐ দিব্য শক্তির ঐরূপ অপূর্ব্ব লীলা যখন বহুভাগ্য ফলে কাহারও নয়নপথে পতিত হয় তখন

প্রাণে প্রাণে বুঝিয়া থাকি এ শক্তি প্রকাশ মানবের নহে, সাক্ষাৎ ঈশ্বরের! তখনই ভবরোগগ্রস্ত পথভ্রান্ত জিজ্ঞাসু মানবের মোহ মলিনতা দূরে অপসারিত হইয়া সে বলিয়া উঠে—'হে গুরু তুমি কখনই মানুষ নও, তুমিই তিনি!'

অতএব বুঝা যাইতেছে শ্রীশ্রীজগন্মাতা যে ভাবরূপে মানবমনের সকল প্রকার অজ্ঞান মলিনতা দূর করেন সেই উচ্চ ভাবেরই নাম গুরুভাব বা গুরুশক্তি। ঐ ভাবকেই শাস্ত্র গুরু নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও মানবকে উহার প্রতি মনের ষোল আনা শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাস অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু স্থূলবুদ্ধি, ভক্তিশ্রদ্ধাদি সবে মাত্র শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, এ প্রকার মানবমন তো আর একটা অশরীরী ভাবকে ধরিতে, ছুঁইতে, ভাল বাসিতে পারে না; এ জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছে দীক্ষাদাতা মানবকে গুরু বলিয়া ভক্তি করিতে। সেজন্য যাঁহারা বলেন, আমরা গুরুভাবটিকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিতে পারি, কিন্তু যে দেহটা আশ্রয় করিয়া ঐ ভাব আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় তাহাকে মান্য ভক্তি কেন করিব? ঐ ভাব তো আর তাহার নহে?—তাঁহাদিগকে আমরা বলি, 'ভাই করিতে পার কর, কিন্তু দেখিও যেন নিজের মনের জুয়াচুরিতে ঠকিতে না হয়; শক্তি বা ভাব এবং যদবলম্বনে ঐ ভাব প্রকাশিত থাকে তদুভয়কে কখনও তো পৃথক পৃথক থাকিতে দেখ নাই, তবে কেমন করিয়া আগুন ও আগুনের দাহিকা শক্তিকে পৃথক করিয়া একটিকে গ্রহণ ও ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে এবং অপরটিকে ত্যাগ করিবে, তাহা বলিতে পারি না!' যে যাহাকে ভালবাসে বা ভক্তি করে সে ভালবাসিতের ব্যবহৃত অতি সামান্য জিনীসটাকেও হৃদয়ে ধারণ করে। তাহার স্পর্শিত ফুলটা, কাপড়খানা, চোপড়খানাও সে পবিত্র বলিয়া বোধ করে। তিনি যে স্থান দিয়া চলিয়া যান সেখানকার মাটীটাও তার কাছে বহু মূল্যবান ও বহু আদরের জিনীস বলিয়া বোধ হয়। তবে তিনি যে শরীরটাতে অবস্থান করিয়া তাহার পূজা গ্রহণ করেন ও তাহাকে কৃপা করেন, সেটার প্রতি যে তাহার শ্রদ্ধা ভক্তি হইবে এটা কি আবার বুঝাইয়া বলিতে হইবে? যাহারা গুরুভাবটি কি তাহাই বুঝে না তাহারাই ঐরূপ কথা বলিয়া থাকে। আর যাহার গুরুভাবের প্রতি ঠিক ঠিক ভক্তি হইবে তাহার ঐ ভাবের আধার গুরুর শরীরটার উপরেও ভক্তি শ্রদ্ধার বিকাশ হইবেই হইবে। ঠাকুর এই বিষয়টী বিভীষণের ভক্তির দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেন।

শ্রীরামচন্দ্রের মানবলীলা সম্বরণের অনেক কাল পরে কোন সময়ে নৌকা ডুবি হইয়া একজন মানব লঙ্কার উপকূলে* সমুদ্রতরঙ্গের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়। বিভীষণ অমর, কাজেই তিন কালই তিনি লঙ্কায় রাজত্ব করিতেছেন—তাঁহার নিকট ঐ সংবাদ পৌঁছিল। সভাস্থ অনেক রাক্ষসের সুকোমল মানব-দেহরূপ খাদ্যের আগমন শুনিয়া জিহ্বায় জল আসিল। রাজা বিভীষণের কিন্তু ঐ সংসাদ শুনিয়া এক অপূর্ব্ব ভাবান্তর আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি গলদশ্রুলোচনে ভক্তি-গদ্‌গদ বাক্যে বার বার বলিতে লাগিলেন, 'অহো ভাগ্য!' রাক্ষসেরা তাঁহার ভাব না বুঝিতে পারিয়া সকলে একেবারে অবাক্! তৎপরে বিভীষণ তাহাদের বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন—'যে মানব শরীর, আমার রামচন্দ্র ধারণ করিয়া লঙ্কায় পদার্পণ করেন ও আমাকে কৃতার্থ করেন বহুকাল পরে আজ আবার সেই মানবশরীর দেখিতে পাইব —একি কম ভাগ্যের কথা! আমার মনে হইতেছে যেন সাক্ষাৎ রামচন্দ্রই পুনরায় ঐরূপে আসিয়াছেন!' এই বলিয়া রাজা পাত্র মিত্র সভাসদ সকলকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রোপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বহু সম্মান ও আদর করিয়া উক্ত মানবকে প্রাসাদে লইয়া যাইলেন। পরে তাহাকেই সিংহাসনে বসাইয়া নিজে সপরিবারে অনুগত দাস ভাবে তাহার সেবা ও বন্দনাদি করিতে লাগিলেন! এইরূপে কিছু কাল তাহাকে লঙ্কায় রাখিয়া নানা ধন রত্ন উপহার দিয়া সজল নয়নে বিদায় দিলেন ও অনুচরবর্গের দ্বারা বাটী পৌঁছাইয়া দিলেন!—গল্পটি বলিয়া ঠাকুর আবার বলিতেন —"ঠিক ঠিক ভক্তি হলে এইরূপ হয়। সামান্য জিনিষ হতেও তার ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয়ে ভাবে বিভোর হয। শুনিস্ নি—'এই মাটিতে খোল হয়' বলে চৈতন্যদেবের ভাব হয়েছিল? এক সময়ে এই দেশের এক জায়গা দিয়ে যেতে যেতে তিনি শুন্‌লেন যে সেই গ্রামে হরিসংকীর্ত্তনের সময় যে খোল বাজে, লোকে সেই খোল তৈয়ের করে বিক্রি করে দিনপাত করে। শুনেই তিনি বলে উঠ্‌লেন—'এই মাটিতে খোল হয়'—বলেই ভাবে বাহ্য জ্ঞানশূন্য হলেন! কেন না—উদ্দীপনা হলো; এই মাটিতে খোল হয়, সেই খোল বাজিয়ে হরি নাম হয়, সেই হরি সকলের প্রাণের প্রাণ—সুন্দরের চাইতেও সুন্দর!—একেবারে এত কথা মনে হয়ে হরিতে চিত্ত স্থির হয়ে গেল! সেই রকম যার গুরুভক্তি হয় তার গুরুর আত্মীয় কুটুম্বদের দেখ্‌লে তো গুরুর উদ্দীপন হবেই—যে গ্রামে গুরুর বাড়ি সে গ্রামের লোকদের

দেখ্‌লেও ঐরূপ উদ্দীপনা হয়ে তাদের প্রণাম করে, পায়ের ধূলো নেয়, খাওয়ায় দাওয়ায় ও সেবা করে! এই অবস্থা হলে গুরুর দোষ আর দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। তখনই এ কথা বলা চলে—

'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥'*

নহিলে মানুষের তো দোষ গুণ আছেই। কিন্তু তার ভক্তিতে তখন সে তো আর মানুষকে মানুষ দেখে না, ভগবান্ বলেই দেখে! যেমন ন্যাবা-লাগা চোখে সব হলুদবর্ণ দেখে—সেই রকম; তখন তার ভক্তি তাকে দেখিয়ে দেয় যে ঈশ্বরই সব—তিনিই গুরু পিতা মাতা, মানুষ গরু, জড় চেতন সব হয়েছেন।"

দক্ষিণেশ্বরে একদিন এক জন সরল উদ্ধত যুবক ভক্ত ঠাকুর যে বিষয়টি তাহাকে বলিতেছিলেন তৎসম্বন্ধে নানা আপত্তি তর্ক উত্থাপিত করিতে-ছিল। ঠাকুর তিন চারিবার তাহাকে ঐ বিষয়টি বলিলেও যখন সে বিচার করিতে লাগিল তখন ঠাকুর তাহাকে সুমিষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—"তুমি কেমন গো? আমি বল্‌চি, আর তুমি কথাটা নিচ্চ না!" যুবকের এইবার ভালবাসায় হাত পড়িল। সে বলিল—'আপনি যখন বল্‌চেন তখন নিলুম বৈ কি। আগেকার কথা গুলো তর্কের খাতিরে বলেছিলাম।'

ঠাকুর শুনিয়া প্রসন্ন মুখে হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'গুরুভক্তি কেমন জান? গুরু যা বল্‌বে তা তখনি দেখ্‌তে পাবে—সে ছিল অর্জ্জুনের! একদিন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সঙ্গে রথে চড়ে বেড়াতে বেড়াতে আকাশের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—দেখ সখা, কেমন এক ঝাঁক পায়রা উড়চে! অর্জ্জুন অমনি দেখিয়া বলিলেন—হাঁ সখা, অতি সুন্দর পায়রা! পরক্ষণেই শ্রীকৃষ্ণ আবার দেখিয়া বলিলেন—না সখা, ওতো পায়রা নয়! অর্জ্জুন দেখিয়া বলিলেন—তাই তো সখা, ও পায়রা নয়। কথাটি এখন বোঝ। অর্জ্জুন মহা সত্যনিষ্ঠ—তিনি তো আর কৃষ্ণের খোসামোদ করিয়া এরূপ বলিলেন না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথায় তাঁর এত বিশ্বাস ভক্তি! যেমন যেমন শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন অর্জ্জুনও তখন ঠিক ঠিক তা দেখ্‌তে পেলেন।

শাস্ত্র যাঁহাকে অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণসমর্থ গুরু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া-

---

* অর্থাৎ নিত্যানন্দ স্বরূপ শ্রীভগবান্ বা ঈশ্বর।

ছেন তাহা ভাববিশেষ বলিয়া নির্ণীত হইলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা এই—গুরু অনেক নহেন, গুরু এক ; আধার বা যে যে শরীরাবলম্বনে গুরুভাব প্রকাশিত হয় তাহা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তোমার গুরু, আমার গুরু পৃথক নহেন—ভাবরূপে এক! ভক্তিবলে একলব্যের মৃন্ময় মূর্ত্তিতে দ্রোণকে আচার্য্যরূপে পাইয়া ধনুর্ব্বেদ লাভ রূপ মহাভারতীয় কথাটি ইহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে। অবশ্য একথাটি যুক্তিতে দাঁড়াইলেও ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম হওয়া অনেক সময় ও সাধন সাপেক্ষ ; এবং হৃদয়ঙ্গম হইলেও যতক্ষণ মানবের নিজের দেহ বোধ থাকে ততক্ষণ, যে শরীরের ভিতর দিয়া গুরুশক্তি তাহাকে কৃপা করেন সেই শরীরাবলম্বনেই শ্রীগুরুর পূজা করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ঠাকুর এই কথাটির দৃষ্টান্তে নিষ্ঠাভক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন হনুমানের কথা উপদেশ করিতেন।

লঙ্কাসমরে শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ, মহাবীর মেঘনাদ কর্ত্তৃক কোন সময়ে নাগপাশে আবদ্ধ হন এবং উহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নাগকুলের চিরশত্রু গরুড়কে স্মরণ করিয়া আনয়ন করেন। গরুড়কে দেখিবামাত্র নাগকুল ভয়ত্রস্ত হইয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। রামচন্দ্রও নিজভক্ত গরুড়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া গরুড়ের চিরকাল পূজিত ইষ্টমূর্ত্তি বিষ্ণুরূপে তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ও তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, যিনি বিষ্ণু তিনিই রামরূপে অবতীর্ণ! হনুমানের কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে ঐরূপে বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিতে দেখা ভাল লাগিল না। এবং কতক্ষণে তিনি পুনরায় রামরূপ পরিগ্রহ করিবেন এই কথাই ভাবিতে লাগিলেন। হনুমানের ঐ প্রকার মনোভাব বুঝিতে রামচন্দ্রের বিলম্ব হইল না। তিনি গরুড়কে বিদায় দিয়াই পুনরায় রামরূপ পরিগ্রহ করিয়া হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'বৎস, আমার বিষ্ণুরূপ দেখিয়া তোমার ঐরূপ ভাবান্তর হইল কেন? তুমি মহাজ্ঞানী, তোমার তো আর জানিতে ও বুঝিতে বাকি নাই যে, যে রাম সেই বিষ্ণু?' হনুমান তাহাতে বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন—সত্য বটে এক পরমাত্মাই উভয় রূপ পরিগ্রহণ করিয়াছেন এবং সেজন্য শ্রীনাথ ও জানকীনাথে কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু তথাপি আমার প্রাণ সতত জানকীনাথেরই দর্শন চায়—কারণ তিনিই আমার সর্ব্বস্ব! ঐ মূর্ত্তির ভিতর দিয়াই আমি ভগবানের প্রকাশ দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্ব্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥

এইরূপে গুরুভাবটি শ্রীশ্রীজগন্মাতার শক্তিবিশেষ ও সেই শক্তি, সকল মানবমনেই সুপ্ত বা ব্যক্ত ভাবে নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই গুরুভক্তিপরায়ণ সাধক শেষে এমন এক অবস্থায় উপনীত হন যে, তখন ঐ শক্তি তাঁহার নিজের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ধর্ম্মের জটিল নিগূঢ় তত্ত্বসকল তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে থাকে! তখন সাধককে আর বাহিরের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া ধর্ম্মবিষয়ক কোনরূপ সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে হয় না। গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥

গীতা—২য় অঃ, ৫২ শ্লোক।

যখন তোমার বুদ্ধি অজ্ঞান মোহ হইতে বিমুক্ত হইবে তখন আর এটা শুনা উচিত, ওটা শাস্ত্রে আছে—ইত্যাদি কথায় আর তোমার প্রয়োজন থাকিবে না—তুমি ঐ সকলের পারে চলিয়া যাইয়া আপনিই তখন সকল বিষয় বুঝিতে পারিবে। সাধকের তখন ঐরূপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়।

ঠাকুর ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেন—"শেষে মনই গুরু হয় বা গুরুর কায করে।" "মানুষ গুরু মন্ত্র দেয় কাণে—(আর) জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে।" কিন্তু সে মন আর এ মনে অনেক প্রভেদ। সে সময়ে মন শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হয়ে ঈশ্বরের উচ্চ শক্তি প্রকাশের যন্ত্র স্বরূপ হয়, আর এ সময়ে মন ঈশ্বর হতে বিমুখ হয়ে ভোগ সুখ কাম ক্রোধাদিতেই মাতিয়া থাকিতে চায়।

ঠাকুর বলিতেন—গুরু যেন সখি—যতদিন না শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন হয় ততদিন সখির কাজের বিরাম নাই, সেইরূপ যতদিন না ইষ্টের সহিত সাধকের মিলন হয় ততদিন গুরুর কাজের শেষ নাই! এইরূপে মহা মহিমান্বিত শ্রীগুরু জিজ্ঞাসু ভক্তের হাত ধরিয়া উচ্চ উচ্চতর ভাবরাজ্যে আরোহণ করেন এবং পরিশেষে তাহাকে ইষ্টমূর্ত্তির সম্মুখে আনিয়া বলেন, 'ও শিষ্য ঐ দেখ'!—বলিয়াই অন্তর্হিত হন!

ঠাকুরকে একদিন ঐরূপ বলিতে শুনিয়া একজন অনুগত ভক্ত 'শ্রীগুরুর সহিত বিচ্ছেদ তবে তো একদিন অনিবার্য্য,' ভাবিয়া ব্যথিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা

করেন—'গুরু তখন কোথায় যান, মশাই ?' ঠাকুর তদুত্তরে বলেন—'গুরু ইষ্টে লয় হন ! গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব—তিনে এক, একে তিন !'

ঠাকুরের ভিতরে গুরুভাবের প্রকাশ বাল্যাবধিই দেখিতে পাওয়া যায় ! তবে যৌবনে নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভের পর ঐ ভাবের যে পূর্ণ বিকাশ, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। বাল্যাবধি তাঁহাতে ঐ ভাবের প্রকাশ বলাতে কেহ না মনে করেন আমরা ঠাকুরকে বাড়াইবার জন্য কথাটি অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি। যথার্থ নিরপেক্ষ ভাবে যদি কেহ ঠাকুরের জীবন আলোচনা করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন ঐ দোষে কখনই তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হইবে না। এ অদ্ভুত অলৌকিক জীবনের ঘটনাবলি সমূহ যিনি যতদূর পারেন বিচার করিয়া দেখুন না কেন, দেখিবেন, বিচার শক্তিই পরিশেষে হার মানিয়া স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে ! আমাদেরও মন বড় কম সন্দিগ্ধ ছিল না। আমাদের ভিতরের অনেকেই ঠাকুরকে যে ভাবে যাচাইয়া বাজাইয়া লইয়াছেন ঐরূপ করিতে এখনকার কাহারও মন বুদ্ধিতে উঠিবেই না বলিয়া আমাদের বোধ হয়। ঐরূপে ঠাকুরকে সন্দেহ করা এবং পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজেই পরাজিত হইয়া লজ্জায় অধোবদন হওয়া, কতবার কত লোকেরই ভাগ্যে যে হইয়াছে তাহা বলা যায় না। লীলাপ্রসঙ্গে ঐবিষয়ের আভাস পূর্ব্বেই পাঠককে আমরা কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়াছি—পরে আরো অনেক দিতে হইবে ! পাঠক তখন নিজেই বুঝিয়া লইবেন, এজন্য এ বিষয়ে এখন আর অধিক বলিবার অবশ্যক নাই।

'আগে ফল, তারপর ফুল—যেমন লাউ কুমড়ার'—ঠাকুর একথাটি নিত্যমুক্ত ঈশ্বর কোটিদের জীবন প্রসঙ্গে সর্ব্বদাই ব্যবহার করিতেন। অর্থ—ঐরূপ পুরুষেরা জগতে আসিয়া কোন বিষয়ে সিদ্ধ হইবার জন্য যাহা কিছু সাধন করেন তাহা কেবল ইতর সাধারণকে এই কথা বুঝাইয়া দিবার জন্য যে, ঐ বিষয়ে ঐরূপ ফল লাভ করিতে হইলে এইরূপ চেষ্টা তাহাদের করিতে হইবে। কারণ ঐরূপ পুরুষদিগের জীবনালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে জ্ঞান লাভের জন্য তাঁহারা এতটা চেষ্টা জীবনে দেখান, সেই জ্ঞান আজীবন থাকিলে সকল কার্য্য যেরূপ ভাবে করা যায় ঐ সকল পুরুষেরা বাল্যাবধি ঠিক্ তদ্রূপ ব্যবহারই সকল বিষয়ে করিয়া আসিয়াছেন ! যেন ঐ জ্ঞানলাভ করিবার ফল, তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছেন ! নিত্য-মুক্তদিগের সম্বন্ধেই যখন ঐ কথা সত্য, তখন

ঈশ্বরাবতারদের তো কথাই নাই!—তাঁহাদের জীবনে ঐরূপ জ্ঞানের প্রকাশ আজীবনই দেখিতে পাওয়া যায়! সকল দেশের সকল যুগের ঈশ্বরাবতারদের সম্বন্ধেই শাস্ত্রে একথা লিপিবদ্ধ আছে। আর দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন যুগের ঈশ্বরাবতারদিগের মধ্যে অনেক ব্যবহারের একটা সৌসাদৃশ্য আছে। যথা, স্পর্শ দ্বারা ধর্ম্মজীবন সঞ্চারের কথা যীশু, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের জীবনেই দেখিতে পাই! ঐরূপ, তাঁহাদের জন্মগ্রহণকালে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির ঐ বিষয় অলৌকিক উপায়ে জ্ঞাত হইবার কথা, বাল্যাবধি তাঁহাদের ভিতর গুরুভাব প্রকাশিত থাকিবার কথা, তাঁহারা যে মানবসাধারণকে উন্নত করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ পথ দেখাইতে কৃপায় অবতীর্ণ এবিষয়টি বাল্যাবধি উপলব্ধি করিবার কথা প্রভৃতি অনেক কথাই একরূপ দেখিতে পাওয়া যায়! অতএব ঠাকুরের জীবনে বাল্যাবধি গুরুভাব প্রভৃতির প্রকাশ থাকার কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবার কথা নাই। কারণ 'অবতার' পুরুষদিগের থাক্ বা শ্রেণীই একটা পৃথক্। সাধারণ মানবের জীবনে ঐরূপ ঘটনা কখনও সম্ভবে না বলিয়া অবতারপুরুষদিগের জীবনেও ঐরূপ হওয়া অসম্ভব মনে করিলে বিষম ভ্রমে পড়িতে হইবে।

ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের প্রথম জ্বলন্ত নিদর্শন দেখিতে পাই তাঁহার জন্মভূমি কামারপুকুরে। তাঁহার তখন উপনয়ন হইয়া গিয়াছে। অতএব বয়স ৯।১০ বৎসর হইবে। গ্রামের জমীদার লাহা বাবুদের বাটীতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে তদঞ্চলের খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গের নিমন্ত্রণ হয়। এবং অনেক গুলি পণ্ডিতের একত্র সমাবেশ হইলে যাহা হইয়া থাকে, খুব তর্কের হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। অনেক তর্কেও শাস্ত্রীয় প্রশ্নবিশেষের কোনরূপ মীমাংসা হইতেছিল না, এমন সময় বালক শ্রীরামকৃষ্ণ বা গদাধর পরিচিত জনৈক পণ্ডিতকে বলেন 'কথাটার এই ভাবে মীমাংসা হয় না কি?' সভায় পল্লীর অনেক বালকই কৌতূহলাকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছিল এবং নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া পণ্ডিতদিগের উচ্চরবে বাগ্‌যুদ্ধটার বিন্দুমাত্র অর্থবোধ না হওয়ায় কেহবা উহাকে একটা রঙ্গরসের মধ্যে ভাবিয়া হাসিতেছিল, কেহবা বিরক্ত হইয়া পণ্ডিতদিগের অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া সোরগোল করিতেছিল আবার কেহ বা একেবারে অন্যমনা হইয়া আপনাদের ক্রীড়াতেই মন দিয়াছিল। কাজেই এ অপূর্ব্ব বালক যে পণ্ডিতদিগের সকল কথা ধৈর্য্য সহকারে শুনিয়াছে,

বুঝিয়াছে এবং মনে ভাবিয়া একটা সুমীমাংসায় উপনীত হইয়াছে ইহা ভাবিয়া পণ্ডিতটি প্রথম অবাক হইলেন; তাহার পর নিজের পরিচিত পণ্ডিতদের নিকট গদাধরের মীমাংসার কথা বলিতে লাগিলেন; তাহার পর তাঁহারা সকলে উহাই ঐবিষয়ের একমাত্র মীমাংসা বুঝিয়া অপরাপর সকল পণ্ডিত-গণকে ঐ বিষয় বুঝাইয়া বলিলেন। তখন ঐ প্রশ্নের উহাই যে একমাত্র সমাধান তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন এবং কাহার তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ঐ অপূর্ব্ব সমাধান প্রথম দেখিতে পাইল তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এবং যখন নিশ্চিত জানিতে পারিলেন উহা বালক গদাধরই করিয়াছে তখন কেহ বা স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া বালককে দৈবশক্তিসম্পন্ন ভাবিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন আবার কেহ বা আনন্দপূরিত হইয়া বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন!

কথাটির আর একটু অলোচনা আবশ্যক। ক্রীশ্চান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভগদবতার ঈশার জীবনেও ঠিক এইরূপ একটি কথা বাইবেলে * লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন দ্বাদশ বর্ষ। তাঁহার দরিদ্র ধর্ম্মপরায়ণ পিতা মাতা, ইউসুফ্ ও মেরি সে বৎসর তাঁহাকে লইয়া অন্যান্য যাত্রীদের সহিত পদব্রজে নিজেদের বাসভূমি গ্যালিলি প্রদেশস্থ নাজারেথ্ নামক গণ্ডগ্রাম হইতে জেরুজেলাম তীর্থের সুবিখ্যাত মন্দিরে দেবদর্শন ও পূজা বলি ইত্যাদি দিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। য়্যাহুদিদিগের এই তীর্থ হিন্দুদিগের তীর্থ সকলের ন্যায়ই ছিল। এখানে সুবর্ণকৌটায় যাভে দেবতার আবির্ভাব ভক্ত সাধক প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিত। এবং উহার সম্মুখে একটি বেদীর উপর ধূপ ধূনা জ্বালাইয়া পত্র পুষ্প ফল মূল ও মেষ পায়রা প্রভৃতি পশু পক্ষ্যাদি বলি দিয়া উক্ত দেবতার পূজা করা হইত। হিন্দু দিগের ৺কামাখ্যা পীঠ ও ৺বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি তীর্থে অদ্যাপি পায়রা প্রভৃতি পক্ষী বলি দেওয়া এখনও প্রচলিত।

ইয়ুসুফ্ ও মেরি শাস্ত্রানুসারে দর্শন পূজা বলি ও হোমাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সঙ্গীদিগের সহিত নিজ গ্রামাভিমুখে ফিরিলেন। সে সময়ে নানা দিগ্‌দেশ হইতে জেরুজেলাম দর্শনে আগত যাত্রীদিগের অবস্থা, অনেকটা, রেল হইবার পূর্ব্বে পদব্রজে ৺পুরী প্রভৃতি তীর্থ দর্শনে অগ্রসর যাত্রীদিগের মতই ছিল। সেই মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ কূপ তড়াগাদি শোভিত একই প্রকার দীর্ঘ

* লূক্—(২-৪২)।

পথ, সেই মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম স্থান চটী বা সরাই—ধর্ম্মশালারও অভাব ছিল না, শুনা যায়—সেই তীর্থযাত্রীর সহচর পাণ্ডা, সেই চাল ডাল আটা প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যকীয় খাদ্যাদি দ্রব্যপ্রাপ্তিস্থান—মুদির দোকান, সেই ধূলা, সেই ধর্ম্মভাব বিস্মরণকারী নিদ্রালস্যের বৈরী যাত্রীদিগের পরম বন্ধু মশককুল, সেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের যাত্রীবর্গের পরস্পরের সাহায্য লাভ করিতে পারিবে বলিয়া দলবদ্ধ হইয়া গমন, এবং পরিশেষে সেই যাত্রীদিগের একান্ত ঈশ্বর-নির্ভরতা ও ভগবদ্ভক্তি!

ঈশার পিতা মাতা আপন দলের সহিত প্রত্যাবর্ত্তনের সময় ঈশাকে নিকটে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন বোধ হয় অপর কোন যাত্রীবালকের সহিত দলের পশ্চাতে আসিতেছে। কিন্তু অনেক দূর চলিয়া আসিয়াও যখন ঈশাকে দেখিতে পাইলেন না তখন বিশেষ ভাবিত হইয়া তন্ন তন্ন করিয়া দলমধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন ঈশা তাঁহাদের সঙ্গে নাই। কাজেই ব্যাকুল হইয়া পুনরায় জেরুজালেম অভিমুখে ফিরিলেন। সেখানে নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও বালকের তত্ত্ব পাইলেন না। পরিশেষে মন্দিরমধ্যে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখেন বালক ঈশা শাস্ত্রজ্ঞ সাধককুলের ভিতর বসিয়া শাস্ত্র বিচার করিতেছে! এবং শাস্ত্রের জটিল প্রশ্ন সকল, যাহা পণ্ডিতেরাও সমাধান করিতে পারিতেছেন না তাহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে মোহিত করিতেছে!

পণ্ডিত মোক্ষমূলর তৎকৃত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীতে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত বাল্যলীলার সহিত ঈশার বাল্যলীলার সৌসাদৃশ্য পাইয়া ঐ বিষয়ের সত্যতায় বিশেষ সন্দিহান হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, একটু কটাক্ষ করিয়াও বলিয়াছেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের ইংরাজী বিদ্যাভিজ্ঞ শিষ্যেরা গুরুর মান বাড়াইবার জন্য ঈশার বাল্যলীলার কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ইচ্ছা করিয়াই জুড়িয়া দিয়াছেন! পণ্ডিত ঐরূপে আপন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেও আমরা নাচার, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের ঐরূপ বাল্যলীলার কথা আমরা ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরে অনেক বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি এবং ঠাকুরও কখন কখন ঐ বিষয়ে কাহারও কাহারও নিকট নিজমুখে বলিয়াছেন। এই পর্য্যন্ত বলিয়াই এখানে ক্ষান্ত থাকাই ভাল।

ক্রমশঃ।

স্বামি-শিষ্য-সংবাদ।

(বেলুড়।)

বেলুড়ে মঠমন্দির নির্ম্মিত হওয়ার পর স্বামীজি অনেক সময় মঠেই অবস্থান করিতেন। নিজ হস্তে কখন মঠের জমি কোপাইতেন; কখন বা গাছপালা ফল ফুলের বীজ রোপণ করিতেন। আবার কখন বা চাকর বাকরের ব্যারাম হওয়ায় ঘর বাড়ীতে ঝাঁট পড়ে নাই দেখিয়া নিজ হস্তে ঘর দোর পরিষ্কার করিতেন! যদি কেহ তাহা দেখিয়া 'আপনি! কেন?'—বলিত, তাহা হইলে তদুত্তরে বলিতেন তা হলোই বা—মঠের এদের যে অসুখ করবে!" মঠে কতগুলি গাভী, হাঁস, কুকুর ও ছাগল পুষিয়াছিলেন। বড় একটা মাদী ছাগলকে "হংসরাজ" বলিয়া ডাকিতেন ও তারি দুধে প্রাতে চা খাইতেন। ছোট একটী ছাগল্ ছানাকে "মট্রু" বলে ডাকিতেন; তার গলায় ঘুণ্ডুর পরিয়ে দিয়াছিলেন। ছানাটা স্বামীজির পায় পায় বেড়াত। তার সঙ্গে স্বামীজি পাঁচ বছরের বালকের ন্যায় দৌড়া দৌড়ি করে খেলা করিতেন। তখন দেখে কে বুঝিতে পারিত ইনিই সেই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ! কিছু দিন পরে 'মট্রু' মরিয়া যাওয়ায় বিষন্নচিত্তে শিষ্যকে একদিন বলিতেছেন, "দ্যাখ! আমি যেটাকে একটু আদর করতে যাই সেটাই ম'রে যায়।" স্বামী সদানন্দই স্বামীজির এসব খেলার বাসনা পূরণে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন।

মঠের জমি সাফ্ করিতে ও মাটী কাটিতে প্রতি বর্ষেই কতকগুলি স্ত্রী পুরুষ সাঁওতাল আসিত। স্বামীজি তাদের নিয়ে কত রঙ্গ করিতেন। তাদের সুখ দুঃখের কথা শুনিতেন। তাদের কত ভাল বাসিতেন। একদিন কলিকাতা থেকে কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক স্বামিজীর সঙ্গে দেখা করিতে মঠে আসিয়াছেন। স্বামিজী এদিকে খেলো হুকোয় তামাক খাইতে খাইতে সেই সাঁওতালদের সঙ্গে গল্প করিতেছেন। স্বামী সুবোধানন্দ আসিয়া সংবাদ দিলেন 'কলিকাতা থেকে অমুক তমুক এসেছেন।' স্বামীজি বল্ছেন—"রেখেদে তোর অমুক তমুক—আমি এদের নিয়ে বেশ আছি।" স্বামীজি এই দীনদুঃখী সাঁওতালদের ছাড়িয়া আগন্তুক ভদ্রলোকদের সঙ্গে দেখা করিতেও সেদিন বাস্তবিকই গেলেন না।

সাঁওতালদের মধ্যে একজনের নাম ছিল কেষ্ট। স্বামীজি কেষ্টকে বড় ভাল বাসিতেন। কেষ্ট কখনো বা স্বামীজিকে বল্‌তো "ওরে স্বামী বাপ্—তুই আমাদের কাজের বেলা এখান্‌কে আসিস্ না—তোর সঙ্গে কথা বল্‌লে আমাদের কাজ বন্ধ হয়ে যায়, আর বুড়ো বাবা এসে বকে। কথা শুনে স্বামিজীর চোক্ ছল ছল্ করিত। তাদের সংসারের দুঃখের কথা শুনে স্বামীজি কখন কখন কাঁদিয়া ফেলিতেন। তা দেখিয়া কেষ্ট বলিত "যা তোকে আর আমাদের দুঃখের কথা বল্‌বো না—তা হলে বাপ্ তুই যে কাঁদ্‌বি।"

একদিন স্বামীজি কেষ্টকে বলিতেছেন ওরে আমাদের এখানে খাবি? কেষ্ট বলিল আম্‌রা যে তোদের ছোঁয়া খাইনা—জাত যাবেরে বাপ্। স্বামীজির অনুরোধে অবশেষে কেষ্ট স্বীকৃত হলো কিন্তু কোন জিনিষে নুন দিয়ে রাঁধিতে নিষেধ করিল। স্বামিজীর আদেশে মঠে সেই সকল সাঁওতাল-দের জন্য লুচি, তরকারী, মেঠাই মণ্ডা দধি ইত্যাদি জোগাড় করা হইল। স্বামীজি তাদের বসাইয়া খাওয়াইতেছেন ও তাহাদের আনন্দে আনন্দিত হইতেছেন। এমন খাবার তাদের জন্মে কখনো খায় নাই। খাইতে খাইতে বলিতেছে "হেরে স্বামি বাপ্—তোরা এমন জিনিষটা কোথায় পেলি—হামরা এমনটা কখনো খাইনি।" স্বামীজি তাদের পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়া বলিতেছেন "তোরা যে নারায়ণ—আজ আমার নারায়ণের ভোগ দেওয়া হ'লো।" স্বামীজি যে দরিদ্র নারায়ণ সেবার কথা বলিতেন তা তিনি নিজ জীবনে এইরূপে দেখাইয়া গিয়াছেন।

আহারান্তে সাঁওতালরা বিশ্রাম করিতে গেলে স্বামীজি শিষ্যকে বল্‌ছেন "এদের দেখলুম্ যেন সাক্ষাৎ নারায়ণ—এমন সরলচিত্ত—এমন অকপট—আমার প্রতি এমন—ভালবাসা এমন আর দেখিনি"। স্বামীজি গম্ভীর ভাবে মঠের ঘরে আসিলেন—মুখে কথা নাই—যেন কি এক গভীর ভাবে মগ্ন! কিছুক্ষণ পরে বলিতেছেন—"আহা রাখাল দেখ এরা কেমন সরল!" এদের কিছু দুঃখ দূর কত্তে পার্‌বি? নতুবা গেরুয়া পরে আর কি হলো? পরহিতায় সর্ব্বস্ব অর্পণ—এর নাম যথার্থ সন্ন্যাস। আবার বলিতে লাগিলেন "মঠ ফঠ করে আর কি হবে? দে এসব বিলিয়ে গরীব দুঃখী দরিদ্র নারায়ণ দের। আম্‌রা ত গাছতলা সার করেইছি। আহা! দেশের লোক্ খেতে পর্‌তে পাচ্চে না—আম্‌রা কোন্ প্রাণে মুখে অন্ন তুল্‌বো? ও দেশে গিয়ে-

ছিলেম্—মাকে কত বল্লুম 'মা! ওদেশে লোক্ ফুলের বিছানায় শুচ্চে, চব্য চুষ্য খাচ্চে, কি না ভোগ্ করছে—আর আমাদের দেশের লোক্‌গুলো না খেতে পেয়ে মরে যাচ্ছে—মা! এদের কোন উপায় হবে না? আমি ওদেশে ধর্ম্ম প্রচার করতে যাইনি; এ দেশের লোকের অন্ন সংস্থান যদি করতে পারি তাই গিছিলুম্।

বলিতে বলিতে স্বামীজি মঠের ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসী মহারাজগণকে কর্ম্ম ও সেবাপরতায় উৎসাহিত করিতেছেন। বলিতেছেন—'ফেলেদে তোর্ শাঁক বাজানো—ঘণ্টা নাড়া। ফেলে দে তোর্ লেখা পড়া, নিজে মুক্ত হবার চেষ্টা—যা সব গাঁয়ে গাঁয়ে দরিদ্র দুঃখী নারায়ণের সেবায়। নিজের চরিত্র ও সাধনা ব'লে বড় লোকদের বুঝিয়ে,—নিয়ে আয় কড়ি্ পাতি। সে সব দরিদ্র নারায়ণের সেবায় লাগা।"

খানিক বাদে বলিতেছেন—"আহা দেশে গরিব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে নারে! যারা জাতির মেরুদণ্ড—যাদের পরিশ্রমে অন্ন জমাচ্চে—যে মেথর মুদ্দফরাস্ একদিন কার্য্য বন্ধ কর্‌লে সহরে হাহাকার রব উঠে—হায়! তাদের সহানুভূতি করে—তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয় এমন কি দেশে কেউ নাইরে। এই দেখ্‌না—হিন্দুর সহানুভূতি না পেয়ে—মান্দ্রাজ অঞ্চলে হাজার হাজার পেরিয়া কৃশ্চিয়ান্ হ'য়ে যাচ্ছে। মনে করিস্‌নি কেবল পেটের দায়ে কৃশ্চিয়ান্ হয়। তোদের সহানুভূতি পায়না ব'লে। তোরা দিনরাত কেবল বলছিস্ "ছুঁস্‌নে" "ছুঁস্‌নে"। দেশে কি আর্ দয়া ধর্ম্ম আছেরে বাপ্।

কেবল ছুঁতমার্গীয় দল। ওমন আচারের মুখে মার্ ঝেঁটা। মার্ লাথি। ভেঙ্গে ফেল্ তোর ছুঁত মার্গের গণ্ডী। ডেকে নিয়ে আয় সব—'কে কোথায় পতিত কাঙ্গাল দীন দরিদ্র আছিস্'বলে, ডেকে নিয়ে আয় তাদের—ঠাকুরের নামে। এখনি সব গাঁয়ে গাঁয়ে দেশ দেশান্তরে চলে যা। এরা না উঠ্‌লে মা জাগ্‌বেন্ না। এদের সব বুঝিয়ে শুঝিয়ে আগে এদের অন্ন বস্ত্রের সুবিধা করে দে। হায়! এরা দুনিয়াদারি কিছু জানে না, তাই দিন রাত খেটেও অশন বসনের সংস্থান কর্‌তে পাচ্ছে না। এদের সব চোখ খুলে দে—আমি দিব্য চোখে দেখ্‌ছি এদের ও আমার ভেতর একই ব্রহ্ম—একই শক্তি। কেবল—বিকাশের তারতম্য মাত্র। কিন্তু সর্ব্বত্রই সেই এক! সর্ব্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চার না হলে কোন্ দেশ্ কোন্‌কালে কেথায় উঠেছে,

দেখেছিস্!! একটা অঙ্গ পড়ে গেলে (paralysis)অন্য অঙ্গ সবল থাক্‌লেও ঐ দেহ দিয়ে কোন বড় কায আর হবে না—ইহা নিশ্চিত জান্‌বি।

শিষ্য—মশায়, এত বিভিন্ন ধর্ম্ম—বিভিন্ন ভাব—এদের ভেতর যে সকলের মিল হওয়া বড় কঠিন্ ব্যাপার।

স্বামীজি—(সক্রোধে) কঠিন্ ব'লে কোন কাজটাকে মনে কর্‌লে হেথায় আর্ আসিস্ নি। ঠাকুরের ইচ্ছায় এবার সব দিক্ সোজা হয়ে গেছে। তোর কার্য্য হচ্ছে দীন দুঃখীর সেবা করা, জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে—এর ফল কি হবে না হবে ভেবে তোর দরকার কি? তোর কার্য্য হচ্ছে কাজ করে যাওয়া—পরে সব আপনি আপনি হয়ে যাবে। আমার কাজের ধারা (Process) গড়ে তোলা (Constructive) যা আছে সেটাকে ভাঙ্গা নয় (destructive)। জগতের ইতিহাস (history) পড়ে ত্থাখ্, এক একজন মহাপুরুষ এক একটা সময়ে যেন কেন্দ্রস্বরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছিলেন। historyর centre। তাদের ভাবে অভিভূত হয়ে শত সহস্র লোক জগতের হিত সাধন করে গেছে। তোরা সব বুদ্ধিমান্ ছেলে—হেথায় এতদিন আস্‌ছিস্—কি করলি বল্ দিকি? পরার্থে একটা জন্ম দিতে পার্‌লিনি? আবার এসে তখন বেদান্ত ফেদান্ত পড়্‌বি। এবার পরসেবায় দেহটা দিয়ে যা—তবে জান্‌বো—আমার কাছে আসা সার্থক হয়েছে।

শিষ্য এসব কথা শুনে একেবারে বিষণ্ন হয়ে বসেছে। স্বামীজির কাছে এসেও তার কোন উন্নতি হ'লোনা ভেবে। স্বামিজী বল্‌ছেন—"যা নিয়ে আয় তামাক সেজে—একটু সাধু সেবা কর্"। শিষ্য তামাক সেজে স্বামীজিকে দিয়াছে। ধূমপান করিতে করিতে স্বামিজী বলিতেছেন—"আজ বৈকালে মহাভাষ্য পড়া হবে" বই টই সব ঠিক্ করে রাখ্‌গে।

শিষ্য ভাবিল "এইত গুরুদেব বল্‌লেন্ 'এ জন্মটা পর সেবায় দে; আবার এখনি বলিতেছেন বৈকালে মহাভাষ্য পড়া হ'বে" এর মানে কি? স্বামীজি যে মাথা একেবারে গুলিয়ে দিলেন।

স্বামীজি—কি ভাবছিস্? তোর্ "জ্ঞান হবে"। শিষ্য ভাবিল আবার আর এক কথা। এর ত আদি অন্ত কিছু বুঝিতে পারিলাম না। সুধু মঠে এসে প্রসাদ পাওয়াই বুঝি এ জন্মে সার হলো!! শিষ্য স্বামীজির উপদেশ-গুলি কিছুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না। স্বামীজি এলো থেলো ভাবে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। গভীর চিন্তায় মগ্ন। খানিক্ বাদে বলিতেছেন

আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি "জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন। এ ছাড়া ঈশ্বর মীশ্বর কিছুই নাই।" শিষ্য ভাবিতেছে স্বামীজি কি তাঁর কবিতার প্রতিধ্বনি কচ্ছেন "জীবে দয়া করে যেই জন্—সেই জন্ সেবিছে ঈশ্বর"।

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিল। স্বামীজি দোতলায় উঠিলেন্। শিষ্য পেছনে পেছনে ভয়ে ভয়ে চলিল। ধমক খাইয়া আকাশ পাতাল ভাবিয়া ভয়ে আর এখন সেই বালকের মত স্ফুর্ত্তি নাই! স্বামীজির কথা শুনে সে যেন আজ কিম্ভূতকিমাকার হইয়াগিয়াছে। উপরে গিয়ে স্বামিজী মেজেয় পাতা বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। শিষ্য অতি সন্তর্পণে পদ সেবা করিবার উদ্যোগ করিল। এমন সময় স্বামীজি বলিলেন"দে পা টিপে দে"। শিষ্য একটু সাহস পাইল। স্বামীজির রাজীব পদদ্বয় স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া সে আস্তে আস্তে টিপিয়া দিতে লাগিল। স্বামীজির মুখে এখন পূর্ব্বের ন্যায় প্রফুল্ল ভাব। হেসে হেসে বলিতেছেন "আজ যা বলেছি"। সব মনে গেঁথে রাখ্বি। ভুলিস্নি যেন।

শিষ্য—মশায়, মরে গেলেও ভুলব না।

স্বামীজি—যা নীচে গিয়ে রাখালকে ডেকে নিয়ে আয়।

শিষ্য—যাচ্ছি। এই বলে রাখাল মহারাজকে নীচে ডাকিতে চলিল। রাখাল মহারাজ (স্বামি ব্রহ্মানন্দ) স্বামীজির আদেশ শুনে বলিতেছেন "আবার বকুনি হবে বুঝি"। এই ব'লে উপরে আসিলেন। স্বামীজি বলিতেছেন "রাজা, এখন থেকে ঠাকুরের পূজা আর্চ্চাটা একটু কমিয়ে দিও। এই সব ছোক্রাদের সাধন ভজন, পড়া শুনা এসব বিষয়ে লাগিয়ে দেও যাতে এরা ঠাকুরের ভাব বুঝতে পারে। এরা যখন এসে পড়েছে তখন এদের ত তৈয়িরি করে যেতে হবে—কি বল? রাখাল মহারাজ বলিলেন তা তুমি যেমন্ বল্‌বে তেম্‌নি সব হবে। তোমার কথামত কাজ কি আমরা কেউ না করে থাক্‌তে পারি—না কখনো তার অন্যথা করেছি?" স্বামীজি বলিলেন—বাবুরামকে এসব কথা বল্‌বে।" স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "তা বল্‌বো।"

স্বামীজি আবার বলিলেন "আজ বকে বকে বুক্ কেমন্ দুর দুর কর্‌ছে। রাখাল্ মহারাজ বলিলেন—তুমি ত আর শরীরের দিকে চাইবেনা—কেবল দিনরাত ব'কে ব'কে শরীর পাত ক'রে দিলে। ও দেশ্ থেকে এত খেটে এলে এখন কোথায় একটু নিরিবিলি থাক্‌বে—না—কেবল দিনরাত ভাবছো;

আর বক্‌চো; কি হবে ভাই আর ভেবে চিন্তে—তুমিও যেমন—ঠাকুরের ইচ্ছায় সব হয়ে যাবে।" স্বামীজির গুরুভ্রাতাদিগের উপর অসীম বিশ্বাস! তাহার ভিতর আবার রাখাল মহারাজের উপর, কারণ, ঠাকুর ইঁহাকে সাক্ষাৎ পুত্রভাবে দেখিতেন। রাখাল মহারাজ সব হয়ে যাবে বলায় বালকের ন্যায় বিশ্বাসের সহিত বলিলেন "তুই বল্‌ছিস সব হয়ে যাবে?" রাখাল্ মহারাজ বল্‌ছেন "হাঁ আমি নিশ্চিত বল্‌ছি ঠাকুরের ইচ্ছায় সব হয়ে যাবে"। এই বলে রাখাল মহারাজ নীচে নেবে গেলেন।

ক্রমশঃ

ভক্তিরহস্য।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রতীকের কয়েকটী দৃষ্টান্ত।

'প্রতীক' ও 'প্রতিমা'—দুইটি সংস্কৃত শব্দ। আমরা এক্ষণে এই 'প্রতীক' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। 'প্রতীক' শব্দের অর্থ—অভিমুখী হওয়া, সমীপবর্ত্তী হওয়া। সকল দেশেই আপনারা উপাসনার নানাবিধ সোপান রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, এই দেশে অনেক লোক আছেন যাঁহারা, সাধুগণের প্রতিমা পূজা করেন, এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রূপ ও ভাবোদ্দীপক বস্তু-বিশেষের উপাসনা করেন। আবার অনেক লোক আছেন, যাঁহারা মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চতর বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর উপাসনা করেন আর তাঁহাদের সংখ্যা দিন দিন অতি দ্রুতবেগে বাড়িয়া যাইতেছে। আমি পরলোকগত প্রেতোপাসকদের কথা বলিতেছি। আমি পুস্তকপাঠে অবগত হইয়াছি যে, এখানে প্রায় ৮০ লক্ষ প্রেতোপাসক আছেন। তার পর আবার অপর কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা তদপেক্ষা উতচ্চর প্রাণী অর্থাৎ দেবাদির উপাসনা করেন। ভক্তিযোগ এই সকল বিভিন্ন সোপান-গুলির কোনটীতেই দোষারোপ করেন না, কিন্তু এই সমুদয় উপাসনাগুলিকেই এক প্রতীকোপাসনার মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। এই সকল উপাসক-

প্রতীকোপাসনা—উহাদ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, ফলাবিশেষ লাভ হয়।

গণ প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছেন না, কিন্তু প্রতীক অর্থাৎ ঈশ্বরের সন্নিহিত কোন বস্তুর উপাসনা করিতেছেন, এই সকল বিভিন্ন বস্তুর সহায়ে ঈশ্বরের নিকট পঁহুছিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রতীকোপাসনায় আমাদের মুক্তিলাভ হয় না, আমরা যে যে বিশেষ বস্তুর কামনায় উহাদের উপাসনা করি, উহাতে সেই সেই বিশেষ বস্তুই কেবল লাভ হইতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখুন, যদি কোন ব্যক্তি তাঁহার পরলোকগত পূর্ব্বপুরুষ বা বন্ধুবান্ধবের উপাসনা করেন, সম্ভবতঃ তিনি তাহাদের নিকট হইতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। এই সকল বিশেষ বিশেষ উপাস্য বস্তু হইতে যে বিশেষ বস্তু লাভ হয়, তাঁহাকে বিদ্যা অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান বলে, কিন্তু আমাদের চরম লক্ষ্য মুক্তি কেবল স্বয়ং ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা লব্ধ হইয়া থাকে। বেদব্যাখ্যা করিতে গিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য প্রাচ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্বয়ং সগুণ ঈশ্বরও প্রতীক। সগুণ ঈশ্বর প্রতীক হইতে পারেন, কিন্তু প্রতীক সগুণ বা নির্গুণ কোন প্রকার ঈশ্বর নহেন। উহাদিগকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করা যায় না। অতএব লোকে যদি মনে করে যে, দেব, পূর্ব্বপুরুষ, মহাত্মা, সাধু বা পরলোকগত প্রেতরূপ বিভিন্ন প্রতীক সমূহের উপাসনা দ্বারা তাহারা কখনও মুক্তিলাভ করিবে, তবে ইহা তাহাদের মহাভ্রম। খুব জোর উহা দ্বারা তাহারা কতকগুলি শক্তিলাভ করিতে পারে, কিন্তু কেবল ঈশ্বরই আমাদিগকে মুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ সকল উপাসনার উপর দোষারোপ করিবার প্রয়োজন নাই,উহাদের প্রত্যেকটিতেই ফলবিশেষ লাভ হয়, আর যে ব্যক্তি আর বেশী কিছু বুঝেনা, সে এই সকল প্রতীকোপাসনা হইতে কিছু কিছু শক্তি ও কামনার সিদ্ধি লাভ করিবে। তার পর অনেক দিন ভোগ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর যখন সে মুক্তিলাভের জন্য প্রস্তুত হইবে, তখন সে আপনা আপনিই এই সব প্রতীকোপসনা ত্যাগ করিবে।

এই সকল বিভিন্ন প্রতীকোপসনার মধ্যে পরলোকগত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়গণের উপাসনাই সর্ব্বাপেক্ষা সমাজে অধিক প্রচলিত। ব্যক্তিগত ভ্রম, আমাদের বন্ধুবান্ধবগণের দেহের প্রতি ভালবাসা—এই মানবপ্রকৃতি আমাদের মধ্যে এতদূর প্রবল যে, তাঁহাদের মৃত্যু হইলেও আমরা সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের দেহ আবার দেখিতে অভিলাষী হই—আমরা দেহের প্রতি এতদূর

আসক্ত! আমরা ভুলিয়া যাই যে, যখন তাঁহারা জীবিত ছিলেন, তখনই তাঁহাদের দেহ ক্রমাগত পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছিল—আর মৃত্যু হইলেই আমরা ভাবিয়া থাকি যে, তাঁহাদের দেহ অপরিণামী হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আমরা তাঁহাদিগকে তদ্রূপ দেখিব। শুধু তাহাই নহে, আমার যদি কোন বন্ধু বা পুত্র জীবদ্দশায়—অতিশয় দুষ্টপ্রকৃতি ছিল—এরূপ হয়, তথাপি তাহার মৃত্যু হইবামাত্র আমরা মনে করিতে থাকি, তাহার মত সাধু, তাহার মত দেবপ্রকৃতিক লোক আর জগতে কেহ নাই—তাহাকে তখন আমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর করিয়া তুলি। ভারতে এমন লোক অনেক আছে, যাহারা কোন শিশুর মৃত্যু হইলে তাহাকে দাহ করে না, মৃত্তিকার নিম্নে সমাধিস্থ করে ও তাহার উপরে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া থাকে এবং সেই শিশুটিই সেই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইয়া থাকে। সকল দেশেই এই প্রকারের ধর্ম্ম খুব প্রচলিত এবং এমনও দার্শনিকের অভাব নাই, যাঁহাদের মতে ইহাই সকল ধর্ম্মের মূল। অবশ্য তাঁহারা ইহা প্রমাণ করিতে পারেন না।

পরলোকগত আত্মীয় বান্ধবের উপাসনা একপ্রকার প্রতীকোপাসনা।

যাহা হউক, আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই প্রতীকপূজা আমাদিগকে কখনই মুক্তি দিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে বিশেষ বিপদাশঙ্কা আছে। বিপদাশঙ্কা এই যে, এই প্রতীক বা সমীপকারী সোপান পরম্পর যতক্ষণ পর্য্যন্ত আর একটি আগামী সোপানে উপস্থিত হইবার সহায়তা করে, ততক্ষণ উহারা দোষাবহ নহে, বরং উপকারী, কিন্তু আমাদের মধ্যে শতকরা নিরনব্বই জন লোক সারা জীবন প্রতীকোপসনায়ই লাগিয়া থাকি। একটা চার্চ্চের ভিতর জন্মান ভাল, কিন্তু চার্চ্চে থাকিতে থাকিতেই মরা ভাল নয়। স্পষ্টতর ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, এমন কোন সম্প্রদায়ে জন্মান ভাল, যাহাদের মধ্যে কোন বিশেষ সাধন প্রণালী প্রচলিত—উহাতে আমাদের অভ্যন্তরীন ভাবসমূহ জাগ্রত হইবার সহায়তা হয়, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমরা সেই ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণভাব অবলম্বন করিয়াই মরিয়া যাই, আমরা উহার সংকীর্ণ গণ্ডী ছাড়াইয়া কখন উন্নত হইতে—নিজ ভাবের বিকাশসাধন করিতে পারি না। এই সকল প্রতীকোপসনায় ইহাই প্রবল বিপদাশঙ্কা! লোকে আপনাদের নিকট বলিবে যে এগুলি সোপানমাত্র—এই সকল সেপানের

প্রতীকোপাসনার বিপদাশঙ্কা-উহাতেই আবদ্ধ না থাকিয়া উহার সহায়তা লইয়া চরমাবস্থায় পৌঁছিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

মধ্য দিয়া তাহারা অগ্রসর হইতেছে ; কিন্তু যখন তাহারা বৃদ্ধ হয়, তখনও তাহারা সেই সকল সোপান অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে, দেখা যায়। যদি কোন যুবক চার্চ্চে না যায় তবে সে নিন্দার্হ ; কিন্তু যদি কোন বৃদ্ধ চার্চ্চে গমন করে, সেও তদ্রূপ নিন্দার্হ ; তাহার আর এই ছেলেখেলানায় ত কোন প্রয়োজন নাই, কর্ম্ম তাহার পক্ষে উহাপেক্ষা উচ্চতর বস্তুলাভের সহায় স্বরূপ হওয়া উচিত ছিল। তাঁহার আর এই সব প্রতীক, প্রতিমা ও প্রবর্ত্তকের অনুষ্ঠিত কর্ম্মকাণ্ড কি প্রয়োজন ?

প্রতীকোপাসনার আর এক প্রবল—প্রবলতম—রূপ—শাস্ত্রোপসনা। সকল দেশেই আপনারা দেখিবেন, গ্রন্থ ঈশ্বরের স্থান অধিকার করিয়া বসে। আমার দেশে এমন অনেক সম্প্রদায় আছে, যাহারা ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া মানবরূপ পরিগ্রহ করেন—বিশ্বাস করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের মনে মানবরূপে অবতীর্ণ হইলে ঈশ্বরকেও বেদানুযায়ী চলিতে হইবে—আর যদি—তাঁহার উপদেশ বেদানুযায়ী না হয়, তবে তাহারা সেই উপদেশ গ্রহণ করিবে না। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ের লোকেই বুদ্ধের পূজা করে, কিন্তু যদি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, যদি তোমরা বুদ্ধের পূজা কর, তাঁহার উপদেশাবলি গ্রহণ কর না কেন ? তাহারা বলিবে, তাহার কারণ—বুদ্ধের উপদেশে বেদ অস্বীকৃত হইয়া থাকে। গ্রন্থোপাসনা বা শাস্ত্রোপাসনার তাৎপর্য্য এইরূপ। একখানি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া যত খুসি মিথ্যা বল না কেন, কিছুই দোষ নাই ! ভারতে যদি আমি কোন নূতন বিষয় শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি, আর যদি অপর কোন গ্রন্থ বা ব্যক্তির দোহই না দিয়া আমি যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহাই বলিতেছি—এইরূপ ভাবে ঐ সত্য প্রচার করিতে যাই, কেহই আমার কথা শুনিতে আসিবে না, কিন্তু যদি আমি বেদ হইতে কয়েকটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া জুয়াচুরি করিয়া উহার ভিতর হইতে খুব অসম্ভব অর্থ বাহির করিতে পারি, উহার যুক্তি সঙ্গত যে অর্থ হয়, তাহা উড়াইয়া দিয়া আমার নিজের কতকগুলি ধারণাকে বেদের অভিপ্রেত তত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করি, তবে আহাম্মকেরা দলে দলে আসিয়া আমায় অনুসরণ করিবে। তার পর আবার কতকগুলি ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা এক অদ্ভুত রকমের খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মত শুনিয়া সাধারণ খ্রীষ্টানগণ ভয় পাইবেন, কিন্তু তাঁহারা বলেন, আমরা যাহা প্রচার করিতেছি, যীশুখ্রীষ্টেরও সেই মত ছিল—আর যত আহাম্মকেরা তাঁহাদের দলে মিশিয়া

গ্রন্থ বা শাস্ত্রোপাসনা।

থাকে। বেদে বা বাইবেলে যদি না পাওয়া যায়, তবে এমন নূতন জিনিষ লোকে লইতেই চায় না। স্নায়ুসমূহ যে ভাবে অভ্যস্ত হইয়াছে, সেই দিকে যাইতেই চায়। যখন আপনারা কোন নূতন বিষয় শুনেন বা দেখেন, অমনি চমকিয়া উঠেন—ইহা মানুষের প্রকৃতিগত। অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যদি ইহা সত্য হয়, চিন্তা ভাবাদি সম্বন্ধে এ কথা আরো বিশেষভাবে সত্য। মন দাগা বুলাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে, সুতরাং কোন প্রকার নূতন ভাব গ্রহণ করা অতি ভয়ানক, অতি কঠিন; সুতরাং সেই ভাবটীকে সেই 'দাগার' খুব কাছাকাছি রাখিতে হয়, তবেই আমরা ধীরে ধীরে উহা গ্রহণ করিতে পারি। লোককে কোন মতে লওয়াইবার এ উত্তম নীতি বা কৌশল বটে, কিন্তু ইহা যথার্থ ন্যায়ানুগত নহে। এই সব সংস্কারকগণ আর আপনারা যাঁহাদিগকে উদার-মতাবলম্বী প্রচারক বলেন, তাঁহারা—আজকাল জানিয়া শুনিয়া কি ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা বলিতেছেন, তাহা ভাবিয়া দেখুন। তাঁহারা জানেন যে, তাঁহারা শাস্ত্রের যেরূপ ব্যাখা করিতেছেন, সেরূপ অর্থ হয় না, কিন্তু তাঁহারা যদি তাহা প্রচার না করেন, কেহই তাঁহাদের কথা শুনিতে আসিবে না। খ্রীষ্টীয় বৈজ্ঞা-নিকদের * মতে যীশু একজন মস্ত আরোগ্যকারী ছিলেন, প্রেততত্ত্ববাদীদের মতে তিনি একজন মস্ত ভুতুড়ে ছিলেন আর থিওজফিষ্টদের মতে একজন মহাত্মা ছিলেন। শাস্ত্রের এক বাক্য হইতেই এই সব বিভিন্ন অর্থ বাহির করিতে হইবে! ছান্দোগ্য উপনিষদের 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবা-দ্বিতীয়ং' এই বাক্যান্তর্গত 'সৎ' শব্দের অর্থ বিভিন্ন বাদিগণ বিভিন্নরূপ করিয়া-ছেন। পরমাণুবাদিগণ বলেন, সৎ শব্দের অর্থ পরমাণু, আর ঐ পরমাণু হইতেই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। প্রকৃতিবাদিগণ বলেন, উহার অর্থ প্রকৃতি, আর প্রকৃতি হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। শূন্যবাদীরা বলেন, সৎ শব্দের অর্থ শূন্য, আর এই শূন্য হইতেই সমুদয় উৎপন্ন হইয়াছে। ঈশ্বর বাদিগণ বলেন, উহার অর্থ ঈশ্বর, আবার অদ্বৈতবাদীরা বলেন, উহার অর্থ সেই পূর্ণ

* Christian Scientists —মার্কিনদেশীয় একটী প্রবল সম্প্রদায়ের নাম। মিসেস এডি নাম্নী মার্কিন মহিলা এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাত্রী। ইঁহাদের মতে জড়, রোগ, দুঃখ, পাপ প্রভৃতি মনের ভ্রম মাত্র। আমাদের কোন রোগ নাই, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিলে আমরা সর্ব্বপ্রকার রোগমুক্ত হইব। ইহারা বলেন, আমরা খ্রীষ্টের মত প্রকৃত ভাবে অনু-সরণ করিতেছি। সুতরাং তিনি যেরূপে রোগীকে অলৌকিক উপায়ে রোগমুক্ত করিতেন, আমরাও তাহা করিতে সমর্থ।

নিরপেক্ষ সত্তা আর সকলেই ঐ এক শাস্ত্রীয় বাক্যকেই প্রমাণ স্বরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন!

গ্রন্থোপাসনায় এই সব দোষ, তবে উহার একটী মস্ত গুণও আছে—উহাতে একটা জোর আনিয়া দেয়। যে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের এক একখানি গ্রন্থ আছে, সেইগুলি ব্যতীত জগতের অন্যান্য সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই লোপ পাইয়াছে। আপনাদের মধ্যে কেহ কেহ পারসীদের কথা শুনিয়াছেন। ইহাঁরা প্রাচীন পারস্যবাসী—এক সময়ে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১০ কোটি ছিল। আরবেরা ইহাদিগের অধিকাংশকে পরাজিত করিয়া মুসলমান করিল। অল্প কয়েকজন তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ লইয়া পলাইল—আর সেই ধর্ম্মগ্রন্থ বলেই তাহারা এখনও বাঁচিয়া আছে। শাস্ত্র ভগবানের সম্পূর্ণ প্রত্যক্ষ মূর্ত্তি। য়াহুদীদের কথা ভাবিয়া দেখুন। যদি তাঁহাদের একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ না থাকিত, তাঁহারা জগতে কোথায় মিলাইয়া যাইতেন। কিন্তু ঐ গ্রন্থই তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। অতি ভয়ানক অত্যাচারেও তালমুদ (Talmud) তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়াছে। গ্রন্থের ইহাই একটী বিশেষ সুবিধা যে, উহা সমুদয় ভাবগুলিকে লইয়া মনোহর প্রতীক আকারে লোকের সমক্ষে উপস্থিত করে আর সর্ব্বপ্রকার প্রতিমার মধ্যে উহার ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধাজনক। বেদীর উপর একখানি গ্রন্থ রাখুন—সকলেই উহা দেখিবে—একখানি ভাল গ্রন্থ হইলে সকলেই তাহা পড়িবে। আমাকে বোধ হয় আপনারা কতকটা পক্ষপাতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারেন, কিন্তু আমার মতে গ্রন্থের দ্বারা জগতে ভাল অপেক্ষা মন্দ অধিক হইয়াছে। এই যে নানা প্রকারের মতামত দেখা যায়, তাহার জন্য এই সকল গ্রন্থই দায়ী। মতামত সব গ্রন্থ হইতেই আসিয়াছে আর গ্রন্থ সকলই কেবল জগতে যত প্রকার অত্যাচার ও গোঁড়ামী চলিয়াছে, তাহাদের জন্য দায়ী। বর্ত্তমান কালে গ্রন্থ সমূহই সর্ব্বত্র মিথ্যাবাদীর সৃষ্টি করিতেছে। সকল দেশেই যে মিথ্যাবাদীর সংখ্যা কিরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া থাকি!

উহার গুণ।

তার পর প্রতিমার সম্বন্ধে—প্রতিমার উপযোগিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইবে—সমগ্র জগতে আপনারা কোন না কোন আকারে প্রতিমার ব্যবহার দেখিতে পাইবেন। কতকগুলি ব্যক্তি মানবাকার প্রতিমার অর্চ্চনা করিয়া থাকে আর আমার

প্রতিমা।

বিবেচনায় উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রতিমা। আমার যদি প্রতিমা পূজায় প্রয়োজন হয়, তবে আমি পদ্মাকৃতি, গৃহাকৃতি বা অন্য কোন আকৃতি প্রতিমা না করিয়া বরং মানবাকৃতি প্রতিমার উপাসনা করিব। এক সম্প্রদায় মনে করেন, এই প্রতিমাটীই ঠিক ঠিক প্রতিমা, অপরে মনে করেন, উহা ঠিক নয়। খ্রীষ্টিয়ান মনে করেন, ঈশ্বর ঘুঘুর রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিলেন, ইহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু হিন্দুদের মতানুসারে তিনি যে গোরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, উহা সম্পূর্ণ ভ্রম ও কুসংস্কারাত্মক। য়াহুদীরা মনে করেন যে, দুই দিকে দুই দেবদূত উপবিষ্ট—সিন্দুকের আকৃতি একটী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিলে তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু নর বা নারীর আকারে যদি কোন প্রতিমা গঠিত হয়, তবে উহা ঘোরতর দোষাবহ। মুসলমানেরা মনে করেন যে, তাঁহাদের প্রার্থনার সময় যদি পশ্চিম দিকে মুখ করিয়া কাবানামক কৃষ্ণপ্রস্তরযুক্ত মন্দিরটীর আকৃতি চিন্তা করিতে চেষ্টা করা যায়, তাহাতে কোন দোষ নাই, কিন্তু চার্চ্চের আকৃতি ভাবিলেই তাহা পৌত্তলিকতা। প্রতিমা পূজায় এইরূপ গোঁড়ামি আসিবার আশঙ্কা রূপ দোষ বিদ্যমান। তথাপি প্রতিমা পূজা প্রভৃতি সমুদয়ই ধর্ম্মের চরমাবস্থায় আরোহণের আবশ্যকীয় সোপানাবলি বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শুধু একখানি গ্রন্থের দোহাই দিলেই চলিবে না। কেবল শাস্ত্রের গোঁড়ামী না করিয়া আমরা নিজেরা যথার্থ কি বিশ্বাস করি, তাহা ভাবিতে হইবে। আপনি নিজে কি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, ইহাই প্রশ্ন। ঈশা মসি বুদ্ধ এই এই করিয়াছিলেন বলিলে কি হইবে—যতদিন না আমরা নিজেরাও সেগুলি জীবনে পরিণত করিতেছি। আপনি যদি একটা ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া মুশা এই খাইয়াছিলেন বলিয়া চিন্তা করেন, তাহাতে ত আপনার পেট ভরিবে না—এইরূপ মুশার এই এই মত ছিল জানিলেই আর আপনার উদ্ধার হইবে না। এ সকল বিষয়ে আমার মত অতিশয় উদার। কখন কখন আমার মনে হয়, যখন এই সব প্রাচীন আচার্য্যগণের সহিত আমার মত মিলিতেছে, তখন আমার মত অবশ্যই সত্য, আবার কখন কখন ভাবি, আমার সঙ্গে যখন তাঁহাদের মত মিলিতেছে, তখন তাঁহাদের মত ঠিক। আমি আপনাদের সকলকে ঐরূপ স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে বলি। এই সমস্ত বিশুদ্ধস্বভাব আচার্য্যগণের গোঁড়া হইবেন না। তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ ভক্তিশ্রদ্ধা করুন,

স্বাধীনভাবে গবেষণা করিয়া ধর্ম্মকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে হইবে।

কিন্তু ধর্ম্মটাকে একটা স্বাধীন গবেষণার বস্তু বলিয়া দৃষ্টি করুন। তাঁহারা যেমন নিজেরা চেষ্টা করিয়া জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়াছিলেন, আমাদিগকেও তদ্রূপ নিজের নিজের জন্য চেষ্টা করিয়া জ্ঞানালোক লাভ করিতে হইবে। তাঁহারা জ্ঞানালোক পাইয়াছিলেন বলিয়াই আমাদের তৃপ্তি হইবে না। আপনাদিগকে বাইবেল হইতে হইবে বাইবেলকে পথের আলোকস্বরূপ, পথপ্রদর্শক স্তম্ভ বা নিদর্শনস্বরূপ ভক্তিশ্রদ্ধা করা ছাড়া উহার অনুসরণ কারতে হইবে না।

উহাদের মূল্য ঐ পর্য্যন্ত, কিন্তু প্রতিমাপূজাদি অত্যাবশ্যক। আপনারা মনকে স্থির করিবার অথবা কোনরূপ চিন্তা করিবার চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। আপনারা দেখিবেন, আপনাদের মনে মনে মূর্ত্তি গঠন না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না। দুই প্রকার ব্যক্তির মূর্ত্তিপূজার প্রয়োজন হয় না—নরপশু, যে ধর্ম্মের কোন ধার ধারে না আর সিদ্ধ পুরুষ, যিনি এই সকল সোপান পরম্পরা অতিক্রম করিয়াছেন। আমরা যতদিন এই দুই অবস্থার মধ্যে অবস্থিত ততদিন আমাদের ভিতরে বাহিরে কোন না কোনরূপ আদর্শ বা মূর্ত্তির প্রয়োজন হইয়া থাকে। উহা কোন পরলোকগত মানব হইতে পারে অথবা কোন জীবিত নর বা নারী হইতে পারে। ইহা অবশ্য ব্যক্তির উপর, দেহের উপর আসক্তি আর ইহা খুবই স্বাভাবিক। আমাদের স্বভাবই এই যে, আমরা সূক্ষ্মকে স্থূলে পরিণত করিয়া থাকি। যদি আমরাই এইরূপ সূক্ষ্ম হইতে স্থূল না হইব, তবে আমরা এখানে এরূপ অবস্থায় রহিয়াছি কেন? আমরা স্থূলভাবাপন্ন আত্মা আর সেই কারণেই আমরা এই পৃথিবীতে আসিয়াছি। সুতরাং মূর্ত্তিই যেমন আমাদিগকে এখানে আনিয়াছে, মূর্ত্তির সহায়তায়ই আমরা ইহার বাহিরে যাইব। ইহা হোমিওপ্যাথিক সদৃশ চিকিৎসার মত 'বিষস্য বিষমৌষধং'। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়সমূহের দিকে গিয়া আমাদিগকে মানুষভাবাপন্ন করিয়াছে, আর মুখে আমরা যাহাই বলি না কেন, আমরা সাকার পুরুষ সমূহের উপাসনা করিতে বাধ্য। বলা খুব সহজ বটে, সাকারের উপর আসক্ত হইও না, কিন্তু আপনারা দেখিবেন, যে একথা বলে, সেই ব্যক্তিই সাকারের উপর ঘোরতর আসক্ত—তাহার বিশেষ বিশেষ নরনারীর উপর তীব্র আসক্তি—তাহারা মরিয়া গেলেও তাহাদের প্রতি তাহার আসক্তি যায় না—সুতরাং মৃত্যুর পরেও সে তাহাদের

প্রতিমাপূজার অত্যাবশ্যকতা।

অনুসরণেচ্ছুক। ইহার নামই পুতুলপূজা। ইহাই পুতুলপূজার বীজ, মূল কারণ. আর যদি কারণই রহিল, তবে কোন না কো৻ আকারে মূর্ত্তিপূজা থাকিবেই থাকিবে। কোন জীবিত মন্দ প্রকৃতি নর বা নারীর উপর আসক্তি অপেক্ষা খ্রীষ্ট বা বুদ্ধের প্রতিমার উপর আসক্তি থাকা—টান থাকা—কি ভাল নয়? পাশ্চাত্যদেশীয়েরা বলিয়া থাকে, মূর্ত্তির সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসা বড়ই খারাপ—কিন্তু তাহারা একটা স্ত্রীলোকের সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তাহাকে, 'তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার জীবনের আলোক, তুমি আমার নয়নের আলো, তুমি আমার আত্মা' এই সব অনায়াসে বলিতে পারে। তাহাদের যদি চার পা থাকিত, তবে চার পায়ের হাঁটু গাড়িয়া বসিত! ইহা সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত পৌত্তলিকতা! পশুরা ঐরূপে হাঁটু গাড়িয়া বসিবে! একটা স্ত্রীলোককে আমার প্রাণ, আমার আত্মা বলার মানে কি? এভাব ত দুদিনের বেশী থাকে না—এ কেবল স্ত্রী পুরুষের দৈহিক আসক্তি মাত্র। তা যদি না হইবে, তবে পুরুষ পুরুষের নিকট ঐরূপে হাঁটু গাড়িয়া বসে না কেন? পশুগণের মধ্যে যে কায দেখিতে পান, উহাও সেই কামবৃত্তি—কেবল একরাশ ফুলচাপা দেওয়া মাত্র। কবিরা ইহার একটা সুন্দর নামকরণ করিয়া উহার উপর আতর গোলাপজল ছড়া দেন—তাহা হইলেও উহা কাম ছাড়া আর কিছুই নহে। লোকজিৎ জিন বুদ্ধের মূর্ত্তির সমক্ষে এরূপে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া তুমিই আমার জীবনস্বরূপ বলা কি উহাপেক্ষা ভাল নহে? আমি কোন স্ত্রীলোকের সম্মুখে হাঁটু না গাড়িয়া বরং শত শতবার এইরূপ অনুষ্ঠান করিব।

আসল 'পুতুলপূজা' কি?

আর এক প্রকার প্রতীক আছে—পাশ্চাত্য দেশে ঐরূপ প্রতীকোপাসনার অস্তিত্ব নাই, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রে উহার উল্লেখ আছে। আমাদের শাস্ত্রকারেরা মনকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা বিভিন্ন বস্তুকে ঈশ্বররূপে উপাসনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন—আর ঐ সমুদয় উপাসনাগুলির প্রত্যেকটীই ভগবৎপ্রাপ্তির এক একটী সোপানস্বরূপ—প্রত্যেকটীতেই তাঁহার কিছু না কিছু নিকটে পৌঁছাইয়া দেয়। অরুন্ধতী দর্শনন্যায়ের দ্বারা শাস্ত্রে এই তত্ত্বটী অতি সুন্দর ভাবের বিবৃত হইয়াছে।

অরুন্ধতী দর্শনন্যায়ের প্রতীক ও প্রতিমা পূজার উপযোগিতা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা—মূর্ত্তিতে ঈশ্বরারোপ করায় উপকারিতা—ঈশ্বরে মূর্ত্তি আরোপে দোষ।

অরুন্ধতী অতি ক্ষুদ্র নক্ষত্র। ঐ নক্ষত্র কাহাকেও দেখাইতে হইলে প্রথমে উহার নিকটবর্ত্তী একটী খুব বড় নক্ষত্র দেখাইতে হয়। তাহাতে লক্ষ্য স্থির হইলে তাহার নিকটস্থ একটী ক্ষুদ্রতর নক্ষত্রে—তার পর তদপেক্ষা ক্ষুদ্রতর নক্ষত্রে লক্ষ্য স্থির হইলে অতি ক্ষুদ্রতম অরুন্ধতী নক্ষত্র দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এইরূপে এই সকল বিভিন্ন প্রতীক ও প্রতিমায় মানবকে ক্রমে সেই সূক্ষ্ম ঈশ্বরকে লক্ষ্য করাইয়া থাকে। বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের উপাসনা—এই সবই প্রতীকোপাসনা—ইহাতে মানবকে প্রকৃত ঈশ্বরোপাসনার সমীপে পঁহুছিয়া দেয় মাত্র, কিন্তু বুদ্ধ ও খ্রীষ্টের উপাসনায় কোন ব্যক্তির মুক্তি হইতে পারে না, তাঁহাকে উহা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। যীশু খ্রীষ্টের ভিতর ঈশ্বরের প্রকাশ হইয়াছিল, কিন্তু কেবল ঈশ্বরই আমাদিগকে মুক্তিদানে সমর্থ। অবশ্য এমন অনেক দার্শনিক আছেন, যাঁহাদের মতে ইঁহারা প্রতীক নহেন, ইঁহাদিগকে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য। যাহা হউক, আমরা এই সমুদয় বিভিন্ন প্রতীক, এই সমুদয় সোপানপরম্পরা গ্রহণ করিতে পারি, তাহাতে আমাদের কোন ক্ষতি হইবে না। কিন্তু যদি এই সব প্রতীকোপাসনার সময় আমরা মনে করি, আমরা ঈশ্বরোপাসনা করিতেছি, তাহা হইলে আমরা সম্পূর্ণ ভ্রমে পড়িব। যদি কোন ব্যক্তি যীশুখ্রীষ্টের উপাসনা করেন ও মনে করেন, তিনি উহা দ্বারাই মুক্ত হইবেন, তিনি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

যদি কেহ মনে করে যে, ভূত প্রেতের উপাসনা করিয়া বা কোন মূর্ত্তি পূজা করিয়া তাহার মুক্তি হইবে, তবে সে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তবে যদি আপনি মূর্ত্তিটী ভুলিয়া তন্মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পারেন, তবে আপনি যে কোন বস্তুর ভিতর ঈশ্বর দর্শন করিয়া তাহাকে উপাসনা করিতে পারেন। ঈশ্বরে অন্য কিছু আরোপ করিবেন না, কিন্তু যে কোন বস্তুতে ইচ্ছা ঈশ্বরারোপ করিতে পারেন। একটা বিড়ালের মধ্যে আপনি ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারেন। বিড়ালের বিড়ালত্ব ভুলিতে পারিলেই আর কোন গোল নাই, কারণ, তাহা হইতেই সমুদয় আসিয়াছে। তিনিই সব। আমরা একখানি চিত্রকে ঈশ্বর-রূপে উপাসনা করিতে পারি, কিন্তু ঈশ্বরকে ঐ চিত্ররূপে উপাসনা করিলে চলিবে না। চিত্রে ঈশ্বরারোপে কোন দোষ নাই, কিন্তু চিত্রকেই ঈশ্বর মনে করায় দোষ আছে। বিড়ালের মধ্যে ঈশ্বর দর্শন—সে ত খুব ভাল কথা—তাহাতে কোন বিপদাশঙ্কা নাই। কিন্তু বিড়ালরূপী ঈশ্বর প্রতীক মাত্র। প্রথ-মোক্তটী ভগবানের যথার্থ উপাসনা।

তার পর ভক্তিযোগে প্রধান বিচার্য্য—শব্দশক্তি। আমরা সে দিন আচার্য্যের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম। এক্ষণে ভক্তিযোগের অন্তর্গত নাম শক্তির আলোচনা করিতে হইবে। সমগ্র জগৎ নামরূপাত্মক। হয় উহা নাম ও রূপের সমষ্টি স্বরূপ, অথবা উহা কেবল নাম মাত্র এবং উহার রূপ কেবল একটী মনে কর মূর্ত্তিমান। সুতরাং ফলে এই দাঁড়াইতেছে যে এমন কিছুই নাই, যাহা নামরূপাত্মক নহে। আমরা সকলেই বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর নিরাকার, কিন্তু যখনই আমরা তাঁহার চিন্তা করিতে যাই, তখনই তাঁহাকে নামরূপযুক্ত ভাবিতে হয়। চিত্ত যেন একটী স্থির হ্রদের তুল্য, চিন্তা সমূহ যেন ঐ চিত্ত হ্রদের তরঙ্গ-স্বরূপ আর এই সকল তরঙ্গের স্বাভাবিক আবির্ভাব প্রণালীকেই নামরূপ কহে। নামরূপ ব্যতীত কোন তরঙ্গই উঠিতে পারে না। যাহা একরূপ মাত্র, তাহাকে চিন্তা করিতে পারা যায় না। উহা অবশ্যই চিন্তার অতীত বস্তু হইবে, কিন্তু যখনই উহা চিন্তা ও জড়পদার্থের আকার ধারণ করে, তখনই উহার অবশ্যই নামরূপ আসিয়া থাকে। আমরা উহাদিগকে পৃথক্ করিতে পারি না। অনেক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, ঈশ্বর শব্দ হইতে এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছেন। খ্রীষ্টিয়ানগণের যে একটা মত আছে, শব্দ হইতে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে, সংস্কৃত ভাষায় উহার নামই শব্দ ব্রহ্মবাদ। উহা একটী প্রাচীন ভারতীয় মত, ভারতীয় ধর্ম্ম প্রচারকগণ কর্ত্তৃক ঐ মত আলেকজান্দ্রিয়ায় নীত হয় এবং তথায় ঐ মত প্রতিষ্ঠিত হয়। এইরূপে তথায় শব্দ ব্রহ্ম বাদ ও অবতারবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ঈশ্বর শব্দ হইতে সমুদয় সৃষ্টি করিয়াছিলেন, একথার গভীর অর্থ আছে। ঈশ্বর স্বয়ং যখন নিরাকার, তখন কিরূপে এই সকল আকৃতির উৎপত্তি হইল, কিরূপে সৃষ্টি হইল, তৎসম্বন্ধে ইহা ব্যতীত আর উত্তম ব্যাখ্যা হইতে পারে না। সৃষ্টি শব্দের অর্থ—বাহির করা—বিস্তার করা। সুতরাং ঈশ্বর শূন্য হইতে জগৎ নির্ম্মাণ করিলেন, এ আহাম্মকি কথার অর্থ কি? জগৎ ঈশ্বর হইতে নির্গত হইয়াছে। তিনিই জগদ্রূপে পরিণত হন আর সমুদয়ই তাঁহাতে প্রত্যাবৃত্ত হয় আবার বাহির হয়, আবার প্রত্যাবৃত্ত হয়। অনন্ত কাল ধরিয়া এইরূপ চলিবে। আমরা দেখিয়াছি, আমাদের মন হইতে যে কোন ভাবের সৃষ্টি হয়, তাহা নামরূপ ব্যতীত হইতে পারে না। মনে করুন, আপনাদের মন সম্পূর্ণ স্থির রহিয়াছে, উহা সম্পূর্ণ চিন্তাহীন রহিয়াছে। যখনই চিন্তার আরম্ভ হইবে, উহা অমনি নামও

মন্ত্র বা শব্দ শক্তির দার্শনিক তত্ত্ব।

রূপাদি আশ্রয় করিতে থাকিবে। প্রত্যেক চিন্তা বা ভাবেরই একটী নির্দ্দিষ্ট নাম ও একটী নির্দ্দিষ্ট রূপ আছে। সুতরাং সৃষ্টি বা বিকাশের ব্যাপারটাই অনন্তকাল ধরিয়া নাম রূপের সহিত জড়িত। অতএব আমরা দেখিতে পাই, মানুষের যত প্রকার ভাব আছে অথবা থাকিতে পারে, তাহার প্রতিরূপ একটী নাম বা শব্দ অবশ্যই থাকিবে। তাহাই যদি হইল, তবে যেমন আপনার দেহ আপনার মনের বহির্দ্দেশ বা স্থূল বিকাশস্বরূপ, তদ্রূপ এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডও মনেরই বিকাশস্বরূপ, ইহা সহজেই মনে করা যাইতে পারে। আরও ইহা যদি সত্য হয় যে, সমগ্র জগৎ একই নিয়মে গঠিত, তবে যদি আপনি একটী পরমাণুর গঠন প্রণালী জানিতে পারেন, তবে সমগ্র জগতের গঠন প্রণালীই জানিতে পারিবেন। আপনাদের নিজেদের শরীরের বাহ্য বা স্থূল ভাগ এই স্থূল দেহ আর চিন্তা বা ভাব উহারই আভ্যন্তরিক সূক্ষ্মতর ভাগ মাত্র। আপনারা ইহার দৃষ্টান্ত প্রতিদিনই দেখিতে পাইতে পারেন। কোন ব্যক্তির মস্তিষ্ক যখন বিশৃঙ্খল হয়, তাহার চিন্তা বা ভাব সমূহও অমনি বিশৃ-ঙ্খল হইতে থাকে। কারণ, ঐ দুইটী একই বস্তু—এক বস্তুরই স্থূল ও সূক্ষ্ম ভাগ মাত্র। মন ও ভূত বলিয়া দুইটী পৃথক্ পদার্থ নাই। ৪০ মাইল উচ্চ বায়ুমণ্ডলের কথা ধরুন। এই বায়ুমণ্ডলের যতই ঊর্দ্ধদেশে যাওয়া যায়, ততই উহা সূক্ষ্মতর হইতে থাকে। এই দেহ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। মন ও দেহ একই বস্তু—এক বস্তুই যেন সূক্ষ্ম ও স্থূলভাবে স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে। দেহটা যেন নখের মত। নখ কাটিয়া ফেলুন, আবার নখ হইবে। বস্তু যতই সূক্ষ্মতর হয়, তাহা ততই অধিক স্থায়ী হয়, সর্ব্বকালেই ইহার সত্যতা দেখা যায়; আবার যতই স্থূলতর হয়, ততই অস্থায়ী হইয়া থাকে। অতএব আমরা দেখিতেছি, রূপ স্থূলতর, নাম সূক্ষ্মতর। ভাব, নাম ও রূপ—এই তিনটী কিন্তু একই বস্তু—একেই তিন, তিনেই এক—একই বস্তুর ত্রিবিধ রূপ। সূক্ষ্মতর, কিঞ্চিৎ ঘনীভূত ও সম্পূর্ণ ঘনীভূত। একটী থাকিলেই অপর গুলিও থাকিবেই। যেখানে নাম, সেখানেই রূপ ও ভাব বর্ত্তমান। সুতরাং সহজেই ইহা প্রতীত হইতেছে যে, এই দেহ যে নিয়মে নির্ম্মিত, এই ব্রহ্মাণ্ডও যদি সেই একই নিয়মে নির্ম্মিত হয়, তবে ইহাতেও নাম, রূপ ও ভাব এই তিনটী জিনিষ অবশ্য থাকিবে। ঐ ভাবই ব্রহ্মাণ্ডের সূক্ষ্মতম অংশ, উহাই প্রকৃত পক্ষে জগতের সঞ্চালিনী শক্তি এবং উহাকেই ঈশ্বর বলে। আমাদের দেহের অন্তরালস্থ ভাবকে আত্মা এবং জগতের অন্তরালস্থ ভাবকে ঈশ্বর বলে।

তার পরই নাম এবং সর্ব্বশেষে রূপ—যাহা আমরা দর্শন স্পর্শন করিয়া থাকি। যেমন আপনি একজন নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি, এই ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড-স্বরূপ, আপনার দেহের একটী নির্দ্দিষ্ট রূপ আছে, আবার তাহার 'দেবদত্ত' বা 'অনসূয়া' প্রভৃতি স্ত্রী পুংবাচক বিভিন্ন নাম আছে, তাহার পশ্চাতে আবার ভাব অর্থাৎ যে চিন্তা বা ভাবসমষ্টির প্রকাশে এই দেহ নির্ম্মিত—তাহা রহিয়াছে; তদ্রূপ এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরালে নাম রহিয়াছে—আর সেই নাম হইতেই এই বহির্জগৎ সৃষ্ট বা বহির্গত হইয়াছে। সকল ধর্ম্ম এই নামকে শব্দব্রহ্ম বলিয়া থাকে। বাইবেলে লিখিত আছে,—'আদিতে শব্দ ছিলেন, সেই শব্দ ঈশ্বরের সহিত যুক্ত ছিলেন, সেই শব্দই ঈশ্বর।' সেই নাম হইতে রূপের প্রকাশ হইয়াছে এবং সেই নামের অন্তরালে ঈশ্বর আছেন। এই সর্ব্বব্যাপী ভাব বা জ্ঞানকে সাংখ্যেরা মহৎ আখ্যা প্রদান করেন। এই নাম কি? আমরা দেখিতে পাইতেছি, ভাবের সঙ্গে নাম অবশ্যই থাকিবে। ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত—আমি ত ইহার ভিতর কোন দোষ দেখিতে পাই না। সমগ্র জগৎ সমপ্রকৃতিক আর—আধুনিক বিজ্ঞান নিঃসংশয়ে প্রমাণ করিয়াছেন যে, সমগ্র জগৎ যে সকল উপাদানে নির্ম্মিত, প্রত্যেক পরমাণুও সেই উপাদানে নির্ম্মিত। আপনারা যদি একতাল মৃত্তিকাকে জানিতে পারেন, তবে আপনারা সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকেই জানিতে পারিবেন। সমগ্র জগৎকে জানিতে হইলে কেবল একটুখানি মাটি লইয়া উহাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলেই হইবে। যদি আপনারা একটী টেবিলকে সম্পূর্ণরূপে—উহার সর্ব্বপ্রকার ভাব লইয়া জানিতে পারেন, তাহা হইলে আপনারা সমগ্র জগৎটীকে জানিতে পারিবেন। মানুষ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সম্পূর্ণ প্রতিনিধি স্বরূপ—মানুষ স্বয়ংই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ। সুতরাং মানুষের মধ্যে আমরা রূপ দেখিতে পাই, তাহার পশ্চাতে নাম, তৎপশ্চাতে ভাব—অর্থাৎ মননকারী পুরুষ—রহিয়াছেন। সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডও অবশ্যই সেই একই নিয়মে নির্ম্মিত হইবে। প্রশ্ন এই, নাম কি? হিন্দুদের মতে এই নাম বা শব্দ—ওঁ। প্রাচীন ঈজিপ্টবাসিগণও তাহাই বিশ্বাস করিত।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।

যাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া লোকে ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, আমি সংক্ষেপে তাহাই বলিব—তাহা ওঁ।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ওমিত্যেকাক্ষরং পরং।
ওমিত্যেকাক্ষরং জ্ঞাত্বা—যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥

ওঁ এই অক্ষরই—ব্রহ্ম, ওঁ এই অক্ষরই শ্রেষ্ঠ। ওঁ এই অক্ষরের রহস্য জানিয়া যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহাই লাভ করিয়া থাকেন।

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে যাহা বলিবার বলা হইল। এক্ষণে আমরা জগতের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড ভাবগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এই ওঙ্কার সমগ্র জগতের সমষ্টিভাব বা ঈশ্বরের নাম। উহা বহির্জগৎ ও ঈশ্বর এই উভয়ের যেন মধ্যভাগে অবস্থিত উহা উভয়েরই বাচক বা প্রতিনিধি স্বরূপ। কিন্তু সমগ্র জগৎকে সমষ্টি-ভাবে না ধরিয়াও আমরা জগৎটাকে বিভিন্ন যথা ইন্দ্রিয় যথা স্পর্শ, রূপ, রস ইত্যাদি অনুসারে এবং অন্যান্য নানা প্রকারে খণ্ড খণ্ড ভাবে গ্রহণ করিতে পারি। এই প্রত্যেক স্থলেই এই ব্রহ্মাণ্ডটীকেই বিভিন্ন দৃষ্টি হইতে লক্ষ লক্ষ ব্রহ্মাণ্ড রূপে দৃষ্টি করা যাইতে পারে আর এইরূপ বিভিন্ন ভাবে দৃষ্ট জগতের প্রত্যেক-টীই স্বয়ং এক একটী সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ড হইবে এবং প্রত্যেকটীরই বিভিন্ন নামরূপ ও তাহাদের অন্তরালে একটা ভাব থাকিবে। এই অন্তরালবর্ত্তী ভাবগুলিই এই সব প্রতীক। আর প্রত্যেক প্রতীকের এক একটী নাম আছে। এইরূপ নাম বা পবিত্র শব্দ অনেক আছে আর ভক্তিযোগীরা বিভিন্ন নামের সাধন উপদেশ দিয়া থাকেন।

ওঙ্কার ব্যতীত অন্যান্য মন্ত্র।

এই ত নামের দার্শনিক তত্ত্ব বিবৃত হইল—এক্ষণে উহার সাধনে ফল কি, ইহাই বিচার্য্য। এই সব নামের একরূপ অনন্ত শক্তি আছে। কেবল ঐ শব্দগুলির উচ্চারণেই আমরা সমুদয় বাঞ্ছিত বস্তু লাভ করিতে পারি, আমরা সিদ্ধ হইতে পারি। কিন্তু তাহা হইলেও দুটী জিনিসের প্রয়োজন। 'আশ্চর্য্যোবক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা।' গুরু আলৌকিক শক্তিসম্পন্ন এবং শিষ্যেরও তদ্রূপ হওয়া প্রয়োজন। এই নাম এমন ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া চাই, যিনি উত্তরাধিকারসূত্রে উহা পাইয়াছেন। যেন অতি প্রাচীনকাল হইতে গুরু হইতে শিষ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রবাহ আসিতেছে আর গুরু পরম্পরাক্রমে আসিলেই নাম শক্তিসম্পন্ন থাকে আর উহার পুনঃপুনঃ জপে উহা প্রায় অনন্তশক্তিসম্পন্ন হয়। যে ব্যক্তির নিকট হইতে এরূপ শব্দ বা নাম পাওয়া যায়, তাঁহাকে গুরু আর যিনি পান, তাঁহাকে শিষ্য বলে। যদি বিধিপূর্ব্বক এইরূপ মন্ত্রগ্রহণ করিয়া উহা

নাম সাধনের ফল।

পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করা হয়, তবে আর ভক্তিযোগের কিছু করিবার অবশিষ্ট রহিল না। কেবল ঐ মন্ত্রের বার বার উচ্চারণে ভক্তির উচ্চতম অবস্থা আসিবে।

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্ব্বশক্তি
স্তত্রার্পিতা নিয়মিত স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দ্দৈবমবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

হে ভগবন্, আপনার কত নাম রহিয়াছে। আপনি জানেন, উহাদের প্রত্যেকের কি তাৎপর্য্য। সব নামগুলিই আপনার। প্রত্যেক নামেই আপনার অনন্তশক্তি রহিয়াছে। এই সকল নাম উচ্চারণের কোন নির্দ্দিষ্ট দেশ কালও নাই—কারণ, সব কালই শুদ্ধ ও সব স্থানই শুদ্ধ। আপনি এত সহজলভ্য, আপনি এমন দয়াময়। আমি অতি দুর্ভাগ্য যে, আপনার প্রতি আমার অনুরাগ জন্মিল না।

ভারতে শিল্পাদর্শ।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।] [শ্রীপ্রিয়নাথ সিংহ।

আমাদের ধারণা জীবন ধারণের জন্য আহার যেমন প্রয়োজন, মানব-জাতির মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য সেই মত আত্মবাদীর প্রয়োজন, এবং জগতে সর্ব্বপ্রকার মানসিক উন্নতির উদ্বোধন এক মাত্র আত্মবাদীর দ্বারাই হইয়া আসিয়াছে। পৃথিবীতে যে জাতি যত অধিক পরিমাণে আত্মবাদীর সংস্পর্শে আসিয়াছে সে জাতির মানসিক উন্নতি তত অধিক। আর যাহারা আত্ম-বাদীর সংস্পর্শে একেবারেই আসে নাই তাহারা অদ্যাপি পশুবৎ। চীন জাপানীরা ভারতীয় ধর্ম্মের সহিত ভারতের শিল্প প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদ্রূপ বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব্বেও আর্য্যরা অপরাপর জাতির মধ্যে বৈদিক ভাব সমূহের প্রচারের সহিত বৈদিক যুগের শিল্পও বিস্তৃত করিয়া-ছিলেন। শুক্রাচার্য্যের অসুররাজ্যে গমন করতঃ তাহাদের আচার্য্যত্ব গ্রহণ এবং বহুকাল পরে পুনরায় দেবলোকে প্রত্যাবর্ত্তন, বশিষ্ঠদেবের মহাচীনে যোগসাধনাদির নিমিত্ত গমন, জনৈক ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের সহিত সক্রেটিসের

এথেন্সে মিলন ইত্যাদি ইতিহাস প্রোক্ত ঘটনাগুলিতে ঐ বিষয়ের আভাস পাওয়া যায়।

স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন ভারতের ঠিক ঠিক ইতিহাস যখন আবিষ্কৃত হইবে তখন প্রমাণিত হইবে যে ধর্ম্ম বিষয়ে ভারত যেমন মনুষ্য কুলের আদি গুরু শিল্প সম্বন্ধেও তদ্রূপ। মানবের ভগবৎ জ্ঞান লাভের জন্য যেমন ভগবানের অবতার হওয়া আবশ্যক, আমাদের মনে হয় সমগ্র মানব জাতিকে শিল্পাদি ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়া উন্নত করিবার জন্য আত্মবাদী জাতিরও তেমনি প্রয়োজন। পাশ্চাত্য ধারণা, গ্রীক রোমকেরাই সভ্যতার আদি গুরু। চীন জাপানের ইতিহাসালোচনায় কিন্তু ঐ বিষয়ের বিপরীত ধারণাই হয়। জাপানের ইতিহাস লেখক কাপ্তেন বৃঙ্কলে জাপানী শিল্পের বিকাশ সম্বন্ধে দেখাইয়াছেন যে ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্ম জাপানে আসিবার পর জাপানীদের শিল্প-শক্তির অভিব্যক্তি আরম্ভ হয়। জাপানী ভাস্কর্য্যের যে প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় তৎসম্বন্ধে তিনি এই কথা বলেন, "৮৫০—৮৮০ খৃষ্টাব্দে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা পায়, আর জাপানের উৎকৃষ্ট শিল্প শক্তি এই নূতন বিশ্বাসে ব্যয়িত হয়। সুতরাং উৎকৃষ্ট চিত্র যাহা বর্ত্তমান আছে তাহা নারার নিকট হরিউজীর মন্দিরের দেওয়ালের সাজ। ইহা সপ্তম শতাব্দীতে ঘটে। ধর্ম্ম ও শিল্পের এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ জাপানে যেমন এমন আর অন্য কোন দেশে দেখা যায় না। কেবল চিত্রকলা নয় ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য এই সঙ্গে প্রবেশ করে। কিন্তু আরও ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায় যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে শিল্পের বিভিন্ন ধরণ ধারণ (style) ও উৎপন্ন হয়। জাপানী শিল্পে সেই জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের দরুণ গ্রীক ধরণ স্পষ্ট দেখা যায়, কারণ সেকেন্দর বাদসার অধিকার হইতে উত্তর ভারতে গ্রীক সভ্যতার প্রচার হয়; এবং তথা হইতে তাহা বৌদ্ধ ধর্ম্মের ভিতর দিয়া চীন জাপানে আনীত হয়।" *

বৃঙ্কলের শেষোক্ত কথাগুলি ন্যাজামুড়ো বাদ দিয়া লইতে হইবে। কারণ সেকেন্দর যখন ভারতে আসেন, ভারতের স্থাপত্য তখন গ্রীক স্থাপত্য অপেক্ষা অনেক উন্নত এবং ইহার অভ্রান্ত প্রমাণ গ্রীক ইতিহাসেই বর্ত্তমান। +

* Capt. F. Brinkley's Japan. Its History art & Literature. Vol VII. p. 17.

+ Indo Aryan Vol 1. p. 44.

সেকেন্দর ভারতে অবৈতনিক চিকিৎসালয়, অতিথিশালা, বিদ্যালয়, বিশ্ব-বিদ্যালয়, মহা উন্নত নৌযুদ্ধের প্রণালী* প্রভৃতি দেখাইয়াছিলেন। সেকেন্দর নিজে এই প্রাচ্যদেশে সভ্য পরিচ্ছদ, (পায় জামা ও চোগা) পরিতে শিখেন ও ভারতীয় চিকিৎসক নিজ পলটনে নিযুক্ত করেন। (১) ভাস্কর্য্য বিদ্যা পানি-নীর পূর্ব্ব হইতেই এদেশে ছিল নতুবা পানিনী ভাস্কর্য্য, তক্ষক, বর্দ্ধকী এ সকল কথার ব্যুৎপত্তি কেন লিখিবেন? (২) পাশ্চাত্যদের মতে পানিনী খৃষ্ট পূর্ব্ব ১১০০ সালে জন্মান। এই সময়ে গ্রীক শিল্পের বোধ হয় জন্মই হয় নাই। ফাগুর্সন, কনিংহাম্, ম্যাক্‌স্‌মুলার, মূর প্রভৃতি সমস্ত পাশ্চাত্য প্রত্ন-তত্ত্ববিদের ঐ গ্রীকী ভ্রান্ত মত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সপ্রমাণ খণ্ডন করিয়াছেন। ১৯০০ সালে পারিস্ সহরের মহাপ্রদর্শনীতে য়ুরোপী প্রত্ন-তত্ত্ববিদ্‌গণের সভায় আহুত হইয়া স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহাদের ভারতের প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধি গবেষণায় গ্রীক প্রাদুর্ভাব দেখানের বিশেষ প্রতিবাদ করেন। এবং বলেন, যে ভারত কোন বিষয়েই গ্রীক জাতিকে গুরুত্বে বরণ করে নাই। যদি স্থাপত্য বা ভাস্কর্য্য গ্রীকদের নিকট গ্রহণ করিল, তবে সঙ্গীত সম্বন্ধে কেন কোন কিছু গ্রহণ করে নাই, আমাদের সঙ্গীতেও ত অনেক অভাব আছে? পাশ্চাত্য সঙ্গীতে যে বস্তু অধিক পরিমাণে আছে আমাদের সঙ্গীতে তাহার বিশেষ অভাব; আবার আমাদের সঙ্গীতে যাহা বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান, পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তাহার বড়ই অভাব। বৃক্‌লে আরও বলেন "পণ্ডিতেরা জাপানী শিল্পের জন্ম সময় ৫৬৩—৫৬৭ খৃষ্টাব্দে নির্দ্ধারিত করেন। ঐ কালেই চীনের দরবারী সভ্যতা, ভাষা ও আদব কায়দা এবং তাহার সঙ্গে বৌদ্ধ মন্দিরাদি সুসজ্জিত করিবার শিল্পও (যথা কারুকার্য্য, দেওয়ালের চিত্র প্রভৃতি) জাপানে প্রবিষ্ট হয়। কিন্তু সময়টা ঠিক নির্দ্ধারিত করার আবশ্যক নাই, কারণ এ বিষয়ে প্রচলিত জনশ্রুতি ব্যতীত বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস নাই।† তবে সপ্তম শতাব্দীর অনেকগুলি শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বর্ত্তমান আছে। ভাস্কর্য্য শিল্পের কতকগুলি নিদর্শন খুবই উচ্চদরের হইয়াছিল।

* Magasthenese's Description of Ancient India

১। স্বামী বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য।

২। Dr. R. L. Mitra Indo Aryan I. p. 39.

† Brinkley's Japan & China p. 17.

সে সকল নারার মন্দিরে অদ্যাপি আছে। কোন সমালোচকই শিল্পচাতুর্য্য সম্বন্ধে ঐ নিদর্শন গুলিকে অত্যুচ্চ স্থান না দিয়া থাকিতে পারেন না। কিন্তু জনশ্রুতি আছে যে, কোন অজ্ঞাতনামা চীনে বা কোরিয়ার ভাস্করই উহা গড়ে। কিন্তু চীন বা কোরিয়ায় এরূপ শিল্পের কোনও নিদর্শন পাওয়া যায় না। জাপানের শিল্পের ইতিহাস আবিষ্করণে এই প্রকার কঠিন সমস্যা পদে পদে উঠে। হইতে পারে ধর্ম্মের খাতিরে ঐ সকল শিল্প কার্য্য করিতে যাইয়া জাপানী শিল্পী নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ যথা নাম যশের ইচ্ছা নিমজ্জিত রাখিয়াছিল। এবং চীনে ও কোরিয়রা জাপানে ধর্ম্ম প্রচার, ব্যাখ্যা এবং মন্দিরাদি শিল্পভূষিত করিয়াছিল বলিয়া লোকে মনে করিতে পারে তাহাদের শিল্পীই ঐ সমস্ত ভাস্কর্য্য প্রস্তুত করিয়াছিল। জাপানীরা যে কারণেই হউক কিন্তু চীন কোরিয়াদেরই প্রতি ঐ উচ্চ কার্য্যের সুখ্যাতি অর্পণ করে। এস্থলে জাপানী শিল্পী নিজের স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া সম্ভবত পরবর্ত্তী লোকেরা এই ভ্রমে পতিত হয়। ঐ বিষয়ে সুখ্যাতি প্রকৃত পক্ষে জাপানীর প্রাপ্য।" * আর একস্থলে বৃঙ্কলে বলেন "অতি অল্পকাল হইল অতি বিশদ ভাবে ও অতি বুদ্ধিমত্তার সহিত ঐ নারা এবং অন্যত্রের শিল্পগুলি বিচার করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে।+

যাহা হউক পূর্ব্বে যে কি গোলযোগ ছিল তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি—কাকুজির মন্দিরের কুলুঙ্গিতে দুটী প্রমাণ ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের মূর্ত্তি (কাঠের ভাস্কর্য্য) আছে। শিল্পীর উদ্দেশ্য ভীমপরাক্রম ও অবিচলিতদৃঢ়তা, ঐ সকল অসুর বিনাশী দেবদেবীর মূর্ত্তিতে পরিস্ফুট করেন। ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধিও মূর্ত্তিদ্বয়ে অভ্রান্তরূপে বিকশিত আছে। কালের প্রভাবে অবশ্য ইহার রং উঠিয়া গিয়াছে (এই স্থানে বৃঙ্কলে টীকা করিয়াছেন—"ইন্দ্রের রং লাল, ব্রহ্মার সবুজ (!)" এটা কি কলমের ভ্রম, না সে দেশে এই ভ্রম প্রচলিত ?) কিন্তু তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিমাণের সামঞ্জস্য কিংবা তাহাদের বীরোচিত গাম্ভীর্য্য ও ভঙ্গী বিনষ্ট হয় নাই। যদি ঐ মূর্ত্তিগুলি গ্রীসের কোন ভগ্নাবশিষ্ট নগর হইতে বাহির হইত তবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা তখনি উহাদের বহুমান ও প্রশংসা করিতেন। এই মূর্ত্তিদ্বয় ও পূর্ব্বকথিত ভাস্কর্য্য নিদর্শনের ন্যায় একজন নামহীন কোরিয়ার শিল্পীর দ্বারাই নির্ম্মিত বলিয়া প্রবাদ।

* Brinkley's Japan & China p. 19.

+ অবশ্য য়ুরোপী পণ্ডিতেরাই ঐগুলির বিচার ও শ্রেণীবিভাগ করেন।

ঐ শিল্পী ষষ্ঠ শতাব্দীতে জাপানে আসিয়াছিলেন। এই ধারণা অদ্যাপি অনেক প্রসিদ্ধ লোকেরও আছে। এইরূপে অনুসন্ধানে, জাপানী ভাস্কর্য্য বিদ্যার ইতিহাসে নানা গোলমাল দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ পূর্ব্বোক্ত মূর্ত্তিদ্বয় ১৩ শতাব্দীর উঁচ্চেই শ্রেণীভুক্ত বলিয়া স্পষ্টই মনে হয়, অথচ যিনি ঐ মূর্ত্তিদ্বয়ের নির্ম্মাণকর্ত্তা বলিয়া লোক প্রবাদ, তিনি জাপানে যে সময় আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া এ দেশের লোকে নির্দ্দেশ করে, তখন চীন, জাপান, কোরিয়াতে ভাস্কর্য্য শিল্পের শৈশবাবস্থা মাত্র। ঐ মূর্ত্তি দুইটীর গঠনের ভাব ও অঙ্গ সংস্থানাদি এতই সুন্দর যে চীনে বা কোরিয়ায় কোন কালেই ঐরূপ ভাস্কর্য্য-নিদর্শন পাওয়া যায় না। জাপানে ১৩ শতাব্দীর ভাস্কর্য্য সমস্ত এই প্রকারের অতি উচ্চ দরের। অতএব বিচার বুদ্ধির ও ইতিহাসের প্রতি আদৌ লক্ষ্য না রাখিয়া ঐ মূর্ত্তিদ্বয়কে কোন অজ্ঞাতনামা চীনে বা কোরিয় শিল্পি গঠিত না বলিয়া ১৩ শতাব্দীর উঁচ্চেই শিল্পশ্রেণীভুক্ত বলাই উচিত মনে হয়।" * আমরা জানি চীন জাপান ও কোরিয়ার অনেক প্রাচীন মন্দিরে বাংলা অক্ষরে নমো বুদ্ধায় ইত্যাদি মন্ত্র লেখা আছে। বৃক্লে এ কথার উল্লেখ তাঁহার এত বড় ইতিহাসে একেবারেই করেন নাই! অথচ স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়াছেন যে ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মযাজকগণ জাপানে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন যতদিন না কোরিয়া রাজ, জাপান রাজকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পরোয়ানা পাঠান ততদিন ভারতের বৌদ্ধাচার্য্যগণ তথায় ধর্ম্মবিস্তারে বড় একটা কৃতকার্য্য হন নাই। রাজার সহায় প্রাপ্ত হইলে ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা অতি শীঘ্র ঘটে বটে, কিন্তু চীন জাপানাদি দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার ভারতীয় পরিব্রাজকদের দুর্দ্দমনীয় উদ্যমেই যে ঘটিয়াছিল, ইতিহাস এখন এ বিষয়ের সম্পূর্ণ সাক্ষ্য দেয়। ভারতে ধর্ম্মাশোকের সময় হইতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী পর্য্যন্ত শিল্পোন্নতি খুব বিশদ ভাবে হয়। আমাদের বিবেচনায় জাপানী ভাস্কর্য্যের যথাযথ ইতিহাস পাইতে হইলে ঐতিহাসিককে উড়িষ্যা, অজন্তা, কান্দাহার, দাক্ষিণাত্য এবং বাঙ্গালার স্থানে স্থানে অদ্যাপি যে সকল শিল্পনিদর্শন পাওয়া যায় তাহার সহিত মিলাইয়া বিচার করিতে হইবে। ভারতীয় ধর্ম্মের সঙ্গে যখন জাপানি শিল্প এত ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ তখন প্রচলিত প্রবাদ মত উক্ত ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের মূর্ত্তিগুলি সপ্তম শতাব্দীতেই উৎপন্ন বলিয়া মানিয়া লইয়া পূর্ব্বোক্ত বিচার

* Ibid VII. p. 111, 112, 113.

আরম্ভ করাই যুক্তিযুক্ত। ১৩শত বৎসর ধরিয়া লোকে যাহা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে তাহা সহসা অগ্রাহ্য করা উচিত নহে। আবার মূর্ত্তিগুলির নির্ম্মাণকর্ত্তা যদি স্বেচ্ছায় ধর্ম্মের প্রেরণায় আত্মগোপন করিয়া থাকেন, তবে উঁঙ্কেই উহাদের প্রণেতা ইহা কেমন করিয়া সিদ্ধান্ত হইতে পারে। উঁঙ্কেই তাঁহার অপর সমস্ত শিল্প আপনার বলিয়া স্বীকার করিয়া কেবল কোকুকুজি ও নারার মূর্ত্তিগুলির সময়েই কি আত্মগোপন করিয়াছিলেন? জাপানীরা অদ্যাপি বিশ্বাস করে এবং তাহাদের বুধমণ্ডলীর মধ্যেও এই বিশ্বাস প্রচলিত যে ঐ মূর্ত্তিগুলি কোন জাপানী কৃত নয়, জাপানের বহির্ভূত কোন দেশের লোকের দ্বারা কৃত। বৃক্ষলে অবশ্য জাপানেই জনশ্রুতি শুনিয়াছিলেন যে যিনি ঐ মূর্ত্তির ভাস্কর তিনি ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মের প্রেরণায় আত্মগোপন করিয়াছিলেন। জাপানীমনে ঐ ঘটনা অদৃষ্টপূর্ব্ব ও অদ্ভুৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল বলিয়াই উহা প্রবাদরূপে অদ্যাপি সুরক্ষিত। অতএব ধর্ম্মের প্রেরণায় আত্মগোপন করা প্রাচীন জাপানের জাতীয় চরিত্র ছিল না বলিয়া সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। পক্ষান্তরে ইতিহাসে ভূরি প্রমান পাওয়া যায় ঐ চরিত্র ভারতের নিজস্ব। অন্ততঃ পাঁচশত বাঙ্গালি ধর্ম্ম প্রচারকের মূর্ত্তি, চিত্রিত বা কাষ্ঠনির্ম্মিত হইয়া চীনের মন্দির সমূহের মধ্যে অদ্যাপি বর্ত্তমান—চীনেরা অতীব সতর্কতার সহিত ঐ গুলি অদ্যাপি রক্ষা করে। কিন্তু বাঙ্গালী প্রচারকের দ্বারা যে ঐ প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়, এ তথ্য বাঙ্গালায় বা ভারতে কয়জন জ্ঞাত? আবার কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তিতে রং দেওয়া এক উড়িষ্যাতেই বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে। অতএব ইহা কি সম্ভব হইতে পারে না যে, বাঙ্গালী পরিব্রাজকদের পদানুসরণ করিয়া ধর্ম্মভাবাপন্ন ভারতীয় শিল্পীরাই ঐ প্রদেশে গমন করিয়া ঐ সকল মূর্ত্তি গঠন করেন? এক মাত্র ভারতেই শিল্পসাগর মন্থনে শিল্পীর নাম ধাম অতি অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতীয় শিল্পী চরিত্রের প্রধানতম লক্ষণই আত্মগোপন করা। অদ্যাপি চীন, জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্র ও তন্ত্র শাস্ত্রের দুই সহস্র বর্ষের পুরাতন স্ক্রল (scroll) পাওয়া যায়, তাহার মন্ত্র যন্ত্রাদি সমস্ত বাঙ্গালা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। হরি নামক জনৈক জাপানী পরিব্রাজক ভারত ভ্রমণকালে ঐ প্রকার একটী স্ক্রল সঙ্গে আনেন এবং আমাদের দেখান অতএব প্রমাণিত হইতেছে যে বৌদ্ধ ধর্ম্মপ্রচারকদের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ শিল্পী ও তান্ত্রিক শিল্পীরাও চীন জাপানে গমন করিয়াছিলেন।

বুস্কলেকে এ কথা প্রকারান্তরে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে ভারতীয় শিল্প জাপানে ভারতীয় ধর্ম্মের সহিত প্রবিষ্ট হয়। জাপানের চিত্রকলার সমস্ত মাধুর্য্য যে রেখাপাতের উপর নির্ভর করে এ বিষয়ে এখন সকলেই একমত। ভারতের প্রাচীন যুগের চিত্রকলা যিনি অবগত তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য যে জাপানি রেখাপাত ও অজন্তার চিত্রকলার রেখাপাত মূলে একরূপ। জাপানের চিত্রসমূহের প্রধান বিষয় আত্মসংযম। উহা সকল চিত্রেরই মুখের ভাবে প্রকাশিত। * বুস্কলে জাপানি শিল্প সম্বন্ধে অনেক প্রশংসা করিলেও এ কথা কোথাও বলেন নাই! এই আত্মসংযম ব্যতিরেকে যে মানুষ উন্নতি করতে পারেনা ইহা ভারতের ভাব এবং দুই হাজার বৎসর আগে যে উহা জাপানে প্রবেশ লাভ করিয়াছে ইহাও ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে।

ধর্ম্মতত্ত্ব আমাদের দেশে যেমন এক অপার সিন্ধু শিল্পও তদ্রূপ। সমস্ত জীবন উহার আলোচনায় অতিবাহিত করিলেও উহার পরিসীমা করা যায় না। অতএব এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যে অনেক ত্রুটী ও অভাব লক্ষিতহইবে একথা বলা বাহুল্য। পরিশেষে এই সারকথা বলা আবশ্যক মনে হয় যে, আমাদের দেশে ধর্ম্ম ও শিল্প চিরকাল একই বস্তু; য়ুরোপী শিল্পের অনুকরণে আমাদের কোনও শুভ ফল ফলিবে না। কারণ প্রকৃত শিল্প শক্তির পুনর্জ্জাগরণ এদেশে ধর্ম্মের সংপ্রসারণেই হইবে। বৈদিক সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত আমাদের জাতীয়তা ধর্ম্মের উপরই প্রতিষ্ঠিত আছে, আর সেই জাতীয়তার পরিপুষ্টি যুগে যুগে মহাশক্তিমান মহাপুরুষদের আবির্ভাব হইয়াই হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের অভ্যুদয়ে বর্ত্তমান যুগে ভারতে ধর্ম্ম পুনরায় সজীব হইয়া উঠিয়াছে; অতএব শিল্প ও যে পুনর্জ্জাগরিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আর এক কথা পৃথিবীর ইতিহাস যেমন পুরাতত্ত্ববিদেরা পৃথিবীর মধ্যেই প্রাপ্ত হন তেমনি একটা জাতির ইতিহাস সেই জাতিই চিরকাল বক্ষে ধারণ করিয়া থাকে। প্রেম ও সত্যনিষ্ঠার সহিত উহা অনুসন্ধান করিলেই আবিষ্কৃত হয়। আমাদের শিল্পাদি সকলবিষয়ের ও জাতীয় জীবনের ইতিহাস আমাদের অবতারগণের জীবনে ও দেশে প্রচলিত জনশ্রুতি আদিতে নিঃসংশয় নিবদ্ধ আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনরূপ আলোকের সহায়ে উহা অনুসন্ধান করিলে নিঃসংশয় পাওয়া যাইবে।

---

* Lafcadio Hearn's Gleanings in Buddha Field p. 121.

মধুর রস ও বৈষ্ণবকবি।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর]   [শ্রীজীতেন্দ্রলাল বসু।

মিলনকালে শ্রীকৃষ্ণের যে সমস্ত দোষ শ্রীরাধার নয়নে পড়িয়া 'শঠ লম্পট' বলিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল, ক্রোধের উদয় করিয়া মানে বসাইয়াছিল, বিরহে সেই সকল দোষই যেন গুণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে ঃ—নিজের দোষ ভিন্ন আর কিছুই শ্রীরাধার এখন মনেই উদয় হইতেছে না। বুঝি তাহাকে ভালবাসা দিতে পারি নাই, বুঝি তাহার উপযুক্ত হইতে পারি নাই, তাই সে আমাকে ছাড়িয়া গেল, এই ভাবই এখন শ্রীরাধার মনে প্রবল—

শ্যামবন্ধুর কত আছে আমা হেন নারী।
তার অকুশল কথা সহিতে না পারি ॥

এখন শ্রীরাধার হৃদয়ে দীনত্ব পূর্ণমাত্রায় বিরাজমানঃ—

তাবত অলি গুঞ্জরে   যাই ফুল ধুতুরারে
যাবত ফুল মালতী নাহি ফুটে।
মোরা গ্রাম্য গোপবালিকা   ততহুঁ পশুপালিকা
হাম কি রে শ্যাম সম যোগ্যে ॥"

মিলনাবস্থায় সৌভাগ্য গর্ব্বিত রাধিকার

আমার অঙ্গের   বরণ সৌরভ
যখনে যে দিকে পায়।
বাহু পাসরিয়া   বাউল হইয়া
তখনে সে দিকে ধায় ॥

এই উক্তির সহিত উপরে উদ্ধৃত উক্তির কি মহৎ পার্থক্য! প্রেমিকার মনে বিরহ দ্বারা এমনই সুফল ফলিয়া থাকে। এইরূপ নিজ দৈন্য বোধের সহিত নিজের জীবনে ধিক্কার আসিয়া উপস্থিত হয়—

আমারে মরিতে সখি কেন কর মানা।
মোর দুখে দুখী রহ ইহা গেল জানা ॥
দাব দগধ ধিক ছটফটি এহ।
এ ছার নিলজ প্রাণে না ছাড়য়ে দেহ ॥
কানু বিনে নাহি যায় দণ্ড ক্ষণ পল।

কেমনে গোঙাব আমি এ দিন সকল॥
এ বড় শেল মোর হৃদয়ে রহল।
মরণ সময়ে তারে দেখিতে না পাইল॥
বড় মনে সাধ লাগে সো মুখ সোঙরি।
পিয়ার নিছনি লৈয়া মুঞি যাউঁ মরি॥

আর সেই বিরহক্লিষ্ট হৃদয়ে সেই "শঠ লম্পঠ পিয়া" সকল সৌন্দর্য্যের সকল গুণের আধার হইয়া জুড়িয়া বসিয়াছেন—

কাঁহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন।
কাঁহা মোর গুণনিধি ও চান্দবদন॥
কাঁহা মোর প্রাণবন্ধু নবঘন শ্যাম।
কাঁহা মোর প্রাণেশ্বর কোটী কোটী কাম॥
কাঁহা মোর নবাম্বুদ সুধা-নিরমল।
কাঁহা মোর মৃগমদ কোটীন্দু শীতল॥

এখানেই আমরা মধুর রসান্তর্গত শান্তরসের মহিমাবোধ দেখিতে পাই। এইরূপে ভক্তের আকুল ক্রন্দনের ভিতর দিয়া ভক্তির সম্পূর্ণতা প্রকাশিত হইয়াছে। বিরহে ও মিলনে এই প্রভেদ; মিলনে আমিত্বের প্রসার—বিরহে আমিত্বের সঙ্কোচ ও ক্রমশঃ তাহার একেবারে বিলোপসাধন। মিলনে চিত্তের চঞ্চলতা, বিরহে চিত্তের স্থৈর্য্য। মিলনে দেহের কার্য্য, বিরহে মনের কার্য্য, মিলনে বাহ্যশরীর দ্বারা প্রিয় সম্ভোগ, বিরহে হৃদয় দ্বারা প্রিয় রসাস্বাদন। মিলনে দেহের দ্বারা আলিঙ্গন, বিরহ হৃদয়ের নিভৃত মন্দিরে প্রিয়তমের প্রতিষ্ঠা। সেই জন্যই মিলনে শ্রীরাধা লালসাময়ী, বিরহে পাগলিনী—মিলনে, আপনগত বিশ্ব, বিরহে বিশ্বগত আপনি—মিলনে, বিশ্বের সমস্ত প্রাণী, সমস্ত জীব, সমস্ত জড় জগৎ আপনার আনন্দের উপাদান মাত্র, বিরহে সেই সকল বস্তুই যেন আত্মীয়াদপি আত্মীয় প্রিয়তমের রূপ-বিশেষ! বিরহে মেঘ আর মেঘ নাই, প্রিয়তমের প্রতিচ্ছবি হইয়া বসিয়াছে!—তমাল আর তমাল নাই, কৃষ্ণের স্বরূপ ধারণ করিয়াছে!

আকাশ নব জলধর হেরি,
সেই ধনি কাতরে করু পরলাপ
নীলাম্বরে অবশ হই না পারই
অরুণাম্বরে তনু ঝাঁপ।

নাহ না চিনই কাল কি গোর।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥
পতি কর পরশে মানই জঞ্জাল।
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥

বিরহের এতাদৃশ মহত্ব বৈষ্ণবকবি ভিন্ন অন্য কবি চিত্রিত করিতে পারিয়াছেন কি না জানিনা। আবার বৈষ্ণব কবিও বিরহচিত্রে এত মহত্ব আনিতে পারিতেন কিনা জানি না, যদি তাঁহারা শ্রীরাধার ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে ভক্ত ও ঈশ্বরের সম্বন্ধ উপলব্ধি না করিতেন। ভক্তের সহিত ভগবানের বিরহ ও সেই বিরহজনিত ভক্তের হৃদয়ে যে নিদারুণ যাতনা তাহা ভক্ত ভিন্ন কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই ও ভক্তকবি ভিন্ন তাহা চিত্রিত করিবার কাহারও শক্তি নাই। এই জন্যই বৈষ্ণব কবিতায় এখন শ্রীরাধার মনে যে ভাব দাঁড়াইয়াছে তাহা সকল প্রেমিকার লোভনীয় ইহার—নাম সম্পূর্ণমাত্রায় আত্মবিলোপ। এখন প্রিয়তমের চরণতলে তাঁহার শুধু থাকিবার আকাঙ্ক্ষা। যেখান দিয়া শ্রীকৃষ্ণ চলিবেন সেইখানকার মাটী হইয়া তাঁহার চরণের কষ্ট দূর করাই এখন তাঁহার সুখ। কোনও প্রকারে প্রিয়তমের সহিত চিরমিলন সম্পাদনই এখন তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, বা ঐকান্তিক সার্থকতা।

যাহাঁ পঁহু অরুণচরণে চলি যাত।
তাহাঁ তাহাঁ ধরণী হইয়ে মঝু গাত॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি পাহ।
হম ভরি সলিল হই তথি মাহ॥
এ সখি বিরহ-মরণ নিরদ্বন্দ্ব।
ঐছন মিলই যব গোকুলচন্দ্র॥
যো দরপণে পহুঁ নিজ মুখ চাহ।
মঝু অঙ্গ জ্যোতি হইয়ে তথি মাহ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত।
মঝু অঙ্গ তাহে হইয়ে মৃদু বাত॥
যাহাঁ পহুঁ ভরমই জলধর শ্যাম।
মঝু অঙ্গ গগন হই তুছ ঠাম॥
গোবিন্দদাস কহে কাঞ্চন গোরি।
সো মরকত-তনু তুহুঁ কিয়ে ছাড়ি॥

এইখানে আমরা মধুর রসের সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণে উপস্থিত হইয়াছি। সম্ভোগে যে আত্মসমর্পণ তাহা নিঃস্বার্থ হইলেও সম্পূর্ণ নহে। প্রেমের পারাকাষ্ঠা বিরহেই ব্যক্ত হইয়াছে মিলনে নহে। শুধু আত্মসমর্পণ নহে সেবা পাইবার আকাঙ্ক্ষা বিরহে একেবারে লুপ্ত! এ অবস্থায় সেবিত হইবার আর প্রবৃত্তি নাই কেবল সেবা করিবারই প্রবৃত্তি আছে!

তোমা না দেখিয়া শ্যাম মনে বড় তাপ।
অনলে পশিব কি যমুনায় দিব ঝাঁপ॥
এবার পাইলে রাঙ্গা চরণ দুখানি।
হিয়ার মাঝারে থুইয়া জুড়াব পরাণি॥
মুখের মুছাব ঘাম খাওয়াব পান গুয়া।
শ্রমেতে বাতাস দিব চন্দন আর চুয়া॥
মালতী ফুলেরে গাঁথিয়া দিব মাল।
বানাইয়া দিব চূড়া কুন্তল ভাল॥
কপালে চন্দন দিব তিলক চাঁন্দ।
নরোত্তম দাস কহে পিরীতের ফান্দ॥

মধুর রসে বাৎসল্যরসান্তর্গত স্নেহও আছে তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই স্নেহ বড় স্নিগ্ধ, বড় উজ্জ্বল—এ স্নেহ শত দুঃখদায়ী প্রিয়তমের বিন্দুমাত্র অমঙ্গল সহ্য করিতে পারে না—"তাঁর অকুশল কথা সহিতে না পারি॥"

এই স্নেহ এখন ব্রজের সকলকার উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে—নিজের অসহনীয় দুঃখেও শ্রীরাধা এখন ব্রজের সকলের ভাল খুঁজিতেছেন, তাহাদের সুখচিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছেন—

এই তরুশাখায় রহিল সারী শুকে।
এই দশা পিয়া যেন শুনে ইহার মুখে॥
এই বনে রহিল মোর রঙ্গিণী হরিণী।
পিয়া যেন ইহারে পুছয়ে সব বাণী॥
শ্রীদাম সুবল আদি তার যত সখা।
ইহা সবার সনে তার পুন হবে দেখা॥
দুখিনী আছয়ে তার মাতা যশোমতী।
আসিতে যাইতে তার নাহিক শকতি॥

তারে আসি পিয়া যেন দেয় দরশন।
কহিও বন্ধুরে এই সব নিবেদন॥

যেমন নিবিড় স্নেহ তেমনি গভীর সখ্য। প্রাণের সকল দুঃখ সকল সুখ প্রিয়তমের কাছে ব্যক্ত করিবার জন্যই কেবল এখন রাধিকার প্রাণ সতত ব্যাকুল—

একবার বাহুড়িয়া আইস ব্রজপুরে।
নিরখি তোমার মুখ দুখ যাউক দূরে॥
শীতল মন্দির মাঝে তোমা বসাইব।
যত মনের দুখ কথা সকলি কহিব॥

রাধা-কৃষ্ণের বিরহে, শ্রীরাধা অপেক্ষা সখীগণের কষ্ট অধিক, এত অধিক যে শ্রীরাধাকে নিজের যন্ত্রণা ভুলিয়া সখীকে প্রবোধ দিতে হয়।

নিজ সখী বদন হেরি।
সুধামুখী বুঝি কহে গদগদ বাত।
রসিক সুপাহু মোহে যদি উপেখান
তুহুঁ কাহে তাপায়সি গাত॥
মঝু লাগি যতন করলি দুখ পায়লি
দৈবহি যদি নহ কাজ।
তুহুঁ কাহে বিরস বদন ঘন রোয়সি
কি যে পুনঃ করলি অকাজ॥ *

রাধাকৃষ্ণের মিলনে সখীর অতুল আনন্দ, বিরহে অশেষ যন্ত্রণা। তাই পুনর্ব্বার যুগলমিলন সাধন করিবার জন্য সখীর অসীম উদ্যোগ ও উৎসাহ, এবং তাহা হইতেই বৈষ্ণব কবিতার "মাথুরের" উৎপত্তি। "মাথুর" অর্থাৎ সখী কর্তৃক মথুরাগত-শ্রীকৃষ্ণের নিকট শ্রীরাধার বিরহাবস্থার অপূর্ব্ব বর্ণনা! শ্রীরাধার বিরহের চরমাবস্থা এই মাথুরে বর্ণিত হইয়াছে।

আমরা দেখিয়াছি যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মুখে ব্যক্ত করা সম্ভব ততক্ষণ পর্য্যন্ত শ্রীরাধিকা নিজের দুঃখ, নিজের আকাঙ্ক্ষা, নিজের নৈরাশ্য যন্ত্রণা সখীর কাছে ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ক্রমশঃ তাঁহার এমন অবস্থা উপস্থিত হইল যে তখন আর হৃদয়ের কথা মুখে ব্যক্ত করিবার উপায় রহিল না। তখন ক্রমশঃ বাহ্য প্রলাপ অন্তর্হিত হইয়া চিন্তার কার্য্য আরম্ভ হইল। এ যন্ত্রণা

* নব্যভারত, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩১৬।

আর সখীর কাছেও প্রকাশ করা বুঝি রাধার অসহ্য ও অসাধ্য হইয়া উঠিল। ক্রন্দনে শোকের লাঘব হয়, মনের দুঃখ ব্যথার ব্যথীর কাছে ব্যক্ত করিলে কষ্টের লাঘব হয়। যতক্ষণ শ্রীরাধার কাঁদিবার শক্তি ছিল, সখীর কাছে নিজ হৃদয়ের যন্ত্রণা ব্যক্ত করিবার শক্তি ছিল ততক্ষণ রাধা তাহা দ্বারা অনেক পরিমাণে স্বস্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এখন অনবরত স্মৃতির দংশনে, অবিচ্ছিন্ন প্রিয়চিন্তায়, তাঁহার হৃদয়ের যে অবস্থা তাহা আর কথায় প্রকাশ হওয়া অসম্ভব; এখন তাঁহার ব্যথা হৃদয় মধ্যে অন্তর্নিহিত, তাঁহার কার্য্য কলাপ সাধারণ স্বভাবের সীমা অতিক্রম করিয়া যে রাজ্যে ক্ষুদ্র মনুষ্যের বুদ্ধি চলে না, সংসারবদ্ধের দৃষ্টি ভীত, চকিত হইয়া ফিরিয়া আসে সেই রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে। লোকে ইহার নাম দেয় উন্মাদ, বৈষ্ণব কবি ইহার নামকরণ করিয়াছেন "দিব্যোন্মাদ"। যে ভাল বাসিয়া উন্মাদ না হয় সে কি ভগবান্‌কে পাইবার অধিকারী হয়? এ ভালবাসা সংসারের বহুদূরে, সাংসারিকের ক্ষুদ্র কল্পনার বহু উচ্চে, অহমিকাপূর্ণ তুচ্ছ জীবের বুদ্ধির আয়ত্তের অনেক বাহিরে অবস্থিত। বৈষ্ণব কবির আধ্যাত্মিকতা এই সকল কবিতার প্রতিঅক্ষরে অক্ষরে, প্রতি শব্দবিন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে; এই সকল পদে বৈষ্ণব কবি প্রণয় রাগ ছাড়িয়া প্রেম রাগে বিচরণ করিয়াছেন—তাহা যিনি দেখিতে না পান তিনি বৃথাই বৈষ্ণবকবির পদাবলী পাঠে সময়ক্ষেপ করেন।

অকথ্য বেদন সই কহা নাহি যায়।
যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়॥
পায়ে ধরি কান্দে তার চিকুর গড়ি যায়।
সোণার পুতলি যেন ধূলায় লুটায়॥

মহাকবি চণ্ডীদাসবিরচিত এই কবিতায় শ্রীরাধার যে মহিমাময়ী মূর্ত্তি চিত্রিত হইয়াছে, কোনও পার্থিব নায়িকায় কি এই মূর্ত্তি সম্ভব? শত বৎসর পরে সুধন্য বঙ্গ দেশের অধিবাসিগণ এই দিব্যমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া জীবন সার্থক করিয়াছিল।

সেকথা যাউক, এখন আমরা শ্রীরাধার বিরহকর্ষিত মূর্ত্তির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এই মূর্ত্তি সখী কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণসমীপে চিত্রিত হইয়াছে।

মাধব বিধু বদনা।
কবহুঁ না জানই বিরহক বেদনা॥

তুহুঁ পরদেশ তেঁ ভেলি ক্ষীণা।
প্রেমপরতাপে চেতন হরু দীনা॥
কিসলয় তেজি শুতলি আয়সে
কোকিল কলরবে উঠই তরাসে॥
পোরহি কুচ কুঙ্কুম দূর গেল।
কৃশ ভুজ ভূখন খিতিতল মেল॥
অবনত বদনে হেরত গীন।
ক্ষিতি লিখইতে ভেল অঙ্গুলি ছীন॥
কহই বিদ্যাপতি উচিত চরীত।
সে সব গণইতে ভেলি মূরছিত॥

বিদ্যাপতির সেই লালসাময়ী রাধিকার আজ কি অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! যাহার যত লালসা তাহারই তত বিরহ, সেই চিত্র আর এই চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। এই চিত্রখানি দেখিলেই রামায়ণের বিরহকর্ষিতা সীতা দেবীর ছবিখানি হৃদয়পটে জাগ্রত হইয়া উঠে।

দদর্শ শুক্লপক্ষাদৌ চন্দ্ররেখামিবোজ্জ্বলাম্।
মন্দপ্রখ্যায়মানেন রূপেণ রুচিরপ্রভাম্॥
পিনদ্ধাং ধূম জালেন শিখামিব বিভাবসোঃ॥
পীতেনৈকেন সংবীতাং ক্লিষ্টেনোত্তমবাসসা।
সপঙ্কামনলঙ্কারাং বিপদ্মামিব পদ্মিনীম্॥ *

আবার বিদ্যাপতি কহিতেছেন:—

মাধব দেখলি বিয়োগিনী বামে
অধর ন হাস বিলাস সখি সঙ্গ
আহোনিশ জপ তুয়া নামে॥
আনস শরদ সুধাকর সমতমু
বোলই মধুর ধুনি বানী।
কোমল অরুণ কমল কুম্ভিলায়সে
দেখি মন অই লহ জানি॥
হৃদয়ক ভার ভেল সুবদনি
নয়ন না ছোর নিরোধে।

* রামায়ণম্, সুন্দর কাণ্ড ১৫শ স।

সখী সব আয় খেলাওয়ল রঙ্গ করি
তনু মন কিছুও না রোধে ॥
রগড়ল চানক মৃগমদ কুঙ্কুম
সব তেজলি তুয়া লাগি।
জনি জলহীন মীনজক ফিরইছ
আহোনিশ রহইছ জাগি ॥ (১)

এখন শ্রীরাধার এমন অবস্থা যে চেতন কি অচেতন তাহা বুঝা যায় না—

"চেতন মূরছন বুঝই না পারি।"

আবার পরক্ষণেই রাধা প্রকৃত উন্মাদ—

মাধব কি কহব বিরহ বিষাদ।
তিল এক তুঁও বিনে যো কাহ শতযুগ
তাহে কি এতহুঁ পরমাদ ॥
পন্থ নেহারিতে নয়ন আন্ধারল
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহ।
কত উন্মাদ মোহ বহি যাওত
কত পরবোধব কেহ ॥
দশমী দশায়ে আছয়ে এক ঔষধ
শ্রবণে কহিয়ে তুয়া নাম।
শুনাইতে তবহি পরাণ ফেরি আওত
সো দুখ কি কহব হাম ॥
কত কত বেরি তোহে সম্বাদলু
কৈছন তুয়া আশোয়াস।
না বুঝিয়ে রীত ভীত রহুঁ অন্তরে
কহ তহি বলরাম দাস ॥

বলরাম দাস যে চিত্র দেখাইয়াছেন তাহা কল্পিত চিত্র মাত্র নহে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জীবনে এমনই অবস্থা বারংবার লক্ষিত হইয়াছে। (১) ভক্তের ভাবময় জীবনে তিন অবস্থা ভগবদ্ভক্তগণ বর্ণনা করিয়াছেন—যথা বাহ্য—অর্দ্ধবাহ্য ও অন্তর্দশা। যখন হৃদয় ভক্তিতে পরিপূর্ণ অথচ সংসারের জ্ঞান থাকে

(১) নগেন্দ্র নাথ গুপ্ত সম্পাদিত বিদ্যাপতি (সা. প গ্র) ৪৪৭।

তখন তাহাকে বাহ্য দশা কহে। যখন সেইরূপ অবস্থায় হৃদয়ের কার্য্য অধিক হয় কিন্তু একেবারে বাহ্য লুপ্ত হইয়া যায় না তখন তাহাকে অর্দ্ধবাহ্য দশা কহে। যখন বাহ্য একেবারে লুপ্ত হইয়া হৃদয় প্রিয়চিন্তায় সম্পূর্ণ মাত্রায় বিলীন হইয়া যায় তখন তাহাকে অন্তর্দশা কহে। বাহ্যে নিজের অবস্থা নিজে স্মরণ করিবার ও বর্ণনা করিবার শক্তি থাকে। অর্দ্ধ বাহ্যে কখনও প্রলাপ কখনও বা স্বাভাবিক কথা ভক্তের মুখে উচ্চারিত হয়। অন্তর্দশায় বাহ্য জ্ঞান একেবারে থাকে না। এ সকল অবস্থাই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জীবনে প্রকটিত হইয়াছিল। (২) "কৃষ্ণ মথুরায় গেল গোপীর যে দশা উপজিল। কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা হইল"। (৩)

আমরা শ্রীরাধার অর্দ্ধ বাহ্য দশার একটী চিত্র দেখাইয়াছি আরও দু একটী দেখাইতে ইচ্ছা করি। চিত্রগুলি এত সুন্দর যে রাশি রাশি উদ্ধৃত করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সময় এবং স্থান সঙ্কীর্ণতার জন্য তাহা করিতে পারিলাম না।

সুচির বিরহে যব ক্ষীণ কলেবর
বিগলিত ভূষণ বেশ।
আছয়ে তোহারি পরশ রস লালসে
কেবল জীবন শেষ॥
মাধব শুনইতে তোহারি সম্বাদ।
শিশিরের লতা হেন বিনি অবলম্বনে
উঠইতে করু কত সাধ॥
তোহারি রচিত ফুল হার নিরখি ধনী
পহিরলি শির পর লাই।
তুয়া পরিরম্ভণে অনুভবি মনমাহা
পহিরলি হৃদয় লাগাই॥
উরল মনসিজ ভরমে অভিসারই
বাঢ়ল অধিক তরাস।
চলইতে কহই কৈছে পুন আওর
ভণ ঘনশ্যামদাস॥

---

(১) চৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্য ১৭শ দেখ —
(২) ঐ ঐ ২০শ ,,
(৩) ঐ ঐ ১৮শ ,,

মোহের এই এক অবস্থা। শ্রীরামচন্দ্র জানকী প্রেরিত মণি হৃদয়ে ধারণ করিয়া এমনি সুখ অনুভব করিয়াছিলেন।

স প্রাপ হৃদয়ন্যস্তমণিস্পর্শনিমীলিতঃ।
অপায়াধরসংসর্গাং প্রিয়ালিঙ্গন নির্বৃতিম্॥ (১)

অর্দ্ধ বাহ্য দশার আর এক অবস্থা সখী কৃষ্ণের কাছে বর্ণনা করিয়াছেন—

তুয়া নামে প্রাণ পাই সব দিশ যায়।
না দেখিয়া চাঁদ মুখ কান্দে উভরায়॥
কাঁহা মোর দিব্যাঞ্জন নয়নাভিরাম।
কোটীন্দু শীতল কাঁহা নবঘনশ্যাম॥
অমৃতের সার কাঁহা সুগন্ধি চন্দন।
পঞ্চেন্দ্রিয় কর্ষ কাঁহা মুরলীবদন॥
দূরেতে তমাল তরু করি দরশন।
উপগত হৈয়া ধায় চাহে আলিঙ্গন॥
কি কহিব রাইক যো উনমাদ।
হেরইতে পশুপাখী করয়ে বিষাদ॥
পুন পুন চেতন পুন পুন ভোর।
নরোত্তম দাসক দুখ নাহি ওর॥

এখন শ্রীরাধার ক্রমশঃ সর্ব্ব বস্তুতে শ্রীকৃষ্ণ স্ফূর্ত্তি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অন্তরে বাহিরে জগন্ময় সেই কমনীয় মূর্ত্তি তাঁহার নয়নে বিরাজ করিতেছে; সেই মূর্ত্তি যখন দেখিতে না পান তখনই তাঁহার আকুল ক্রন্দন জাগিয়া উঠে; যে মূর্ত্তি বিরহের পূর্ব্বে শুধু হৃদয় মধ্যে ছিল তাহা এখন বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে। যে শ্রীরাধা বিরহের প্রথমাবস্থায় বলিয়াছেন—

আমারে ছাড়িয়া শ্যাম,　　মধুপুরে যাইবেন
　একথা তো কভু শুনি নাই।
হিয়ার মাঝরে মোর　　এ ঘোর মন্দিরে গো
　রতন পালঙ্ক বিছা আছে।
অনুরাগের তুলিকায়　　বিছান হয়েছে তায়
　শ্যামচাঁদ ঘুমায়ে রয়েছে॥

* রঘুবংশ—১৪শ সর্গ—৬৫।

তোমরা যে বল শ্যাম মধুপুরে যাইবেন
কোন পথে বন্ধু পলাইবে।
এ বুক চিরিয়া যবে বাহির করিয়া দিব
তবে তো শ্যাম মধুপুরে যাবে॥

তিনিই বিরহে প্রাণমাত্রাবশেষ হইয়াছিলেন। যে হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বদা বিরাজমান তাঁহার আবার বিরহ কেমন করিয়া হয়? বিরহ আসে অন্তর্লীনতার অভাবে—বিরহ আসে পূর্ণৈকাগ্রতার অভাবে—সংসারাশক্তির প্রভাবে—দ্বৈত বোধের মায়াময়ী বিস্মৃতির ঘোরে। হৃদয়ে একবার কৃষ্ণস্ফূর্ত্তি হইয়াছিল বলিয়াই শ্রীরাধার বিরহের এত প্রখরতা, তাহার নৈরাশ্যের এত তীব্রতা, তাহার চিন্তার এত একাগ্রতা যদি হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রতিষ্ঠা না হইত তাহা হইলে কি কৃষ্ণবিরহে রাধাকে উন্মাদ করিতে পারিত? যে ভালবাসা কেবল ইন্দ্রিয়ের তাহা দ্বারা প্রিয় বিরহে ক্ষণিক যন্ত্রণা মাত্র। যে ভালবাসা মনের ও ইন্দ্রিয়ের সেই ভালবাসাতেই প্রিয় বিরহে অসীম যাতনা —মনের যাতনা, ইন্দ্রিয়ের যাতনা, আত্মার যাতনা, শরীরের যাতনা। সেই বিরহেই বিরহী বিরহিণীর

চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥

এই দশ দশা সম্ভবে এবং উহার পরাকাষ্ঠাতেই উজ্জ্বল নীলমণি শৃঙ্গার ভেদ ও বিশ্বময় প্রিয়স্ফূর্ত্তি। প্রথমে প্রেমোৎপত্তি পরে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রিয় সম্ভোগ এবং মনের ভিতর প্রিয়ের প্রতিষ্ঠা; তাহার পর বিশ্ব ব্যাপিয়া প্রতি অণুর মাঝে প্রিয়তম মূর্ত্তির স্ফুরণ তাহার পর নিজের আত্মার ভিতর প্রিয়তমের আত্মার অনুভব, সম্মিলন ও একীভূত হওয়া। জ্ঞানদ্বারা মনের মধ্যে অনুভূত, দৃষ্ট ও আস্বাদিত প্রিয় মূর্ত্তির সর্ব্বক্ষণ ও সর্ব্বত্রানুভূতির প্রবল ও বিশ্ববিজয়িনী আকাঙ্ক্ষাই ভক্তের মনে ভগবদ্বিরহের এবং শ্রীরাধার মনে শ্রীকৃষ্ণের বিরহ সৃষ্টির কারণ। এই আকাঙ্ক্ষা ও তজ্জনিত এইরূপ সম্পূর্ণানুভূতি হইতেই একাকারিতা বা যোগ আইসে। তখন আর ভক্তের মনে দ্বৈত ভাব থাকে না। সকল বেদ বেদান্তের যাহা প্রতিপাদ্য ভক্তের তখন সেই অপূর্ব্ব অবস্থা। তখন ভক্ত ভগবানের পার্থক্য তিরোহিত হইয়া যায়। এইরূপে চরম বিরহে পরমাত্মা অনুভব উপস্থিত করে।

———

সমালোচনা।

The soul of Man.—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—রামকৃষ্ণ মিশন, ময়নাপুর, মান্দ্রাজ। ১৫৫ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৲ টাকা।

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রণীত জীবাত্মার তত্ত্ব সম্বন্ধীয় এই নূতন প্রকাশিত পুস্তক খানিতে ১৯০৯ সালের খ্রীষ্টমাসের সময় তৎপ্রদত্ত Science, modern and ancient (প্রাচীন ও আধুনিক বিজ্ঞান), Determination of Conscious tendencies (চেতন জীবের প্রবৃত্তি নিরূপণ), regions higher and lower (উচ্চ ও নিম্ন লোকসমূহ), ও The locus of the soul (আত্মার বাসস্থান)—এই চারিটি অতিশয় হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের বক্তৃতা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়, শুধু বেদান্তাদি হিন্দু শাস্ত্রে এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশাস্ত্রেই যে তাঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি, তাহা নহে, উপদিষ্ট বিষয়গুলি তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যা নহে, সহজ সাধনের দ্বারা জীবনে সেগুলি উপলব্ধি করিয়াছেন। এই কারণেই তাঁহার বাক্যপ্রণালীও অতি সরল। প্রাত্যহিক জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি লইয়া তদ্দ্বারা বেদান্তের দুরূহ তত্ত্বসমূহ ইনি অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। 'উচ্চ ও নিম্ন লোক সমূহ' নামক বক্তৃতায় ইনি 'স্বর্গ ও নরক যে কেবল মনের অবস্থাবিশেষ মাত্র, উহাদের বাস্তব সত্তা নাই, এইমত খণ্ডন করিতে ও স্বর্গ নরক নামধেয় স্থানবিশেষেরও যে অস্তিত্ব আছে, তাহা শাস্ত্র ও যুক্তিসহকারে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই বক্তৃতাটী সর্ব্বসাধারণে প্রণিধান সহকারে পাঠ করিলে চিন্তার অনেক বস্তু পাইবেন। মোট কথা, যাঁহারা ধর্ম্ম জীবন যাপন করিতে ইচ্ছা করেন এবং ধর্ম্মের দুরূহ তত্ত্বসমূহ অপরোক্ষানুভূতিসম্পন্ন আচার্য্য মুখ হইতে অতি সরল ভাবে বিবৃত দেখিতে চাহেন, তাঁহারাই এই পুস্তক পাঠে প্রভূত উপকার পাইবেন। জীবাত্মা কি বস্তু, পরমাত্মার সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ,জীবাত্মার ক্রমবিকাশ হইয়া কিরূপে পরিশেষে উভয়ের সম্মিলন হয়, এই সমুদয় সুপরিচিত বৈদান্তিক তত্ত্বসমূহই ইহাতে বিবৃত—এই কারণে আমরা গ্রন্থপ্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা না করিয়া আলোচনার প্রণালীর উল্লেখ করিয়াই গ্রন্থের পরিচয় প্রদানে ক্ষান্ত হইলাম। বলা বাহুল্য,মান্দ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন হইতে প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তকাবলির ন্যায় ইহার কাগজ ছাপা প্রভৃতি অতি সুন্দর।

The Path to Perfection.—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—রামকৃষ্ণ মিশন, ময়নাপুর, মান্দ্রাজ। ক্রাউন, ১৯ পৃঃ। মূল্য ৵৹ আনা।

এটী স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ প্রদত্ত একটা বক্তৃতা পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পূর্ণত্ব বা সিদ্ধিলাভের উপায় অতি সহজ ভাষায় সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

Principles and purpose of Vedanta,—স্বামী পরমানন্দ প্রণীত। ৩৪ পৃঃ। বেদান্ত সমিতি, ৩৫ ওয়েষ্ট, ৮০ ষ্ট্রীট, নিউইয়র্ক, আমেরিকায় প্রাপ্তব্য।

স্বামী পরমানন্দ প্রণীত The path of Devotion, vedanta in Practice ও The true spirit of religion is universal নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনখানি পুস্তিকা পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি 'বেদান্তের মূল তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য' নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় অসাম্প্রদায়িক ভাবে বেদান্তের সমুদয় তত্ত্ব সংক্ষেপে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাতে বেদান্ত ও তাহার উৎপত্তি, ঈশ্বরতত্ত্ব, সগুণ ও নিগুর্ণ ঈশ্বর, ঈশ্বরের সহিত মানবের সম্বন্ধ, কর্ম্মফল, শাস্তি ও পুরস্কার, পুনর্জ্জন্ম, আত্মার অমরত্ব, যোগ, কর্ম্মযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ এবং বেদান্তের সার্ব্বভৌমিকতা এই কয়েকটী বেদান্তের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় সংক্ষিপ্ত অথচ সরল ভাবে বর্ণিত আছে। পুস্তিকাখানি প্রথম শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপযোগী।

লক্ষ্য মাসিক পত্র। ১ম তরঙ্গ ১ম অংশ। ৬৪ পৃষ্ঠা। সম্পাদক শ্রীযুগলকুমার ভারতী কালনা পোষ্ট (বর্দ্ধমান)। বার্ষিক মূল্য ১৷০ টাকা।

এই নূতন মাসিক পত্রখানি সমালোচনার জন্য অনেক দিন টেবিলে পড়িয়া আছে। সময়াভাবে পড়িয়া উঠিতে পারি নাই। আজ একটু অবকাশ পাইয়া ইহার অন্তর্গত কয়েকটী প্রবন্ধ পড়িয়া আমাদের মন্তব্য দুই চারি কথায় বলিতেছি।

এই পত্র ধর্ম্মসম্বন্ধীয় আলোচনায় পূর্ণ। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ ও কবিতায় ইহার অধিকাংশ কলেবর পূর্ণ হইলেও ইহাতে মোহমুদ্গার ও কৌপিনপঞ্চকের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীদীনবন্ধু বেদান্তরত্ন মহাশয়ের ভক্তিতত্ত্ব প্রবন্ধই এই সংখ্যাটির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা ক্রমশঃ প্রকাশ্য। আমরা আশা করি, এই প্রবন্ধ নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হইবে এবং এবারকার মত নিতান্ত অল্পমাত্রায় না হইয়া অধিক পরিমাণে বাহির হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কথিত শিক্ষাষ্টক ও উপাদেয়। মোহমুদ্গার ও কৌপীনপঞ্চকের পদ্যানুবাদও মন্দ নহে। 'অভি-নন্দন' শীর্ষক কবিতাটি আমাদের বেশ ভাল লাগিল। লক্ষ্য ক্ষুদ্র কলেবর হইলেও ইহার লক্ষ্য অতি মহৎ। এই নাস্তিকতা জড়বাদের দিনে ধর্ম্মের আলোক হস্তে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া কম সৎসাহসের পরিচয় নহে। আমরা এই পত্রের বহুল প্রচার ও উন্নতি কামনা করি।

উপসংহারে সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া কয়েকটি অপ্রিয় কথা বলিতে হইতেছে। আশা করি সম্পাদক মহাশয় ভবিষ্যতে এই দোষগুলির সংশোধন করিয়া ইহাকে আমাদের আরো অধিক আদরের বস্তু করিবেন। ইহার প্রথম দোষ কবিতার সংখ্যা বাহুল্য ও ক্রম প্রকাশ্য প্রবন্ধের আতিশয্য। মাসিকপত্রে যত সুলিখিত গদ্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, ততই ভাল। আর ২।১ পাতা ক্রম প্রকাশিত প্রবন্ধে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে। কবিতাগুলিতে স্থানে স্থানে অনেক দোষ আছে—আমরা অনেক স্থলে পড়িয়া অর্থবোধ করিতে পারি নাই। ভাষা ও বর্ণশুদ্ধির দিকে যেন সম্পাদক মহাশয়ের আদৌ